أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

দুনিয়া ও আখেরাত (২)

ভলিউম-২

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান এম, এম; এফ, আর
প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আদ্‌দুনিয়া ওয়াল্ আখেরাহ্ ...... **১—৬৭**

পুনরুত্থান সম্পর্কে ১

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও আখেরাতের স্থায়িত্ব . ৩

দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাস মনে উপস্থিত না থাকা ৫

মানুষ প্রতি মুহূর্তে সফরে আছে ৬

প্রতি মুহূর্তে মানুষের আয়ু হ্রাস পায় ৮

আখেরাতের সফরের প্রতি গুরুত্ব প্রদান .. ৮

নফ্‌সের ধোঁকা ৯

এবাদতে গীবতের প্রতিক্রিয়া ১১

সুদের প্রতি আকর্ষণ এবং যাকাত হইতে পশ্চাদপসরণ ১৩

কার্যকরী এবং স্থায়ী মুরাকাবার আবশ্যকতা ১৫

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ১৫

দুনিয়া খেল-তামাশা ভিন্ন কিছুই নহে .. ১৭

শুধু বিশ্বাস স্থাপন যথেষ্ট নহে ১৮

ফ্যাশন অনুসারীদের প্রশ্ন ও উহার উত্তর ১৯

মাশায়েখে কেরামের কর্তব্য ২২

অনভিজ্ঞ মুরশিদের কার্যপদ্ধতি ২৩

কামেল পীরের কার্যধারা ২৪

আমলে 'আযীমত' এবং 'রোখ্‌ছত' ২৬

শোক্‌রের তওফীক ও উহার প্রণালী ... ২৮

বিপদের বিভিন্ন প্রকার ২৯

আযীমত এবং রোখ্‌ছতের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত .. ৩০

শরীঅতী সহজ ব্যবস্থার ক্রিয়া ৩১

সুন্নত পালন করার অর্থ ৩২

আমলই এল্‌মের উদ্দেশ্য ৩৩

তক্‌দীরের মাস্‌আলা ৩৪

তক্‌দীরে অবিশ্বাসী ধৈর্যহীন ৩৫

খোদার রহস্যসমূহের অনুসন্ধান ৩৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও হেকমত ... ৪১

কোরআনে করীম তাজাল্লীবিশেষ ৪৫

তাজাল্লীর লক্ষণ বা ফল ৪৯

নশ্বরতা এবং অবিনশ্বরতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যক ৫১

দুনিয়ার কোন পদার্থই অনর্থক নহে ... ৫৩

আল্লাহ্ তা'আলার অভাবশূন্যতার স্বরূপ ৫৪

দুনিয়া ও আখেরাতের স্বরূপ বুঝা ৫৭

নফ্‌সকে পবিত্র করিবার উপায় ৬০

পীরের হাল্‌কা এবং তাওয়াজ্জুহের তথ্য ৬১

দুনিয়ার প্রকারভেদ ৬৩

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় ৬৫

হাম্মুল আখেরাহ্ ...... **৬৮—১১৫**

মহান ভবিষ্যদ্বাণী ৬৮

আল্লাহ্‌র ওয়াদা অলঙ্ঘনীয় ৬৯

-এর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও ইহার ফলাফল ৭১

আল্লাহ্‌র কালাম স্বর হইতে পবিত্র ৭৩

শিশুদের শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞ আলেম নিযুক্ত থাকা উচিত ৭৩

বাধ্যতামূলক বিশ্বাস ধর্তব্য নহে ৭৪

মু'জেযার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা ৭৪

মহান ভবিষ্যদ্বাণীর তফ্‌সীল ৭৫

হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসাপদ্ধতি ... ৭৭

কামেল পীরের পরিচয় ৭৯

সংসারানুরাগ ও পরকালের প্রতি উদাসীনতা ৮১

দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়া অনুরাগের পার্থক্য ৮৫

দুনিয়ার মহব্বত এবং লালসার স্তর ... ৮৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**
রাসূল (দঃ)-এর মহব্বতের মাপকাঠি ৮৮
নারীর উপর সংসারাসক্তির প্রাধান্য ৯১
চিন্তার প্রয়োজন ৯৩
দুনিয়াদার অস্থিরতা ও চিন্তামুক্ত নহে ৯৬
দুনিয়া কাম্য হওয়ার বিভিন্ন স্তর ৯৭
আল্লাহ্ওয়ালাগণ মৃত্যুকে ভয় করেন না ৯৮
ঈমানের দৌলত মর্যাদার যোগ্য ১০০
আখেরাতের সহিত মনোযোগ স্থাপনের উপায় ১০২
বেহেশ্ত ও দোযখের বিস্তৃতি ১০৬
আজকাল প্রত্যেক মূর্খই মুজ্তাহিদ্ . . . ১০৮
ধর্মপ্রচারের নিয়ম ১০৯
আখেরাত অন্বেষণের নিয়ম ১১০
তেজারাতে আখেরাহ্ . . . . . . **১১৬—১৪৪**
মুসলমানদের একটি ত্রুটি ১১৬
ইতিহাস এবং হাদীসের মধ্যে প্রভেদ ১১৭
ছাহাবায়ে কেরামের লক্ষ্য ছিল ধর্মের উন্নতি ১১৮
জাতির প্রতি সমবেদনাশীলদের লোক দেখান সমবেদনা জ্ঞাপন ১১৯
আলেমদের প্রতি প্রশ্নবাণের স্বরূপ ১২১
স্বার্থত্যাগের স্বরূপ ১২২
ধর্মকে বিভক্তিকরণের স্বরূপ ১২৩
আয়াতের অর্থ ১২৪
দৈহিক এবাদত ও আর্থিক এবাদতের মধ্যে পার্থক্য ১২৬
শরীঅত হইতে দূরে সরিয়া থাকা ১২৯
বড়লোকদের দুর্বল বাহানা ১৩০
আল্লাহ্র রাস্তার ব্যয় করা সম্বন্ধে ত্রুটি ১৩১
হাদিয়া কবূল করার শর্ত ১৩৩
বাতিল পীরের দৃষ্টান্ত ১৩৪
বিষয় **পৃষ্ঠা**
হাদিয়ার নিয়মাবলী ১৩৫
চাঁদা আদায় করার শর্তসমূহ ১৩৭
শরীঅতানুগ চাঁদার প্রতি উৎসাহ প্রদান ১৪০
ধর্মানুরাগের দৃষ্টান্ত ১৪১
ছাত্রাবাসের ফযীলত ১৪২
ছদ্কায়ে জারিয়ার ফযীলত্ ১৪৩
তায্কীরুল্ আখেরাহ্ . . . . . . **১৪৫—১৬৭**
উপক্রমণিকা ১৪৫
আরেফ এবং সাধারণ লোকের এবাদতের পার্থক্য ১৪৬
ছাহাবায়ে কেরামের এলমের স্বরূপ ১৪৭
অনুসরণে লজ্জার কারণ ১৪৮
আল্লাহ্ওয়ালার দৃষ্টিতে দুনিয়া ১৫০
খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার সঠিক পন্থা ১৫২
সবকিছুই আমলের উপর নির্ভরশীল ১৫২
তক্দীর সম্বন্ধে তা'লীমের ফল ১৫৩
বিজ্ঞান এবং দর্শনের তথ্যানুসন্ধান ১৫৫
আলেমদের সংসর্গের প্রয়োজনীয়তা . . ১৫৭
দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়ার অনুরাগ ১৫৯
ছগীরা গুনাহের প্রতি বেপরোয়া হওয়ার কুফল ১৬১
ধর্ম এবং উন্নতি ১৬২
ধর্মপরায়ণ লোকদের ত্রুটি ১৬৩
সূফিগণের ত্রুটি ১৬৫
যেকের এবং কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ১৬৬
বাইআ'তের স্বরূপ ১৬৭
তারজীহুল্ আখেরাহ্ . . . . . **১৬৮—২০৮**
আল্লাহ্ তা'আলার অভিযোগ ১৬৮
ক্ষতিকর বিষয়ের বিভিন্ন স্তর ১৭০
অসতর্কতার স্তর ১৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাযের দ্বারা মন্দ কাজের দ্বার বন্ধ হওয়া	১৭১
দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ফল	১৭২
আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকার কুফল	১৭৪
পূর্ণাঙ্গ তওহীদের ক্রিয়া	১৭৫
অদৃষ্টের স্বরূপ	১৭৬
শরীঅতে বিশ্বাসের স্থান	১৭৭
তওবার ভরসায় পাপ কার্য করা নিষিদ্ধ	১৭৮
দুনিয়ার প্রধান দুইটি শাখা	১৭৯
অনুমতি ব্যতীত পর-দ্রব্য ব্যবহার করা অবৈধ	১৮২
সহানুভূতি প্রকাশ ও ধার দেওয়ার ফল	১৮৩
চাঁদার টাকা আত্মসাৎ করা	১৮৪
ধর্মকে সুযোগ-সুবিধার অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে	১৮৫
খাছ লোকদের অপকর্ম	১৮৬
স্বভাব সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা	১৮৮
মান-মর্যাদার মোহ অর্থলোভ হইতেও অধিক	১৯১
সম্মান মোহের ফল	১৯২
কেবল ধর্মের বাহ্যিক রূপের নাম ধর্ম নহে	১৯৩
রূহ এবং দেহের সম্পর্ক	১৯৫
খাঁটি নিয়তের লক্ষণ	১৯৭
নফ্‌সের গোপন ধোঁকা	১৯৮
মূলতঃ দুনিয়া অন্বেষণ করা নিষিদ্ধ নহে	১৯৯
নবী (দঃ)-এর অভ্যাসের অনুসরণ	১৯৯
কামেল পীরের অবস্থা	২০০
দুনিয়া কামনার প্রকারভেদ	২০২
দুনিয়া শব্দের নিগূঢ়তত্ত্ব	২০৪
আখেরাতের অবস্থা	২০৬
আখেরাতের অস্তিত্ব	২০৮
দারুল মাস্‌উদ্‌	**২০৯—২২৯**
উপক্রমণিকা	২০৯
কবর এবং রূহের সম্পর্ক	২১০
আখেরাতকে ভয় করার কারণ	২১১
আখেরাতের নেয়ামত সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফল	২১২
দানকৃত বস্তুর সওয়াব মৃত ব্যক্তিরা পাইয়া থাকে	২১৪
দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতসমূহের সাদৃশ্য	২১৭
বেহেশ্‌তের বিস্ময়কর ফল	২১৯
আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট	২১৯
বেহেশ্‌তে কোন কষ্ট নাই	২২১
রূহের অবস্থা	২২২
সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের স্বরূপ	২২৫
নেক আমলের তওফীক	২২৬
দুইটি এল্‌মী সূক্ষ্ম কথা	২২৭
সত্যিকারের এল্‌ম	২২৯

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

■

আদ্‌দুনিয়া ওয়াল্‌ আখেরাহ্‌

[ইহকাল ও পরকাল]

■

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ
مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ
فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ ـ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ○ لا وَّاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ
الْحَيَوَانُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

পুনরুত্থান সম্পর্কে

উল্লিখিত আয়াতটির পূর্বে পুনরুত্থানের মাস্‌আলা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপূর্বে নবুওয়ত সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহার পূর্বে একত্ববাদের বর্ণনা রহিয়াছে। মোটকথা, এই তিনটি বিষয় প্রায় পর্যায়ক্রমিকরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ত্রয় সমগ্র কোরআনে 'উম্মাহাতুল মাসায়েল' অর্থাৎ, যাবতীয় মাস্‌আলাসমূহের মূলরূপে গণ্য হইতেছে। অন্যান্য মাস্‌আলাগুলি ইহাদের পরিপূরক, উপক্রমণিকা বা মূল বক্তব্যের সূচনা। এই তিনটি বিষয় সর্ববিষয়ের মূলাধার। এতদসত্ত্বেও বলা যাইবে না যে, কোরআনের অন্যান্য মাস্‌আলাগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় নহে ; বরং কোরআন শরীফের প্রত্যেকটি মাস্‌আলাই অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এই তিনটি মাস্‌আলা কোরআনের অন্যান্য মাস্‌আলাগুলির উৎস ও লক্ষ্যস্থল বলিয়া অন্যান্য সমস্ত মাস্‌আলা অপেক্ষা এই তিনটির নিজস্ব মর্যাদা ও গুরুত্ব অধিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

গত পরশু দিল্লীস্থিত মাদ্রাসা আবদুল ওয়াহ্‌হাবে 'তাওহীদ' (একত্ববাদ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছি। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে এবং গতকল্য পানিপথের মজলিসে 'নবুওয়ত' সম্বন্ধে যথেষ্ট বর্ণনা করিয়াছি। সুতরাং অদ্যকার ওয়াযে কেবল পুনরুত্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। তাহাতে কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ পর্যায়ক্রমে বিষয় তিনটিকে বর্ণনা করিয়াছেন, আমার এই সফরেও বিষয় তিনটি তদ্রূপ পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হইয়া যাইবে। এই আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তুর সারাংশ বটে। সুতরাং প্রথমত এই তিনটি বিষয় কোরআনের যাবতীয় মাস্‌আলাসমূহের মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, সেদিক হইতেও পুনরুত্থানের মাস্‌আলাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এতদ্ভিন্ন এই আয়াতটি পুনরুত্থান বা আখেরাতের মাস্‌আলার সারাংশ, আর সারাংশই বস্তুর মূল ও নির্যাস হইয়া থাকে। এই হিসাবে ইহা অত্যধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণেই সারাংশকে প্রাণবস্তু বলা হয়। তবে প্রথমত পুনরুত্থানের মাস্‌আলাটি সঙ্গীয় মাস্‌আলা দুইটির ন্যায় কোরআনের অন্যান্য মাস্‌আলার প্রাণবস্তু। অতঃপর এই আয়াতটি সেই প্রাণবস্তুর সারাংশ। সুতরাং ইহা আরও অধিক প্রয়োজনীয় বা প্রাণের প্রাণবস্তু বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব, ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইল। শ্রোতৃমণ্ডলীর উচিত গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গভীর মনোযোগ ও একনিষ্ঠতার সহিত এই বিষয়টিকে শ্রবণ করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। এই বিষয়টি যদিও নিতান্ত স্পষ্ট বলিয়া প্রমাণের বা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে, কিন্তু আজকাল মানুষ এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া রহিয়াছে; সুতরাং সচেতন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সাধারণত নিয়ম এই যে, প্রকাশ্য বস্তু প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে। তবে অসতর্ক হইয়া ভুলিয়া থাকার সময় সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। যেমন, কোন দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যদি দিবালোকে অন্ধের ন্যায় কাজ করে, তবে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয়, "মিয়া! দিন প্রকাশ পাইয়াছে বা সূর্য উদিত হইয়াছে।" অথচ সেই ব্যক্তি এবং সারা জগতের মানুষ অবগত আছে যে, সূর্য উদিত হইয়াছে এবং দিবা আলোকিত হইয়াছে। কাজেই এরূপ উক্তি অনর্থক এবং অনাবশ্যক ছিল। অথচ কেহ ইহাকে অনর্থক বলে না, এরূপ সম্বোধনের উদ্দেশ্য সূর্যোদয়ের সংবাদ প্রদান নহে, কারণ, آفتاب آمد دلیل آفتاب "সূর্য নিজেই নিজের প্রমাণ।" ইহার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজনীয়ও নহে; বরং এখানে উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যোদয়ের সময় তোমার যেরূপ কাজ করা উচিত ছিল, তুমি তদ্রূপ করিতেছ না, ইহাতে সন্দেহ হয়, সূর্য উদিত হইয়াছে বলিয়া তুমি মনে কর না। কেননা, তুমি তদনুযায়ী কাজ কর না। সুতরাং আমি তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, হুঁশ ঠিক করিয়া কাজ কর। কিংবা কোন ব্যক্তি স্বীয় পিতার সহিত বেআদবী করিতেছে। তখন তাহাকে বলা হয়, মিয়া! ইনি তোমার পিতা। তবে এখানে কি পিতৃত্ব সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য? কখনই নহে। কেননা, পিতৃত্ব সম্বন্ধে বক্তা অপেক্ষা সম্বোধিত ব্যক্তি অধিক অবহিত। বক্তা হয়তো ২/৪ বৎসর ধরিয়া উহাদের পুত্রত্ব, পিতৃত্ব সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছে এবং সম্বোধিত ব্যক্তি জ্ঞান হওয়া অবধি 'আব্বা আব্বা' বলিয়া পয়সা চাহিয়াছে। এখানে পিতৃত্ব সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য হইলে দুনিয়াবাসী তাহাকে বেওকুফ বলিয়া অভিহিত করিত। অথচ কেহই তাহাকে বেওকুফ বলে না। অতএব, বুঝা গেল, এখানে শুধু এবিষয়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্য যে, ইনি তোমার পিতা, পিতৃত্বের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। তোমার বর্তমান কার্যধারা পিতৃত্বের মর্যাদার বিপরীত; বরং

তোমার আচরণে মনে হয়, তুমি তাঁহাকে পিতা বলিয়াই মনে কর না। কেননা, এরূপ আচরণ অপরের সহিত করা হয়। এই হিসাবে এরূপ সতর্কবাণী নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসার যোগ্য মনে করা হয়।

অতএব, দেখুন, তাহার পিতৃত্ব যদিও সুস্পষ্ট এবং বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে, তথাপি সতর্কবাণী হিসাবে ইহাকে প্রশংসনীয় মনে করা হয়। এইরূপে আলোচ্য পুনরুত্থান বিষয়টিও যে নিতান্ত স্পষ্ট, এই স্পষ্টতায় কোনই সন্দেহ নাই। তথাপি মানুষ ইহাকে ভুলিয়া থাকার কারণে বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও আখেরাতের স্থায়িত্বঃ এখন আমি উদ্দিষ্ট বিষয় বর্ণনা করিতেছি। এই বিষয়টি দুই অংশের সমন্বয়ে যুক্ত। দুনিয়ার অস্থায়িত্ব এবং আখেরাতের স্থায়িত্ব। প্রথম অংশটি যদিও দৃষ্ট হওয়াবশত এতই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার যে, বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে। কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি তৎতুলনায় কঠিন এবং সূক্ষ্ম। কাজেই বর্ণনার মুখাপেক্ষী। 'তৎতুলনায়' শব্দটি এই জন্য বলিলাম যে, ইহাও অধিক কঠিন নহে। কেননা, গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং প্রথমটি যখন স্পষ্ট, তখন তৎসঙ্গে জড়িত বিষয়টি আপনাআপনিই বুঝা যাইবে এবং উহা মানিয়া লওয়া অনিবার্য হইবে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিষয়টি স্বভাবত বাধ্যতামূলকভাবে দ্বিতীয়টির অর্থ ব্যক্ত করিতেছে। কেননা, প্রথমটি অনুভবনীয়। যে বস্তু অনুভবনীয় বস্তুর সহিত জড়িত হয়, তাহাও অনুভবনীয়ই হইয়া থাকে। অনুভবনীয় বিষয় বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নহে। দুনিয়ার অস্থায়িত্বকে অনুভবনীয় এবং সর্ববাদিসম্মত এই কারণে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত জ্ঞানীগণ দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা সর্ববাদিসম্মত।

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব এবং আখেরাতের স্থায়িত্বকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলার কারণ এই যে, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস যখন দৃঢ় হইয়া যায় এবং একদিন এখান হইতে সকলেরই পরলোকে যাত্রা করিতে হইবে, এ কথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে, তখন এই বিশ্বাসের অনিবার্য ফল এই হয় যে, দুনিয়া এবং উহার আনুষঙ্গিক পদার্থসমূহের প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বস্তু হইতে দৃষ্টি ফিরিয়া আসে, দুনিয়ার আসবাবপত্র হইতে আগ্রহ উঠিয়া যায়। কেননা, অস্থায়ী বস্তুর প্রতি ঘৃণা, বীতশ্রদ্ধ এবং উদাসীনতা সৃষ্টি হওয়া মানুষের স্বভাব। মানুষ একনিষ্ঠতাকে পছন্দ করে, ইহা আমরা দিবা-রাত্র দেখিয়া আসিতেছি।

যেমন, জনৈক মুসাফির সন্ধ্যাকালে কোন এক মুসাফিরখানার এক কামরায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সে উহাতে আসবাবপত্র রাখিয়া অবস্থানের এন্তেজাম করার পূর্বেই তাহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, সে উক্ত কামরায় মাত্র এক রাত্রির মেহমান। রাত্রি ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে এই কামরা ত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। এই কামরার সহিত মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য তাহার সাক্ষাৎ। অতঃপর এই মুসাফিরখানা কোথায়, আর সেইবা কোথায়? উক্ত কামরার কোন স্থান যদি ভাঙ্গা থাকে, উহা মেরামতের খেয়াল তাহার আদৌ হয় না। কোন কড়িকাঠ স্থানচ্যুত থাকিলে সে উহার স্থানে আর একটি বদলাইয়া দেওয়ার চিন্তা করে না। কিম্বা সাজ-সরঞ্জামের কোন ত্রুটি থাকিলে উহা পূর্ণ করিয়া লওয়ার প্রতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করে না। অথচ এখানে তাহাকে এক রাত্রি তো নিশ্চয়ই যাপন করিতে হইবে এবং বিশ্রামও করিতে হইবে। মানুষ স্বভাবত সুখ-শান্তির উপকরণ যোগাইতে ইচ্ছুক; সুতরাং স্বভাবের তাড়নায় কামরাটি

মেরামত করিয়া লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মুসাফিরকে কয়েক ঘণ্টা পরেই এই কামরা ত্যাগপূর্বক অন্যত্র যাইতে হইবে বলিয়া সে তাহা করে না।

এইরূপে যখন মানুষের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইবে যে, দুনিয়া অস্থায়ী, ইহা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়া অনিবার্য, তখন মুসাফিরখানার কামরার ন্যায় দুনিয়ার প্রতি অবশ্যই তাহার ঘৃণা জন্মিবে। কিন্তু নিজের বাসগৃহের কামরার ব্যাপারে কেহ এরূপ ব্যবহার করে না, যদিও মুসাফিরখানার কামরা এবং নিজের বাসগৃহের কামরা উভয়কেই এক দিন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া সমান বিশ্বাস আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা দেখিতেছি, যে ব্যবহার মুসাফিরখানার কামরার সহিত করা হয়, বাসগৃহের কামরার সহিত তদ্রূপ করা হয় না। বাসগৃহের কামরার কড়িকাঠ বাহির হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ উহা নূতন করিয়া লাগাইবার ফিকিরে লাগিয়া যায়। চুনের আস্তর মলিন হইয়া গেলে উহা চকচকে করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করে। সাজ-সরঞ্জামের ত্রুটি থাকিলে তাহা পূরণ করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইয়া যায়। এই প্রভেদ কেন? এই জন্য নহে যে, খোদা না করুন, দুনিয়া এবং বাড়ী-ঘরের অস্থায়িত্বের প্রতি আপনার বিশ্বাস নাই; বরং প্রভেদ এই জন্য যে, মুসাফিরখানার কামরায় প্রবেশের পূর্বেই আপনার এই বিশ্বাস পূর্ণভাবেই থাকে যে, প্রাতঃকালেই আপনাকে এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে। যতক্ষণ আপনি উক্ত কামরায় অবস্থান করেন, ততক্ষণ এই চলিয়া যাওয়ার কল্পনা অন্তরে হাজির থাকে। পক্ষান্তরে বাসগৃহের কামরায় প্রবেশ করার পূর্বে বা অবস্থানকালেও কোন সময় আপনার কল্পনাশক্তি আপনার মনে ইহা হইতে বিচ্ছেদের কল্পনা জাগাইয়া দেয় না; বরং কোন সময় ভুলেও এই চিন্তা উদয় হয় না, অথচ এবিষয়ে আপনার সুদৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। কিন্তু সেই বিশ্বাস মনে হাজির থাকে না। পক্ষান্তরে মুসাফিরখানার কামরায় অবস্থানকালে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যাওয়ার বিশ্বাস হামেশা মনে হাজির থাকে। এই কারণেই মুসাফিরখানার কামরা নিঃসঙ্গ ও ভয়ানক মনে হইয়া থাকে। উহার সহিত অন্তরের নামমাত্র আকর্ষণও হয় না। পক্ষান্তরে বাসগৃহের সহিত পূর্ণ মাত্রায় অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উহাতে প্রবেশ করিলে মনে শান্তি আসে, তথাকার প্রত্যেকটি বস্তু ভাল মনে হয়। এখানে আসিলে মনের সকল ভয়-ভীতি দূর হইয়া যায়। উহাকে সজ্জিত করার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে তরঙ্গায়িত হয়। অথচ ভয়ের কারণ অর্থাৎ, অস্থায়িত্বের বিশ্বাস এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রত্যয় উভয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। প্রভেদ শুধু এই যে, মুসাফিরখানার বেলায় বিশ্বাসও আছে, তাহা মনে সর্বক্ষণ হাজিরও আছে। আর দুনিয়ার বাসগৃহের বেলায় বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহা সর্বক্ষণ মনে উপস্থিত থাকে না।

আরও একটি প্রভেদ আছে যে, দুনিয়ার বিচ্ছেদ এবং অস্থায়িত্বের কল্পনা বর্তমানে বা নিকট ভবিষ্যতে হয় না; বরং দূর ভবিষ্যতে ধ্বংস হওয়ার কল্পনা মনে আসে। শিশুরা ধারণা করে, আমরা এখন শিশু মাত্র। যৌবনে পদার্পণ করিব, জীবনের স্বাদ উপভোগ করিব। তারপরে কোন দিন বৃদ্ধ হইব। তখন মৃত্যু আসিবে। এইরূপে যুবকেরা কল্পনা করে, এখনও তো বৃদ্ধ হওয়ার বাকী আছে। এখনই কি? এখন তো আমার এবং ধ্বংস হওয়ার মধ্যস্থলে এক মঞ্জিল ব্যবধান আছে। এইরূপে বৃদ্ধরাও মনে করেন যে, এইমাত্র বার্ধক্য আসিল। মাত্র আরম্ভ। ইহার মুদ্দত শেষ হইলে কোন এক সময় মৃত্যু ঘটিবে। মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তি ধ্বংসকে নিজের জন্য দূরবর্তী ভবিষ্যতকালে মনে করিয়া থাকে।

আমি হজ্জে যাইতেছিলাম, আমার এক মুরুব্বী আমাকে বলিলেন ঃ এখনও তুমি বালক। এত কিসের তাড়াহুড়া আমাদের বয়সে উপনীত হইলে হজ্জ করিয়া লইও। আর যদি এতই তাড়াহুড়া থাকে, তবে আগামী বৎসর আমিও যাইতেছি, আমার সঙ্গে যাইও। আমি তাঁহাকে উত্তর করিলাম, হযরত, আপনার বয়স এত হইয়াছে, যদি আপনি আমাকে পাট্টা লিখিয়া দেন যে, আমিও এত আয়ু প্রাপ্ত হইব, তবে আমি অবশ্যই এখন যাওয়া বন্ধ করিয়া আপনার সঙ্গেই চলিতে পারি। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি এত আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার কাছে নিশ্চয়তা কি আছে যে, আমিও এত আয়ু প্রাপ্ত হইব, যে ভরসায় আমি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিব।

আমার সামনেরই আর একটি ঘটনা। এক বৃদ্ধের সহিত এক যুবকের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধের স্বাভাবিক বয়স পূর্ণ হইয়াছিল। পরস্পর বিদায় গ্রহণের সময় হইলে বৃদ্ধ বলিল ঃ "দেখুন, আমার স্বাভাবিক আয়ু পূর্ণ হইয়াছে। আপনার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয় কি না হয় কে জানে? আমি ভোরের প্রদীপের ন্যায় প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি।" যুবক লোকটি বলিল ঃ আপনার জীবন প্রদীপতো রাত্র পাড়ি দিয়া ভোরের নিকটবর্তী হইয়াছে, কিছু আয়ু তো পাইয়াছেন। আমি তো সন্ধ্যাকালেরই প্রদীপ। এইমাত্র প্রজ্বলিত হইয়াছি। এমন কি, এখন পর্যন্ত ভালরূপে আলোকিত হইতেও পারি নাই। সামান্য বাতাসের ঝাপ্টা লাগিলে এখনই নিভিয়া যাইব। আপনি তো ভোরের প্রদীপ। সারা রাত্রি শান্তিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। এখন ভোরেই তো নিভিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। আর আমার তো নিরাপদে রাত্র কাটাইয়া যাওয়াই সন্দেহজনক। সুতরাং আমার অবস্থা আপনার চেয়ে অধিক নৈরাশ্যজনক এবং সাক্ষাতের নিরাশায় আমি আপনার চেয়ে অধিক অগ্রবর্তী। কাজেই এই সাক্ষাতের আক্ষেপ আপনার সঙ্গে কোন বিশেষত্ব নাই, ইহাতে আমরা উভয়েই সমান। মাশাআল্লাহ্‌, কেমন সুন্দর উত্তর! খুবই সত্য কথা বলিয়াছে—"আমি তো সান্ধ্য-প্রদীপ।" বায়ুর সামান্য এক ঝাপ্টাই আমাকে বিলীন করিয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইহা নূতন ধরনের বাক্‌পদ্ধতি বটে। প্রশংসনীয় উত্তর। যাহার সারমর্ম এই যে, বৃদ্ধ এবং যুবক সকলে প্রদীপের ন্যায়ই বটে। কেহ সান্ধ্য-প্রদীপ আর কেহ ভোরের প্রদীপ। নিভিবার আশঙ্কা হইতে কেহই মুক্ত নহে।

মোটকথা, মানুষ যে মনে করে, "এখনও তো বালক, অতঃপর যুবক হইব, তারপর বৃদ্ধ হইব, তারপর আরও বৃদ্ধ হইব।" বলুন তো হযরত! আপনার নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন কি সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে, আপনি যুবক হইবেন, তৎপর বৃদ্ধ হইবেন। কিংবা আপনি এমন কি ওহী প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, এমন চ্যালেঞ্জের সহিত দাবী করিতেছেন। আপনি কি খবর রাখেন? হয়তো এই মুহূর্তই শেষ মুহূর্ত হইতে পারে। সম্ভবত এই নিঃশ্বাসই শেষ নিঃশ্বাস। হয়তো এখনই আপনার জন্য দুনিয়ার জল-বায়ুবন্ধ হইয়া যাইবে। আপনার পার্থিব জীবন হয়তো নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছিয়াছে।

দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাস মনে উপস্থিত না থাকা ঃ মোটকথা, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমাদের কথাবার্তা ও কল্পনা হইতে বুঝা যায়, মূলে অস্থায়িত্বের বিশ্বাস থাকিলেও এখন মনে উপস্থিত নাই। থাকিলেও দূরবর্তী ভবিষ্যতে ধ্বংস হইবে বলিয়া বিশ্বাস আছে। অথচ কোরআন শরীফের পরিষ্কার ঘোষণানুযায়ী শরীঅতের উদ্দেশ্য—প্রতি মুহূর্তে দুনিয়া ধ্বংস হওয়া সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস মনে উপস্থিত রাখিতে হইবে। যেমন—হাদীস শরীফে অনুরূপ বিশ্বাস লাভ করার উপায়ও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ "পৃথিবীতে মুসাফিরের ন্যায় বাস কর।" অর্থাৎ, পার্থিব জীবনকে এক মুসাফিরের সফরকালের

অবস্থার ন্যায় মনে কর। মুসাফির যেমন নিজের বিশ্রাম শিবিরে কিংবা মুসাফিরখানায় আসবাবপত্র কাছে রাখিয়া অবস্থান করে, তুমিও দুনিয়াতে এইরূপে বাস কর। দুনিয়াকে আখেরাতের সফরে বিশ্রাম শিবির বা মুসাফিরখানা মনে কর। মুসাফিরখানাকে যেমন কেহই স্থায়ী বাসস্থান মনে করে না, তুমিও দুনিয়াকে স্থায়ী বাসস্থান মনে করিও না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহপূর্ণ বাণী যেহেতু আমাদিগকে সম্বোধন করিতেছে, তাই আমাদের রুচির প্রতিও কিছুটা লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কেননা, غريب অর্থাৎ, মুসাফির শব্দে তবুও দুনিয়াতে এক প্রকার অবস্থানের আভাস রহিয়াছে, যদিও তাহা মুসাফিরখানায় অবস্থানের ন্যায় হউক। কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এতটুকু অবস্থানের কল্পনাও নাই। তিনি বলিয়াছেন, "দুনিয়ার সহিত আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়ার সঙ্গে আমার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেন কোন পথিক পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং চলিতে চলিতে পথে কোন বৃক্ষের নীচে ক্ষণেকের নিমিত্ত ছায়ায় দাঁড়াইয়াছে।"

প্রকৃতপক্ষে ইহাও كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ কথারই ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত কথায় সর্বপ্রকারের সন্দেহের অবসান ঘটিয়াছে। উদ্দেশ্যের বিপরীত কোন কল্পনা হইতে পারে না। অর্থাৎ, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না যে, আমরা দুনিয়াতে এক রাত্রির জন্য অবস্থান করিতেছি, ভোরে এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—যেমন মুসাফিরকে ভোরে মুসাফিরখানা ত্যাগ করিতে হয়; বরং এইরূপ মনে কর যে, আমরা পথ চলিতেছি।

মানুষ প্রতি মুহূর্তে সফরে আছেঃ মনে কর যে, প্রতি মুহূর্তে আমরা সফরে আছি। প্রতি মুহূর্তে সফরের পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। যদি কোন বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোক সন্দেহ করে যে, "আমরা তো কোথাও অবিরত পথ অতিক্রমকারী লোক দেখিতেছি না; বরং কোন কোন অবস্থায় তো আমরা নড়াচড়াও করি না; বরং নড়াচড়ার বিপরীত নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকি। এমতাবস্থায় পথ অতিক্রম অসম্ভব। নিশ্চলতা ও পথ চলা দুই বিপরীত বিষয়। দুই বিপরীতের একত্র সমাবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব।" তবে ইহার উত্তর এই যে, পথচলার জন্য নড়াচড়া অনিবার্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নড়াচড়া হয় না বলিয়া আপনি কিরূপে বুঝিলেন? আপনি জানেন কি যে, নড়াচড়া দ্বিবিধ? স্থানের গতি এবং কালের গতি। এস্থলে স্থানের গতি অর্থাৎ, স্থানান্তরিত হওয়া তো অবশ্যই নাই। কেননা, প্রকাশ্যেই দেখা যায়, আখেরাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন সিঁড়ি নির্মাণ করেন নাই, যাহা বাহিয়া আমরা আখেরাতে চলিয়া যাইতে পারি। আর না কোন সিঁড়ি আছে যদ্দ্বারা আমরা আসমানে যাইয়া পৌঁছিতে পারি। মাইল দুই মাইলের রাস্তাও নহে, যাহা অতিক্রম করিয়া আমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে পৌঁছিতে পারি। যেমন, আমরা রেল বা এক্কা গাড়ীতে আরোহণ করিয়া এক শহর হইতে অন্য শহরে গমন করিয়া থাকি।

অতএব, এস্থলে স্থানের গতি নাই বলিয়া আপনি কেমন করিয়া মনে করিতে পারেন যে, এখানে কালেরও গতি নাই? এখানে কালের গতি রহিয়াছে। অর্থাৎ, যদিও আমরা নিছক নড়াচড়া বা গতিহীন অবস্থায় থাকি, কিন্তু কালের গতি যথারীতি প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কালের গতি চলিতে চলিতে এমন এক মুহূর্তে যাইয়া পৌঁছিবে, যাহার পরে আমরা আখেরাতে থাকিব। কোন সিঁড়ি বাহিয়াও নহে, কোন রাস্তা অতিক্রম করিয়াও নহে; বরং কালের গতিতে—যাহা আমাদের ক্ষমতার বাহিরে। কেননা, আমরা কালের গতিকে বাড়াইতেও পারি না, কমাইতেও পারি না। রোধ করা তো দূরেরই কথা।

আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে, আমি অষ্টম ঘণ্টার মধ্যে থাকিয়া যাইব। নবম ঘণ্টায় পৌঁছিব না। আপাদমস্তক সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেও তাহা সম্ভব হইবে না। আপনাকে নবম ঘণ্টায় প্রবেশ করিতেই হইবে। কালের গতি আপনাকে বাধ্য করিবে। অন্যথায় যদি আখেরাতে পৌঁছিবার জন্য কোন সিঁড়ি থাকিত, তবে আমরা উহাতে আরোহণ না করিলেও পারিতাম, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাতে পৌঁছার জন্য এমন আশ্চর্যজনক সিঁড়ি নির্মাণ করিয়াছেন, যাহা অনুভব করা যায় না, আমাদের ইচ্ছারও সেখানে কোন দখল নাই।

অতএব, কালের গতি অবশ্যই সাব্যস্ত আছে। দ্বিবিধ গতির একটি না থাকিলে অপরটিও না থাকা অনিবার্য নহে। আয়ু পথ অতিক্রমের জন্য শুধু গতির প্রয়োজন, কালের গতির মাধ্যমে তাহা সাব্যস্ত আছে। স্থানের গতি নাই, উহার প্রয়োজনও নাই। মোটকথা, কালের গতি প্রবাহে আমরা জীবন পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। সুতরাং হুযূর (দঃ)-এর এই বাণী—"আমার দৃষ্টান্ত ঐ পথিকের ন্যায়, যে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে"—সম্পূর্ণ ঠিক হইয়াছে। এই কালের গতির উপর আমাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার কোন দখল না থাকার কারণেই ইহা আমাদের অসতর্কতা বা ভুলিয়া থাকার কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, আমাদের অবস্থার প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে না। আমরা বুঝিতে পারি না, এই মুহূর্তের পূর্ব মুহূর্তে আমাদের অবস্থা কি ছিল এবং এখন কিরূপ হইয়াছে এবং এই মুহূর্ত অতীত হওয়ার ফলে আমাদের পার্থিব জীবনের কি পরিমাণ অংশ নিঃশেষ হইল।

এই কারণেই বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেনঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন এক মাসের বয়স্ক হয়, তখন তাহার মাতা বলে, আমার সন্তান এক মাসের বয়স্ক হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বুঝে না যে, তাহার আয়ুষ্কালের এক মাস কমিয়া গিয়াছে। তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত হইতে তাহার আয়ুষ্কালের প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব হইতে আরম্ভ করে, যেই পরিমাণ সময় অতীত হইতে থাকে, তাহাই তাহার আয়ু হইতে কমিতে থাকে। যেমন, বরফের চাকা, যতই রাখা হয় ততই উহার অবয়ব কমিতে থাকে। এমন কি, শেষে এমন এক মুহূর্ত আসিবে, যখন উহা গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। মানবের আয়ুর অবস্থাও তদ্রূপ। এস্থলে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িল। কোন একজন গ্রাম্য লোক বিদেশে গিয়া চাকুরী গ্রহণ করিল। কিছুকাল পরে চাকুরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন বাড়ীর দিকে চলিল, তখন বাড়ীতে নেওয়ার জন্য ফরমাইশী ও অন্যান্য ভাল ভাল সদাইয়ের সঙ্গে দুই চারি সের বরফও খরিদ করিল। আসবাবপত্র অনেক বলিয়া বহন করিয়া নিতে কষ্ট হইবে। সুতরাং লাগেজ হাল্‌কা করার উদ্দেশ্যে, তাহাদের গ্রামেরই দুই চারি জন যাত্রী—যাহারা তাহার একদিন পূর্বে বাড়ী যাইতেছিল, তাহাদের নিকট বরফের বাণ্ডিলটি দিয়া বলিল, ভাই, এই বরফগুলি আমার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলে বড়ই অনুগ্রহ হইবে, আমার বোঝা হাল্‌কা হইবে। আমিও ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামীকল্য যাইতেছি। তাহারা বরফের বাণ্ডিলটি তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। গ্রাম্য লোকেরা বরফের গুণাগুণ কি বুঝিবে? কেবল এতটুকু জানে যে, উহা ঠাণ্ডা বস্তু। রীতি এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে বাড়ীর লোকেরা আগন্তুকের জন্য পছন্দনীয় বস্তু রাখিয়া দেয়। সে আসিলে সকলে মিলিয়া তাহা পানাহার করে। এই রীতি অনুযায়ী তাহারা বরফকে অমনিভাবে সাধারণ কাপড়ে জড়াইয়া রাখিয়া দিল । পরবর্তী দিন সে ব্যক্তি বাড়ীতে আসিলে যাবতীয় উপঢৌকনের সঙ্গে কথায় কথায় বরফের কথাও উঠিল। হাঁ, আমি গতকল্য এক ব্যক্তির নিকট বরফও পাঠাইয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছ কিনা? বাড়ীর লোকেরা আনন্দের সহিত বলিল, পাইয়াছি।

উহা তোমার অপেক্ষায় তুলিয়া রাখা হইয়াছে, কেহ স্পর্শও করে নাই। সে বলিল, বল কি ? বরফ এখন পর্যন্ত রহিয়াছে। নির্বোধের দল ! তোমরা বরফগুলি বিনাশ করিয়া দিয়াছ। দেখি, এখন পর্যন্ত কেমন করিয়া রাখা হইয়াছে ? তাহারা আনন্দের সহিত উহা আনিতে গেল। কাপড় খুলিয়া দেখিল, বরফের চিহ্নও নাই। কেবল ভিজা কাপড়খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। বরফের এত বড় চাকার কিছুই নাই। কাফন পড়িয়া রহিয়াছে, মুর্দা নাই।

দেখুন, ইহারা বরফের বৈশিষ্ট্য জানে না যে, ইহাকে যতই দীর্ঘ সময় রাখিয়া দেওয়া হয়, ততই কমিয়া যাইতে থাকে। অন্যান্য পদার্থ রাখিয়া দিলে রক্ষিতই থাকে। এই ধারণায় এবং বরফের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া তাহারা নিজের হাতেই বরফগুলি নষ্ট করিয়া দিল। বরফেরই অনুরূপ আমাদের আয়ু। অহরহ তাহা কমিয়াই যাইতেছে।

প্রতি মুহূর্তে মানুষের আয়ু হ্রাস পায়ঃ প্রতি মুহূর্তে আমাদের আয়ুর এক মূল্যবান অংশ বরফের ন্যায় গলিয়া যাইতেছে। আর আমরা ঐ গ্রাম্য লোকদের ন্যায় অসতর্ক রহিয়াছি। বুঝিতেছি না যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিণামও তাহাদের ন্যায়ই হইবে। তাহারা যেমন নিজের হাতে বরফ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তদ্রূপ আমরাও নিজের হাতে নিজের আয়ু নষ্ট করিতেছি। কোন একদিন হাত ঝাড়িয়া পৃথক হইয়া যাইব এবং এই মহামূল্যবান আয়ু ফুরাইয়া যাইবে। তখন আফসোস্ করা ভিন্ন আর কোনই উপায় থাকিবে না।

এই অসতর্কতা এবং বেপরোয়া মনোভাবই দুনিয়ার যাবতীয় মজা এবং দুনিয়াদারগণের তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ভিত্তি। আর ইহাই সেই আস্তিনের সাপ, যাহা ভিতরে ভিতরে আমাদের মূল উপড়াইয়া ফেলিতেছে। আমাদের মূল্যবান সফরের পথে বাধা উৎপন্ন করিতেছে। আহা ! কতই না ভাল হইত, যদি আমাদের চক্ষু হইতে এই গাফলতের পর্দা উঠিয়া যাইত এবং আমরা সচেতন হইয়া এই দীর্ঘমেয়াদী মন্দা জ্বরের চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করিতাম। এই দুশ্চিকিৎস্য রোগের ঔষধের চিন্তা করিতাম। সেই ঔষধ—যাহা হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ন্যায় রোগীর জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহা এই যে, প্রতি মুহূর্তে নিজেকে পথচারী মুসাফির এবং দুনিয়াকে স্বীয় গন্তব্য স্থলের সড়ক মনে করি। এই ধ্যান এবং কল্পনা উঠিতে বসিতে সর্বক্ষণ নিজের মনে উপস্থিত রাখি, নিজের পার্থিব জীবনকে একজন মুসাফিরের সফরের অবস্থার চেয়ে অধিক মনে না করি। যেমন মুসাফির সফরে কেবল পথের সহায়ক এবং দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারার মত কার্যই করিয়া থাকে। সফরের পথ দীর্ঘ হওয়ার মত কিংবা উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার মত কার্য করে না। আপনি কখনও দেখেন নাই যে, দ্রুত গন্তব্যস্থানে গমনাভিলাষী মুসাফির পথে কোথাও খেলাধুলায় মগ্ন হয় কিংবা কোন চিত্তাকর্ষক বস্তুতে মজিয়া থাকে ; বরং পথে ঘটনাক্রমে কোন বাধা জন্মিয়া উদ্দেশ্য ব্যাহত হইলে এবং সফরের ক্ষতি হইলে তদ্দরুন মন খুব খারাপ হইয়া পড়ে। পথে যানবাহন বিনষ্ট হইলে নূতন বাহনের চেষ্টা করে। গাড়ী পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে চিন্তিত হইয়া পড়ে। আবার গার্ড গাড়ীর গতি বাড়াইয়া উক্ত বিলম্বের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইলে তাহার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়। মোটকথা, কোথাও আকস্মিক ক্ষতি হইয়া গেলে তাহা পূরণের জন্য এবং ত্রুটি সম্পূরণের জন্য চেষ্টিত থাকে।

আখেরাতের সফরের প্রতি গুরুত্ব প্রদানঃ ইহা আমাদের দুনিয়ার সফরের অবস্থা। আমাদের উচিত অন্ততপক্ষে এতটুকু অবস্থা এবং গুরুত্ব আখেরাতের সফরেও দান করি, দুনিয়াবী সফরে যেমন প্রতিবন্ধক কারণগুলি এড়াইয়া চলি। আকস্মিক ক্ষতিতে মন বিষণ্ণ হয় এবং সহায়ক বস্তু

দেখিলে আগ্রহের সহিত তাহা অবলম্বন করি। তদ্রূপ আখেরাতের সফরে আমাদের প্রত্যেকটি গতিবিধি যাচাই করিয়া দেখা উচিত, ইহা প্রতিবন্ধক, কি সহায়ক। কোন অবস্থা বা কার্য সফরের প্রতিবন্ধক হইলে উহা পথের ডাকাত জ্ঞানে বর্জন করা উচিত। দুনিয়াবী মুসাফির যেমন নিজের ধন-প্রাণকে চোর-ডাকাত হইতে হেফাযত করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদেরও আখেরাতের সফরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলিকে চোর-ডাকাত মনে করা উচিত। পক্ষান্তরে যেসব কাজ উক্ত সফরের সহায় হয় এবং দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া আগ্রহ ও আনন্দের সহিত উহা অবলম্বন করা উচিত।

মোটকথা, প্রত্যেক মুহূর্তে নিজের অবস্থার প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রাখা এবং খেয়াল রাখা উচিত। আমাদের চলার পথে যেন কোন কণ্টক আত্মপ্রকাশ না করে, কিংবা আমাদের আলোময় পথে কোন অন্ধকারের চিহ্ন না পড়ে; যাহার অন্ধকারে আমরা পেরেশান ও দিশা হারাইয়া সরল পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। সারকথা এই যে, কোন অবস্থাকে সহায়ক মনে করিলে অবলম্বন করা এবং প্রতিবন্ধক মনে করিলে বর্জন করা উচিত। কিন্তু আফসোস! আমাদের বিবেকহীনতা এবং বেপরোয়া মনোভাব সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে জ্ঞানশক্তি আমাদের যথেষ্ট আছে। আহা! যদি আমাদের চেতনা আসিত এবং গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতাম, তবে বুঝিতে পারিতাম যে, এসমস্ত কার্য আমাদের জন্য কত ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর। আমাদের এসমস্ত কাজের ফল বিনাশ ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

নফ্‌সের ধোঁকা ঃ আমাদের প্রতি এবং আমাদের অবস্থার প্রতি আফসোস! আমাদের অবস্থা এতই নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন সময় এসমস্ত অসঙ্গত আচরণের জন্য তওবা করিবার কল্পনা করিলেও ধোঁকাবাজ নফ্‌স তৎক্ষণাৎ বলে, মিয়া! এখনই কি হইয়াছে, একবার সাধ মিটাইয়া গুনাহর কাজ করিয়া লই। অতঃপর এক সঙ্গে তওবা করিলেই চলিবে। নচেৎ এমন হইতে পারে যে, আজ তওবা করিব, কাল আবার কোন চিত্তাকর্ষক গুনাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পাপ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িব। তখন অযথা তওবা ভঙ্গ হইয়া যাইবে, পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মুখে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইব। মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না। ইহার চেয়ে উত্তম এই যে, প্রথম গুনাহ্‌র দিক হইতে মনকে তৃপ্ত করিয়া লই, তৎপর তওবার চিন্তা করিব।

আফসোস! আমাদের অবস্থা সেই মুসাফিরের ন্যায়, যে এক দীর্ঘ সফরের সঙ্কল্প করিয়াছে। সফর কঠিন, পথ দুর্গম, সে পথিমধ্যে নিজের ঘোড়ার একটি পা ভাঙ্গিয়া দিয়া বলে, নূতন করিয়া আর একটি ঘোড়া লইয়া সফর করিব। অতঃপর দ্বিতীয় ঘোড়ারও এই অবস্থা করিল। মোটকথা, এইরূপে সে যদি নিজের বাহনের শত্রু হইয়া পড়ে, তবে বলুন, উক্ত মুসাফির এক পাও কি অগ্রসর হইতে পারিবে? কিংবা কোন বুদ্ধিমান কি বলিতে পারে যে, এই ব্যক্তি কোন না কোন উপায়ে এক সময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া যাইবে। কখনও না। এই উপায়ে তো সে এখান হইতে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারিবে না। আমাদের অবস্থাও এইরূপ। দিবা-রাত্র গুনাহ্‌র মধ্যে লিপ্ত থাকি এবং নিজের আয়ুরূপ বাহনের প্রত্যেকটির পা ভাঙ্গিয়া দ্বিতীয় বাহনের আশায় থাকি। অতঃপর কোন সময় যৎসামান্য টুটা-ফুটা এবাদতের তওফীক হইলে কিছু নামায-রোযা আদায় করি বটে, কিন্তু তাহার দ্বিগুণ পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দেই। আচ্ছা বলুন তো! এমতাবস্থায় আমরা পূর্বোক্ত মুসাফিরের ন্যায় আখেরাতের দিকে পা বাড়াইতে পারি কি? এক ইঞ্চি পথও অতিক্রম করিতে পারি কি? কখনই না; বরং উক্ত মুসাফির যেমন মধ্যস্থলে

পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তদ্রূপ আমরাও আখেরাতের সড়কের উপর এক পাও আগাইতে পারিব না। শুধু ইহাই নহে; বরং আমরা এত দুর্ভাগা যে, উক্ত মুসাফিরের ন্যায় এক অবস্থায়ও থাকিতে পারি না; বরং যতটুকু সম্মুখের দিকে অগ্রসর হই, উহার দ্বিগুণ পিছনের দিকে সরিয়া যাই।

এই সময় একটি ঘটনা মনে পড়িল। জনৈক লোক কোথাও চাকুরী করিত। ছুটিতে বাড়ী আসিল, ছুটি শেষ হইবার নিকটবর্তী হইলে সতর্কতাপূর্বক কিছু আগে বাড়ী হইতে যাইবার ইচ্ছা করিল। সন্ধ্যার সময় যাইতে বাড়ীর লোকেরা অনেক বাধা দিল; কিন্তু সে বড় একগুঁয়ে ছিল। বলিলঃ "না। আমাকে এখনই যাইতে হইবে, নচেৎ আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে।" অবশেষে একগুঁয়েমি করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি হাঁটিতে লাগিল। অল্প দূর যাইতেই রাত্রি হইয়া গেল। ঘটনাক্রমে তখন মাসের শেষাংশ বলিয়া রাত্র খুব অন্ধকার ছিল, তদুপরি আকাশে গাঢ় মেঘও ছিল, কিছু বৃষ্টিও পড়িতেছিল। অন্ধকারে সে পথ ভুলিয়া রাস্তা হইতে এমনিভাবে সরিয়া পড়িল যে, সারা রাত ঘুরিয়াও ঠিক পথ পাইল না; বরং এমন চক্করে পড়িল যে, ঘুরিতে ঘুরিতে অর্ধরাত্রি পরে নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। রাত্রি ভোর হইতেই, সম্মুখে নিজের গ্রাম দেখা দিল। বাড়ীর সম্মুখের জামে মসজিদ এবং উহার সম্মুখে একটি বট গাছ। বস্তিতে পৌঁছিয়াই সে তাহা দেখিতে পাইল এবং মনে মনে বলিলঃ ভাই, ইহা তো দেখিতে আমাদের গ্রামের মসজিদেরই মত। আবার দেখিতেছি কে যেন আমাদের সেখানকার বট গাছটিও উপড়াইয়া আনিয়া এখানে রোপণ করিয়াছে। কি দারুণ সাদৃশ্য। ঠিক তাহাই মনে হইতেছে। একটুও তো প্রভেদ নাই! আরও অগ্রসর হইয়া সম্মুখে নিজ গৃহের দরজা দেখিতে পাইল। উহা দেখিয়া বলিলঃ ওঃ হো! ইহা তো একেবারে আমাদের ঘরেরই মত! যেন সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই ঘর; দরজা! চত্বর, চৌকি সবই সেইরূপ!

কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া এখন তাহার মনে কিছু ভয় হইতে লাগিল। আস্তে আস্তে বাড়ীর দরজায় যাইয়া পৌঁছিল। এখন তো আরও অস্থির। ইয়া আল্লাহ্! ব্যাপার কি! সত্যই ইহা আমাদের বাড়ী নহে কি? আবার ভাবে, ইহা আমাদেরই বাড়ী। আবার মনে হয়, স্বপ্ন নাকি? আবার বলে, না স্বপ্ন নহে, আমি তো জাগ্রতই আছি। এই তো আমার হাত পা নড়িতেছে। এমন সময় তাহার ভাতিজা ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাচাকে দেখিয়া সালাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? ভাতিজাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। কাজেই বলিতে লাগিল, لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ আমার উপর এবং আমার জ্ঞানের উপর অভিশাপ। সারা রাত্রি জঙ্গলে জঙ্গলে হোঁচট খাইয়া ঘুরিয়াছি, বৃষ্টিতে ভিজিয়াছি, বহু মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি। কিন্তু যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এক ফার্লংও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। যেমন, কলুর বলদ আর কি, একই কেন্দ্রের চতুর্দিকে সারাদিন ঘুরিতে থাকে। মনে করে, বহু মাইলের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছে সেখানেই রহিয়াছে। যেই কেন্দ্রের উপর প্রথমে ঘুরিতে দেখা গিয়াছিল, এখন পর্যন্ত সেখানেই ঘুরিতেছে।

এইরূপই আর একজন লোক ছিল। তাহার ঘোড়াটি ছিল বড়ই অবাধ্য এবং চরম পর্যায়ের দুষ্ট। উহার এক দুষ্টামি ইহাও ছিল যে, মলত্যাগ করিয়া উহা না শোঁকা পর্যন্ত এক পাও সম্মুখে চলিত না। আরোহী উহার দুষ্টামিতে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কোন উপায় দেখিতেছিল না। ইতিমধ্যে তাহার এক সফরের প্রয়োজন পড়িল। অগত্যা সেই চরম অবাধ্য টাট্টুঘোড়া লইয়াই

সফরে যাত্রা করিল। অভ্যাসমত সে তাহার দুষ্টামি শুরু করিল, পায়খানা করিয়াই ঘুরিয়া তাহা শুঁকিতে লাগিল।

ঘটনাক্রমে অপর এক পথিকের সহিত তাহার দেখা হইল। সে ঘোটকটির ভাবগতিক দেখিয়া বিস্মিত হইল। বলিলঃ "আপনার ঘোড়াটি তো বিচিত্র ধরনের! এমন তো কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই। আরোহী বলিল, ভাই, কি বলিব, হতভাগা ঘোড়াটি আমার জন্য মহাবিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার এই রোগের চিকিৎসার চেষ্টা করিয়া আমি ব্যর্থ হইয়াছি, কিন্তু হতভাগার সংশোধন হইতেছে না।" অতঃপর বিস্তারিত অবস্থা তাহাকে জানাইল। পথিক বলিলঃ দেখ, আমি ইহার কেমন সুন্দর চিকিৎসা করিতেছি। এই বলিয়া সে নিজের ঘোড়াকে উহার পশ্চাতে লইয়া আসিল। দুষ্ট ঘোড়াটি পায়খানা করিয়াই যখন শুঁকিবার জন্য পিছনের দিকে ঘুরিত, তখনই লোকটি পশ্চাৎ দিক হইতে উহার মুখের উপর চাবুক মারিত, উহাকে মুখ ঘুরাইতেই দিত না। আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ করিয়া এবার অনেক দূর পথ তাড়াতাড়ি শান্তির সহিত অতিক্রান্ত হইয়া গেল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া উক্ত পথিক অন্য পথ ধরিল এবং বলিলঃ ভাই, আমার সাধ্যানুযায়ী এতক্ষণ আমি তোমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। এখন আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি। এখন তুমি জান আর তোমার ঘোড়া জানে। সে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

লোকটি চলিয়া যাইতেই ঘোড়া পশ্চাৎ দিকে ঘুরিয়া দেখিল। যখন বিশ্বাস জন্মিল যে, লোকটি আর উহার পিছনে নাই, চলিয়া গিয়াছে। এখন আর কোন ভয় নাই, তৎক্ষণাৎ সেখানেই থামিল এবং পিছনের দিকে ফিরিয়া চলিল, আর যেই যেই স্থানে মলত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু শোঁকা হয় নাই, প্রত্যেক স্থানে পালাক্রমে শুঁকিয়া লইল। আরোহী যতই চেষ্টা-চরিত্র করিল, কিন্তু দুর্ভাগা ঘোড়াটি নিবৃত্ত হইল না। তাহার সম্পূর্ণ সফরকেই সে ব্যর্থ করিয়া দিল। ইহা সেই পথিক বন্ধুর অনুগ্রহেরই ফল। তাহার এই অনুগ্রহ না হইলে তাহার সফর ব্যর্থ হইত না। ঘোড়ার অভ্যাস অনুযায়ী চলিতে থাকিলে যত পথ অতিক্রম করিত, তাহা যেই প্রকারে যত সময়েই হউক না কেন অতিক্রান্তই হইত। কিন্তু পথিক বন্ধুর অনুগ্রহের ফলে এতক্ষণের সমস্ত মেহনত-পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া গেল এবং যেখানে ছিল পুনরায় সেখানেই আসিয়া পৌঁছিল। "هنوز روز اول" "যথা পূর্বং তথা পরং" এর অনুরূপ হইয়া গেল। অথচ সফরের বন্ধু নিজের ধারণা অনুসারে তাহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সময় বিশেষে অনুগ্রহও নিগ্রহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়। এই ঘটনায় তাহা পরিষ্কাররূপে দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই ঘটনারই অনুরূপ আমাদের অবস্থা। এই দেখুন না, আমাদের বিলাসিতা ও আরাম-প্রিয়তা। এসমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া কেমন বিস্ময়বোধ করিতেছি এবং ঘটনায় পতিত ব্যক্তিকে কেমন পরিতাপজনক অবস্থায় মনে করিতেছি। কিন্তু নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি না যে, আমরা স্বয়ং এই রোগের রোগী। উক্ত মুসাফির অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আমাদের অবস্থা। আমাদের মধ্যে খোদাভীরু অনেক বান্দা আছেন, যাঁহারা শেষ রাত্রে উঠিয়া নফল নামায পড়িয়া থাকেন। বিনয়ের সহিত মুনাজাত করিয়া থাকেন। 'তওবা' এবং 'এস্তেগ্‌ফার' করেন। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায রীতিমত আদায় করেন এবং রোযা রাখিতে অভ্যস্ত আছেন।

এবাদতে গীবতের প্রতিক্রিয়াঃ আফসোসের বিষয়! তাহাদেরই কেহ কেহ প্রাতঃকালে উঠিয়া নিজের ভাই-বন্ধুদের সম্বন্ধে দুই একটা গীবত বা পশ্চাৎনিন্দা করিয়াই সারা রাত্রির নফল নামায, যাবতীয় এবাদত এবং পরিশ্রম বরবাদ করিয়া ফেলেন। সমস্ত এবাদত এবং পরিশ্রমের ফল এই

দুই একটি গীবতই থাকিয়া যায়। যাহা পারলৌকিক শাস্তির জন্য যথেষ্ট হয়। সমস্ত কৃত কাজ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। যেস্থানে ছিল আবার সেস্থানে আসিয়া দাঁড়ায়। যেমন, সেই দুষ্ট ঘোড়া উক্ত পথিককে পুনরায় প্রথম মঞ্জিলে আনিয়া রাখিয়া দিল। অনুরূপভাবে সফরের দুষ্টামির ফল এই বদভ্যাস পুনরায় আমাদিগকে তদ্রূপ অপমানজনক গহ্বরে আনিয়া ফেলে। এমন অসতর্কতা এবং বিবেকহীনতা সাক্ষাৎ খোদার গযব! ইহার একমাত্র কারণ দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিশ্বাস অন্তরে উপস্থিত নাই, আক্ষেপ তো ইহারই। আর আমরা যে আয়ুপথের সফর ও উহার দূরত্ব অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি, সেই সফরের অনুভূতিরই অভাব, অথচ এই অনুভূতি থাকা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা এতটুকু বুঝি না যে, দুনিয়াতে আমরা মুসাফির। আমাদের গন্তব্য পথ বহুদূর ; বরং নিজদিগকে আমরা দুনিয়ার স্থায়ী অধিবাসী মনে করিতেছি। বস্তুত কালের গতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সর্বক্ষণ মুসাফির। সুতরাং আমরা যেমন স্থানীয় গতি হিসাবে নিজেকে মুসাফির মনে করি, তদ্রূপ কালের গতি হিসাবেও মুসাফির মনে করা উচিত। প্রভেদ শুধু এই যে, আখেরাতের সফরকে স্থানের গতি হিসাবে সফর বলা হয় না এবং এই প্রভেদের ভিত্তিতেই এবাদতের বিধান ও আহ্‌কামে পরিবর্তন ঘটে।

স্থানের গতিভিত্তিক সফরকেই ফেকাহ্‌শাস্ত্রে সফর বলা হয়। আপনারাও দিবারাত্র ইহাকেই সফর বলিয়া থাকেন। সুতরাং আপনারা এক স্থান হইতে অন্যত্র সফরে বাহির হইলে নামায কছর করার হুকুম বর্তে এবং আপনাদিগকে 'মুসাফির' বলা হয়। অন্যথায় 'মুকীম' বলা হয়। পক্ষান্তরে হুযূর (দঃ) যেই হিসাবে আপনাদিগকে সার্বক্ষণিক মুসাফির বলিয়াছেন, ইহার ভিত্তিতে শরীঅতের আহ্‌কামের পরিবর্তন ঘটে না। তাহার জন্য কছরের অর্থাৎ, চারি রাকাআত ফরয নামাযকে দুই রাকাআত পড়ার বিধান নাই। ইহা খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। পাছে নফ্‌স এবং শয়তান ধোঁকা না দেয় যে, হাদীস অনুযায়ী আমরা যখন মুসাফির সাব্যস্ত হইয়াছি, তখন কছরই আদায় করিব। দুই রাকাআতের স্থলে চারি রাকাআত কেন পড়িব? আল্লাহ্‌র দান বান্দা গ্রহণ করিবে। দুই রাকাআত হইতে তো অব্যাহতি পাওয়া গেল। যেমন, এক মূর্খের কাহিনী—সে সকল অবস্থায়ই কছর পড়িত। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি সকল অবস্থায় কছর পড়েন, ইহা তো ফেকাহ্‌শাস্ত্রের স্পষ্ট বিরোধিতা। সে উত্তর করিল, আমার কার্য ফেকাহ্‌র বিরোধী হইলেও হাদীসের অনুরূপ। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে عابر سبيل অর্থাৎ, 'পথচারী' বলিয়াছেন এবং আমাদের দুনিয়ায় অবস্থানকে সফর বলিয়াছেন। অতএব, আমি কছর পড়িয়া এমন কি অন্যায় কাজ করিতেছি?

এইরূপে আর এক ব্যক্তি এক মাইল পথ অতিক্রম করার প্রয়োজন হইলেও কছর পড়িত। কেহ তাহাকে বলিল, "আপনার এই কাজ তো বিচিত্র এবং অভিনব। ফেকাহ্‌শাস্ত্রের বিপরীত। কোন মায্‌হাবেই এক মাইলের সফরে কছরের বিধান নাই। কেহ ইহাকে সফরের পথ বলিয়া সাব্যস্ত করেন নাই।" সে উত্তর করিল ঃ স্বয়ং কালামুল্লাহ্‌র প্রকাশ্য দলিল বিদ্যমান থাকিতে কোন ইমামের মত কেন গ্রহণ করিব? আল্লাহ্ বলেন, وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ "যখন তোমরা যমীনের উপর চল।"—ইহার চেয়ে অধিক দলিল আর কি হইতে পারে? যমীনের উপর চলা এক মাইল পথেও হইতে পারে। সুতরাং এই আয়াতের নির্দেশানুসারে আমি কছর পড়িতেছি। জিজ্ঞাসাকারী লোকটি বলিল, ضَرَبَ فِى الْاَرْضِ -এর অর্থ যখন যমীনের উপর বিচরণ করা, তখন আপনি গৃহ হইতে মসজিদে আসিয়াও তো কছর পড়িতে পারেন। কেননা, আয়াতে কোন

নির্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ নাই। গৃহ হইতে মসজিদে আসাকেও যমীনের উপর চলা বলিতে পারেন। কাজেই এতটুকু চলার জন্যও তো কছর পড়িতে পারেন ?

এইরূপ আরও এক ব্যক্তি চলিতে চলিতে এমন জায়গায় আসিয়া মাগরিবের নামাযের সময় হইল, যেখানে একদিকে মসজিদ অপর দিকে খোলা মাঠ। মধ্যস্থলে সড়ক। মাগরিবের আযান হইয়া গিয়াছে। সে মাঠে গিয়া তায়াম্মুম করিয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিল। নামাযের পরে কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মসজিদেই তো পানি রহিয়াছে, আপনি তায়াম্মুম কেন করিলেন ? সে উত্তর করিল ঃ “মিয়া, মসজিদে পানি থাকিলে আমার কি ? আমার কাছে তো পানি নাই।” আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ وَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا তোমরা “পানি না পাইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।” বলুন, আমার নিকট পানি কোথায় ? সুতরাং আমার জন্য তায়াম্মুমের বিধান রহিয়াছে।

এসমস্ত কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য—আমাদের রুচি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যথাসাধ্য নফ্‌সের আরামই খুঁজিয়া বেড়াই যে, নফ্‌সের উপর কোন প্রকার বোঝা না চাপাইয়া জিম্মা খালাস করা যায় কিনা। সুতরাং এই রুচি অনুযায়ী আপনি যেন এরূপ মনে না করেন যে, হাদীস অনুযায়ী আমরা যখন মুসাফির হইলাম, তখন আজ হইতে ‘কছর’ আরম্ভ করিয়া দেই। দুই রাকাআতের দায় হইতে তো অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। এখন হইতে আর সেই দুই রাকাআত পড়িতে হইবে না। হাদীসের মর্মানুযায়ী যেই অর্থে আমাদিগকে মুসাফির বলা হইয়াছে, সেই অর্থ আমাদের মধ্যে থাকুক বা না থাকুক, দুনিয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু হইতে মন বিতৃষ্ণ হউক বা না হউক, নফ্‌সকে কোন প্রকারে আরাম দেওয়া আবশ্যক, উহার কোন ব্যবস্থা হউক।

সুদের প্রতি আকর্ষণ এবং যাকাত হইতে পশ্চাদপসরণ ঃ আমরা এমন বুযুর্গদের কথাও শুনি, যাঁহারা বিনাদ্বিধায় সুদ গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে যদি বলা হয় যে, “সুদ হারাম, কেন ইহা গ্রহণ করিতেছেন ?” নিতান্ত নির্ভীকভাবে তাঁহারা উত্তর করেন, “ভারতবর্ষ হইল দারুল হরব (শত্রু দেশ)। কোন কোন আলেমের মতে দারুল হরবে সুদ খাওয়া জায়েয আছে। আমরা তাঁহাদেরই মত মানিয়া চলিতেছি। ইহাতে ক্ষতি কি ?” কিন্তু যাকাত আদায়ের সময় আসিলে যখন তাহাদের নিকট যাকাতের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, তখন বলে ঃ “ভাই আমার সমস্ত ধনই তো ‘হারাম।’ সুদের ধন, অপরের হক। অপরের হকের মধ্যে যাকাত ওয়াজেব হয় কি ? সুতরাং আমি যাকাত দিতে অক্ষম। আপনিই বলুন, যাকাত দিতে পারি কিনা ? সুদের ধন না হইলে অবশ্যই আনন্দের সহিত যাকাত আদায় করিতাম।” দেখুন, নফসের কেমন জঘন্য চাল ! কেমন বিচিত্র ভান ! গ্রহণের বেলায় তো যাহাকিছু পাওয়া যায় হালাল না হইলেও হালাল, কিন্তু দেওয়ার বেলায় তাহা জঘন্য ধরনের হারাম ; বরং দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হারাম। কেননা, এখন তো দিবার পালা। ফলকথা, নফ্‌স সর্বদা ইত্যাকার অজুহাত আবিষ্কার করিয়া থাকে এবং আরামের পথ খুঁজিতে থাকে। হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রঃ) বলেন ঃ

چوں شتر مرغ شناس ایں نفس را نے برد بار و نے پرد بر ھوا
گر بپر گوئیش گوید اشترم ور نہی بارش بگوید طائرم

অর্থাৎ, নফ্‌সের দৃষ্টান্ত উট পাখীর ন্যায়। উহাকে উড়িতে বলিলে উত্তর দেয়, “মিয়া, তুমিও আশ্চর্য মানুষ, আমাকে উড়িতে বলিতেছ। উটও কি কোন দিন উড়িয়াছে ? আমি তো উট।

তুমি আমার আকৃতি দেখ না? বল, আমার আকার উটের চেয়ে কিসে কম?" আবার যদি বলা হয়, আচ্ছা যদি উট বলিয়া উড়িতে অক্ষম হও, তবে উটেরই কাজ কর। বোঝা বহন কর এবং সম্মুখে চল। তখন উত্তর দেয়, মিয়া! তুমি দেখিতেছি অন্ধ এবং নির্বোধ। তুমি আমার বিরাট পাখা এবং লম্বা পালক দেখিতে পাও না? পাখীকে কোথাও বোঝা বহন করিতে দেখিয়াছ? পাখী তো কেবল উড়িয়া বেড়াইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ, যেই অবস্থাকে নিরাপদ মনে করে, উহাই অবলম্বন করে। যদি উট হইলে বোঝা বহন করিতে হয়, তবে পাখী বনিয়া যায়। আবার পাখী হইলে যদি উড়িতে বলা হয়, তবে উট সাজিয়া যায়।

নফ্‌সের অবস্থাও এইরূপ। আমোদ-আহ্লাদ এবং চিত্তবিনোদনের আয়োজন হইলে বেশ শক্তিশালী হয়। খুব লাফালাফি করে। প্রাণ খুলিয়া পাপের কাজ করে। কিন্তু নামায-রোযার আলোচনা উঠিলে দুর্বল সাজে। অজুহাত তালাশ করে। খোদার কোন নিরীহ বান্দা খোদার ভয়ে শেষ রাত্রে উঠিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে এই সান্ত্বনা দিয়া শোয়াইয়া দেয় যে, এখনও অনেক রাত বাকী। একটু পরেই উঠিয়া নামায পড়িবে। এইরূপে হাত বুলাইয়া পিঠ চাপড়াইয়া শোয়াইয়া রাখে এবং সান্ত্বনা দিতে থাকে। অবশেষে ভোর হইয়া যায়।

এইরূপে যদি খোদার কোন বান্দা খোদার ভয়ে খুব ভীত হইয়া পড়ে, পাপের ভয়ঙ্কর রূপসমূহ তাহার সম্মুখে শাস্তির বিভীষিকা টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করে, তখন সে তওবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নফ্‌স তওবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় এবং বলেঃ বাস্তবিক, তওবা তো অবশ্যই করা আবশ্যক। কিন্তু ইহাও ভাবা উচিত, আল্লাহ্‌র দরবারে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হই কিনা। আচ্ছা আরও কিছু পাপ কার্য করিয়া সাধ মিটিলে তখন সত্যিকারের তওবা করিয়া লইব। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

هرشبے گویم که فردا ترك ایں سودا کنم باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

"প্রত্যেক দিনই বলি, আগামীকল্য তওবা করিব।" পাপ যাহা করিবার ছিল করিয়া ফেলিয়াছি। দুই একটা যাহা বাকী আছে, তাহা করিয়া দৃঢ়তার সহিত তওবা করিব। "অতঃপর যখন আগামীকল্য আসে, তখন উহাকে পরবর্তী দিনের উপর ন্যস্ত করে।" এইরূপে ইহাও নফ্‌সের একটি ধোঁকা যে, হারাম মাল খাওয়ার সময় হিন্দুস্তানকে শত্রু দেশ বলিয়া বিনাদ্বিধায় সুদ খাইতে আরম্ভ করে। আবার যাকাতের সময় আসিলে মালকে হারাম বলিয়া দেয়। কেমন সুন্দর মনগড়া মাস্‌আলা আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা, মালিকানা-স্বত্ব থাকিলেই মালের যাকাত ওয়াজেব হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল কাহারও অধিকারে থাকিলে তাহা হালালই হউক কিংবা হারামের সহিত মিশ্রিত হউক, যাকাত অবশ্যই ওয়াজেব হইবে। হারামের সহিত মিশ্রিত মালের যাকাত আদায় না করিলে দুই শাস্তির উপযোগী হইবে। হারাম মাল খাওয়ার জন্য এক শাস্তি এবং যাকাত আদায় না করার জন্য আর এক শাস্তি। কিন্তু যাকাত আদায় করিলে শুধু হারাম মাল খাওয়ার শাস্তি হইবে। যাকাত অনাদায়ের শাস্তি হইবে না। অবশ্য পারলৌকিক কঠিন দণ্ড ভোগ করার জন্য প্রথম অপরাধই যথেষ্ট। তথাপি যাকাত আদায় করিলে শাস্তি কিছু লাঘব তো হইবেই।

সারকথা এই যে, আমরা আখেরাতের সফর হিসাবে নিজদিগকে মুসাফির মনে করা উচিত ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে তো নিজেকে 'মুকীম' মনে করিলাম শুধু এই জন্য যে, সফরের অবস্থা মনে

রাখিলে দুনিয়ার আমোদ-আহ্লাদ ও মজা এবং সুখ-শান্তির উপকরণ উপভোগ করা যাইবে না। ফেকাহ্‌শাস্ত্র অনুযায়ী নিজেকে যে ক্ষেত্রে মুকীম মনে করাই উচিত ছিল, সে ক্ষেত্রে মুসাফির মনে করিলাম। কেন? শুধু এই কারণে যে, ইহাতে আরাম দেখা যায়। চারি রাকাআত ফরয নামায কছর করিয়া দুই রাকাআত পড়া যায়। অথচ আয়ুষ্কাল অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার হিসাবে আমাদের মুসাফেরী অবস্থার খেয়াল আদৌ হয় না যে, আমাদের এই দীর্ঘ সফরের গন্তব্যস্থান কোথায়?

কার্যকরী এবং স্থায়ী মুরাকাবার আবশ্যকতাঃ এই কারণেই আমরা দুনিয়ার আমোদে মত্ত। আমোদ-স্ফূর্তির উপকরণ প্রস্তুতে, আমোদ-স্ফূর্তিতে মাতাল। দুনিয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট কোন কিছুরই খেয়াল নাই। আহা! কতইনা ভাল হয়, যদি আখেরাতের সফরের কথা সর্বদা আমাদের স্মরণ থাকে এবং একথার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া যায় যে, এই দুনিয়া হইতে অবশ্যই একদিন আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে। অথবা আমরা দুনিয়ার এক পথচারী মুসাফিরের ন্যায় কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য পথের পথিক এবং দূর-দারাযের রাস্তা অতিক্রমকারী। আমাদের এই কষ্টসাধ্য সফরের জন্য এক মহান গন্তব্যস্থান আছে। সেই গন্তব্যস্থানের মহত্ত্ব এবং গুরুত্বের কারণেই এই পথ অতিক্রমে আমাদের কতই না প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু এই ধারণার ত্রিসীমানায়ও আমরা নাই। অবশ্য চারি রাকাআত ফরযকে দুই রাকাআত করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি।

বন্ধুগণ! 'আমরা এ দুনিয়ায় আখেরাতের মুসাফির।' এই ওযীফা নিত্য করণীয় কাজ, উঠিতে বসিতে ও নিদ্রায়-জাগরণে এই ধ্যান যখন স্থায়ীরূপে হইয়া যাইবে, তখন ইহার অনিবার্য ফল এই দাঁড়াইবে যে, দুনিয়া হইতে মন উঠিয়া যাইবে। আকর্ষণের পরিবর্তে ঘৃণা উৎপন্ন হইবে। সুখ-শান্তি ও আমোদ-আহ্লাদের যাবতীয় উপকরণ চরম পর্যায়ের যন্ত্রণাময় এবং ঘৃণাব্যঞ্জক হইবে। প্রত্যেক পার্থিব পদার্থই বিতৃষ্ণা উৎপাদক হইবে। এক মুহূর্তও দুনিয়াতে তিষ্ঠিয়া থাকা কষ্টসাধ্য হইবে। স্বভাবত ইচ্ছা হইবে—যে প্রকারেই হউক চল, এখানে যখন স্থায়ীভাবে থাকাই যাইবে না, দুনিয়ার এ সমস্ত নেয়ামত যখন একদিন আমাদের হস্তচ্যুত হইবেই; সুতরাং আমরা এখনই এইগুলি ছাড়িয়া চলিয়া যাই। এমন জায়গায় চল—যাহা চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর, যেখানে নিরাপদে ও শান্তিতে জীবন যাপন করা যায়।

ইহা একেবারে স্থূল কথা যে, কোন অপরাধে কাহাকেও কারাগারে পাঠাইলে কারাগারের নির্জন কামরা তাহার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয়। এক মুহূর্তও মন টিকে না, সর্বক্ষণ এই চিন্তা থাকে, যে প্রকারেই হউক এখান হইতে বাহিরে যাই। এইরূপে দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা সর্বক্ষণ মনে রাখিতে রাখিতে দুনিয়ার প্রতি মন বিরক্ত হইয়া পড়িবে। তখন এই আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল, চিত্তবিনোদনের নির্ঝরণী এবং যাবতীয় স্বাদ আস্বাদনের উৎস একটি ভীতিপূর্ণ, পরিতাপজনক এবং শঙ্কাপূর্ণ মজলিস ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। চতুর্দিক হইতে ভয়ঙ্কর দৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। তখন দুনিয়া কিংবা উহার কোন চিত্তাকর্ষক পদার্থের প্রতি মন লাগান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। দুনিয়া কিসে বর্জন করা যায়, উহার উপকরণ ও উপলক্ষ সম্বন্ধে চিন্তা হইবে এবং আখেরাত লাভ করার উছিলা ও উপকরণের অন্বেষণ হইবে।

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতিঃ এসম্বন্ধে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এই— وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا "যাহারা আমার রাস্তায় চেষ্টা করিবে, আমি তাহাদিগকে আমার পথ দেখাইয়া দিব।" সুতরাং এই

প্রতিশ্রুতি অনুসারে আখেরাতের সফরে তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে তাহা সহজেই পাইয়া যাইবে, পথ উন্মুক্ত হইবে। এতদিন এই উদ্দিষ্ট পথ সম্বন্ধে অমনোযোগী ও বেপরোয়া থাকিয়া হৃদয়ে যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া যাইবে। ইতঃপর কৃতকার্যতার মহান উপায়সমূহ দৃষ্টিগোচর হইবে। উদ্দিষ্ট গন্তব্যস্থান নিকটবর্তী এবং সহজলভ্য মনে হইতে থাকিবে—এই তো হইল উক্ত ব্যাপারের কিতাবী প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত দুনিয়ার অস্থায়িত্ব এবং ইহাকে ছাড়িয়া যাওয়ার কথা সর্বদা স্মরণ থাকিলে ইহার প্রতি অনুরাগ লোপ পাইবে। অনুরাগজনিত অন্ধকার দূরীভূত হইবে, অজ্ঞতার অন্ধকার দূরে সরিয়া যাইবে। এখন অনিবার্যরূপে অন্তরে এক প্রকার আলোর উদয় হইয়া হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আখেরাতের সফরের পথ আলোকিত হইবে। আমল ও এবাদতের রাজপথ ঝকঝক করিবে। অতঃপর সফর করিয়া গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছা খুবই সহজ হইয়া পড়িবে। আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যলাভের আশা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কেননা, পথের এই আলোর মধ্যে উক্ত আশার আলো দৃষ্ট হইবে। কারণ, খোদার সৃষ্টি অনর্থক এবং নিষ্ফল নহে, এসমস্ত সৃষ্ট পদার্থের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য এবং মঙ্গল অবশ্যই নিহিত রহিয়াছে। যাবতীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে ইহাও একটি উদ্দেশ্য যে, স্বীয় অভ্যাসানুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা কোন কার্যকে ফলশূন্য করেন নাই। সওয়াব হউক বা আযাব। এমন কখনই নহে যে, এই পরীক্ষা-জগতে মানুষ কোন কাজ করিবে এবং উহার বিনিময়ে সওয়াব কিংবা আযাব হইবে না। অবশ্য আমরা কোন কোন আমল দেখিতে পাইতেছি, যাহার বিনিময়ে দুনিয়াতে সওয়াব-আযাব কিছুই হয় না।

দেখুন, এক ব্যক্তি আজ শরীঅত অনুযায়ী কোন ভাল কাজ করিল। আমরা তাহার এই কাজের বিশেষ কোন ফল বা সওয়াব দেখিতে পাই না। আবার কোন ব্যক্তি শরাবপান বা যেনার ন্যায় জঘন্য কাজ করিল, ইহার দরুন পাপের কোন প্রতিক্রিয়া বা শাস্তি ভোগ করিতেও দেখি না। অতএব, জগতে যখন কোন ভাল-মন্দ কাজের সওয়াব বা আযাব ভোগ করিতে দেখিতেছি না, তখন বুঝা গেল যে, ইহা ছাড়াও অন্য কোন জগত নিশ্চয়ই আছে, যেখানে এসমস্ত কার্যের ফল পাওয়া যাইবে, উক্ত কার্যসমূহের ফল অবশ্যই ভোগ করিবে। আমরা এক মহান গন্তব্যস্থানের দিকে সফর করিতেছি, উপরোক্ত বর্ণনাটি একথার যৌক্তিক প্রমাণ।

'যুক্তি' বলিতে পারিভাষিক যুক্তি আমার উদ্দেশ্য নহে। এখানে আমার উদ্দেশ্য অগ্রগণ্যতা অর্থে যুক্তি। অর্থাৎ, সম্ভাব্য পদার্থের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব উভয়ই সমান। কোন প্রতিবন্ধক না থাকা অবস্থায় ইহার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের যেকোন একদিক অগ্রগণ্য হওয়াকেই আমি যৌক্তিক প্রমাণ বলিয়াছি। যেমন—আখেরাতও মূলত একটি সম্ভাব্য বিষয়, ইহারও উভয় দিক সমান। অর্থাৎ, হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। হওয়াও অবধারিত নহে, না হওয়াও অনিবার্য নহে। কিন্তু যুক্তি এবং বিবেক ইহার অস্তিত্বের দিককে অগ্রগণ্য মনে করে। কেননা, অস্তিত্বে কোন বাধা নাই। যেহেতু আজ পর্যন্ত ইহার অনস্তিত্বের পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য যৌক্তিক প্রমাণ উত্থাপন করা হয় নাই। সুতরাং বুঝা গেল যে, আখেরাত জ্ঞানত সম্ভব এবং উপরোক্ত অগ্রগণ্যতার যুক্তিতে উহার অস্তিত্ব সপ্রমাণিত। এখন অগ্রগণ্যতার উপরের ধাপ হইল 'অনিবার্যতা।' আর শরীঅতের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা উহার অস্তিত্ব অনিবার্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব, আখেরাতের অস্তিত্ব জ্ঞানত সম্ভাব্য ছিল। সত্যবাদী সংবাদদাতার বাণী উহাকে ওয়াজেবের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। সুতরাং আখেরাত জ্ঞানত সম্ভব এবং শরীঅতের বিধানে ওয়াজেব বা অনিবার্য।

ইহাকে "معاد" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মাআদ (معاد) বা আখেরাত প্রমাণ করার প্রয়োজন কেন হইল? শুধু এই কারণে যে, আমরা দেখিতেছি, অস্থায়ী পদার্থের অস্থায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে উহা হইতে মন উঠিয়া যায়। অতঃপর দুনিয়া হইতে মন উদাসীন হইয়া পড়িলে অপর জগতের অন্বেষণ আরম্ভ হয়। উল্লিখিত বর্ণনায় ইহা ইতিপূর্বে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ থাকিলে তাহাতে আখেরাতের স্থায়িত্বের কল্পনা অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়ে। দুনিয়ার অস্থায়িত্ব যেহেতু প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে। কাজেই ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আখেরাতের স্থায়িত্বও প্রমাণের মুখাপেক্ষী নহে; বরং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। এতদুভয়ের অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকার বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু মানুষ ইহা হইতে অমনোযোগী হইয়া পড়ার কারণে সতর্ক করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। সেই সতর্ক করার জন্য এখন ইহা বর্ণিত হইতেছে।

দুনিয়া খেল-তামাশা ভিন্ন কিছুই নহেঃ এই অমনোযোগিতা নিরসনের জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেনঃ ○ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ "এই দুনিয়া এবং ইহার সংশ্লিষ্ট সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নহে।" আল্লাহ্‌ তা'আলা আখেরাতের অস্তিত্ব প্রমাণে এই আয়াতটি উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ ইতিপূর্বে বর্ণিত আখেরাত সম্বন্ধীয় আয়াতেও ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সম্মুখের দিকে وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ "আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন" আয়াতটি দ্বারা আরও অধিক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। "দুনিয়া খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নহে" কথা হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে এমন একটি কথা ব্যক্ত করিতে চান, যাহা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতে বুঝা যায় না। তাহা এই যে, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস যদিও وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি বেহেশ্‌তের কামরায় স্থান দিব" এবং وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ আয়াত দ্বারাই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে; আর আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এতটুকু যথেষ্টও বটে; কিন্তু কেবল আখেরাতের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান এবং জ্ঞানদানই এস্থলে উদ্দেশ্য নহে; বরং এই বিশ্বাস হইতে যে ফল উৎপন্ন হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান দান করাই প্রধান উদ্দেশ্য—তাহা হইল আখেরাতের জন্য আমল করা। অথচ দুনিয়ার ব্যস্ততা ইহার প্রতিবন্ধক। এখানে যেন কারণের দ্বারা আদি কারণের প্রমাণ আনয়ন করা হইয়াছে। কেননা, দুনিয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহ যখন খেল-তামাশার শামিল বলিয়া স্মরণ থাকিবে, তখন ইহা আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং আখেরাতের মুসাফির হইতে কখনও এমন আশা করা যায় না যে, সে নিষিদ্ধ কার্যে মশ্‌গুল হইয়া নিজের মূল্যবান সফর ও দুর্গম পথকে বাধাসঙ্কুল করিয়া তুলিবে। দুনিয়ার উদ্দেশ্যের মুসাফিরই যখন নিজের সফরে এইরূপ বাধাজনক কার্য হইতে দূরে থাকে, তখন আখেরাতের মুসাফিরের তো নিষিদ্ধ কার্যসমূহে লিপ্ত হইয়া সফরে বাধা সৃষ্টি করা হইতে অবশ্যই দূরে থাকা উচিত।

সুতরাং বুঝা গেল যে, আখেরাতের অস্তিত্ব প্রমাণ প্রসঙ্গে এই আয়াতটি (وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ) বর্ণনা করার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশ্য এই যে, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন যেমন উদ্দেশ্য, তদ্রূপ সংসারের প্রতি বিরাগ উৎপাদনও উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই এবাদত বা আমলের প্রতি উৎসাহ জন্মিবে। অতএব, মূল উদ্দেশ্যটি যেন এল্‌ম (বিশ্বাস) এবং আমল (এবাদত)—দুইটি অংশ দ্বারা প্রস্তুত হয়। প্রথম এবং শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে আখেরাতের

প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দিকে মন আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং মধ্যবর্তী আয়াতে দুনিয়া হইতে বিরত থাকার তা'লীম দিয়া আখেরাতের জন্য এবাদত করার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যেখানেই এল্‌ম বা বিশ্বাস সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে কেবল জ্ঞান দান করাই উদ্দেশ্য নহে; বরং তদনুযায়ী আমল করাও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। আর আমলের জন্য এল্‌ম হয় একটা উছিলা মাত্র।

শুধু বিশ্বাস স্থাপন যথেষ্ট নহেঃ অনেকে ইহা মনে করিয়া খুশী যে, আখেরাতের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। আমার কিসের চিন্তা? সাবধান! ইহাও নফ্‌সের একটি অতি সূক্ষ্ম ভ্রান্ত ধারণা। উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কেবল বিশ্বাস কখনও যথেষ্ট নহে। উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় বিশ্বাস বা ঈমান কিছুটা হিতকর হইলেও আমল ভিন্ন ইহা পূর্ণমাত্রায় ধর্তব্য নহে। আজকাল মানুষের রুচি বিচিত্র ধরনে বিগড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা কেবল বিশ্বাস স্থাপনই মুক্তির যথেষ্ট উপায় মনে করিয়া থাকে, আমলের যেন কোন আবশ্যকই নাই। ইহার একমাত্র কারণ হইল, আজকাল লোকে এল্‌ম ও আলেমদের সহিত যোগাযোগ এবং তাঁহাদের সাহচর্য ত্যাগ করিয়াছে। বুযুর্গানের কাছেও ঘেঁষে না। যে সমস্ত সভায় দ্বীনি এল্‌মের আলোচনা হয়, তথায় তাহাদের মন বসে না, ইহার ফলেই এসমস্ত ভুলে পতিত হইয়া বিপথগামী হইয়া যায়। আমল তো আমলই। যেই ঈমানকে সকলেই একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকে, তাহাতেও বিচিত্র গোলমাল। বিশ্বাসের সংশোধনও আলেমের সংসর্গ ভিন্ন দুষ্কর। অতএব, শুধু বিশ্বাস তো প্রথমত যথেষ্টই নহে। যদিও তাহাদের ধারণানুসারে ইহাকে যথেষ্ট মনে করাও হয়, তথাপি আফ্‌সোসের বিষয়! উহাকেও পূর্ণ করিয়া লয় না।

এখন অনেক কম লোক এমন পাওয়া যাইবে, যাহাদের আকীদা শরীঅতের বিধানানুরূপ এবং তাহারা সেই সত্যপন্থী দলের শামিল হইতে পারে, যাঁহাদের সম্বন্ধে হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে ৭২ দলই দোযখী, কেবলমাত্র একটি দল মুক্তি পাইবে।" উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হুযূর, তাহারা কোন্ দল? তিনি উত্তর করিলেনঃ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ অর্থাৎ, "যে দলে আমি এবং আমার ছাহাবীগণ রহিয়াছি।" অতএব, দেখুন, অতি অল্প লোকই এই দলে রহিয়াছে। যাহারা আছেন তাহারাও এরূপ ভুলের মধ্যে রহিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে কতক লোক مَا اَنَا عَلَيْهِ -এর দলকে কেবল বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। অর্থাৎ, তাহারা বলে, "হুযূর (দঃ) এবং তাঁহার ছাহাবাগণের সহিত শুধু বিশ্বাসের ঐক্য রক্ষা করিলেই মুক্তি পাওয়ার উপযোগী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হইবে। অথচ ইহা তাহাদের ভুল। কেননা, 'যাহা' শব্দটি এখানে ব্যাপকার্থক, কিন্তু তাহারা ইহাকে নির্দিষ্টরূপে কেবল বিশ্বাসের সহিতই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। অথচ বিশ্বাস, আমল, স্বভাব-চরিত্র, অভ্যাস যাবতীয় বিষয় এই مَا, শব্দের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে যেমন বিশ্বাস সংশোধনের প্রয়োজন রহিয়াছে, তদ্রূপ বিশ্বাসের পরিপূরক যাবতীয় কার্যাবলী এবং স্বভাব-চরিত্রেরও প্রয়োজন আছে। যাহারা কেবল বিশ্বাস সংশোধন করিয়াই সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করিতেছে এবং নিজদিগকে مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -এর দলে শামিল করে। অথচ তাহাদের কার্যাবলী এমনই যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীদের কার্যাবলীর সহিত কোনই সামঞ্জস্য নাই। তদুপরি বড় আপত্তিজনক কথা এই যে, ইহারা যে সমস্ত বুযুর্গ লোকের সহিত সম্পর্কিত, তাঁহারাও কেবল আকীদা ঠিক করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন এবং আমল ও এবাদতের

কাছেই যান না; বরং খুশীর সহিত বলিয়া থাকেনঃ "ভাই! অমুক বুযুর্গ লোকের আকীদা খুবই উত্তম।" যেন একথায় তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া দিলেন, তাঁহার কার্যাবলী ফাসেক লোকের মত হইলেও সেদিকে লক্ষ্যই করা হয় না।

অথচ চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে—আমল ভিন্ন এই আকীদা সংশোধন শুধু মৌখিক জমা খরচ, সেই আকীদার উপর পূর্ণ নির্ভরও নাই। কেননা, দৃঢ় বিশ্বাস স্বভাবত আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তির শরীঅতসম্মত আকীদা দৃঢ় হয় এবং বিশ্বাসের দিক দিয়া সে "مَاأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ" -এর পন্থী হয়, তবে তাহার আমল ফাসেক-ফাজেরের ন্যায় হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বিপদের কারণ এই যে, আমাদের দলে যাঁহারা সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করেন, তাঁহাদের প্রতি খোদার রহমত হউক, তাঁহারাও مَاأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ -এর দলভুক্ত হওয়ার জন্য শুধু আকীদা সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় হওয়াকে যথেষ্ট মনে করেন। তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র ও আমলের প্রতি লক্ষ্য করেন না। যখন ইঁহারাই আমলের প্রতি লক্ষ্য করেন না এবং উপেক্ষা করিয়া চলেন, তখন তাঁহাদের অনুসারীরাও স্বাধীন হইয়া পড়ে এবং প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করিতে থাকে। তাহাদের কেহ কেহ বাতিলপন্থী ও প্রবৃত্তির বশীভূত লোকের জীবন যাপন পদ্ধতি এবং দুনিয়াদার লোকের ফ্যাশন্ অবলম্বন করে। বুযুর্গানে দ্বীনের নিয়ম-পদ্ধতিকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখান করে। সত্যপন্থীগণের শিক্ষা-দীক্ষাকে দাকিয়ানুসী যুগের ভাবধারা আখ্যা দিয়া থাকে। সত্যপন্থীর দাবীদারগণের ইহা বিরাট ভুল; বরং ইহা নফ্সের একটি বড় ধোঁকা। সে তাহাদিগকে শরীঅত অনুমোদিত কার্য সংশোধন করা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

মোটকথা, রাসূল (দঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের সহিত ঐক্য রক্ষা করা যেমন আকীদার ব্যাপারে অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ অন্যান্য কার্যকলাপেও অত্যাবশ্যক। এখন বুঝা গেল যে, সুন্নী জামাআতে কেবলমাত্র তাঁহারাই সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করিতে পারেন, যাঁহারা আকায়েদের ন্যায় যাবতীয় কার্যকলাপ এবং জীবন যাপন পদ্ধতিতেও হুযূর (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবায়ে কেরামের পন্থা-পদ্ধতির অনুসারী। তাহাদের স্বভাব-চরিত্র হুযূর (দঃ)-এর স্বভাব-চরিত্রের নমুনা এবং তাহাদের সামাজিকতা হুযূর (দঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সামাজিকতার ন্যায় সৌন্দর্যমণ্ডিত। তদুপরি বুযুর্গানে দ্বীনের চাল-চলনকে প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করেন। অন্তরে বুযুর্গানে দ্বীনের মর্যাদা এবং চোখে তাঁহাদের সম্মান ও ভক্তি বিদ্যমান থাকে। বাতিলপন্থীগণের চাল-চলনের প্রতি ঘৃণা হয়।

ফ্যাশন অনুসারীদের প্রশ্ন ও উহার উত্তরঃ আপনাদের এইরূপ হওয়া উচিত নহে, যেরূপ হক্‌পন্থীদের রীতি-নীতিকে উপেক্ষার যোগ্য মনে করিয়া আধুনিক নব্য যুবকরা নয়া যমানার ফ্যাশনকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করা নিজেদের আকীদার শামিল করিয়া লইয়াছে। যখন তাহাদের বলা হয়, হকপন্থী হইতে হইলে আকীদার ন্যায় উহার পরিপূরক আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে, অথচ তোমরা তাহা ছাড়িয়া দিয়া হক্‌পন্থী হওয়ার দাবী করিতেছ। তোমাদের দাবী তখনই সত্য বলিয়া মানা যাইবে, যখন তোমরা ভিতরের ন্যায় নিজেদের বাহিরকেও হকপন্থীদের অনুরূপ করিয়া লইবে এবং তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র, জীবনযাত্রা প্রণালী, কার্যকলাপ, বেশভূষা ও সামাজিক আচরণ অবলম্বন করিবে। তখন তাহারা বাহ্যদৃষ্টি অনুসারে এক জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলে যে, আপনি বলিতেছেন, হকপন্থী হইতে হইলে সকল বিষয়েই নবী (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করিতে হইবে, তবে প্রথমে নিজেকেই সংশোধন করিয়া লউন। অতঃপর আমাদিগকে

উপদেশ দিন। কেননা, আপনার কথা অনুযায়ী আপনি নিজেও হকপন্থীদের দল হইতে বহির্গত এবং “مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ” -এর ছেরাতুল মুস্তাকীম হইতে দূরে পড়িয়া যাইতেছেন।

কবি বলেনঃ چاه کن را چاه در پیش

“কূপ খননকারী নিজেই কূপের সম্মুখীন।” আপনি আমাদিগকে পথভ্রষ্ট বলিতেছিলেন, এখন দেখিতেছি আপনি নিজেই পথভ্রষ্ট। বলুন তো, এমন আঁটসাঁট আচ্‌কান এবং বুক খোলা চোগা হুযূর (দঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনও পরিয়াছিলেন কি? এই প্রকার সেলিম শাহী জুতা হুযূর (দঃ) এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ কখনও পরিধান করিয়াছিলেন? ইতিহাসে কোথাও হুযূরের ইত্যাকার জীবন-যাপন প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায় না। এই সঙ্কীর্ণমুখী চুড়িদার পায়জামা পরিধান করা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ হাদীসে কিংবা ছাহাবায়ে কেরামের কোন্ বাণীতে প্রমাণিত আছে? বরং ইতিহাসের পাতা জোরাল ভাষায় এবং হুযূর (দঃ)-এর হাদীস স্পষ্ট শব্দে আমাদিগকে অবগত করিতেছে যে, হুযূর (দঃ)-এর এবং সমস্ত ছাহাবায়ে কেরামের মোটামুটি পোশাক ছিল তিনখানা কাপড়—তহবন্দ, টাখ্‌নু বা গিরার উপর পর্যন্ত কোর্তা, একটি চাদর। যাঁহারা একান্ত দরিদ্র ছিলেন, তাঁহারা কেবল এক কোর্তা কিংবা এক তহবন্দ পরিয়াই কাল যাপন করিতেন। অবশ্য হুযূর (দঃ) এবং ধনবান ছাহাবীগণ পাগড়ী এবং জুব্বাও পরিধান করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। আর জুতা পরিধান করিতেন সেই দোয়ালবিশিষ্ট সেণ্ডেল। মোটকথা, আপনাদের ন্যায় এই ধরনের পোশাক, জুতা তাঁহারা পরিতেন বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। জনাব! ইহাও বলুন তো! এই পোলাও-কোরমা, বিরিয়ানী প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্য হুযূর (দঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন কি? হুযূর (দঃ) তো অধিকাংশ সময়ই যব কিংবা খোরমা খাইয়াই জীবনধারণ করিতেন। কচিৎক্রমে গম ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -এর দলভুক্ত হওয়ার জন্য আপনারাও ঘৃতপক্ক ও চর্বিযুক্ত খাদ্য বর্জন করুন এবং গমের রুটি ও যবের ছাতুর উপর জীবনধারণ করুন। অতঃপর আপনাদের হকপন্থী হওয়ার দাবী শোভা পাইবে।

কিন্তু এই প্রশ্নও প্রবৃত্তির এক প্রকার জটিল জালবিশেষ। ইহার উত্তরে আমি বলিব, যদিও শব্দটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বস্তুই ইহার অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহার ব্যাপকতার অর্থে এক প্রকার সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে। ইহার পর বাক্যটির অর্থ এইরূপ নির্দিষ্ট হয় যে, হুযূর (দঃ)-এর কার্যকলাপ এবং চাল-চলন অবশ্য প্রত্যেক বিষয়েই অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণত কার্যকলাপ এবং চাল-চলন বলিতে যাহা বুঝায় এখানে কেবল তাহাই উদ্দেশ্য নহে। অর্থাৎ, কেবল তাঁহার কার্যাবলীই অনুসরণীয় নহে; বরং কতক বিষয় তিনি নিজে না করিলেও উম্মতের জন্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। (ইহাকে তাঁহার বাগধারা বলিলে সঙ্গত হয়।) মোটকথা, হুযূরের অবলম্বিত কার্যাবলী অনুসরণ করিলে যেমন, مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -এর দলভুক্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ তাঁহার অনুমতিযুক্ত কার্যগুলি অবলম্বন করিলেও উক্ত দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা না করিয়া থাকেন। উভয় প্রকারের কার্যই হুযূরের কার্যধারা অর্থাৎ, مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ -এর অন্তর্ভুক্ত এবং হকপন্থী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এই জাতীয় আচ্‌কান, চোগা, জুতা প্রভৃতি যদিও হুযূর (দঃ) নিজে ব্যবহার করেন নাই, এই প্রকারে জর্দা, পোলাও, কোরমা প্রভৃতি রুচিকর খাদ্য আহার করেন নাই, কিন্তু খাওয়া-পরার

ব্যাপারে তিনি উম্মতকে এরূপ প্রশস্ততার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, ছাহাবায়ে কেরাম অপেক্ষা উচ্চতর হকপন্থী আর কেহ ছিল না—ইহা সর্ববাদিসম্মত। এমন কি, তাঁহারা ছিলেন হুযূর (দঃ)-এর চাল-চলন এবং কার্যকলাপের মূর্ত প্রতীক। তাঁহাদের অনুসরণকে হুযূর (দঃ) পারলৌকিক মুক্তির উছিলা বলিয়াছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে দেখা যাইবে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামের উত্থানকালে ছাহাবাগণ খাওয়াপরার ব্যাপারে প্রশস্ততা অবলম্বন করিয়াছেন এবং নানাবিধ নেয়ামত উপভোগ করিয়াছেন। অথচ হুযূরের জীবিতকালে অর্থাৎ, ইসলামের প্রাথমিক সময় ইহা ছিল না। এতদ্ভিন্ন হুযূর (দঃ)-এর জীবদ্দশায় ইস্‌লামের প্রথম যুগে ও শেষের দিকে ছাহাবাগণের অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন এবং দরিদ্রাবস্থার পরে সুখ-শান্তির উপকরণ অবলম্বন করা একেবারে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। হুযূরের এন্তেকালের পরবর্তীকালের কথা তো দূরেই থাকুক। সুতরাং বুঝা গেল যে, শরীঅতের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া নানাবিধ নেয়ামত উপভোগ করা এবং সুখ-শান্তির উপকরণ অবলম্বন করার অনুমতি হুযূরের বাণী দ্বারাই প্রমাণিত আছে। অতএব, এতদনুযায়ী আমল করিলেও হকপন্থী দলের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিবে, যদিও ইহা হুযূরের বিশেষ কার্যধারার অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং যবের রুটি খাওয়া অবশ্যই হুযূরের কার্য সংক্রান্ত সুন্নত। সাধ্য থাকিলে এতদনুযায়ী আমল করা খুবই উচ্চ ধরনের, উত্তম এবং পছন্দনীয় কার্য। অবশ্য হুযূরের প্রত্যেক সুন্নত অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেক লোকের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই মর্মে আমার একটি গল্প মনে হইয়াছে। একদিন হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শেবন্দী (রঃ) কোন কিতাবে ছাহাবায়ে কেরামের জীবন যাপন প্রণালী সম্বন্ধীয় একটি হাদীস দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারা যব পিষিতেন এবং তন্মধ্যস্থিত মোটা খোসাগুলি ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া অবশিষ্ট ছাতু চালুনি দ্বারা চালা ব্যতীত এমনি গুলিয়া রুটি পাকাইয়া খাইতেন। যদিও ইতিপূর্বে এই হাদীসটি বারবার তাঁহার নজরে পড়িয়াছিল; কিন্তু অদ্য ঐ হাদীসটি পাঠ করিয়া তাঁহার মনে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল এবং বিশেষভাবে একথার প্রতি লক্ষ্য হইল যে, আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতি হুযূর (দঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় কেন হইবে না? আমরা আড়ম্বরপূর্ণ খাদ্য কেন গ্রহণ করিব? তৎক্ষণাৎ তিনি শিষ্যমণ্ডলীকে বলিলেনঃ "আজ হইতে আমরাও যবের আটা না চালিয়াই তদ্দ্বারা রুটি প্রস্তুত করিয়া খাইব।"

ফলত পরবর্তী দিন যবের রুটি ঐরূপেই প্রস্তুত হইল এবং তিনি ভক্ষণ করিলেন। সমস্ত শস্যের মধ্যে যেহেতু যবের খোসা সর্বাপেক্ষা শক্ত হইয়া থাকে, এদিকে না চালিয়া রুটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। কাজেই সকলেরই পেটে ব্যথা আরম্ভ হইয়া গেল এবং সকলে এত কষ্ট পাইলেন যে, পরবর্তী বেলায় আর তাহা খাইতে সাহস পাইলেন না।

আল্লাহু আক্‌বার! এই মহাপুরুষদের উচ্চ মর্যাদা এসমস্ত উক্তি হইতেই প্রকাশ পায়। আমাদের ন্যায় প্রবৃত্তির দাস হইলে সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ কল্পনা হইত। কল্পনা কিসের? মুখ ফুটিয়াই বলিয়া ফেলিতঃ "খুব ভাল সুন্নতই পালন করিলাম, যাহার ফলে পেট চাপিয়া বেড়াইতেছি। এরূপভাবে দুই চারিবার সুন্নত পালন করিলে সম্ভবত দুনিয়া ছাড়িয়াই যাইতে হইবে। আমরা এমন সুন্নত পালন হইতে বিরত রহিলাম।" কিন্তু তাঁহাদের 'আদব' দেখুন, ভবিষ্যতে যব খাওয়া তো বর্জন করিলেন, কিন্তু হুযূর (দঃ)-এর এই শ্রেণীর সুন্নতের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রহিল। তিনি নফস্‌মারা কঠিন হৃদয় পীরদের ন্যায় যবের রুটি খাওয়া অবধারিত করিয়া লইলেন না। গোঁড়া পীরেরা

অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা হইতে থাকিলেও যব খাওয়া ত্যাগ করিতেন না। হযরত খাজা সাহেবের গুণ এই যে, যবও আর খাইলেন না এবং সুন্নতের উপরও কোন দোষ আসিতে দিলেন না। তিনি উভয় বিষয়কে কেমন সুন্দরভাবে একত্রিত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেনঃ আমি বেআদবী করিয়া ফেলিয়াছি। সর্বপ্রকারে হুযূর (দঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ইহা প্রকারান্তরে তাঁহাদের সহিত সমকক্ষতার দাবীই বটে, ইহা আমাদের নিছক ভুল হইয়াছিল। সেই ভুলের শাস্তি ভোগ করিলাম। সুন্নতের প্রতি কোন দোষারোপ হইতে পারে না; বরং প্রকৃতপক্ষে ত্রুটি আমাদেরই। অর্থাৎ, সেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে এবং উহা বরদাশ্‌ত করিতে আমাদের নফ্‌স অক্ষম। জীবন যাপনের এই পদ্ধতি ছাহাবায়ে কেরামেরই উপযোগী, তাঁহারাই উহা বর্‌দাশত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমাদের সেই লোভ করা উচিত নহে।

মাশায়েখে কেরামের কর্তব্যঃ মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

چار پارا قدر طاقــت بار نه بر ضـعـيـفـاں قدر همت كار نـه

"চতুষ্পদ জন্তুর উপর উহার ক্ষমতানুযায়ী বোঝা চাপাও। দুর্বল লোক হইতে তাহার শক্তি অনুযায়ী কাজ লও।"

মাওলানা এই কবিতাটির মধ্যে শিক্ষা দিতেছেন যে, মুরশিদগণের উচিত শিষ্যগণ হইতে তাহাদের সাহস এবং শক্তি অনুযায়ী কাজ লওয়া, শক্তির অতিরিক্ত কাজের চাপ দেওয়া উচিত নহে। অন্যথায়ঃ

طفــل را گر ناں دهى بر جائے شير طفـل مسكين را ازاں نان مرده گير

"স্তন্যপায়ী শিশুকে যদি দুধের পরিবর্তে রুটি খাইতে দেওয়া হয়, তবে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

শিশুকে দুধের পরিবর্তে রুটি খাইতে দেওয়ার অর্থ তাহাকে ধ্বংস করা। হাফেয শিরাযীও এই মর্মটুকু তাঁহার কবিতায় কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেনঃ

خستگــاں را چوں طلب باشد وقوت نبود گــر تــو بيــداد كنى شرط مــروت نه بود

"যে সমস্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থার লোকের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু শক্তি নাই, তাহাদের প্রতি যুলুম করা মনুষ্যত্বের বিপরীত হইবে।"

কেহ কেহ হাফেয শিরাযীর উপর বৃথা আক্রমণ করিয়া থাকেন যে, তিনি মদ্যপায়ী এবং মাতাল ছিলেন। তাঁহার উক্তি কেমন করিয়া আরেফানা হইবে? এরূপ প্রশ্ন তাহাদের ভুল এবং কু-মতলবের প্রমাণ। এরূপ প্রশ্ন বিশেষ করিয়া কেবল হাফেয শিরাযীকেই করা হয় নাই; বরং সমস্ত কামেল লোকের প্রতিই সর্বদা ইত্যাকার প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের মর্যাদার উপর কোন প্রকার দাগ পড়ে না; বরং তাঁহাদের মর্যাদা আরও ফুটিয়া উঠে। বুঝা যায়—তাঁহাদের জ্ঞান অতি উচ্চস্তরের এবং সাধারণ লোকের নাগালের বাহিরে। হযরত হাফেযের উক্তি হইতে তাছাওউফ শাস্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ মাস্‌আলা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। তাঁহার উন্নত মস্তিষ্কের প্রমাণ তাঁহার উচ্চস্তরের উক্তিগুলি হইতেই প্রকাশ পায়। একজন অনুপযুক্ত, অযোগ্য, মাতাল লোকের উক্তি হইতে তাছাওউফের এত মাসআলা আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব (রঃ) বলিতেনঃ "যে যেই ধরনের লোক তাহার ভিতর হইতে তাহাই নির্গত হয়।" অর্থাৎ, কাহারও উক্তি হইতে উচ্চস্তরের বিষয়বস্তু এবং জটিল মাসআলা তখনই বাহির করা যাইতে পারে, যখন তাহার ভিতরে সে সমস্ত বিষয়বস্তু ইচ্ছামূলকভাবে বিদ্যমান

থাকে। অন্যথায় কোন দুশ্চরিত্র মদ্যপায়ী লোকের উক্তি হইতে তুমি সেই শ্রেণীর বিষয়বস্তু বাহির কর তো? সুতরাং হাফেয শিরাযীর উক্তি হইতে এই শ্রেণীর তাছাওউফের মাসআলা আবিষ্কৃত হওয়াই তিনি মুরশিদে কামেল হওয়ার প্রমাণ। তিনি বলিতেছেনঃ

خستگاں را چوں طلب باشد وقوت نبود   گر تو بیداد کنی شرط مروت نه بود

"যে সমস্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত লোকের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে শক্তি নাই, তাহাদের প্রতি অবিচার করা মানবতাবিরোধী।" ইহাও কঠোর স্বভাব মুরশিদদিগকেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, মুরীদগণের সহিত তাহারা যেন সহজসাধ্য আচরণ করেন। শক্তি এবং যোগ্যতা অনুযায়ী তাহাদিগ হইতে কাজ লন। এমন না হয় যে, তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং মস্তিষ্ক বিগ্‌ড়াইয়া যায়। অতঃপর সে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।

অনভিজ্ঞ মুরশিদের কার্যপদ্ধতিঃ দেখুন, কোন ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ্‌ তাআলার মহব্বত লাভের আগ্রহে পরিপূর্ণ। তাহার অন্বেষণ হৃদয়ে উচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান। কিন্তু এতদসঙ্গে দুর্বলতা এবং বার্ধক্যের কারণে পিঠ কুঁজো হইয়া পড়িয়াছে। সামান্য পথ চলিয়াই হাঁপাইয়া পড়ে। চব্বিশ হাজার বার আল্লাহ্‌ তাআলার 'এসমে জালালী' ওযীফা করিবার শক্তি নাই। সে যাইয়া কোন পীরের মুরীদ হইল। পীর ছাহেব তাঁহাকে বলিলেনঃ দৈনিক চব্বিশ হাজার বার 'এস্‌মে জালালী'র ওযীফা কর। সে বলিলঃ "হযরত! 'চব্বিশ হাজার বার' জালালী নামের ওযীফা করিয়া আমি কোথায় থাকিব? এক দিনেইতো মরিয়া যাইব।" পীর ছাহেব বলিলেনঃ "কোন ক্ষতি নাই, মরিলে শহীদ হইয়া যাইবে। খোদার অন্বেষণে লিপ্ত হইয়া তদবস্থায় মরিয়া গেলে শহীদ হওয়ার সওয়াব লাভ করিবে; বরং অতি উচ্চ স্তরের শহীদ হইবে।" পীর সাহেব, খুব ঠিকই বলিয়াছেন! বাস্তবিক এই ব্যক্তির শহীদ হওয়াতে কোন সন্দেহ নাই। সে তো অবশ্যই শহীদ হইবে। কিন্তু আপনি সাবধান থাকুন। তাহাকে শহীদকারী আপনিই। তাহার তো শহীদ হওয়ার ভাগ্য হইল। কিন্তু আপনার আমলনামায় একটি ইচ্ছাকৃত হত্যার মহাপাপ লিখিত হইল এবং আপনি হত্যাকারী আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

দিল্লী নগরীতে এক পীর ছাহেব ছিলেন। তিনি সমস্ত মুরীদকে একই ছড়ি দ্বারা শাসন করিতেন। দুর্বল-সবলের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখিতেন না। তাঁহার দরবারে যুবক-বৃদ্ধ সকলের জন্য একই ওযীফা ছিল। এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার মুরীদ হইল। পীর ছাহেব তাহাকে "ছালাতে মা'কূস" শিক্ষা দিলেন। লোকটি পীর ছাহেবের নির্দেশ অমান্য করার যোগ্য মনে করিল না, পীর ছাহেবের শিক্ষানুযায়ী "ছালাতে মা'কূস" পড়িল এবং তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারটি পীর ছাহেবের কর্ণগোচর করা হইলে তিনি বলিলেনঃ "কোন ক্ষতি নাই, ভালই হইয়াছে, শহীদ হইয়াছে, নফ্‌সের পবিত্রকরণ পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে।"

ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা বলিতেছি। এক চিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অন্ধ ও অনভিজ্ঞ ছিল। তাহার নিকট এক রোগী আসিল। তিনি তাহাকে জোলাবের ব্যবস্থা করিয়া খুব কড়া ঔষধ প্রদান করিলেন এবং বলিলেনঃ ঘরে যাইয়া সেবন কর, ইহাতে দাস্ত হইবে। রোগী বাড়ী যাইয়া ঔষধ সেবন করা মাত্র দাস্ত হইতে আরম্ভ করিল। যখন দাস্তের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক হইয়া গেল, তখন গৃহবাসীরা অস্থির হইয়া হাকীম ছাহেবের নিকট গিয়া বলিলঃ হুযূর! অনর্গল দাস্ত হইতেছে। রোগী ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। তিনি বলিলেন, এখনই কি হইয়াছে। ইহা জোলাব। হাসি-তামাশা নহে। দাস্ত হইবেই এবং দুর্বলতাও বাড়িবে। তোমরা ভয়

পাইতেছ কেন ? পরে আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহারা নীরবে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ আরও অপেক্ষা করা হইল, কিন্তু দাস্ত এমন তীব্রভাবে আরম্ভ হইয়াছে যে, বন্ধ হইবার নামই নাই। অনেকক্ষণ পরেও যখন পায়খানা বন্ধ হইল না, তখন তাহারা ভীষণ ভয় পাইয়া গেল। পুনরায় হাকীম ছাহেবের নিকট গিয়া বলিলঃ এতক্ষণ হইয়া গেল, দাস্ত এক মিনিটের জন্যও বন্ধ হইতেছে না। রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। তিনি উত্তর করিলেন, রোগীর আগে তোমাদেরই তো প্রাণ বাহির হইতেছে দেখিতেছি। আরে ভাই! দাস্ত হইতেছে—ভালই তো কথা। অনিষ্টকারী মল বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে সারা জীবন কষ্ট দিবে। তাহারা আবার নীরবে চলিয়া গেল। কিন্তু দাস্ত বন্ধ হইল না। অবশেষে রোগীর প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তাহারা হাকীমকে জানাইল। দাস্ত বন্ধ হইবার ছিল না, বন্ধ হইল না। শেষ পর্যন্ত রোগীই চলিয়া গেল। হাকীম বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ অনিষ্টকারী পদার্থ বাহির হইয়াও এরূপ হইল! দাস্ত বন্ধ হইলে খোদা জানেন, কি অবস্থা হইত। এই বেওকুফকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত যে, মৃত্যুর উপরে আর কোন্ অবস্থা ছিল—দাস্ত বন্ধ না হইলে যাহা ঘটিতে পারিত ? মানুষের শেষ অবস্থা হইতেছে মৃত্যু। দাস্ত বন্ধ হইলেও খুব বেশী হইলে মৃত্যুই ঘটিত। অতএব, এই বেওকুফ হাকীম যেমন এই রোগীর মৃত্যুর কারণ; বরং হত্যাকারী হইয়াছে, তদ্রূপ উপরোক্ত মুরীদ যদিও শহীদ হইয়াছে, কিন্তু মুরশিদের আমলনামায় এক অন্যায় হত্যার বিশ্রী দাগ লাগিয়াছে, যাহা মুছিয়া ফেলিলেও নিশ্চিহ্ন হইবার নহে।

ফলকথা, হাফেয শিরাযী এই কবিতায় এই শ্রেণীর কঠোর স্বভাব মুরশিদকে যালেম এবং এই ধরনের কার্যকে অবিচার ও মনুষ্যত্ব বিরোধী মনে করিয়াছেন।

বন্ধুগণ, বাস্তবিকই ইহা বড় যুল্‌ম। এই ধরনের মুরশিদগণ মুরীদের অবস্থার প্রতি একটুও লক্ষ্য করেন না; বরং সকলের উপর একই ছড়ি ঘুরাইতে থাকেন। দুর্বল এবং সবল সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন।

কামেল পীরের কার্যধারাঃ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের কার্যপ্রণালী কেমন অনুগ্রহপূর্ণ ছিল! তাঁহাদের দরবারে সর্বপ্রথম নিয়ম এই ছিল যে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও শক্তিশালী মুরীদকে পূর্ণমাত্রায় এস্‌মে যাতের ওযীফা তা'লীম দিতেন। দুর্বল কিংবা কর্মব্যস্ত হইলে শক্তি ও অবসর অনুযায়ী তা'লীম দিতেন। কাহাকেও দশ হাজার বার, কাহাকেও বা পাঁচ হাজার বার, কাহাকেও বা পাঁচ শত বার। শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক মুরীদ হইতে কাজ আদায় করিতেন। কঠোরতা পছন্দ করিতেন না। আমার পীর ছাহেব বলিতেনঃ আজকাল তোমরা যে দেখিতেছ, মসজিদে প্রত্যেক নামাযের পর মুছল্লিগণ সালাম ফিরাইয়া তিনবার لَآ اِلٰهَ। اِلَّا। اللّٰهُ যেকের করিয়া থাকে, ইহার তাৎপর্য এই যে, কোন পীর নিজের কোন দুর্বল মুরীদকে তা'লীম দিয়াছিলেনঃ 'তুমি আর অধিক কি পারিবে? প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার এই যেকের করিও।' দুনিয়ার দস্তুর এই যে, খরবুযা দেখিয়া খরবুযার রং পরিবর্তিত হয়। লোকেরা তাহাকে দেখিয়া এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। দুর্বল-সবল নির্বিশেষে সকলেই এইরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই যেকেরও যেন দুনিয়ার অন্যান্য প্রথার ন্যায় একটি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই তাহা পালন করিতেছে। প্রকৃত বস্তু লোপ পাইয়াছে। বস্তুত দুনিয়ার অবস্থাই এইরূপ হইয়াছে যে, আসল বস্তু লোপ পাইয়া 'রস্‌ম' (প্রথা) অবশিষ্ট রহিয়াছে। মূলত দুর্বল মুরীদদের অবস্থার পরিলক্ষিতে ইহার সূচনা হইয়াছিল। এই রুচি সম্পর্কে আমাদের পীর ছাহেব একটি কবিতা বলিয়াছেনঃ

گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ وفریاد ہم
بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں

অর্থাৎ, “আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্যলাভের জন্য একবার ‘আল্লাহ্‌’ বলাই যথেষ্ট। অধিক পরিমাণে যেকের করার উপর উহা নির্ভর করে না ; বরং তোমার সাহস ও শক্তি পরিমাণ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। শক্তির বাহিরে কিছু করিতে যাইও না।” মোটকথা, হুযূরের তা'লীম খুবই সহজ ছিল, মুরীদের তাহাতে কোন প্রকার কষ্ট হইত না। খুব আনন্দের সহিত ওযীফা এবং যাবতীয় কার্য সমাধা করিতে পারিত। আমি তো তাঁহার তা'লীম দেখিয়া বলিতাম ঃ

بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ می دارد   برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب معنی را

“কাহাকেও হাল্‌কা-পাতলা রাখিতেন, সে হাসিতে-খেলিতে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া যাইত। কাহাকেও অতিরিক্ত কাজের চাপে জড়াইয়া রাখিতেন। সে হাল এবং অপরূপ অবস্থার মধ্যে ডুবিয়া থাকিত।”

بگوش گل چہ سخن گفتۂ کہ خندہ است   بعندلیب چہ فرمودۂ کہ نالاں ست

“ফুল হাসিতেছে, বুলবুল কাঁদিতেছে, জানি না তুমি উহাদের কানে কানে কি বলিয়া দিয়াছ ?”

তাঁহার দরবারে এমন কোন অবধারিত নিয়ম ছিল না, যাহা মানিয়া চলা সকলের জন্য অপরিহার্য হইত এবং যাহার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক হইত ; বরং যাহার জন্য যেরূপ উপযোগী মনে করিতেন, তা'লীম দিতেন। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যাইত যে, যাহাকে সামান্য কাজ তা'লীম দিতেন, ইহাই তাহার জন্য এত উপকারী হইত যে, সেই সামান্য কাজেই তাহার সমস্ত দোষ-ত্রুটি সংশোধন হইয়া যাইত। আর কোন ওযীফা বা আমলের প্রয়োজন হইত না। আল্লাহু আকবার! বাস্তবিকই ইহা বড় কঠিন কাজ এবং ইহার জন্য বড় তত্ত্বজ্ঞানী লোকের প্রয়োজন। সকলকে একই ছড়ি দ্বারা তাড়া করা অনভিজ্ঞতার প্রমাণ।

যেমন—কোন কোন ডাক্তার সর্বপ্রকার জ্বরের জন্যই কুইনাইন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। চিন্তা করিয়া দেখেন না—কোন্‌ প্রকারের জ্বর, মওসুমী জ্বর না আবহাওয়ার কারণে, রোগীর প্রকৃতি গরম না স্বাভাবিক, দুর্বলতা কি পরিমাণ ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া জ্বর দেখিলেই এক কুইনাইনেরই ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞ ডাক্তার প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ নির্বাচন করিয়া থাকেন। কুইনাইন উপযুক্ত মনে করিলে ব্যবস্থা দিবেন, অন্যথায় দিবেন না কিংবা দিলেও উহার সংশোধক কোন ঔষধ সঙ্গে মিশাইয়া দিবেন। যাহাতে রোগীর কোন ক্ষতি না হয়। এইরূপে মুরীদের সর্ববিধ অবস্থা পূর্ণরূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ী তা'লীম দেওয়া খুব তত্ত্বজ্ঞানী কামেল পীরের কাজ।

অতএব, কোন কঠোর স্বভাব পীর—যিনি মুরীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ক্ষতিকর মনে করেন, তিনি এখানেও বলিতেন, ব্যথা হউক কিংবা মরুক, যব খাওয়া ছাড়িতে পারিবে না। প্রাণ গেলেও নবী (দঃ)-এর সুন্নত ত্যাগ করা চলিবে না! মরিলে শহীদ হইবে। আমাদের জন্য দৃঢ়তার উপর আমল হইল—যব খাওয়া এবং উঃ পর্যন্ত না করা।

জনৈক মৌলভী ছাহেব রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নামাযের সময় হইলে তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনে প্লাটফরমে নামায পড়িতে ইচ্ছা করিলেন। সহযাত্রীরা বলিল ঃ হুযূর! এই ষ্টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ থামিবে না। আপনি ভিতরেই নামায পড়ুন। তিনি বলিলেন ঃ বাঃ! ইহা কেমন কথা যে, চলমান গাড়ীতে নামায! গাড়ী যাউক বা থাকুক আমি নীচে নামিয়াই

নামায পড়িব। সকল যুগেই এরূপ কঠোর প্রকৃতির গোঁড়া কিছু লোক বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞানীও হইয়া থাকেন, তাঁহারা এরূপ অবস্থায় বলেনঃ গাড়ীর ভিতরে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলেও যেরূপে সম্ভব হয়, নামায গাড়ীতেই পড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু ভিড়ের জন্য রুকূ-সজ্‌দা করিতে না পারিয়া ইশারায় নামায আদায় করিলে সাবধানতার জন্য তাহা অবশ্যই পুনরায় যথারীতি পড়িয়া লইতে হইবে। উক্ত গোঁড়া মৌলভী ছাহেবের ন্যায় গাড়ী হইতে নামিয়া নামায পড়িতে হইবে না।

আমলে 'আযীমত' এবং 'রোখ্‌ছত'ঃ উক্ত গোঁড়া লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, 'আযীমত' অর্থাৎ, খোদা প্রদত্ত সহজ পন্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আদি নির্দেশ দৃঢ়তা সহকারে পালন করাই শরীঅত বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে সওয়াবও অধিক হয়। পক্ষান্তরে 'রোখ্‌ছত' অনুযায়ী অর্থাৎ, সহজ পন্থা অবলম্বনে আমল করিলে সওয়াব কম হয়। সুতরাং সহজ পন্থার বিধান থাকিলেও তাঁহারা তদনুযায়ী আমল করেন না। মনে করেন, এই সহজ পন্থার বিধান একান্ত অসুবিধার সময় সাধারণ লোকের জন্য বটে, যেন তাহারা শরীঅত বিধানের কঠোরতায় সংকীর্ণমনা না হয়। আমরা তো খাছ লোক। অযথা কেন সহজ পন্থা অবলম্বনপূর্বক নিজেকে সওয়াব কম পাওয়ার উপযোগী করিব? ইহা তাহাদের মহাভুল। কেননা, শরীঅতসম্মত সহজ পন্থাকে তাহারা আসল বিধান মনে করে না; বরং উহাতে সওয়াব কম হয় বলিয়া মনে করে। অথচ এরূপ ধারণা ফেকাহশাস্ত্রের বিপরীত। এই মাসআলায় সকলেই একমত যে, আযীমত ও রোখছত যথাস্থানে প্রযুক্ত হইলে উভয়ের সওয়াবই সমান। কেননা, উভয়ই শরীঅতের বিধান এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ নির্দিষ্ট অবস্থায় শরীঅতের আসল নির্দেশ।

যদিও কেহ কেহ ধারণা করেন যে, খাছ লোকের পক্ষে রোখছত অনুযায়ী আমল করার চেয়ে আযীমত অনুযায়ী আমল করাই উত্তম। কিন্তু আমার মতে খাছ লোকের জন্যও রোখ্‌ছতের ক্ষেত্রে তদনুযায়ী আমল করাই আযীমত অনুযায়ী আমল করা অপেক্ষা অধিক সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেননা, খাছ লোকের কার্যপ্রণালীকে সাধারণ লোকেরা আদর্শস্থানীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যাবতীয় কার্যে এবং এবাদতে তাহারা খাছ লোকেরই অনুসরণ করে। অতএব, রোখছতের ক্ষেত্রে খাছ লোকেরা যদি তদনুযায়ী আমল না করিয়া আযীমত অনুযায়ী করে এবং সাধারণ লোককে রোখছত বা সহজ পন্থা অবলম্বন করিতে বলে, তবে তাহারা মনে করিবে, ইঁহারা যাহা করিতেছেন সম্ভবত ইহাই শরীঅতের আসল নির্দেশ। কেবল আরামের জন্য আমাদিগকে সহজ পন্থানুযায়ী আমল করিবার উপদেশ দিতেছেন। ইহাতে আমাদের বেশ আরাম হইল। একদিকে কাজে যে পরিমাণ আরামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অপর দিকে সওয়াব সেই পরিমাণই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন তাহারা গোলকধাঁধায় পতিত হয় এবং ভাবে, আযীমত অনুযায়ী আমল করিলে কষ্টে পতিত হইব, যদিও সওয়াব বেশী পাইব। পক্ষান্তরে সহজ পন্থা অবলম্বন করিলে কষ্ট কিছুটা লাঘব হইবে বটে; কিন্তু প্রচুর সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইব। এমতাবস্থায় তাহাদের মনে এরূপ খটকা হইবে যে, এমন লঘুতার চেয়ে কঠোর পন্থাই অধিক উত্তম ছিল। কেননা, তাহাতে কষ্ট-ক্লেশ থাকিলেও একাগ্রতা এবং শান্তি থাকিত। এখন তো দ্বিধার সৃষ্টি হইল যে, এই সহজ পন্থা অবলম্বন করিব বা না করিব, মনে হয় যে, শরীঅত আমাদের সুবিধা ও হিতের পূর্ণ ব্যবস্থা করে নাই। কাজেই সাধারণ মানুষকে ইত্যাকার সন্দেহ হইতে রক্ষা করা এবং তাহাদের ধর্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ ও নিরাপদ রাখার জন্য খাছ লোকের পক্ষেও রোখছত অর্থাৎ, সহজ পন্থা অনুযায়ী আমল করাই সঙ্গত। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বিশিষ্ট লোকেরা মূলত বৈশিষ্ট্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই আযীমত

অনুযায়ী কার্য করা পছন্দ করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সমস্ত খাছ লোকের শিরোমণি। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকিতেন। কঠিন হইতে কঠিনতম কার্যও তাঁহার নিকট অতি সহজ ছিল এবং অতি উচ্চ পর্যায়ের কষ্টকর কার্যও তাঁহার জন্য সহজসাধ্য ছিল। তিনি তো রোখছতের ক্ষেত্রে রোখছতের পন্থাই অবলম্বন করিতেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا

“রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই বস্তুর যেকোন একটি অবলম্বনের অনুমতি দেওয়া হইলে তিনি সহজতর বস্তুকেই অবলম্বন করিতেন।” ছাহাবায়ে কেরাম কখনও কখনও রোখছতযুক্ত কার্যকে সহজ দেখিয়া ধারণা করিতেন, হুযূরের মরতবা অতি উচ্চ, কষ্ট করার প্রয়োজন তাঁহার নাই। অতএব, সম্ভবত বিশেষ করিয়া তাঁহাকেই এই রোখছত প্রদান করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, আমাদের মধ্যে সেই বিশেষত্ব নাই। কোথায় আল্লাহ্‌র রাসূল, আর কোথায় আমরা! چه نسبت خاک را با عالم پاک “পবিত্র জগতের সহিত মাটির দুনিয়ার কি সম্পর্ক?” সুতরাং আমরা এই সহজ পন্থার যোগ্য নহি। আমাদের অধিক পরিশ্রম এবং কষ্ট করা উচিত। এই ধারণায় তাঁহারা রোখছত অনুযায়ী আমল করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আযীমত অনুযায়ী আমল করিতে মনস্থ করিলেন। হুযূর (দঃ) তাঁহাদের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া বলিলেনঃ

مَابَالُ اَقْوَامٍ يَّتَنَزَّهُوْنَ عَمَّا اَصْنَعُهٗ فَوَاللهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللهِ واَشَدُّهُمْ لَهٗ خَشْيَةً

“মানুষের কি হইল, যে কাজ আমি করি তাহা হইতে তাহারা দূরে থাকে? আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে তাহাদের অপেক্ষা আমার জ্ঞান অনেক বেশী এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে তাহাদের অপেক্ষা আমি অধিক ভয় করি।” —বোখারী, মুসলিম

কোন কোন ছাহাবীর অনুরূপ উক্তি ও সংকল্পের ব্যাপারে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا اَمَا وَاللهِ اِنِّىْ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَافْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ○

“তোমরাই কি এরূপ বলিয়াছ? সাবধান! আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌কে তোমাদের চেয়ে আমি অধিক ভয় করি। তাঁহার নির্দেশ তোমাদের চেয়ে আমি অধিক পালন করি, কিন্তু আমি কখনও রোযা রাখি, কখনও রাখি না, কখনও রাত্রি জাগিয়া এবাদত করি, কখনও ঘুমাই এবং কখনও স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে বিমুখ থাকিবে, সে আমার দলে নহে।” —বোখারী, মুসলিম

ফলত হুযূরের নির্দেশে ছাহাবায়ে কেরাম রোখছত অনুযায়ীই আমল করিয়াছেন। অতএব, স্বয়ং নবী করীম (দঃ) যখন রোখছত অনুযায়ী আমল করিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দেশে ছাহাবায়ে কেরামও করিয়াছেন, তখন তথাকথিত খাছ লোকের পক্ষে রোখছত অনুযায়ী আমল করা অপেক্ষা আযীমত অনুযায়ী আমল করা উত্তম বলিয়া ধারণা করা প্রকাশ্য ভুল। কেহ কি এরূপ ধারণা করিতে পারে যে, হুযূর (দঃ) কিংবা ছাহাবায়ে কেরাম কষ্টকর কার্য করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন? কিংবা কষ্টজনক কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করিতেন? ধারণা তো দূরের কথা

এমন কল্পনা করাও মহা পাপ। সুতরাং বুঝা যায়, রোখছতের ক্ষেত্রে তদনুযায়ী আমল করাই শরীঅতের আসল বিধান। অতএব, প্রত্যেক যুগের খাছ লোকের উচিত শরীঅতের বিধানানুযায়ী রোখছতের ক্ষেত্রে নিজেরাও আমল করিয়া লাভবান হওয়া এবং অপরকেও সেই তা'লীম দেওয়া, যেন তাহারাও আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করিতে পারে। এরূপ ধারণা করিবেন না যে, রোখছত শরীঅতের আসল বিধান নহে এবং এমন ধারণা অপরের মনেও উৎপত্তি হইতে দিবেন না। কথায়ও নহে কাজেও নহে, যাহার ফলে শরীঅতের বিধান অনুযায়ী আমল করিতে লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং একান্ত আনন্দিত ও প্রশান্ত চিত্তে শরীঅতের নির্দেশ গ্রহণ করে।

দেওবন্দ শহরে দুইজন বুযুর্গ ছিলেন—আকবর ও কবীর। আকবর অন্তিম পীড়াকালেও ওযূ করিতেন। কবীর তাঁহাকে বলিলেনঃ এমতাবস্থায় আপনি কেন ওযূ করেন, আপনার জন্য তো তায়াম্মুমের অনুমতি রহিয়াছে, আপনি তায়াম্মুম করুন। তাহা হইলে এই কষ্ট হইতে নাজাত পাইবেন। তিনি বলিলেনঃ আমি আযীমত অনুযায়ী আমল করিতেছি। কবীর বলিলেনঃ মাওলানা! তায়াম্মুমকে পবিত্রতা সাধনে ওযূর সমকক্ষ মনে করেন না বলিয়াই আপনি ওযূ করিতেছেন। মূলত আপনার এই কার্যে শরীঅতের উপর প্রশ্ন আসে যে, শরীঅত আমাদিগকে একটি ত্রুটিপূর্ণ কার্যের বিধান দিয়াছে। এই ধারণায় আযীমত অবলম্বন করিলে সওয়াবের যোগ্য হওয়া যায় না। ইহাতেই তিনি বুঝিয়া গেলেন এবং রোখছত অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

অতএব, দেখুন, রুগ্নাবস্থায় তায়াম্মুম করার রোখছত ছিল, উক্ত বুযুর্গ লোক তদনুযায়ী আমল না করিয়া ওযূকেই শরীঅতের আসল বিধান মনে করিয়া আযীমতের উপর আমল করিতেছিলেন, অথচ কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ কষ্টের ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে তায়াম্মুমই ওযূর কাজ দিবে। অর্থাৎ ওযূর দ্বারা যেমন পূর্ণ পবিত্রতা সাধিত হইত, তায়াম্মুম দ্বারাও তাহাই হইবে।

শোক্‌রের তওফীক ও উহার প্রণালীঃ দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদানের পর উহার কারণস্বরূপ বলিয়াছেনঃ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ "আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে পবিত্র করিতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার নেয়ামত পূর্ণ করিতে।" ইহাতে বুঝা যায়, তায়াম্মুম দ্বারা ওযূর ন্যায় পূর্ণ পবিত্রতাও লাভ হয় এবং ইহাতে অতিরিক্ত আরও একটি নেয়ামতও রহিয়াছে। এমতাবস্থায় ওযূর মধ্যে তাহা নাই। অর্থাৎ, নেয়ামত পূর্ণ করা। যেন পবিত্রতার সাথে সাথে নেয়ামত পূর্ণ করাও উদ্দেশ্য। এই নেয়ামত পূর্ণ করার দরুনই শোক্‌র করিবার নির্দেশ হইয়াছে— لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ রোখ্‌ছত প্রদানের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম রহস্য এবং ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুমের রোখ্‌ছত প্রদানের মধ্যে তোমাদের প্রতি নেয়ামত পূর্ণ করাও আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমরা অন্তরের সহিত শোকর করিবার তওফীক লাভ কর। কেননা, তায়াম্মুম আমার একটি নেয়ামত ও অনুগ্রহ। তোমরা তায়াম্মুমের সুযোগ লাভ করিলে ইহাকে নেয়ামত মনে করিয়া অবশ্যই আমার শোক্‌র করিবে। সোব্‌হানাল্লাহ্! কেমন দয়া এবং অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কষ্ট দেখিতে পারেন না। ওযূ করিলে ইহা কোথায় পাওয়া যাইত? আমাদের হাজী ছাহেব (রঃ) বলিতেনঃ "মিয়া আশরাফ আলী! তৃষ্ণার সময় গরম পানি পান না করিয়া খুব শীতল পানি পান করিও। গরম পানি পান করিলে যদিও মুখে আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলিবে, কিন্তু অন্তর ইহাতে অংশগ্রহণ করিবে না। ইহাতে শোক্‌রের হক আদায় হইবে না। পক্ষান্তরে ঠাণ্ডা পানি পান করিলে শুধু মুখ হইতেই

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ বাহির হইবে না; বরং প্রত্যেকটি লোমকূপ হইতেও বাহির হইবে। মন প্রফুল্ল হইবে, অন্তর উৎফুল্ল হইবে।” ফলকথা, এমতাবস্থায় যে শোক্‌র আদায় হইবে, তাহা অতি উচ্চস্তরের শোকর হইবে।

এইরূপে যখন ওযূ করাতে খুব কষ্ট হইবে বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস হয় এবং মন ওযূ করিতে ভয় পায়, এমন সময় তায়াম্মুম করিলে মনে কেমন আনন্দ হইবে? কেমন শোক্‌র আদায় হইবে? বলাবাহুল্য, তায়াম্মুমের রোখছতের দরুন ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। বিভিন্ন প্রকার কষ্ট হইতে মুক্তি পাওয়া গেল। যদিও ওযূ করাও সম্ভব ছিল, যাহা হয়তো দেখা যাইত, কিন্তু মনের ভয় এবং রোগ বৃদ্ধির প্রবল ধারণা মনকে অস্থির করিবার জন্য যথেষ্ট ছিল। মোটকথা, তায়াম্মুমের সময় তায়াম্মুম করিলে অন্তর হইতে অনিবার্যরূপে শোক্‌র আসে। শুধু এক শোক্‌র নহে; বরং প্রত্যেকটি স্নায়ু হইতে, প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস হইতে আল্লাহ্‌র শোকরই আদায় হয়।

ইহা অভিজ্ঞতার কথা এবং চাক্ষুষ ব্যাপার। শোক্‌র মহব্বত বৃদ্ধি করে। কেননা, শোক্‌র আসে নেয়ামত ও অনুগ্রহের বিনিময়ে। বলাবাহুল্য, অনুগ্রহ এবং নেয়ামত প্রত্যক্ষ করাই নেয়ামতদাতা ও নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধির প্রধান উছিলা। সুতরাং শোক্‌রও মহব্বত বৃদ্ধির কারণ বটে। বস্তুত আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভ করাই প্রত্যেক মানুষ এবং তরীকতপন্থীর উদ্দেশ্য। কাজেই আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি পাওয়াও রোখছত প্রদানের অন্যতম কারণ ও যুক্তি।

বিপদের বিভিন্ন প্রকারঃ কিন্তু ইহাতে এরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে না যে, মসিবত দ্বারা কি মহব্বত বৃদ্ধি পায় না? কেননা, বিপদগ্রস্ত আরেফগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মসিবতেই তাঁহারা অন্তরে মহব্বতের উন্নতি উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে, মসিবতও মহব্বত বৃদ্ধির কারণ হয়। কিন্তু সর্বপ্রকারের মসীবতে তাহা হয় না, বরঞ্চ কোন কোন মসিবতে মহব্বত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এখন বুঝিয়া লওয়া দরকার, মহব্বত বৃদ্ধিকারী মসিবত চিনিবার মাপকাঠি এবং মহব্বত বৃদ্ধিকারী মসিবত ও উহার বিপরীতের প্রভেদ জানিবার উপায় কি? দেখুন, মসিবত দুই প্রকার। (১) আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আগত মসিবত; ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই; বরং ইহার উৎপত্তিস্থল একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। এই শ্রেণীর মসিবত বাস্তবিক সর্বদা খোদা প্রেমিকদের মনে মহব্বত বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মাতা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইলে তাঁহারা স্বাভাবিক দুঃখিত হন বটে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাঁহাদের যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে না; বরং ইহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। কেননা, তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মৃত ব্যক্তির হায়াত আল্লাহ্ তা'আলা এই পরিমাণই নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহার মৃত্যু এই সময়ের সহিতই সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অতএব, স্বাভাবিক সময়ই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

আর এক প্রকারের মসিবত আছে, যাহা মানুষ নিজের কর্মফলে আনিয়া থাকে। সে অথবা তাহার কার্য মসিবত আসিবার কারণ হয়। এই শ্রেণীর মসিবত মহব্বত বৃদ্ধির কারণ হয় না।

সুতরাং তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার সময় তাহা না করিয়া কেহ যদি ওযূ করে এবং মনে করে যে, ইহা কষ্টকর কাজ, ইহাতে নফ্‌স্ কষ্ট পায়, কাজেই ইহাতে খোদার মহব্বত বৃদ্ধি পাইবে। কেহ কেহ এরূপ ক্ষেত্রে বলিয়াও বেড়ায়, “ভাই, আমি এখন কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ওযূ করিয়াছি। বড় ভাল লাগিয়াছে, মন আনন্দিত হইয়াছে। অন্তর আলোকিত হইয়াছে।” তাহার বুঝা উচিত, ইহা নফ্‌সের ধোঁকা। মানুষ এই আনন্দকে খোদার মহব্বতের আনন্দ মনে করিয়া থাকে। অথচ ইহা

শুধু নফ্সেরই উপভোগ্য আনন্দ। এই আলো আত্মগর্বজনিত আলো। ইহাও নফ্সের এক বড় রকমের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি যে, আত্মগর্বের আলোকে খোদার আলো এবং নফ্সের আনন্দকে খোদার মহব্বতজনিত আনন্দ বলিয়া প্রকাশ করে। অথচ ইহার উৎপত্তিস্থল আত্ম-অহঙ্কার। অন্যথায় প্রকৃত আনন্দ উহাই, শরীঅত বিধানানুযায়ী কার্য করিয়া যে আনন্দ ও খুশীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাই সত্যিকারের 'নূর', যাহাকে খোদার মহব্বত বলা হয় এবং ইহাই তরীকতপন্থীর উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে নফ্সের ধোঁকায় পতিত ব্যক্তি এখানেও বলিত, যবই খাও—যদিও মৃত্যুই হউক। এই মৃত্যুতেও সুখ, জীবনের যাবতীয় সুখ হইতে ইহা উত্তম। ইহাতে এমন স্বাদ পাইবে যে, সারা জীবনে ইহার আনন্দ বিলুপ্ত হইবে না। আল্লাহ্র মহব্বতে অন্তররাজ্য আলোকিত হইবে। কিন্তু জনাব! আপনি কি জানেন? ইহার ফল কি হইবে? কেবল ইহাই হইবে যে, কয়েকদিন আমল করার পর সুন্নতের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবে। আমল করা ব্যতীত এমনি সুন্নতের প্রতি পূর্বে যেই ভক্তি ছিল, সে ভক্তিও থাকিবে না। অতএব, এই সুন্নত পালনই সুন্নত বর্জন এবং উহার প্রতি বিতৃষ্ণার কারণ হইয়া যাইবে। অতএব, ইহার কুফল বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে।

আযীমত এবং রোখ্ছতের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত ঃ এখন আরও সূক্ষ্ম কথা আমার মনে পড়িয়াছে, যদ্দারা আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ বিস্তারিত জ্ঞান লাভ হইবে। দেখুন, কেহ আযীমত অনুযায়ী আমল করিয়া কঠিনতম কার্য অবলম্বন করিল। ইহার অনিবার্য ফল এই হয় যে, সে উক্ত কার্য সমাধা করিয়াই ফলের প্রতীক্ষা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং উচ্চ পর্যায়ের ফলই কামনা করিতে থাকে। অর্থাৎ, সে মনে করে, আমার পরিশ্রমের পরিমাণ এবং কাজের দুঃসাধ্যতা তো সুস্পষ্ট। সুতরাং পরিশ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে আমার যথার্থ ফল লাভ করা উচিত। পক্ষান্তরে রোখছত অনুযায়ী সহজতম কার্য অবলম্বনকারী কার্যশেষে ফলের মুখাপেক্ষীও থাকে না এবং কোন নির্দিষ্ট ফলের প্রত্যাশীও থাকে না। কেননা, সে এতটুকু উপলব্ধি করিতে থাকে যে, আমি এমন কি কাজই করিয়াছি? আমি তো রোখছত অনুযায়ী আমল করিয়াছি এবং সহজ ও সুবিধাজনক পন্থা তালাশ করিয়াছি। অতএব, কাজই যখন কিছু করি নাই, তখন ফলই কি পাইব?

মনে করুন, এক ব্যক্তি পাঁচ হাজার বা দশ হাজারবার এস্‌মে-যাতের ওযীফা করিতে থাকে। তৎসঙ্গে রীতিমত ঘুমায়ও, পানাহারও করে, পার্থিব অন্যান্য কাজকর্মও করে। মোটকথা, সে এসমস্ত কাজ এমন আরামের সহিত করে যে, নফ্সের নিকট মোটেই কষ্টকর হয় না। আর এক ব্যক্তি অনেক বেশী মাত্রায় এস্‌মে-যাতের ওযীফা করে, অন্যান্য নফল এবাদতও করে, ঘুমায়ও না, পানাহারও কেবল জীবন রক্ষা পরিমাণ করে, পার্থিব কাজ-কর্ম করে না। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলকথা, খুব উচ্চ পর্যায়ের মা'রেফাতের পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সর্বপ্রকারের নফল ও প্রয়োজনীয় কার্য খুব নিয়মানুবর্তিতার সহিত করিতেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি নিজের প্রত্যেকটি কার্যের ও পরিশ্রমের পরেই বিরাট বিরাট ফল এবং প্রচুর পুরস্কারের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। শুধু প্রতীক্ষাই নহে; বরং সে নিজেই নিজের পরিশ্রমের বিচার করিয়া ফল ও পুরস্কার নির্ণয় করিয়া ফেলে। অর্থাৎ, আমার কাশ্ফ্ হউক, নানাবিধ দৃশ্য ও অবস্থা অন্তরে প্রকাশিত হউক, উচ্চ মর্যাদা লাভ হউক। যতই প্রতীক্ষার মুদ্দৎ দীর্ঘ হইতে থাকে এবং তাহার কল্পিত ফল লাভে বিলম্ব ঘটিতে থাকে, ততই এই ব্যক্তির মন বিরক্ত হইতে থাকে এবং মনে করে, আমার কার্যের বিনিময়ে যেই ফল পাওয়া উচিত ছিল, যাহার আমি উপযোগী ছিলাম, তাহা পাইলাম না। যোগ্যতার চেয়ে কম আমাকে দেওয়া হইয়াছে। যোগ্যতার বিচার করা হয় নাই।

পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি কোন কিছুর প্রতীক্ষা করিবে না। সে মনে করিবে, 'আমি কিই-বা করিয়াছি যে, পুরস্কার পাইব কিংবা ইহার কোন ফলাফল নির্ধারিত হইবে?' এমতাবস্থায় সে যাহাকিছু পাইবে গনীমত মনে করিবে। উহাকেই সে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ এবং পুরস্কার বলিয়া বুঝিবে এবং ইহার জন্য খোদা তা'আলার লাখ লাখ শোক্‌র আদায় করিবে এবং বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অসীম নেয়ামত দান করিয়াছেন। আমি ইহার উপযুক্ত ছিলাম না। ফলকথা, এই ব্যক্তি সর্বদা শোক্‌রগুযার থাকিবে; আর ঐ ব্যক্তি কেবল অভিযোগ করিবে।

শরীঅতী সহজ ব্যবস্থার ক্রিয়াঃ অতএব, বুঝা গেল শরীঅত যে সহজ ব্যবস্থা দান করিয়াছে, তদনুযায়ী আ'মল করিলে অন্তর অধিক শোক্‌র আদায় করিতে বাধ্য হয়। আর অধিক শোক্‌র হইতেই মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কাজেই শরীঅত প্রদত্ত রোখছত অর্থাৎ, সহজ পন্থানুযায়ী আমল করা উচিত, যেন খোদার মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সহজ পন্থার অর্থ এই নহে যে, একেবারে নফ্‌সের বশীভূত হইয়া পড়িবে এবং যে কাজ নফ্‌স্ সহজ মনে করে, কেবল তাহাই করিবে; আর বাকী সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিবে।

যেমন, কোন এক পেটুক ব্যক্তিকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কোরআন মজীদের কোন্ আয়াতটি তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا "খাও, পান কর।" এখন দেখুন, তাহার নফ্‌স্ যেহেতু পানাহারের অনুরক্ত ছিল, কাজেই কোরআনের যাবতীয় নির্দেশের মধ্যে তিনি কেবল এই দুইটি নির্দেশই পছন্দ করিলেন। কেননা, এই আয়াতের মর্মানুসারে খুব সহজে ও শান্তির সহিত খাইতে পাওয়া যায়।

অতএব, বলিতেছিলাম—সহজ ও আরামের অর্থ এরূপ সহজ নহে, এরূপ আরাম প্রশংসনীয়ও নহে; বরং শরীঅত অনুযায়ী নিন্দনীয়। তবে হাঁ! স্বয়ং নবী করীম (দঃ) আল্লাহ্‌র নেয়ামতস্বরূপ যে সহজ ও আরাম প্রদান করিয়াছেন—শরীঅতের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া তাহা ভোগ করা প্রশংসনীয়। সীমা ডিঙ্গাইয়া আরাম উপভোগ করা নহে।

আমার এক বন্ধু বলিতেনঃ সকল সময়েই কঠিন আ'মল করিলে সওয়াব অধিক পাওয়া যায়। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ "ইহাতে কি ভেদাভেদ মোটেই নাই?" তিনি বলিলেনঃ "না, সাধারণত কঠিন কাজে অধিক সওয়াব হয়।" ঘটনাক্রমে আছরের নামাযের সময় হইল। আমি তাঁহাকে বলিলামঃ "এখন নামাযের জন্য ওযূ করিতে হইলে দুইটি উপায় আছে—প্রথমত মসজিদের কূপের পানি দ্বারা ওযূ করা যায়; দ্বিতীয়ত, জালালাবাদ হইতে পানি আনিয়া করা যায়। বলুন, আপনি কোন্‌টি পছন্দ করেন?" তিনি বলিলেনঃ "মসজিদের কূপের পানি দ্বারা ওযূ করাই ত সঙ্গত।" আমি বলিলামঃ "কেন? আপনি যে বলিয়াছিলেন, সকল সময়েই কঠিন কার্যে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। জালালাবাদ হইতে পানি আনিয়া ওযূ করাই তো কঠিন কাজ।" ফলকথা, কঠিন কাজকে সকল সময়ে অধিক সওয়াবের কারণ মনে করা ভুল; বরং প্রথমত ইহা উদ্দেশ্যের সহিত নির্দিষ্ট। যে সমস্ত কার্য 'এবাদতে মাকছুদা' (অর্থাৎ উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদত) নহে; বরং শর্ত প্রভৃতি জাতীয়। তাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজেও সহজ পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَمْرَيْنِ اِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا

অতএব, আমাদেরও এই হাদীসের মর্মানুযায়ী এমতাবস্থায় রোখছত অনুযায়ী আমল করা উচিত। ওযূও উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদত নহে; বরং উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদত নামাযের অন্যতম শর্ত।

কাজেই ওযূ সম্বন্ধে সহজ পন্থা অবলম্বন করা সঙ্গত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেখানে 'রোখছতে' এমন কোন শরীঅতসম্মত সুবিধা রহিয়াছে যাহা 'আযীমতে' নাই, সেক্ষেত্রে কঠিন পন্থা 'আযীমত' অবলম্বন না করাই সঙ্গত; বরং রোখছত অর্থাৎ, সহজ পন্থাই তথায় অগ্রগণ্য হইয়া থাকে। ওযূ যেমন উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদত নহে, তদ্রূপ যব খাওয়া যদিও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং ছাহাবায়ে কেরামও তাহা পালন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এবাদতের উদ্দেশ্যে করেন নাই; বরং ইহা তাঁহাদের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহাও শুধু শক্তিশালী হযম শক্তি বিশিষ্ট ছাহাবাগণেরই অভ্যাস ছিল। আজকালও যাহারা নিজেদের হযম শক্তির উপর এতটুকু নির্ভর করিতে পারেন যে, আচালা যবের রুটি খাইলে কোন ক্ষতি বা কষ্ট হইবে না, পেট চাপিয়া চাপিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহাদের পক্ষে যবের রুটি খাওয়া দূষণীয় নহে; বরং ভাল ও উত্তম। অবশ্য হুযূরের অনুসরণের নিয়তে খাইলে বিশেষ সওয়াব হইবে।

সুন্নত পালন করার অর্থঃ পক্ষান্তরে যদি দুর্বল হযম শক্তির লোক সুন্নত পালনের আগ্রহে আচালা যবের রুটি খাইয়া নামাযে দাঁড়ায় এবং পরক্ষণেই পেটে এমন তীব্র ব্যথা আরম্ভ হয় যে, দাঁড়াইতে সক্ষম না হইয়া বসিয়া নামায আদায় করে, তবে সেই যব ও যবের ছিল্‌কা (খোসা) খাওয়াতে এত অধিক সওয়াব পাইবে না, বসিয়া নামায পড়িয়া নামাযের যতখানি ফযীলত (সওয়াব) হইতে সে বঞ্চিত হইল, অথচ ইহা নিজেরই কর্মফল।

কিন্তু যব খাওয়া এমনভাবে ত্যাগ করা, যাহাতে নবী (দঃ)-এর সুন্নতের উপর কোন দোষারোপ না হয় এবং যবও খাওয়া না হয়, ইহা দুই বিপরীতের সমাবেশ বটে। এই অসাধ্য সাধন করিতে পারেন খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শেবন্দী (রঃ)-এর ন্যায় মহাপুরুষেরাই। সোব্‌হানাল্লাহ্! কেমন সূক্ষ্ম উপায়ে যব খাওয়া হইতে হাত গুটাইয়া লইলেন। বলিলেনঃ "ভাই! আমরা যবের রুটি খাইতে গিয়া বেআদবী করিয়াছি। তাহাতে আমরা যেন নবী (দঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের সমকক্ষতার দাবী করিয়াছিলাম, যাহা আমাদের পক্ষে অসঙ্গত ছিল। আমাদের মধ্যে ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় রিয়াযত্ করিবার শক্তি কোথায়? ইহা তাঁহাদেরই সামর্থ্যে ছিল—উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত আমাদের জন্য নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। মোটকথা, সুন্নত মোতাবেক আমল করার অর্থ হুযূর (দঃ)-এর নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ না করা। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে হুযূরের কার্যাবলী ও অভ্যাসের অবিকল অনুকরণ অনিবার্য নহে।

অতএব, مَاأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ -এর ব্যাপকতার যেই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল যে, আজকাল যত রকমের পরিধেয় বস্ত্র এবং খাদ্যদ্রব্যের প্রচলন রহিয়াছে, ইহার সবগুলিই তো 'সুন্নতে নববী' ও ছাহাবীদের আদর্শের খেলাফ। সুতরাং ভারতীয় জুতাও কোট-প্যাণ্ট প্রভৃতির ন্যায় সুন্নতের খেলাফ। এইরূপে আচ্‌কান, চোগা, ইংলিশ জুতাও কোট-প্যাণ্টের ন্যায় সুন্নত (مَاأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ) -এর অন্তর্ভুক্ত নহে। তবে কেন আজকালকার মৌলবীরা আমাদিগকে কোট-প্যাণ্ট ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছেন। অথচ নিজেরা সুন্নতের বিপরীত আচ্‌কান-চোগা ত্যাগ করিতেছেন না। অতএব, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমার এই বর্ণনায় উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর সত্যান্বেষীদের জন্য যথেষ্ট হইয়াছে এবং ইহাও জানা গিয়াছে যে, ما، শব্দের মধ্যে দুই প্রকারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে—(১) কার্য সংক্রান্ত—অর্থাৎ, হুযূর (দঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম যেরূপ আমল করিয়াছেন। (২) বাণী সংক্রান্ত—অর্থাৎ, যাহা হুযূর (দঃ) নিজে করেন নাই বটে; কিন্তু উহা করিবার জন্য উম্মতকে প্রকাশ্যভাবে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন কিংবা উহা কোন মূলনীতির

অন্তর্ভুক্ত আছে। অথচ সে ক্ষেত্রে হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন শরীঅতগত প্রমাণ নাই। অতএব, এই নীতি অনুসারে ভারতীয় জুতা অনুমতির আওতায় আসিতে পারে। কিন্তু ইংরেজী জুতা ও পোশাক-পরিচ্ছদ কাফেরদের সাদৃশ্যহেতু হারাম হওয়ার কারণ রহিয়াছে। কাজেই ইহার বিধেয়তা কোনরূপেই প্রমাণিত হইতে পারে না।

তথাপি কেহ কেহ সত্যপন্থী হওয়ার দাবী করিয়াও তাঁহাদের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চাল-চলন অবলম্বন করিতেছে না। অথচ সত্যপন্থী এবং মুক্তির যোগ্য হওয়ার মাপকাঠি ছিল—সর্ববিষয়ে مَاانَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ অর্থাৎ, হুযূর (দঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যাহা করিয়া গিয়াছেন, সর্ববিষয়ে তদনুযায়ী আমল করা। তাঁহাদের কাজ-কর্ম এবং চাল-চলনের সকল অংশকে অবশ্যই অনুসরণীয় মনে করা উচিত। এক অংশকে যথেষ্ট মনে করিয়া অপর অংশকে ত্যাগ করা উচিত নহে। যেমন, হাল ফ্যাশনের ভদ্রলোকেরা ধর্মীয় যাবতীয় কর্তব্য হইতে কেবলমাত্র মৌলিক বিষয় (সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ) অর্থাৎ, বিশ্বাস্য বিষয়গুলিকে সংশোধন করাই সত্যপন্থী হওয়ার মাপকাঠি স্থির করিয়া লইয়াছেন এবং প্রত্যেক সঠিক বিশ্বাসবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কার্যকলাপ এবং চাল-চলনের বিচার ব্যতীতই নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া থাকেন। অথচ শরীঅতের বিধান ইহার প্রকাশ্য বিরোধী।

আমলই এল্‌মের উদ্দেশ্যঃ আমি প্রথমে যেই আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়াছি, ইহাই উক্ত আয়াতের মৌলিক বিষয়বস্তু। এই আয়াতে বলা হইয়াছে, কেবল এল্‌মই যথেষ্ট নহে, আমলেরও প্রয়োজন আছে। এই কথাটির প্রতি সচেতন করার জন্য শুধু আখেরাতের অস্তিত্বের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বরং সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার নিকৃষ্টতা এবং হীনতাও বর্ণনা করিয়াছেন, যেন মানুষ তাহা স্মরণ পথে জাগরূক রাখিয়া পরলোকের জন্য আমল করার উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিতে পারে। এইমাত্র আমি তাহাই বলিলাম, “আমলই এল্‌মের উদ্দেশ্য।” বরং আমি বলি, প্রত্যেক এল্‌মের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

আরও বিশদভাবে বুঝিয়া লউন, مَاهٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ الخ “এই দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নহে। বস্তুত আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন”, আয়াতে একথার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, এই আয়াতে শুধু আখেরাতের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদনই উদ্দেশ্য নহে; বরং দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিয়া উহা হইতে বিরাগী করাও উদ্দেশ্য। অন্যথায় কেবল আখেরাতের বিশ্বাস উৎপাদনই যদি উদ্দেশ্য হইত, তবে তজ্জন্য কেবল اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ বলাই যথেষ্ট ছিল। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বিষয়টি ইহার সঙ্গে যোগ করাই আমার কথার স্পষ্ট প্রমাণ। অন্যথায় এই আয়াতটিকে অনর্থক দীর্ঘ করা হইয়াছে বলিতে হয়। অথচ কালামুল্লাহ্ সম্বন্ধে এরূপ কল্পনাও মহাপাপ।

এল্‌ম দুই প্রকার। (১) যাহার সম্বন্ধে স্বয়ং জ্ঞানলাভই উদ্দেশ্য। (২) যাহা শুধু আমল করার উদ্দেশ্যে জানিয়া লওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকারের এল্‌মের মধ্যে তো আমরা এবং সর্বসাধারণ ওলামা শরীক রহিয়াছেন। অর্থাৎ, এস্থলে আমরা যেমন এল্‌ম এবং আমল উভয়কেই উদ্দেশ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছি, তদ্রূপ তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে একমত এবং উভয়কেই উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। যদিও এতটুকু প্রভেদ করিয়া থাকেন যে, কোন বিষয়ের জ্ঞান উহারই জন্য উদ্দেশ্য এবং কোন বিষয়ের জ্ঞান অপর বিষয়ের জন্য উদ্দেশ্য।

যেমন, ওযূর প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা মৌলিক উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা নামায আদায়ের অপরিহার্য শর্ত বলিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। অতএব, কেবল ওযূর প্রণালীর জ্ঞান লাভ করা যথেষ্ট নহে; বরং ওযূ করিয়া নামায সমাধা করিলেই ওযূ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ সার্থক হইবে। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই।

প্রথম বিষয়ের জ্ঞান—যাহা শুধু জানিয়া লওয়াই মৌলিক উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে সাধারণ ওলামা কেবল জ্ঞান লাভ করাই মুখ্য-উদ্দেশ্য মনে করেন। আমলের জন্য এই শ্রেণীর এল্‌মকে কোন স্তরেই উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। যেমন, আমাদের আলোচ্য বিষয় (আখেরাতের জ্ঞান) হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কিন্তু আমি বলি, এক্ষেত্রে যদিও জ্ঞানলাভই মুখ্য এবং মৌলিক উদ্দেশ্য, তথাপি আমলও উদ্দেশ্যের মধ্যে অংশীদার রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ের জ্ঞান এই জন্য তা'লীম দেওয়া হইয়াছে, যেন আমলের ব্যাপারে তদ্দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমল ভিন্ন জ্ঞানের উদ্দেশ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না।

তক্‌দীরের মাস্‌আলা ঃ সূরা-হাদীদের মধ্যে এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তক্‌দীর সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ

اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ۝ الخ

অর্থাৎ, "দুনিয়াতে যাহাকিছু ঘটে, তাহা নফসের মধ্যেই হউক কিংবা অন্য কিছুর মধ্যেই ঘটুক। সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তাহা আল্লাহ্ তা'আলার দফ্‌তরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে সহজ কাজ।" সুতরাং দুনিয়ার কোন ঘটনাই আল্লাহ্‌র দফ্‌তরে লিখিত বিষয়ের বিপরীত হইতে পারে না। সম্মুখের বাক্যে এই লিপিবদ্ধ করার কারণ বর্ণনা করিতেছেন; لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ অর্থাৎ, "তোমাদিগকে এই মাসআলাটি এই জন্য তা'লীম দিলাম এবং দফ্‌তরের লিখন সম্বন্ধে অবহিত করিলাম, যেন এই জ্ঞানলাভের পর হারান বস্তুর জন্য তোমাদের মনে কোন দুঃখ এবং চিন্তা না আসে। আবার লব্ধ ও হস্তস্থিত বস্তুর আনন্দ গর্ব-অহঙ্কারের আকারে না হয়।"

পছন্দনীয় ও লোভনীয় পদার্থের হস্তচ্যুত হওয়ার জন্য আফ্‌সোস এবং দুঃখ-কষ্ট না হওয়া ছবরেরই নামান্তর। বস্তুত ছবরের আদেশ আমাদিগকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বহু স্থানে করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে দুঃখ-চিন্তা করিতে নিষেধ করার অর্থ ছবরের আদেশ করা। সারকথা এই দাঁড়াইল যে, তোমাদের ছবরের পূর্ণতা সাধনের জন্য আমি তোমাদিগকে তক্‌দীরের মাস্‌আলা তা'লীম দিয়াছি। পূর্ণ ছবর অবলম্বনের জন্য এই সংবাদটি প্রদান করা একান্ত জরুরী ছিল। কেননা, অদৃষ্টের প্রতি স্থির বিশ্বাস ব্যতীত পূর্ণ ছবর হাছিল করা যায় না। অতএব, ছবর ও তক্‌দীরের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আবশ্যক রহিয়াছে।

চাক্ষুষ দৃষ্টিতেও এই আবশ্যকতার প্রয়োজন বুঝা যাইতেছে যে, অদৃষ্টবাদী লোকের কিংবা তক্‌দীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারীর পুত্র-বিয়োগ ঘটিলে সে দ্রুত ছবর অবলম্বন করিতে পারে। পক্ষান্তরে তক্‌দীরের প্রতি আস্থাহীন ব্যক্তি এইরূপ দুঃখ ও চিন্তাজনক ব্যাপারে সর্বদা অস্থির ও ব্যথিত থাকে। মনে করে, আফ্‌সোস! চিকিৎসায় ত্রুটি হইয়াছে। অমুক ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকিলে অবশ্যই আরোগ্য লাভ করিত। এই পরিতাপ তাহার চিরসাথী হইয়া থাকে।

তাহার দুঃখ দূর হইবেইবা কেমন করিয়া? স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসী লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ এই আয়াতটির বিশদ অর্থ এই যে, (ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের সম্বন্ধে) মোনাফেকেরা বলিয়া থাকেঃ مَاكَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا "তাহারা যদি যুদ্ধে যোগদান না করিয়া আমাদের নিকট থাকিত, তবে মরিতও না, নিহতও হইত না।" তাহাদের এই উক্তি তক্‌দীরের প্রতি ঈমান না থাকারই ফল। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেনঃ "যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ যদি তোমরা তাহাদের যুদ্ধে যোগদান করাই মনে কর এবং তোমরা শহরে নিরাপদে থাকিলে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া মনে কর, তবে দয়া করিয়া তোমাদের নিজেদের মৃত্যুকে ফিরাও তো দেখি। তোমরা তো কোথাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাও না, তবে ঘরে বসিয়া বসিয়া মর কেন?"

সুতরাং বুঝা গেল,"যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া মৃত্যুর কারণ হইতে পারে না; আর ঘরে বসিয়া থাকাও মৃত্যুর প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; বরং তোমাদের মৃত্যু খোদার ইচ্ছাধীন এবং তাঁহার দফ্‌তরে নির্ণীত রহিয়াছে। নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে ঘরের বদ্ধ কামরায়ই থাক আর যুদ্ধক্ষেত্রেই থাক, মৃত্যুর থাবা হইতে কখনও অব্যাহতি পাইবে না।" وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ "যদিও সুউচ্চ মজবুত কক্ষের মধ্যে থাক না কেন?"

তক্‌দীরে অবিশ্বাসী ধৈর্যহীনঃ কিন্তু এই মোনাফেকের দল যেহেতু তক্‌দীর মানে না, কাজেই আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি তাহাদের ছবর আসিতে পারে না; বরং তাহারা সর্বদা আক্ষেপ করিয়াই মরিবেঃ "আহা! আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলে মারা যাইত না, জীবিতই থাকিত।" কাজেই বুঝা গেল, তক্‌দীরের প্রতি অবিশ্বাসী কখনও ছবর করিতে পারে না; বরং সর্বদা অস্থিরতা ও চিন্তার মধ্যে থাকে এবং ঔষধ ও চিকিৎসার ত্রুটি মনে করিতে থাকে। পক্ষান্তরে দৃঢ় মনে তক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি সমস্ত ঘটনা, পরিবর্তন, জীবন এবং মৃত্যুকে আল্লাহ্‌রই কার্য বলিয়া মনে করে এবং আল্লাহ্‌র দফ্‌তরে এরূপ লিখিত আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। অবশ্য স্বভাবত স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির বিয়োগজনিত চিন্তা ও শোক এই ব্যক্তির অন্তরেও হইবে। তাহার নফ্‌সও কোন কোন সময় চিকিৎসার ত্রুটি ও অন্যান্য বিষয়কে কারণরূপে তাহার সম্মুখে পেশ করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে এই কল্পনাও আসিবে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহার নির্দিষ্ট সময়ই আসিয়া গিয়াছিল। ধার নেওয়া আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে। সে নফ্‌সকে বুঝাইবে, আমার আত্মীয়জনের আয়ু যেন এই মুহূর্তের সহিতই সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর তাহার শ্বাস গ্রহণের নিমিত্ত কোন বায়ুই অবশিষ্ট ছিল না, তেমনিভাবে চিকিৎসার ত্রুটিও তাহার জন্য নির্ধারিত ছিল। খোদা তা'আলা তাহার মৃত্যুর জন্য বাহ্যজগতে যখন চিকিৎসার ত্রুটিকেই কারণ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তখন এই ত্রুটি পূরণ করিয়া দেওয়ার মত আর কোন শক্তিই জগতে ছিল না। এতটুকু বুঝাইবার পরে অবশ্যই নফ্‌স ছবর অবলম্বন করিবে এবং তাহার অন্তরে দুঃখ-কষ্ট ও শোক-চিন্তার কোন চিহ্ন বাকী থাকিবে না।

মোটকথা, দেখুন! যদিও তক্‌দীরের মাসআলা মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বলিত বিষয়সমূহের অন্তর্গত, যাহা জানা ঈমানের অংশবিশেষ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে পূর্ণ ছবর অবলম্বন উদ্দেশ্য হওয়াও কিতাবী দলিলেই প্রমাণিত রহিয়াছে। বস্তুত ছবর যাবতীয় করণীয় কার্যাবলীর মধ্যে একটি কার্য বটে। অতএব, এই আয়াত দ্বারা আমার এই উক্তির পোষকতা পাওয়া যায় যে, মৌলিক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট বিষয়গুলির জ্ঞানলাভও আমলের মধ্যে ক্রিয়া করিয়া থাকে, এ সমস্ত এল্‌মের

তা'লীম দ্বারা আমলের সংশোধনও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সঠিক আকীদা উহাকেই বলা যাইবে, যাহার ফল বা চিহ্ন আমলের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যথায় তাহার বিশ্বাস ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থে তাহার বিশ্বাস সঠিক নহে বলিতে হইবে।

এই মর্মের পোষকতায় হুযূর (দঃ)-এর একটি হাদীসও রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা শেষ রাত্রিতে অবতীর্ণ হন।" এতদ্দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ দেওয়াই উদ্দেশ্য। কিন্তু রাত্রি জাগিয়া এবাদত করার উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে এই সংবাদ প্রদান করায় বুঝা গেল যে, কেবল সংবাদ দেওয়াই উদ্দেশ্য নহে; বরং রাত্রি জাগিয়া এবাদত করা এবং বিশেষ করিয়া তাহাজ্জুদের নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদানই এই সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্য। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ হওয়ার এল্‌ম মৌলিক বিশ্বাস সম্বলিত এল্‌ম। কিন্তু এই এল্‌মের তা'লীমেও একটি আমলের পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে। অতএব, বুঝা গেল, সর্বপ্রকারের এল্‌ম, মূলত তাহাই উদ্দেশ্য হউক কিংবা না হউক, ইহাতে আমলের সংশোধনও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। এইরূপে আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতে যেমন আখেরাতের জ্ঞান প্রদান উদ্দেশ্য, তদ্রূপ দুনিয়ার প্রতি বিরাগ উৎপাদনও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

খোদার রহস্যসমূহের অনুসন্ধানঃ কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা আমলের ধারই ধারি না। আমাদের অনুসন্ধানের দ্বার এবং যাবতীয় চেষ্টার কেন্দ্র শুধু জ্ঞানলাভ করা। সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর মাসআলা নিয়া মাথা ঘামাইতে থাকি। আজ আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ হওয়ার মাসআলা প্রমাণ করিলাম, কাল আবার তাঁহার আগমনের মাসআলা প্রমাণ করিবার পশ্চাতে লাগিয়া গেলাম। ইহা হইতে অবসর পাইলে আবার আরশের উপর অবস্থানের মাসআলার চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম এবং সমস্ত যুক্তিগত জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম—নিজেই সেইগুলির উত্তর চিন্তা করিতে লাগিলাম। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধীয় মাসআলায় আলোচনা-সমালোচনা করা এবং সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করা সুন্নতের খেলাফ। হযরত ওমর (রাঃ) এসমস্ত মাসআলার আলোচনা করা সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ اَبْهِمُوْا مَااَبْهَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى "স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়কে অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, বিশদভাবে কিছু বলেন নাই, তোমরাও উহাকে অস্পষ্টই রাখ। তোমাদের ইহাই নির্দেশ পালন—অস্পষ্টকে অস্পষ্ট মনে করিয়া ঈমান আন।"

এক বুযুর্গ লোক অপর এক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (দঃ)-এর সহিত মে'রাজের রাত্রিতে কি কি কথাবার্তা বলিয়াছিলেন এবং কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল?" তিনি উত্তর করিলেনঃ

اکنوں کرا دماغ که پرسد ز باغباں   بلبل چه گفت وگل چه شنید وصبا چه کرد

"এখন কাহার সেই মস্তিষ্ক আছে যে, উদ্যান-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিবে, বুলবুল কি বলিয়াছে? ফুল কি শুনিয়াছে এবং ভোরের বায়ু কি করিয়াছে?" অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাই যখন এসব ঘটনা ও রহস্যকে فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤاَوْحٰى "অতঃপর তিনি তাঁহার বান্দার সহিত আলাপ করিলেন যাহাকিছু আলাপ করিলেন" আয়াতে অস্পষ্ট রাখিয়া দিয়াছেন। এখন আমাদের কি সাধ্য, সে সম্বন্ধে মুখ খুলিতে পারি? যখন সে দরবারে এমন অস্পষ্ট রাখাই লক্ষ্য ছিল, তখন উহার বিরুদ্ধে আমরা কি বলিতে পারি? আমাদের কর্তব্য শুধু এই যে, আমাদের সম্মুখে যাহাকিছু বিশদভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, কেবল উহারই বিস্তারিত অনুসন্ধান করি; আর যাহাকিছু আমাদিগকে বলা

হয় নাই, অস্পষ্ট রাখাই সেখানে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করা হইয়াছে, উহার উপর অস্পষ্টরূপেই বিশ্বাস রাখি। যেমন, সত্যিকারের মুমেনের গুণ বর্ণনায় আল্লাহ্ বলেনঃ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ "যাহারা গায়বের উপর ঈমান রাখে।" আমাদের অস্পষ্ট বিষয়ের প্রতি অস্পষ্টরূপে বিশ্বাস রাখিয়া উক্ত প্রশংসিত মু'মেনগণের দলভুক্ত হইয়া যাওয়া উচিত। ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আকলের ঘোড়া দৌড়ান উচিত নহে।

এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টান্ত সেই মেহ্‌মানের ন্যায় হওয়া উচিত, যাহার থাকার জন্য গৃহস্বামী বিশাল ও প্রশস্ত একখানা ঘর ছাড়িয়া দিল। উহাতে বহুসংখ্যক কামরা রহিয়াছে, বিচিত্র আসবাবপত্রে সুসজ্জিত এবং দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ। কিন্তু তিনি মেহমানকে বলিয়া দিলেন, এই মুক্তদ্বার চারিটি কামরায় আনন্দের সহিত থাক এবং বেড়াও। সাবধান! রুদ্ধদ্বার কামরাগুলি কখনও খুলিবার চেষ্টা করিও না। এখন তাহার উচিত, যেই কামরাগুলিতে আনন্দের সহিত থাকিবার ও বেড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাহাই স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা, নিষিদ্ধ কামরাসমূহের কাছেও যাওয়া তাহার উচিত নহে। যদি সে রুদ্ধদ্বার কামরাগুলিরও তালা ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা উহা বন্ধ করিয়া রাখার কারণ অনুসন্ধান করে, তবে তাহা ভদ্রতা বিরোধী এবং অপরাধজনক কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

এইরূপে আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আলোচনা-সমালোচনা করা আমাদের জন্য শোভা পায়। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে মুখ খুলিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে সমস্ত বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা অনধিকার চর্চা এবং অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। তদুপরি আল্লাহ্‌র আদেশের অবমাননা বলিয়া বিবেচিত হইবে। পূর্বোক্ত বুযুর্গ লোক এই কারণেই বলিয়াছিলেনঃ

اکنوں کرا دماغ که پرسد ز باغباں   بلبل چه گفت وگل چه شنید وصبا چه کرد

"এখন কাহার সেই মস্তিক আছে যে, মালীকে জিজ্ঞাসা করিবে—বুলবুল কি বলিয়াছে? ফুল কি শুনিয়াছে এবং প্রাতঃসমীরণ কি করিয়াছে?" কাহার সাধ্য সেই রহস্য ও সূক্ষ্মতত্ত্ব উদঘাটন করিতে পারে? আমাদের জ্ঞানের কি সাধ্য এমন বিপজ্জনক পথে পা বাড়ায়? খোদার রহস্য উদঘাটন করা মানব শক্তির বাহিরে। খোদার সত্তা ও গুণাবলীর রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। ইহা অবগত হওয়া অসম্ভব বিষয়সমূহের অন্তর্গত। ইহাতে সমস্ত জ্ঞানী লোকই একমত।

আমরা কেবল এতটুকু বলিতে পারি যে, সেই পবিত্র সত্তার রহস্য যেমন উদঘাটনীয় নহে, তদ্রূপ তাঁহার অবতরণও তাঁহার মর্যাদারই অনুরূপ, সাধারণ অবতরণের ন্যায় নহে। এইরূপে তাঁহার আগমনও তাঁহার মর্যাদা এবং মহত্ত্বের উপযোগী। যেমন আগন্তুক তেমনই আগমন। আগন্তুকের তত্ত্ব জানিতে পারিলেই সেই আগমনের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। কেননা, আগমনের এমন কোন নির্দিষ্ট স্বরূপ নাই যাহাতে সমস্ত আগন্তুকই নির্বিচারে শরীক থাকিবে এবং আগমন সকলের মধ্যে ব্যাপক একটি কার্য হইবে। বরং আমরা সর্বদা দেখিতেছি, আগন্তুক বিভিন্ন রকমের হইলে আগমনও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। কাজেই আগন্তুকের তথ্য অবগত হওয়া ব্যতীত আগমনের তথ্য জানার উপায় নাই। দেখুন, جاء زيد "যায়েদ আসিয়াছে" বাক্যে যায়েদের আগমন সংবাদ রহিয়াছে। এই আগমনের তথ্য জানিতে হইলে প্রথমে যায়েদকে জানিতে হইবে। যায়েদকে জানিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে, সে নিজে হাঁটিয়া আসার কারণে

আগমন ক্রিয়ার কর্তা হইয়াছে। কিন্তু جاء المدينة 'শহর আসিয়াছে' বাক্যে স্থানের তথ্য জানার পর স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, কোন চলমান পদার্থ নিজে হাঁটিয়া আসিয়া শহরে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া "শহর আসিয়াছে" বলা হয়। অন্যথায় ইহা সত্য যে, শহর নিজের স্থান হইতে নড়ে নাই। এইরূপে কল্পনাশক্তিতে কোন কথার আগমন হইয়াছে বলিলে কল্পনা হাঁটিয়া কথার কাছে গিয়াছে কিংবা কথা হাঁটিয়া আসিয়া কল্পনায় প্রবেশ করিয়াছে বুঝাইবে না ; বরং চিন্তার আগমন কল্পনার মাধ্যমে হইয়া থাকে। চিন্তাশক্তির আলোড়নে কোন মত কিংবা চিন্তা স্থির করিয়া লওয়ার নামই কল্পনায় আসা। এইরূপে ভোরের আগমন প্রভৃতি।

এখন দেখুন, এই তিন প্রকারের আগন্তুকই ক্রিয়ার কর্তা। কিন্তু আগন্তুকত্রয়ের স্বরূপ বিভিন্ন হওয়ায় আগমনের স্বরূপে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হইয়াছে। একের আগমনের সহিত অপরের আগমনের কোনই সামঞ্জস্য নাই।

সুতরাং আমরা যখন দেখিতেছি যে, সৃষ্ট জীবের বা পদার্থের মধ্যে কোন আগন্তুকের স্বরূপ না জানা পর্যন্ত উহার আগমনের স্বরূপ জানা যায় না। এইরূপে স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার স্বরূপ অবগত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার অবতরণ বা আগমনের স্বরূপ জানিবারও কোন উপায় নাই। অতএব, প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা উপলব্ধি কর, অতঃপর তাঁহার অবতরণ এবং আগমনের স্বরূপ আমি বলিয়া দিব। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের স্বরূপ অবগত হওয়া অসম্ভব। তাহা তুমি কখনও অবগত হইতে পারিবে না। কাজেই তাঁহার কার্যাবলী এবং গুণাবলীর তাৎপর্য অবগত হওয়াও তোমার আমার সকলের জন্যই অসম্ভব। সুতরাং এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা সুন্নতের বিপরীত এবং ইহাতে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

এই কারণেই ইমাম শাফেঈ (রঃ) দার্শনিকদের ইমামতে নামায পড়া মকরূহ্ বলিতেন। এই শ্রেণীর দার্শনিক তাহারাই যাহারা আকায়েদ সম্বন্ধীয় আলোচনায় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে ; আর যাহারা ন্যায়পথ লঙ্ঘন করিয়া নিষিদ্ধ বিষয়ের তথ্য অবগত হওয়ার আয়োজন করিয়া উহাতে এমন পেরেশান ও অস্থির থাকে যে, সেক্ষেত্রে আকলের ঘোড়া অচল এবং তীক্ষ্ণধার অস্ত্র অকর্মণ্য হইয়া যায়। সেরূপ ক্ষেত্রে নানা প্রকার দুর্বল ও বেখাপ্পা ব্যাখ্যা করে। ঐ সমস্ত দার্শনিকের পশ্চাতে নামায মকরূহ নহে যাঁহারা বেদআত খণ্ডন এবং বাতিলপন্থীদের জটিল প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা উত্তর প্রদানের উদ্দেশ্যে দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। কেননা, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বেদআত খণ্ডন করা এবং ধর্মীয় মাসআলাসমূহে বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করা। তাঁহারা দুর্বোধ্য তথ্যসমূহ অবগত হওয়ার ইচ্ছাও করেন না এবং দাবীও করেন না। কোথাও তাঁহারা মোটামুটিভাবে এরূপ আলোচনা করিলেও তথ্য অবগতির দাবীস্বরূপ নহে ; বরং প্রতিবাদ করিয়া থাকেন মাত্র। অর্থাৎ, কেহ তথ্যাবগতির দাবী করিলে তাঁহারা সেখানে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন। এই প্রকারের দর্শন প্রশংসনীয় এবং উত্তম বলিয়া গণ্য করা হয়।

মোটকথা, যেমন আল্লাহ্র 'শান' তেমনি তাঁহার অবতরণ। আমরা তাঁহার যথার্থতা জানিতে পারি না যে, তিনি কেমন সত্তা—যিনি দেহ, জড় পদার্থ, বরং জড়হীন সৃষ্ট পদার্থ হইতেও পবিত্র, গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতামুক্ত এবং বিচিত্র পরিপূর্ণতা গুণ বিশিষ্ট। আমরা তাঁহার বিচিত্র গুণাবলীও জানিতে পারি না। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর তথ্য সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ, তাহাতে এমন বিচিত্র কি ? দুনিয়াতে এমন বহু পদার্থ রহিয়াছে যাহার সন্ধান আজ পর্যন্তও আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল ইহাই নহে যে, আমরা বড় বড় রহস্য এবং অজ্ঞাত জগত

সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়াছি; বরং সর্বক্ষণ আমাদের নিকটে অবস্থিত অনেক সাধারণ বস্তু সম্বন্ধেও আমরা অনবগত। উহা জানিতে পারিলে বিস্মিত হইয়া বলি, এমন সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে আমরা এতদিন অজ্ঞ ছিলাম। অতএব, আমরা এক পবিত্র, অবোধ্য, অদৃশ্য এবং অনন্ত গুণের অধিকারী সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে আমাদের মর্যাদায় এমন কি বিশ্রী দাগ লাগিয়া যাইবে? দুঃখের বিষয়! এমন সাধারণ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও আমাদের সম্ভ্রমের কোন হানি হইল না। অথচ এমন মহামহিমান্বিত ও প্রতাপশালী সত্তার তথ্য অবগত না হওয়ার কারণে যেন আমাদের যোগ্যতায় দাগ লাগিয়া যায়। আমরা তো কোন্ ছার; আমাদের অস্তিত্বইবা কি? এই ময়দানে অনেক্ মহান খোদাতত্ত্ববিদ—যাঁহারা আজীবন তত্ত্বজ্ঞান অনুসন্ধানে আল্লাহ্ পাকের রহস্য ও মা'রেফাত সম্বন্ধীয় গবেষণায় মশ্‌গুল রহিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের একটি মুহূর্তও মা'রেফাত চর্চা ছাড়া অতীত হয় নাই। তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে শেখ সাদী (রঃ) বলিতেছেন ঃ

دور بیناں بارگاہ الست - غیر ازیں پے نبردہ اند کہ ہست

" اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর দরবারের প্রতি দূর-দূরান্ত হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপকারিগণ তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে না।" এইরূপে মা'রেফাত তত্ত্ববিদ শীরাযীও বলিতেছেন ঃ

عنقا شکار کس نہ شود دام باز چیں - کینجا همیشه یاد بدست ست دام را

"আন্‌কাকে কেহ কখনও শিকার করিতে পারে না। জাল পাতিলে কোন লাভ নাই। এই ক্ষেত্রে সর্বদা বায়ু ছাড়া আর কিছুই তাহার ভাগ্যে নাই।" এখানে 'আন্‌কা' বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কবি বলিতেছেন ঃ "খোদার সত্তার তথ্য অবগত হওয়ার জন্য আকলের জাল পাতিও না। এখানে বায়ু ছাড়া জালে আর কিছু আসিবে না।" মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন ঃ

در تصور ذات او را گنج کو - تا در آید در تصور مثل او

"আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে।" অর্থাৎ, খোদা তা'আলার মত কোন সত্তার পদার্থ ধ্যান করাও অসম্ভব। কেননা, তুলনীয় পদার্থ ধ্যান করিতে না পারিলে তুল্য পদার্থের ধ্যান করা যায় না। যেহেতু তুল্য বস্তুর উপলব্ধির জন্য শর্ত হইল—উভয় বস্তু অন্তরে মূর্ত হওয়া; অথচ তুলনীয় অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের সত্তা উপলব্ধি করা এবং মূর্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার তুল্য কোন পদার্থের ধ্যান করাও সম্ভব নহে। আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থতা ইহজগতে তো দূরের কথা, আখেরাতেও অবগত হওয়া সম্ভব হইবে না। কেবল দর্শন লাভ হইবে মাত্র। অতএব, সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার জগৎ আখেরাতেও যখন তাঁহার তথ্য জানা যাইবে না, তখন ইহজগতে কেমন করিয়া তাহা জানার আশা করা যাইতে পারে? এই মাস্‌আলায় সমস্ত জ্ঞানী এবং মা'রেফাততত্ত্ববিদগণ একমত।

আল্লাহ্ তা'আলার এল্‌ম, কুদরত প্রভৃতি গুণের ন্যায় যে সমস্ত গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলা ও মানবের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে ব্যাপক রহিয়াছে—তাহাতে কেহ এরূপ ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নহে যে, মানুষের মধ্যে এসমস্ত গুণাবলীর তথ্য তো আমরা যথার্থরূপেই অবগত হইতে পারি, এই গুণাবলীই তো আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে রহিয়াছে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর তথ্য

অবগত হওয়া সম্ভব হইল। ইহার উত্তর এই—তথ্যের প্রেক্ষিতে মানবের ও আল্লাহ্ তা'আলার এ সমস্ত গুণাবলী এক নহে। শুধু নামের পরিপ্রেক্ষিতে এক বলা যায়। বস্তুত উভয়ের স্বরূপ পৃথক পৃথক। এই মূলনীতির উপর একটি আয়াতের তাফ্‌সীর খুবই সহজ হইয়া যায়ঃ

فَاَمَّـا الَّذِيْنَ شَقُـوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ الخ

وَاَمَّـا الَّذِيْنَ سُعِـدُوْا فَفِى الْجَنَّـةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ

এখানে দুইটি প্রশ্ন উত্থিত হয়—(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখী ও বেহেশ্‌তী উভয়ের ক্ষেত্রে خَالِدِيْنَ فِيْهَا -এর পরে مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ বলিয়াছেন। অর্থাৎ, উভয়ের স্থায়িত্ব আসমান এবং যমীনের স্থায়িত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হইবে। বলাবাহুল্য, কিয়ামতের দিন যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে; তখন সমস্ত সৃষ্টজগতের ন্যায় আসমান-যমীনও ধ্বংস হইবে, সুতরাং আসমান-যমীন ধ্বংস হইয়া গেল এবং ইহাদের স্থায়িত্ব রহিল না—কাজেই দোযখী এবং বেহেশ্‌তীদের স্থায়িত্ব অনন্তকালের জন্য হইল না। অর্থাৎ, দোযখীও দোযখের মধ্যে অনন্তকাল থাকিবে না, বেহেশ্‌তীও বেহেশ্‌তের মধ্যে অনন্তকাল থাকিবে না, অথচ ইহা বাস্তববিরোধী।

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, দোযখীদের দোযখে এবং বেহেশ্‌তীদের বেহেশ্‌তে থাকার স্থায়িত্বকে যেই আসমান-যমীনের স্থায়িত্বের সহিত সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা এই নশ্বর জগতের আসমান-যমীন নহে; বরং পরলোকের আসমান-যমীন এবং উহাদের স্থায়িত্ব অনন্ত ও অসীম। ইহাতে বিস্মিত হইবেন না যে, তথায় কি আসমান-যমীন হইবে? বুঝিয়া লউন, তথাকার আসমান-যমীন ইহজগতের আসমান-যমীন অপেক্ষাও বিরাট হইবে। এই মর্মে মাওলানা রূমী (রঃ) বলিতেছেনঃ

غیب را ابرے وبادے دیگرست - آسمانے آفتابے دیگرست

"অদৃশ্য জগতের মেঘ, বায়ু এবং আসমান ও সূর্য অন্য ধরনের। তথাকার মেঘ এবং পানি স্বতন্ত্র। তথাকার আসমান এবং সূর্যও পৃথক।" কিন্তু আমি ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর কথা শুনাইতেছি। ইহজগতেই অনুরূপ বিচিত্র বস্তু বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ, রূহ বা আত্মা; আত্মিক জগতের আসমান-যমীন এই আসমান-যমীন অপেক্ষা অধিকতর বিচিত্র। এই মর্মে হাকীম সানাঈ বলিতেছেনঃ

آسماں هاست در ولایت جاں   کار فرمائے آسماں جهاں
در ره روح پست وبالا هاست   کوه هائے بلند وصحرا هاست

"আত্মিক জগতে ইহজগতের আসমান-যমীনের ন্যায় কার্যকরী আসমান রহিয়াছে। আত্মার পথে উঁচু-নীচুও আছে এবং পাহাড়-জঙ্গলও আছে।" এইদিকেই আর একজন তত্ত্বজ্ঞানী (আরেফ) ইঙ্গিত করিয়াছেনঃ

ستم ست اگرهوست کشد که بسیر سر و سمن درآ
تو ز غنچه کم نه دمیدهٔ در دل کشا به چمن درآ

“দুঃখ এই যে, তুমি সাইপ্রাস বৃক্ষের বাগানে ভ্রমণ করার জন্য লালায়িত। তুমিও নব প্রস্ফুটিত কলি। হৃদয়ের দ্বার খোল এবং এই বাগানেই ভ্রমণ কর।” এই মর্মেই আরেফ শীরাযী বলিয়াছেনঃ

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت ست ـ چو کوئے دوست هست بصحرا چه حاجت ست

“নির্জনতাপ্রিয় ব্যক্তি কোলাহল পছন্দ করে না। বন্ধুর গলিতে অবস্থানকারীর জন্য জঙ্গলের প্রয়োজন নাই।” মাওলানা রূমী (রঃ)-ও এই মর্মে বলিয়াছেনঃ

اے برادر عقل یکدم با خود آر ـ دمبدم در تو خزاں ست و بهار

“ভ্রাতঃ! কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানের সাহচর্য অবলম্বন কর এবং দেখ, স্বয়ং তোমার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই হেমন্ত ও বসন্তকাল রহিয়াছে।”

মোটকথা, যখন এই নশ্বর জগতের সুবিধার জন্য আসমান এবং যমীন রহিয়াছে, তখন সেই স্থায়ী জগৎ পরলোকের সুবিধার জন্য আসমান-যমীনের অধিক প্রয়োজন এবং তাহাও স্থায়ীই বটে; সুতরাং مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (আসমান-যমীনের স্থায়িত্বকাল)-এর দ্বারা সীমাবদ্ধ করাতে দোযখ ও বেহেশ্‌তে অবস্থানের স্থায়িত্ব অনন্ত হওয়াতে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ও হেকমতঃ অবশ্য আর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, তবে এই সীমাবদ্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল? আখেরাতে মুমেনগণ বেহেশ্‌তে এবং কাফেররা দোযখে অনন্তকাল স্থায়ীভাবে থাকিবে বলিয়া যখন বলিয়া দেওয়া হইল, তখন আবার ইহাকে আসমান-যমীনের স্থায়িত্ব (مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ) -এর সহিত সীমাবদ্ধ করিলেন কেন? যদিও স্থায়ী পদার্থের সহিতই সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে নূতন এবং অতিরিক্ত ফায়দা কি হইল? এই প্রশ্নের উত্তর হইল, ইহাতে এক বিচিত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব রহিয়াছে। ইহাতে উক্ত স্থায়িত্বের তাকীদ করা হইয়াছে, তাহাও এক বিচিত্র এবং অভিনব পদ্ধতিতে। خَالِدِيْنَ فِيْهَا (চিরস্থায়ী থাকিবে)-এর মধ্যে এই বিচিত্র ধরনের তাকীদ ছিল না।

মনে করুন, কোন ব্যক্তিকে একটি বাসস্থান অনন্তকালের জন্য দেওয়া হইল এবং বলিয়া দেওয়া হইল, যতদিন এই ঘরের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তুমি এই ঘরে বাস করিবে, স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার গুরুত্বব্যঞ্জক ইহা অপেক্ষা আর কোন্‌ শব্দ হইতে পারে, তাহা আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। ঠিক এইরূপেই আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ “তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত এবং উহাতে বাস করার অধিকার অনন্তকালের জন্য দেওয়া হইতেছে—যে পর্যন্ত বেহেশ্‌তের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। অনন্তকাল পর্যন্ত ইহা তোমাদের ও তোমাদের পিতা এবং পিতামহের জন্য থাকিবে, কখনও তোমাদিগকে ইহা হইতে বাহির করা হইবে না।” বলাবাহুল্য, বেহেশ্‌তের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী ও অনন্ত। অতএব, এই তাকীদ مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (আসমান-যমীনের স্থায়িত্ব) সংযোগ করার ফলে এমন একটি সূক্ষ্ম বিষয় পাওয়া গেল, সহস্র প্রকারে ব্যাখ্যা করিলেও এত দৃঢ়তার সহিত তাহা ব্যক্ত হইত না। এখানে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। অবশ্য ইহা অদ্যকার আলোচ্য বিষয় ছিল না, প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করিলাম।

এখন সৃষ্ট মানবের এবং স্রষ্টা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পার্থক্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি। প্রশ্নটি এই—বেহেশ্‌তী এবং দোযখী উভয়ের সম্বন্ধে خَالِدِيْنَ فِيْهَا বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল, তাহারা নিজ নিজ বাসস্থানে অনন্তকাল বাস করিবে। অথচ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ

"কিন্তু তোমার প্রভুর ইচ্ছাধীন" বাক্যে বুঝা যায়, তাহাদের অনন্তকাল অবস্থান নিশ্চিত নহে। কেননা, উক্ত বাক্যে দেখা যায়, আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে পারেন। অনন্তকালের জন্য ওয়াদা নাই। ইহাতে বেহেশ্তীদের সাহস ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহারা ভাবিবে, আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ও পরিশ্রমের মূলে ছিল অনন্তকাল বেহেশ্তে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা। এই অনন্ত সুখের জন্যই দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামত পরিত্যাগ করিয়াছি। এই অনন্ত সুখ ভোগই ছিল আমাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র। দুর্ভাগ্যবশত সেই অনন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া গেল এবং দোযখীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কলি ফুটিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিবে, দোযখের অনন্ত শাস্তির কথা শুনিয়া দুনিয়ার সমস্ত স্বাদই তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। চল, এখন সেই আশঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত হইলাম।

ইহার উত্তর এই—স্থায়িত্ব অনন্তকালই থাকিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিপরীত ইচ্ছা করিলে অনন্ত থাকিবে না। তবে যেহেতু বহু দলিল দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও মুমেনকে বেহেশ্ত হইতে এবং কাফেরকে দোযখ হইতে বাহির করিবেন না, কাজেই অনন্ত স্থায়িত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। সুতরাং অনন্ত স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা রহিল না।

তবে একটি প্রশ্ন এই থাকিয়া যায় যে, (اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ) বাক্য সংযোগ করা সত্ত্বেও যখন "চিরস্থায়ী থাকিবে" (خَالِدِيْنَ فِيْهَا) বাক্যে বর্ণিত অনন্ত স্থায়িত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না, তবে ইহা সংযোগ করার সার্থকতা কি? সার্থকতা এই যে, ইহাতে আল্লাহ্র স্থায়িত্বের এবং মানবের স্থায়িত্বের প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া গেল। এখন আর কোন সাধারণ মানুষও কল্পনা করিতে পারিবে না যে, বেহেশ্তে প্রবেশের পরে আমরা তো স্থায়িত্বের সার্টিফিকেট পাইয়া গিয়াছি। তবে আমরা যে স্থায়িত্ব হইতে নীচে ছিলাম, আল্লাহ তা'আলাই দয়া করিয়া আমাদিগকে নিজের স্থায়িত্বের স্তরে উন্নীত করিয়া নিয়াছেন। ফলত আজ খোদার ও আমাদের ব্যবধান দূরীভূত হইয়া গেল। আমরাও তাঁহার ন্যায় স্থায়িত্বে স্বত্ববান হইয়া গেলাম। এরূপ কল্পনা 'শির্ক', ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব, এই শ্রেণীর শিরকজনক কল্পনার হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করার জন্য খোদার উপর ন্যস্ত হওয়া (اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ) কথাটি যোগ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে (خَالِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا) বাক্যের মর্মানুযায়ী নিজেদের পারলৌকিক স্থায়িত্বের জন্য এরূপ গর্ব করিও না যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ হইয়া গেলে, অনন্ত স্থায়িত্ব যদিচ এখন তোমাদের ভাগ্যেও আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্থায়িত্ব আমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যতদিন ইচ্ছা স্থায়িত্বের উপর রাখিব। আবার যখন ইচ্ছা কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দিব। অবশ্য বাহির করিব না ইহাও সত্য, কিন্তু আমার ইচ্ছাধীন অবশ্যই থাকিবে। পক্ষান্তরে আমার স্থায়িত্ব কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। আমার সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, কাহারও ইচ্ছার মুখাপেক্ষী নহে। এই স্থায়িত্ব লোপ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

হযরত শাহ্ আবদুল কাদের (রঃ) এই আয়াতের তাফ্সীরে অতি সহজ কথায় এই মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেনঃ اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ বাক্যটি দ্বারা এতটুকু বুঝান উদ্দেশ্য যে, এই স্থায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্ এবং মানুষের গুণাবলীর মধ্যে মূল পার্থক্য ইহাই, যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

মানুষের পারলৌকিক স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে একটি কাহিনী মনে পড়িল। কোন একজন গ্রাম্য লোক কালেক্টরের দরবারে যাইয়া খুব আদবের সহিত সালাম করিল এবং অতি বিনয়ের সহিত তাঁহার

পা দাবাইতে লাগিল। কালেক্টর সাহেব নিষেধ করিলেন এবং বলিলেনঃ মতলব কি? তাই বল। কিন্তু সে ছাড়িল না, দাবাইতেই রহিল। অবশেষে যখন তিনি বহুবার নিষেধ করিলেন এবং বার বার মতলব জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে বলিলঃ আমি আপনার নিকট একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, 'মউরূসী' কাহাকে বলে? তিনি বলিলেনঃ "কোন পাটওয়ারীর নিকট জিজ্ঞাসা কর।" সে বলিলঃ 'না, আমি আপনার কাছেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।' কেহ এরূপ বলে, কেহ ওরূপ বলে, তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। কালেক্টর বলিলেনঃ ১২ (বার) বৎসরের দখলী স্বত্বকে 'মউরূসী' বলে। 'মউরূসী' হক জন্মিলে জমিদার কোন কৃষককে উচ্ছেদ করিয়া অপর কৃষক বসাইতে পারে না। সে বলিলঃ তবে তো সর্বনাশ। 'শামেলী' তহসীলে আপনার তহ্‌সীলদার এগার বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে। আর এক বৎসর অতীত হইলেই তো উক্ত তহ্‌সীল তাহার মউরূসী স্বত্ব হইয়া পড়িবে। অতঃপর আপনার বাবাও তাহাকে তাড়াইতে পারিবে না, আমার বাবাও না। মোটকথা, সে এমন মজার সহিত ব্যক্ত করিল যে, কালেক্টর সাহেব তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া ফেলিলেন। এই ব্যক্তি উক্ত তহ্‌সীলদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে। তিনি অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া উক্ত তহ্‌সীলদারকে সেই তহ্‌সীল হইতে বদলী করিয়া দিলেন।

দেখুন, দুনিয়ার কোন হাকীম স্বেচ্ছায় নিজ পদে স্থায়ী থাকিতে পারে না; বরং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাহাকে বদলী বা বরখাস্ত করিয়া দিতে পারে। তহসীল তো অতি নিম্নস্তরের অফিস, তাহাতেও কাহারও চিরস্থায়ী স্বত্ব হইতে পারে না। অথচ বেহেশ্‌ত যাবতীয় নেয়ামতের সেরা। যাহার প্রতিশ্রুতিতে মুমেনের অন্তর প্রফুল্ল হয়, শরীরে শক্তি আসে, এমন বড় নেয়ামতের উপর আমাদের চিরস্থায়ী স্বত্ব হইয়া যাইবে। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাও (নাউযুবিল্লাহ্‌) উহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। কেমন বিস্ময়ের কথা। সুতরাং মানুষের জন্য পারলৌকিক স্থায়িত্ব সাব্যস্ত থাকিলেও তাহা কখনও আল্লাহ্‌ তা'আলার স্থায়িত্বের সমকক্ষ নহে; বরং উভয় স্থায়িত্বের মধ্যে প্রকারভেদ রহিয়াছে। অতএব, এই শিরক হইতে মানুষকে রক্ষা করার জন্য "তোমার প্রভুর ইচ্ছাধীন" সংযোগ করা হইয়াছে। অতএব, দেখুন, স্থায়িত্ব আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ, মানুষও এক অর্থে এই গুণের অধিকারী। তথাপি উভয় স্থায়িত্বের মধ্যে এমন পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহাতে একটি অপরটি হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ, মানুষের স্থায়িত্ব ত্রুটিপূর্ণ।

যখন উভয় গুণের মধ্যে এরূপ পার্থক্য বিদ্যমান, তখন মানবের গুণ উপলব্ধি করিলে তাহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণের উপলব্ধি অনিবার্য হয় না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। কোন জগতেই আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার এবং গুণাবলীর তথ্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। বিবেকানুযায়ীও অসম্ভব এবং দলিল অনুযায়ীও নিষিদ্ধ। সর্বকালের জ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ ইহাতে একমত হইয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার তথ্য অবগত হওয়া বিবেকানুযায়ী অসম্ভব। কিতাবী দলিল হাদীস শরীফেও বর্ণিত আছে যে, পরলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত এবং সর্বোত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার। সেদিন সেই মহান সত্তার জ্যোতির্ময় চেহারা হইতে সর্বপ্রকারের পর্দা ও বাধা উঠিয়া যাইবে এবং পিপাসাতুরগণ দীদার লাভ করিয়া তৃপ্ত হইবে। وَلَا يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِهٖ حِجَابٌ اِلَّا رِدَاۤءُ الْكِبْرِيَاۤءِ 'কিবরিয়া' অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠত্ববোধের পর্দা নামক একটি পর্দা তখনও অবশিষ্ট থাকিবে। তাহা উঠিবার আশা নাই। কেননা, অনাদি-অনন্ত সত্তার রহস্যই সেখানে। অনাদি-অনন্ত সত্তা কখনও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। এই কারণেই আমি বলিয়াছি, সেই পর্দা উঠিবেও না, উঠিবার আশাও নাই। তাঁহার এই অনাদি-অনন্ত গুণই বিশিষ্টতম গুণ। এই গুণ তিনি ছাড়া অন্য কাহারও নাই।

এই প্রসঙ্গে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণ হইল। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার স্থায়িত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ শুধু অপরিহার্যতা এবং অনাদি-অনন্ত গুণকে আল্লাহ্‌র জন্য খাছ মনে করেন। আর কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়িত্ব এবং দেহহীন অস্তিত্বকে গায়রুল্লাহ্‌র জন্যও স্বীকার করেন। দার্শনিকগণ এসব গুণকে শুধু আল্লাহ্‌র খাছ গুণ বলিয়া থাকেন। এই কারণেই দেহহীন অস্তিত্বের প্রবক্তাদের দার্শনিকগণ কাফের মনে করেন। আর তত্ত্ববিদগণ সত্তার অস্তিত্ব অপরিহার্যতা ও অনাদি-অনন্ত এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়িত্ব—এই তিনটিকে আল্লাহ্‌র খাছ গুণ বলেন, আর দেহহীন অস্তিত্ব অন্যের জন্যও সাব্যস্ত করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, অস্থায়ী কতক পদার্থ আছে যাহা কালের প্রেক্ষিতে অস্থায়ী এবং সৃষ্ট। ইহাদিগকে তাহারা لطائف (লাতায়েফ) অর্থাৎ, সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে 'রূহ' ইহারই অন্তর্ভূক্ত। তাঁহারা ইহাকে সৃষ্ট ও অস্থায়ী এবং দেহহীন অস্তিত্বও বলেন। সুতরাং তাহারা মানবদেহ সৃষ্টির পূর্ব হইতেই ইহার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা এই দেহহীন অস্তিত্বের কারণেই রূহ্‌কে স্থানের মুখাপেক্ষী মনে করেন না, রূহ্ লা-মকানে অবস্থান করে বলিয়া মন্তব্য করেন। তত্ত্ববিদগণের এই মন্তব্য হইতেই সুফিয়ায়ে কেরাম মূলবিহীন সূক্ষ্ম পদার্থের স্থান আরশের উপরে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, উহা আরশের উপরিভাগে অবস্থান করে; বরং যত প্রকারের স্থান দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তন্মধ্যে আরশ সকলের উচ্চে শেষ সীমা—উহার উপরে স্থান বলিতে কিছু নাই। অতএব, আরশের উপর বলিতে লা-মকানই উদ্দেশ্য। আর সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পদার্থ যেহেতু দেহহীন অস্তিত্ব এবং স্থানের মুখাপেক্ষী নহে। সুতরাং 'আরশের উপর' বলিতে স্থানের মুখাপেক্ষীবিহীনতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাঁহারা সে সমস্ত লোককে কাফের মনে করেন না, যাহারা বলেঃ "এমন পদার্থও আছে যাহা দেহহীন অস্তিত্ব, কিন্তু সৃষ্ট ও অস্থায়ী। অবশ্য যাহারা সত্তার অস্তিত্ব অপরিহার্যতা ও আদি-অন্তহীনতা এবং কালের প্রেক্ষিতে স্থায়িত্ব গুণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য সাব্যস্ত করে, সূফিয়ায়ে কেরাম তাহাদিগকে কাফের মনে করেন। কেননা, এগুলি আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্টতম গুণ। অস্তিত্ব অপরিহার্যতার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার উপলব্ধি অসম্ভব। এই গুণ হইতে তিনি কোন সময়ই শূন্য নহেন। কাজেই পরলোকেও তাঁহার সত্তার গুণাবলী উপলব্ধি সম্ভব নহে। এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিয়াছেনঃ অদৃষ্ট বিধানের রুদ্ধদ্বার ইহজগতের ন্যায় পরলোকেও মুক্ত হইবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর তথ্য অবগত হওয়ার উপরই অদৃষ্ট বিধানের তথ্য নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর তথ্য অবগত হওয়া ইহলোকেও সম্ভব নহে। সুতরাং ইহার উপর নির্ভরশীল বস্তু সম্বন্ধে অবগত হওয়া উভয়লোকে অসম্ভব। সুতরাং এমন বিজ্ঞ আলেমগণ যখন নিজের শক্তিকে খর্ব ও অপারক মনে করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর তথ্য অবগত হওয়া অসাধ্য, তবে এখন আমাদের ন্যায় মূর্খ লোকের পক্ষে এসমস্ত বিষয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিতে যাওয়া বেআদবী এবং সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে; বরং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ছাহাবায়ে কেরামের নির্দেশের বিপরীত। এসমস্ত বিষয়ে খোদাদত্ত আন্তরিক জ্ঞানের উপর ক্ষান্ত থাকিয়া আমলের চেষ্টায় লাগিয়া যাওয়া উচিত। ইহাই আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করিতেছিলাম, বাক্য পরম্পরায় উহা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে।

বলিতেছিলাম, যে সমস্ত বিষয়ে মূলত কেবল জ্ঞান-বিশ্বাসই উদ্দেশ্য, সে সমস্ত বিষয়েও কেবল জ্ঞানলাভই উদ্দেশ্য নহে; বরং তদনুযায়ী আমল করাও উদ্দেশ্য এবং لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ আয়াতে আমার সেই উক্তির পোষকতা রহিয়াছে। সুতরাং يَنْزِلُ رَبُّنَا হাদীসে যেমন

আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে নাযিল হওয়ার সংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য, তদ্রূপ রাত্রি জাগিয়া নফল এবাদত করার প্রতি উৎসাহ প্রদানও উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, শুধু এতদসম্পর্কিত জ্ঞানলাভকেই হিতকর মনে করিয়া يَنْزِلُ وَيَحْيٰى প্রভৃতি গুণাবলীর অনুসন্ধানের পশ্চাতে লাগিয়াছি। অথচ যাহা হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য উহা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছি।

এইরূপে وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا আয়াতটিতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শুধু আখেরাত সম্বন্ধে জ্ঞান-বিশ্বাস প্রদানই এই আয়াতের উদ্দেশ্য নহে; বরং আমলের ক্ষেত্রে উহার দ্বারা কাজ লওয়াও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি যেমন আমাদের বিশ্বাস রহিয়াছে, তদ্রূপ উহার অস্থায়িত্বকে স্মরণ পথে উদিত রাখিয়া দুনিয়ার প্রতি মনে বিরাগ উৎপন্ন করা উচিত। ইহাই এতদসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হইবে, যখন সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার প্রতি বিরাগও উৎপন্ন হয়, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা সর্বদা মনে উপস্থিতও থাকে। তাহাতেই উক্ত বিশ্বাসের উদ্দেশ্য সফল হইবে। অন্যথায় এই জ্ঞানলাভ ও বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না। আলোচ্য আয়াতের এবারত এই বিষয়টিকে কেমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছে।

এমন নহে যে, কোন প্রকার কষ্ট বা টানাহেঁচড়া করিয়া কিংবা দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার সাহায্যে এ সমস্ত বিষয়বস্তু বাহির করিতে হইয়াছে; বরং এই বিষয়গুলি এই আয়াত হইতে এমনিভাবে বাহির করা হইয়াছে যেমন কূপ হইতে পানি। কূপে পানি ছিল বলিয়াই বাহির করা সম্ভব হইয়াছে। তদ্রূপ এই বিষয়গুলিও আয়াতের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়াই বাহির করা সম্ভব হইয়াছে। না থাকিলে কোথা হইতে বাহির হইত?

কোরআনে করীম তাজাল্লীবিশেষঃ প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়গুলি এই সংক্ষিপ্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত অসংখ্য বিষয়বস্তুর একটি অংশমাত্র। কোন মানুষের শক্তি নাই যে, সে কোরআনে পাকের এত ব্যাখ্যা করে, যাহার পরে উক্ত আয়াতের মধ্যে আর কোন মাস্আলা অবশিষ্ট না থাকে। কোরআন শরীফের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তুসমূহ শেষ হইবার নহে। ইহাই তো কালামুল্লাহ্‌র 'অক্ষমকারী গুণ', যাহা সমগ্র জগতকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী।

چیست قرآں اے کلام حق شناس رو نمائے رب ناس آمد بناس
حرف حرفش راست در بر معنی معنے در معنے در معنے

"কোরআন শরীফ কি? ইহা একটি আয়না। যাহাতে মানুষ খোদার চেহারা দেখিতে পায়। ইহার এক একটি হরফ হাকীকত এবং মারেফাতের ভাণ্ডার।" অর্থাৎ, কোরআন শরীফ একক খোদাকে দর্শন করিবার একটি আয়না এবং আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিবার সিঁড়ি বা ধাপ। কোরআনের প্রদর্শিত সড়ক ধরিলে মানুষের আর পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃত উদ্দিষ্ট স্থানে ইন্শাআল্লাহ্ সে পৌঁছিয়া যাইবেই। কেননা, কোরআন শরীফ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লীসমূহের মধ্যে একটি তাজাল্লীবিশেষ। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লীকে পথপ্রদর্শক স্থির করিয়া লইবে, সে ব্যক্তি খোদা তা'আলার দরবার পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছিয়া যাইবে। যদিও ইসলামী দার্শনিকগণ এই কোরআনকে স্বর ও বর্ণ দ্বারা গঠিত কালাম

বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বর ও শব্দবিশিষ্ট হওয়া তাজাল্লী হওয়ার পরিপন্থী নহে। কেননা, খোদার কালাম 'কালামে লফ্‌যী' হইলেও আমাদের কালামে লফ্‌যীর ন্যায় নহে। আমাদের সহিত আমাদের কালামে লফযীর যদিও এক খাছ সম্পর্ক রহিয়াছে, তথাপি উচ্চারিত হওয়ার পরেই উহা আমাদের সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেননা, জিহ্বার সহিত ইহার উৎপত্তিস্থলগুলির কোনই সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার সহিত তাঁহার কালামে লফযীর সম্পর্ক এরূপ নহে। যদিও দার্শনিকগণ ইহাকে কালামে লফ্‌যী নাম দিয়াছেন, তথাপি আল্লাহ্‌র কালামে লফ্‌যীকে আমাদের কালামে লফ্‌যীর উপর অনুমান করা ভুল—যদিও আল্লাহ্‌র সত্তা বা গুণের কোন যথার্থ দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নহে। যেমন, আরেফ রূমী বলেনঃ

اے بروں از وهم قال وقيل من ـ خاك بر فرق من وتمثيل من

"আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ধারণাও করা যায় না, অনুমানও করা যায় না, শব্দ এবং ভাষা দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। অর্থাৎ, কোন দৃষ্টান্তের সহিত তাঁহাকে খাপ খাওয়ান যায় না।" কিন্তু সহজবোধ্য করার জন্য আমি উভয় কালামে লফ্‌যীর পার্থক্যের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। কেননা, দৃষ্টান্ত ভিন্ন পার্থক্য পরিষ্কার বুঝা যাইবে না। যেমন, মওলানা বলিয়াছেনঃ

بنده نشكيبد ز تصوير خوشت ـ هر دمت گويد كه جانم مفرست

অর্থাৎ, যদিও প্রদত্ত দৃষ্টান্তের আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কোনই সামঞ্জস্য হইতে পারে না; বরং দুনিয়াতে এমন কোন পদার্থই নাই খোদা তা'আলার সহিত যাহার পূর্ণ অথবা কোনরূপ বাস্তব সামঞ্জস্য থাকিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টান্ত ব্যতীত তৃপ্তি হয় না। সুতরাং সর্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এবং মনের সন্দেহ দূর করার নিমিত্ত উক্ত পার্থক্যের এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

মনে করুন, এক হইল সূর্য আর এক হইল উহার কিরণ—যাহা সূর্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর উহার দীর্ঘাকৃতি কিরণশিখা, যাহা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অপর দিকে একখানি আয়না। প্রথমত উহার উপর সূর্যের কিরণশিখা পতিত হয়। অপর দিকে যমীন—যাহার উপর আয়নায় প্রতিফলিত দীর্ঘাকৃতি কিরণ-শিখা আয়না হইতে আসিয়া যমীনের উপর পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা যেন সূর্য এবং তাঁহার কালামে নফ্‌সী অর্থাৎ, তাঁহার কথা তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন গুণাবলীর অন্যতম—যাহা তাঁহার অবিকল সত্তাও নহে, তাঁহার সত্তার বিপরীত অন্য কিছুও নহে। এই কালামে নফ্‌সী সূর্যের আলোর ন্যায়, আর কালামে লফযী (স্বর ও শব্দ সমন্বয়ে গঠিত কালাম) সূর্যের সেই কিরণ-শিখার ন্যায়, যাহা সূর্যের গোলক হইতে নির্গত হইয়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। আর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হৃদয় আয়না সমতুল্য; আর আমরা যমীনের ন্যায়।

এই দৃষ্টান্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সন্দেহ দূর করা এবং আমাদের 'কালামে লফযী' বলিলে সাধারণত যাহা বুঝি, আল্লাহ্ তা'আলার কালামে লফযীকেও সামঞ্জস্য ব্যতীত যেন তেমনই মনে করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে উভয় কালামে লফযীর পার্থক্যও পরিষ্কার হইয়া যায়। যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, দার্শনিকরা তো আল্লাহ্‌র কালামে লফযীকে সৃষ্ট ও অস্থায়ী পদার্থ বলিয়াছে। অতএব, আল্লাহ্‌র কালামে লফযী ও আমাদের কালামে লফযীতে পার্থক্য যথাযথভাবে জানার উপায় নাই। তবে পার্থক্যের লক্ষণ এই যে, আমাদের কালামে লফযীকে আল্লাহ্‌র কালাম বলা জায়েয নহে।

আর কোরআনের পর্যায়ভুক্ত কালামে লফযীকে আল্লাহ্‌র বাণী বলা জায়েয। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহাও জানা যাইবে যে, সর্বসাধারণের দৃষ্টিপথে বিস্তৃত সূর্য-কিরণ অধিক তীব্র। সূর্যের খাছ কিরণ যেমন আমরা বর্‌দাশত করিতে পারি না, তদ্রূপ আল্লাহ্‌র কালামের জ্যোতি বিকিরণেও কালামে লফযীর তাজাল্লী আমরা বরদাশ্‌ত করিতে পারি না। ইহার কারণ আমাদের সামর্থ্যের দুর্বলতা।

এই কারণেই মূসা (আঃ)-এর প্রতি কালামে লফযীর তাজাল্লী হওয়ার পরেও যখন তিনি আরও অধিক তাজাল্লীর দরখাস্ত করিলেন, তখন জবাব আসিলঃ لَنْ تَرَانِىْ অর্থাৎ, তুমি আমাকে কখনও দেখিতে পারিবে না। অর্থাৎ, দর্শনীয় হওয়ার যোগ্যতা আমার মধ্যে পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান। কোন বস্তুই আমাকে দেখার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কিন্তু তোমার মধ্যে আমাকে দেখার যোগ্যতা নাই। কেননা, আমি খালেছ নূর। আর তোমার দেহ মলিন পদার্থের সহিত মিশ্রিত। উহা আমার নূর বরদাশ্‌ত করিতে অক্ষম। তিনি যেন ইহাই বলিয়া দিলেন যে, তোমার মধ্যে এমন যোগ্যতাই নাই যে, আমাকে দেখার পর সুস্থ ও নিরাপদ থাকিতে পার। যদ্যপি ইহজগতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার যোগ্যতা না থাকার কথা সকলকেই পরিষ্কারভাবে বলিতেছিলেন এবং উহা শ্রবণের পর প্রত্যেক মু'মেনের মনে নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া অনিবার্য। হযরত মূসা (আঃ)-এর মনে নিজের যোগ্যতার বিশ্বাস হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

কিন্তু মূসা আলাইহিস্ সালাম 'আশেক' ছিলেন। সুতরাং আকীদার পরিপ্রেক্ষিতে যদিও তিনি নিজের অযোগ্যতায় বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু দর্শনলাভের আগ্রহ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, ইহার তীব্রতা তখনও হ্রাস পাইয়াছিল না। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই মূসা (আঃ)-এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেনঃ যদি এখনও তোমার মনে আমাকে দেখার আগ্রহ থাকে, তবে اُنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ ۱لاية "তুমি এই পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর।" যদি পাহাড় স্থির থাকিতে পারে এবং আমার তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করিতে পারে, তবে তোমাকেও বঞ্চিত করা হইবে না। ফলত فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ ۱لاية যখন আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়ের উপর নিজের নূর প্রকাশ করিলেন, পাহাড় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, মূসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন এবং নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। নিজের অযোগ্যতা নিজ চক্ষেই দেখিতে পাইলেন, পাহাড় এত দৃঢ় এবং বিরাট পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও যখন তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করিতে পারিল না, তখন আমি কি বরদাশ্‌ত করিব?

যদি প্রশ্ন করা হয়, মূসা (আঃ)-এর সহিত পাহাড়ের কি সম্পর্ক? মূসা (আঃ) পূর্ণাঙ্গ (কামেল) মানুষ, নবী এবং কালীমুল্লাহ্! আর পাহাড় নির্জীব পদার্থ। সুতরাং فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِىْ "পাহাড় যদি নিজের স্থানে নিরাপদে বহাল থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখিতে পাইবে"— এই বাক্যে পাহাড়ের স্থির থাকার উপর মূসা (আঃ)-এর দেখাকে অনুমান করা হইয়াছে। এই অনুমানের তাৎপর্য বোধগম্য হইতেছে না। হয়তো মূসা (আঃ) স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেন। তবে উত্তর এই হইবে যে, মূসা (আঃ) স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে যে তাজাল্লী পাহাড়ের চেয়ে অধিক বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেন, তাহা তো তাঁহাকে পূর্বেও দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ, অন্তরের কিংবা রূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র তাজাল্লী তো তিনি পূর্বেও দেখিতে পাইতেন। কিন্তু এখন তিনি স্বচক্ষে দেখিবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শকদের দর্শন করা আর রূহের মধ্যে তাজাল্লী অনুভব করা এক নহে। চক্ষে দেখার জন্য চক্ষুর উপরই আল্লাহ্‌র তাজাল্লী প্রতিভাত হইতে হইবে। কিন্তু চক্ষু দেহের একটি ক্ষুদ্র, দুর্বল ও কোমল

অংশবিশেষ। পক্ষান্তরে নির্জীব হইলেও পাহাড়ও একটি দেহ, কিন্তু খুব দৃঢ় ও শক্তিশালী। ভারী হইতে ভারী বোঝা বহন করিতে সক্ষম। এই গুণে পাহাড় মানব দেহের যাবতীয় অংশ হইতে অধিক শক্তিশালী। যেমন, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا الاية "তোমাদের গঠনই অধিক দৃঢ়, না আল্লাহ্র সৃষ্টি আসমানের?" আরও বলিয়াছেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

"অবশ্যই আসমান এবং যমীনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ।" এতদুভয় আয়াত হইতেই আসমান-যমীনের গঠন মানুষের গঠন অপেক্ষা অধিক মজবুত ও দৃঢ় বলিয়া বুঝা যাইতেছে। সুতরাং পাহাড়ের ন্যায় এমন কঠিন ও সুদৃঢ় দেহ যখন আল্লাহ্র মহিমা ও প্রতাপের জ্যোতি বরদাশ্ত করিতে পারে নাই, তখন মূসা (আঃ)-এর চক্ষু আল্লাহ্ তা'আলার জগৎ উদ্ভাসী জ্যোতি দর্শনে কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? সুতরাং দুর্বলতা এবং পাহাড়ের দৃঢ়তা সম্মুখে রাখিয়া যখন তিনি পাহাড়ের এরূপ অবস্থা দেখিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস হইয়া গেল যে, তিনি বরদাশ্ত করিতে অক্ষম। এখানে বাহ্যদৃষ্টিতে আর একটি প্রশ্ন উঠে যে, ইহাতে তো মনে হয়, তখন তাঁহার উপর তাজাল্লী প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, তাঁহার উপরও তাজাল্লী প্রতিভাত হইয়াছিল। কেননা, মূসা (আঃ) তাজাল্লীর পরেই বেহুঁশ হইয়াছিলেন। যেমন, فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا الاية আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রথমে তাজাল্লী হইয়া পাহাড় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছিল এবং মূসা (আঃ)-ও বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব, মূসা (আঃ)-এর উপরও তাজাল্লী হইয়াছিল, এই আয়াতে পরিষ্কার তাহা বুঝা যায়।

ইহার উত্তর এই যে, ইহা তো স্বীকার্য কথা যে, তাজাল্লীর পরেই মূসা (আঃ) বেহুঁশ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তিতা দুই প্রকার, (১) সত্তা হিসাবে এবং (২) কালের হিসাবে। সত্তার হিসাবে মূসার বেহুঁশ হওয়া অবশ্যই তাজাল্লীর পরে হইয়াছিল। কালের হিসাবে নহে। কালের হিসাবে বরং তাজাল্লী এবং মূসার বেহুঁশ হওয়া একই সঙ্গে হইয়াছিল। যদি কালের হিসাবে তাজাল্লীর পর মূসা (আঃ) বেহুঁশ হইতেন, তবে অবশ্যই মূসা (আঃ)-এর উপরও তাজাল্লী হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইত। কিন্তু শুধু সত্তা হিসাবে পরে হওয়াতে তাজাল্লী মূসা (আঃ)-এর উপর হইয়াছিল প্রমাণ করা কঠিন। কেননা, কাল হিসাবে উভয়টি একত্রেই হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাজাল্লী শব্দের অর্থ প্রকাশিত হওয়া। প্রকাশিত হইলেই উহাকে উপলব্ধি করা এবং দেখা অবধারিত নহে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা অবশ্যই প্রকাশ পাইয়াছিল। উহারই ফলে পাহাড় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু মূসা (আঃ) তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; বরং তিনি তৎক্ষণাৎ বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার নূর প্রতিভাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু উহা বরদাশ্ত করার ক্ষমতা আমাদের নাই; বরং আল্লাহ্র নূর সর্বদা প্রকাশিত হইতেই চায়। যেমন, আরেফ জামী বলেন ঃ

نکور و تاب مستور ندارد - چو در بندی سر از روزن بر آمد

"আল্লাহ্ তা'আলার 'জামাল' আপাদমস্তক প্রকাশ্য, আবৃত থাকা পছন্দ করে না। যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে উহার জ্যোতি দরজা-জানালার ফাঁক দিয়া ছিট্‌কাইয়া বাহির হয়।" এই

কবিতার শব্দগুলির শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নহে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হইতে আত্মপ্রকাশ ইচ্ছাধীন। কেননা, তিনি দয়ালু এবং মেহেরবান, কাজেই বান্দাকে ডাকেন, আসঃ "আমার তাজাল্লী হইতে ফয়েয হাসিল কর।" কিন্তু কি করি, আমাদের সে যোগ্যতা নাই যে, আমরা সেই ফয়েয লাভ করিতাম। তাঁহার কালামে লফ্‌যীর তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে ছিল, কাজেই উহার ফয়েয আমাদিগকে দান করা হইয়াছে। কিন্তু কখনও মনে করিবেন না যে, আমাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণ হইলেও ব্যক্তিগত যোগ্যতা কিছু ছিল বলিয়াই আমরা কালামে লফ্‌যীর তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করিতে সক্ষম হইয়াছি; বরং মনে করিতে হইবে, এই শক্তিও আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলারই দান। সেই দানের ফলেই আজ উক্ত কালামে লফযীর নূরে আমাদের অন্তর আলোকিত।

তাজাল্লীর লক্ষণ বা ফলঃ এই বরদাশ্‌ত শক্তির কারণে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, হয়তো কালামে লফ্‌যী স্বীয় মহিমা খর্ব করিয়া অপূর্ণতা অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই আমরা বরদাশ্‌ত করিতে পারিয়াছি; বরং উহা স্বীয় মৌলিক কঠোরতা এবং প্রতাপের উপরই রহিয়াছে। উহার লক্ষণ এই যে, একদিন হুযূর (দঃ) যায়েদ ইব্‌নে সাবেত (রাঃ)-এর হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। এমন সময়ে ওহী নাযিল হইতে লাগিল। উক্ত ছাহাবী বলেনঃ "তখন ওহীর ভারে আমার হাঁটু ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। আর একবার তিনি উটের উপর সওয়ার ছিলেন, তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ করিলে ওহীর ভার সহ্য করিতে না পারিয়া উট বসিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, হুযূর (দঃ)-কে সর্বোচ্চ বরদাশত শক্তি প্রদান করা সত্ত্বেও ওহী নাযিল হওয়ার প্রতিক্রিয়া তিনি এত অধিক অনুভব করিতেন। অথচ আমরা আজকাল কালামে মজীদ তেলাওয়াত করি এবং উহা হইতে উপকার লাভ করি; কিন্তু সেই কঠিন প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর হয় না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কালামে পাক প্রথমত জিব্‌রাঈল (আঃ) -এর মাধ্যমে নাযিল হওয়ায় কিছুটা হালকা হইয়াছে। অতঃপর হুযূর (দঃ)-এর উপর নাযিল হইয়া আরও হালকা হইয়াছে। এই সকল মাধ্যমের পর এখন আমাদের বরদাশ্‌তের উপযোগী পরিমাণ হাল্‌কা হইয়াছে। যাহার ফলে আমরা উহা পড়িতে পারি, স্মরণ রাখিতে পারি। কিন্তু উহার মৌলিক মহত্ত্ব কোথাও যায় নাই। উহার প্রকৃত মহিমা ও প্রতাপ সেই দুই মহান ব্যক্তি বহন করিয়া নিয়াছেন। এখন উহা হাল্‌কা হইয়া আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। যেমন, শিশুর দ্বারা কোন বোঝা উঠাইতে হইলে মাতা-পিতা তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তখন শিশুর জন্য উহা উঠাইয়া লওয়া সহজ হয়। কিন্তু এখনও যদি তাজাল্লীর ফল প্রকাশের পথ হইতে বাধা অপসারিত করা হয়, তবে উহার এত বড় ক্রিয়া অবশিষ্ট আছে যে, কোন কোন সময় অতিশয় ভয় ও বিনয়ের সহিত তেলাওয়াত করিতে থাকিলে অভিনব অবস্থার উৎপত্তি হয়। এমন কি কালামে মজীদ শ্রবণ করিয়া কোন কোন ওলীআল্লাহ্‌ এত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের অন্তর খোদার নূরে আলোকিত ছিল বলিয়াই এত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের অন্ধকার হৃদয়েও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই হয় যে, অনেক সময় কোরআন মজীদকে কোরআনের মত পাঠ করিলে এক বিচিত্র কোমলতা ও ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমরা কোরআন শরীফ পড়িতেই জানি না। যদি তেলাওয়াতের হক আদায় করিয়া ভয় ও নম্রতা মনে আনা হয়, তবে স্বাদ না লাগিয়াই পারে না। আরবে একজন

অতি নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র কিংবা সাধারণ লোকও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলে তথা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হয় না। বাস্তবিকপক্ষে তেলাওয়াতের হক তাহারাই আদায় করিয়া থাকে। বিবি ফাতেমা নাম্নী এক অন্ধ ও বৃদ্ধা রমণী মক্কা শরীফের বাবে ওমরায় বসিয়া সর্বদা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন। বাস্তবিক তাঁহার তেলাওয়াতে এক আশ্চর্য মজা পাওয়া যাইত। সকল সময়ে তথায় শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড় লাগিয়া থাকিত। বন্ধুগণ! মজা শুধু আরববাসীর পড়াতেই সীমাবদ্ধ নহে। আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক যেখানেরই হউক না কেন, তাঁহার তেলাওয়াতে অবশ্যই এক বিচিত্র স্বাদ পাওয়া যায়।

মীরাঠের সড়ক পার্শ্বে এক মসজিদে জনৈক হাফেয ছাহেব তারাবীহ্‌র নামায পড়াইতেন। সড়কের সমস্ত যাতায়াতকারী, এমন কি ইংরেজরাও দাঁড়াইয়া তাঁহার কোরআন শরীফ শুনিত। তাজাল্লীর প্রভাব ইহার চেয়ে অধিক আর কি হইবে? বিশ্বাসী না হইয়া নির্বিকার চিত্ত হইলেও মনকে মহাশক্তির সহিত নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। সে মু'মেনই হউক বা কাফেরই হউক, উহার আকর্ষণশক্তি সকলের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) মক্কায় অবস্থানের জন্য কাফেরেরা এই শর্তারোপ করিয়াছিল যে, তিনি কালামে মজীদ শব্দ করিয়া পড়িতে পারিবেন না। কাফেরদের নারীদের উপর ইহার খুব প্রভাব পড়িয়া থাকে। খোদার মহিমা, মূর্খ এবং হীন প্রকৃতির কাফের নারীর উপরও কালামে মজীদ নিজের প্রভাব বিস্তার করিত। অনেক মানুষ শুধু কোরআন শুনিয়াই ঈমান আনয়ন করিয়াছিল। ফলকথা, কোরআন আল্লাহ্‌র তাজাল্লী। তৎকালে আমরা তদুপযোগী ছিলাম বলিয়া তিনি কালামের মাধ্যমে আমাদিগকে নিজের জ্যোতি দেখাইয়াছিলেন। এখন হয়তো তিনি বলিতেছেনঃ

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل - هرکه دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

"ফুলের পাতায় সুগন্ধ লুক্কায়িত থাকার ন্যায় আমি কালামের আবরণে লুক্কায়িত রহিয়াছি; আমার দর্শনকারী আমাকে কালামের দর্পণে দর্শন করিতে পারে।" এই কবিতাটি শাহ্‌যাদী যেবুন্নেসার। এই কবিতাটি সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। ইরানের বাদশাহ্ কবি না হইলেও হঠাৎ অনিচ্ছাক্রমে در ابلق کسے کم دیده موجود এই পদটি তাঁহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। বাদশাহ্ ইরানের কবিদিগকে ইহার দ্বিতীয় পদ যোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কেহই তাহা পারিল না। তিনি হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌র নিকট লিখিলেন যে, তথাকার কবিদের ইহার দ্বিতীয় পদ সংযোগের অনুরোধ করা হউক। শাহ্‌যাদী যেবুন্নেসা বড় কবি ছিলেন। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন ঘটনাক্রমে প্রাতঃকালে তিনি চোখে সুরমা লাগাইতেছিলেন। কিছু সুরমা চোখের ভিতর প্রবেশ করিতেই সুরমামিশ্রিত এক বিন্দু চোখের পানি টপ্‌কাইয়া আয়নার উপর পড়িল। তৎক্ষণাৎ উক্ত কবিতার পদের দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল এবং তিনি উহার দ্বিতীয় পদ রচনা করিয়া ফেলিলেনঃ

در ابلق کسے کم دیده موجود - مگر اشک بتان سرمه الود

"রূপসী রমণীর সুরমাময় চক্ষু হইতে নির্ঝরিত সুরমামিশ্রিত অশ্রুবিন্দু ব্যতীত সাদা-কাল মিশ্রিত রং-এর মোতি কে দেখিয়াছে?" তিনি হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌কে খবর দিলেন; "শাহে ইরানকে লিখিয়া দিন—তাঁহার কবিতার দ্বিতীয় পদ পাওয়া গিয়াছে।" ইরানে ইহা পৌঁছিলে

তাঁহার বহু প্রশংসা করা হইয়াছিল। কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না যে, এই কবি একজন নারী। ইরানের বাদশাহ্‌ তথা হইতে কবির জন্য নানাবিধ পুরস্কার ও পোশাক হাদিয়া পাঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিলেন যে, কবিকে আমার দরবারে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌ যেবুন্নেসাকে বলিলেন, ইরানের বাদশাহ্‌ তোমাকে দাওয়াত জানাইয়াছেন। বল, আমি তাঁহাকে কি লিখিব। যেবুন্নেসা বলিলেনঃ "আপনি উত্তরে আমার পক্ষ হইতে এই কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়া দিন যে, কবি এই জবাব দিয়াছেনঃ

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل ـ هرکه دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

"আমি কথার পর্দায় এমনিভাবে আবৃত আছি যেমন ফুলের পাতার মধ্যে সুগন্ধ। আমার দর্শনকামী আমাকে কথার দর্পণে দর্শন করিতে পারে।"

ফলত কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং ইরানের শাহ্‌ বুঝিলেন, কবি একজন নারী। যাহাহউক, যেবুন্নেসা এই কবিতায় বলিয়াছেন, আমার দর্শনাভিলাষী আমাকে আমার বাক্যের মধ্যে দেখিতে পারে। তবে কি ইহা কখনও হইতে পারে যে, যেবুন্নেসার কালাম তাহার পরিচয় দিবে, আর আল্লাহ্‌র কালামের মধ্যে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইবে না? ইহা কখনও হইতে পারে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন এখন বলিতেছেন যে, কেহ আমাকে দেখিতে চাহিলে আমার কালামের মধ্যে আমাকে দেখিতে পারে। এই মর্মেই কবি বলিয়াছেনঃ

چیست قرآں اے کلام حق شناس ـ رو نمائے رب ناس آمد بناس

"কোরআন শরীফ কি? ইহা একটি দর্পণ, যাহাতে বান্দাগণ খোদার চেহারা দেখিতে পারে।"

বাস্তবিকই কোরআন শরীফ আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দর্শনের আয়না। আমার এই পূর্ণ বর্ণনার সার এই যে, কোরআন এক বিচিত্র বস্তু। আল্লাহ্‌ তা'আলার বিচিত্র, অভিনব, সুস্বাদু এবং রহস্যময় কালাম। ইহার গভীর তলদেশে পৌঁছা এবং ইহার সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করা মানব শক্তির বাহিরে। আপনাদের উচিত আল্লাহ্‌র এই সুমহান নেয়ামতের মর্যাদা দান করা। ইহা খুব মনোযোগের সহিত তেলাওয়াত করা, ইহার সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ হইতে ফায়দা হাসিল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। মর্মার্থ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করা এবং ইহার হেদায়ত অনুযায়ী আমল করা।

নশ্বরতা এবং অবিনশ্বরতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যকঃ এই একটি আয়াতই আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিয়া ইহার মতলব এবং ভাবার্থ বিস্তারিত বর্ণনা করিলাম। ইহা হইতে উপকার লাভ করা আপনাদের কর্তব্য। অর্থাৎ, আখেরাতের স্থায়িত্বে এবং দুনিয়ার অস্থায়িত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও আখেরাতের প্রতি মহব্বত পয়দা করা উচিত। ইহলোকের যে সমস্ত বস্তু আখেরাত হইতে গাফেল করিয়া দেয়, উহাকে মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করা এবং দুনিয়ার এই তুচ্ছ ফায়দা ও সামান্য আরামকে লক্ষ্যস্থল করিয়া লওয়া উচিত নহে।

মোটকথা, আখেরাতের স্থায়িত্বের ও দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অনিবার্য পরিণতি দুনিয়ার প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হওয়া। এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে দুনিয়াকে খেলাধুলা বলা হইয়াছেঃ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ দুনিয়ার স্বরূপকে যেন মাত্র দুইটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি لَهْوٌ (তামাশা) অপরটি لَعِبٌ (খেলা), এই দুইটি শব্দ বাহ্যদৃষ্টিতে সমার্থবোধক বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে কিছু ব্যবধান আছে। لعب، বলা হয়—অনর্থক কার্যকে, আর لهو বলে, আল্লাহ্‌ হইতে অমনোযোগীকারী কার্যকে। সারকথা এই

যে, দুনিয়ার মধ্যে দুই প্রকারের গুণ আছে। (১) অনর্থকতা। (২) এবং অমনোযোগী করা। প্রথমটিকে لعب এবং দ্বিতীয়টিকে لهو বলা হইয়াছে।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, দুনিয়ার সমস্ত অংশই যদি অনর্থক হয়, তবে খোদার সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই নিছক অনর্থক হইয়া পড়ে। অথচ খোদা তা'আলা নিছক অনর্থক এবং ফায়দাবিহীন এক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন মনে করা শুধু ধৃষ্টতাই নহে; বরং এক প্রকারের পাপও বটে। এতদ্ভিন্ন তিনি অন্য এক স্থানে বলিয়াছেনঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ ○

"তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি? এবং তোমরা আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে না?" এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণরূপে ভুল। অন্য এক আয়াতেও তিনি বলিয়াছেনঃ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا "হে আমাদের প্রভু! আপনি এই সমস্ত বস্তু অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই।"

ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন পদার্থই নিরর্থক এবং উদ্দেশ্যবিহীন নহে। অবশ্য কোন্ বস্তুর কি ফায়দা তাহা নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইহাতে ভুল হইতে পারে। প্রকাশ্যে আমরা দেখিতে পাই—দুনিয়া হইতে আমরা মূল্যবান ফায়দাও লাভ করিয়া থাকি। মানুষ সে সবের সাহায্যে নিজের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। অবশ্য এসমস্ত দুনিয়ার ফায়দা। দুনিয়ার যাবতীয় ফায়দার মধ্যে কতক ফায়দা প্রকৃতই হিতকর ছিল। আমরা সেসবের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করি নাই এবং কেবল নফ্‌সের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকারী বিষয়গুলির মধ্যেই দুনিয়ার ফায়দাকে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। যদিও এসমস্ত ফায়দাকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা, বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ ইহাতে শান্তি পায়, উপকারও লাভ করে। কিন্তু ইহাতে সে যে পরলোকের বিরাট প্রাপ্য, অতি গুরুত্বপূর্ণ লাভ এবং মূল্যবান ফায়দা হইতে বঞ্চিত হইতেছে, সে কথা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি এবং এই ভুলের কারণেই আমরা কেবল এমন স্বার্থই উপভোগ করিয়া থাকি, যাহা মাত্র কয়েক দিনের জন্য নফ্‌সের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া থাকে, সত্যিকারের মক্‌সূদ এবং উহার সর্বাধিক উপকারিতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখে।

এই দুনিয়ার ভোগ-বিলাস এবং চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহকেই ফায়দা ও লাভ সাব্যস্ত করা এবং উহাতেই তৃপ্ত থাকার দৃষ্টান্ত অবিকল ঐ ব্যক্তিরই ন্যায়, যে ব্যক্তি রেলগাড়ীতে কোন দূর-দূরান্তের পথ সফর করিতেছে। পথে কোন স্থানে টেলিফোনের রিং শুনিয়া তথায় যাইয়া দাঁড়াইল এবং খুব মজার সহিত উক্ত রিং-এর আওয়ায শুনিতে ও বাজাইতে লাগিল। এদিকে গাড়ী ছাড়ার পথে। ইঞ্জিন হুইসেল বাজাইতেছে। এমন সময়ে যদি তাহাকে বলা হয়, ওহে পথিক—গাড়ী ছাড়িতেছে, হুইসেল বাজিতেছে। তখন সে বলে—বন্ধু, ইহার টন্ টন্ আওয়ায আমার নিকট খুব ভাল লাগিতেছে। আমি তো ইহা ছাড়িয়া যাইতে পারি না। গাড়ী ছাড়িয়া যাউক বা থাকুক, তাতে কোন পরোয়া নাই।

অতএব, এই পথিককে উক্ত রিং-এর আওয়ায ও উহার স্বাদ যেমন মোহিত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার সফব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আপনারাও যদি দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে এবং চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহে মজিয়া থাকেন, তবে আপনাদের পরিণামও তাহাই হইবে। আসল উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া কোন বড় প্রাপ্য লাভ করিতে পারিবেন না।

অতএব, দেখুন, যদিও দুনিয়াতে শান্তি লাভ করা এবং মন সন্তুষ্ট হওয়া লাভের তালিকাভুক্ত। কিন্তু তথাপি তাহা কত বড় ক্ষতিকর প্রমাণিত হইল। কেননা, ইহা এক অতি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান লাভ হইতে গাফেল করিয়া দিল।

দুনিয়ার কোন পদার্থই অনর্থক নহেঃ এইরূপে দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুই মূলত সুবিধা এবং লাভে পরিপূর্ণ। কোন বস্তুই নিরর্থক এবং অকারণ নহে। কিন্তু যখন উহা প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হইয়া যায়, তখন এই লাভও—যাহাকে আমরা দুনিয়ার যাবতীয় ফায়দার মূলাধার মনে করিয়া রাখিয়াছি এবং খুব সম্মানের চক্ষে দেখিতেছি, ঐ সমুদয়কেই খেল-তামাশা বলা হইবে। অর্থাৎ, যেই আকারে আপনারা লাভ ও স্বার্থের পাছে দুনিয়া লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন. এমতাবস্থায় দুনিয়া আপনাদের জন্য খেল-তামাশার অধিক কিছুই নহে। যদিচ মূলত উহাতে বহু সুবিধা এবং লাভও রহিয়াছে; কিন্তু সেই লাভ এমন বিশেষ কিছু নহে, যাহাতে মগ্ন হইয়া আখেরাতের লাভ এবং স্বার্থ ভুলিয়া থাকিতে পারেন।

সারকথা এই যে, প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এবং লাভের জন্য দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, ঐ সমুদয় লাভ-স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হইয়াছে, দুনিয়ার কোন বস্তুই নিরর্থক এবং উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিন্তু প্রবৃত্তির বশীভূত লোকেরা যে সমস্ত মনগড়া লাভ-স্বার্থ ও উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইয়াছে, অথচ তাহা বাস্তবিকপক্ষে ক্ষতিকর, তৎসমুদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু খেল-তামাশা। যাহাহউক, দুনিয়া যদি আখেরাতের প্রতি অমনোযোগিতা ও বিরাগের কারণ হয়, তবে দুনিয়া খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন, ইহার বিপরীতপক্ষে বলা হইয়াছে— وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ অর্থাৎ, একদিকে দুনিয়াকে বলিয়াছেন খেল-তামাশা, অপর দিকে আখেরাতকে বলিয়াছেন জীবন। কেননা, পরিণাম ফলের বিবেচনায় খেল-তামাশা মৃত্যুর সমতুল্য। বস্তুত ফলের মৃত্যু মূলের মৃত্যুর পরিচায়ক। পক্ষান্তরে আখেরাতকে জীবিত বলা হইয়াছে, উহার ফল চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। আর ফলের জীবন মূলের জীবনের পরিচায়ক। সুতরাং আখেরাত নিজেও জীবিত। বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার লাভ-স্বার্থসমূহ অস্থায়ী এবং মৃতই বটে। অতএব, আমরা জীবিত লাভ-স্বার্থ ছাড়িয়া মৃত ফায়দা নিয়া কি করিব? উপকারী বস্তুকে ছাড়িয়া নিরর্থক বস্তুর পাছে লাগা বোকামি বই আর কি? এই জন্যই সম্মুখের দিকে বলিতেছেন, لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ "আহা! ইহারা যদি নিজেদের ধর্মীয় লাভ-স্বার্থ অনুভব করিতে পারিত, দুনিয়াবী ক্ষতি জানিতে পারিত এবং দুনিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকে ক্ষতিকর এবং আখেরাত ও তৎসম্পর্কিত সবকিছুকে হিতকর ও শান্তিদায়ক মনে করিত!"

এখানে لو, অব্যয়টি ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা কখনও কখনও আকাঙ্ক্ষার অর্থেও আসে। এস্থলে আকাঙ্ক্ষার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে চরম পর্যায়ের দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। যেমন, কোন স্নেহময় পিতা নিজ পুত্রের সহিত স্নেহসূচক কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। স্নেহপরবশ হইয়া পুত্রের সহিত নিজেও তোত্‌লা সাজেন। উপমা নহে, এইরূপে খোদা তা'আলার সত্তার পক্ষে কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী হওয়া অসম্ভব এবং তাঁহার প্রবল প্রতাপ ও অপার মহিমার বিপরীত। কেননা, আকাঙ্ক্ষা এমন বস্তুরই করা হয়, যাহা সাধারণত লাভ করা যায় না এবং উহার প্রয়োজনও আছে। অথচ খোদা তা'আলা মহাশক্তিমান ও চিরস্থায়ী, যাবতীয় বস্তুর মালিক। তাঁহার জন্য দুর্লভ কিছুই নহে। দ্বিতীয়ত, তিনি কোনকিছু লাভ করার মুখাপেক্ষীও নহেন। তবে তিনি আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বীয় বান্দাগণের মনসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহাদের রুচি

অনুযায়ী তাহাদের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য শুধু তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া। বুঝাইয়া দেওয়ার দুইটি উপায় ছিল। (১) বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ হওয়া। (২) বান্দা যেহেতু যোগ্যতার অভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ হইতে পারে না, কাজেই বান্দার খাতিরে আল্লাহ্ বান্দার অনুরূপ হওয়া। এই কারণেই কোরআনের যে সমস্ত স্থানে আশা-আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক শব্দ আসিয়াছে, তথায় প্রকৃতই আল্লাহ্‌র আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য নহে। এইরূপে যে সমস্ত জায়গায় বিস্ময়জ্ঞাপক শব্দ আসিয়াছে, সেখানেও প্রকৃত বিস্ময় উদ্দেশ্য নহে। অর্থাৎ, খোদা তা'আলা কোন ব্যাপারে বিস্মিত হন না। কেননা, বিস্ময়জনক বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলেই জ্ঞানলাভের পর বিস্ময় আসে। যেমন, কোন ব্যক্তির জানা ছিল না যে, তাহার ভাই আসিবে। ঘটনাক্রমে কোন সংবাদ প্রদান ব্যতীত আসিয়া পড়িলে বিস্ময়বোধ করে। বলে, হাঁ! তুমি কেমন করিয়া আসিয়া গেলে! মোটকথা, বিস্ময়ের জন্য সর্বদা অজ্ঞ থাকা অনিবার্য। অথচ খোদা তা'আলা তাহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁহার জ্ঞান সৃষ্ট জগতের যাবতীয় বিষয় এবং বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং কোন বিষয় কিংবা ঘটনা তাঁহার পক্ষে পেরেশানী কিংবা বিস্ময়ের কারণ হইতে পারে না; বরং বিস্ময়বোধক শব্দে উদ্দেশ্য হয় বিস্মিত করা—বিস্মিত হওয়া নহে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেনঃ এই বিষয়টির জন্য তোমাদের বিস্মিত এবং পেরেশান হওয়া উচিত। আমি কি বিস্মিত হইব? আমার দৃষ্টিতে কোন বিষয়ই বিস্ময়কর নহে। এইরূপে আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারও। "আমার নিকট কোন কিছুরই অভাব নাই, সমগ্র জগৎ আমার সৃষ্ট এবং অধীন। অতএব, আমি কি আকাঙ্ক্ষা করিব! তবে হাঁ, নিঃসন্দেহ, এই বিষয়টি তোমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার যোগ্য বটে।"

আল্লাহ্! আল্লাহ্!! আল্লাহ্‌র কি শান! কেমন তাঁহার দয়া! যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বান্দা এত অনুভূতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, নিজেদের ক্ষতিকর এবং লাভজনক বস্তুরও আশা-আকাঙ্ক্ষা করে না। তখন নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিজে আকাঙ্ক্ষী সাজিয়া সচেতন করিয়া দিলেন যে, এই বিষয়টি তোমাদের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী। যেমন, একজন স্নেহশীল পিতা বলেনঃ "আহা! যদি আমার পুত্র পড়াশুনা করিত।" অথচ পুত্র পড়াশুনা করিলে পিতার কোন লাভ হইত না। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমার পুত্র বুঝুক যে, পড়াশুনাও আকাঙ্ক্ষা করার উপযোগী বস্তু বটে।

এইরূপে আমরা যদি আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান লাভ করি, তবে কি ধারণা করা যাইতে পারে যে, আমাদের এই জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কোনরূপ লাভবান হইবেন? (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলার কোন লাভ নাই। শুধু আমাদেরই লাভ।

আল্লাহ্ তা'আলার অভাবশূন্যতার স্বরূপঃ আমি যে আল্লাহ্ তা'আলাকে অভাবশূন্য বলিলাম, এই অভাবশূন্যতার অর্থ বেপরোয়াভাব নহে; যেমন, মূর্খেরা তাহা মনে করিয়া থাকে। কি নিকৃষ্ট অর্থ—কোন যুবক মানুষ দুই-চারিটি সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে যেখানেই দুই-চারি জন একত্রিত হয়, এইরূপে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করে। কেহ বলে, "আহা! কেমন যুবক অবস্থায় মরিল!" আর একজন বলেঃ "হাঁ ভাই, কেমন ছোট ছোট সন্তানগুলি রাখিয়া মরিয়াছে। নিরীহ বেচারাগণ অভিভাবকশূন্যই রহিয়া গেল।" তৃতীয় জন বলেঃ "হাঁ মিঞা! আল্লাহ্ পাক বড়ই বেপরোয়া। যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, সেখানে টুঁশব্দটি করিবার জো নাই।" খোদার গযব! এই ক্ষেত্রে বেপরোয়া শব্দের অর্থ ইহাছাড়া আর কি হইবে যে, লোকে মনে করে, (নাউযুবিল্লাহ্)

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণের সুবিধা-সুযোগের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন না। বান্দার অবস্থার প্রতি তিনি একদম অমনোযোগী এবং বেপরোয়া। তাঁহার নিকট কোনই সু-বিধান নাই। দেখুন, ইহা কত বড় বেআদবী! আপনি আপনার গোলামকে জোলাব খাওয়াইয়া তাহার সুবিধার্থে গৃহবাসীদের হইতে পৃথক নির্জন স্থানে রাখিয়াছেন, যেন কোলাহল হইতে পৃথক থাকিয়া একাগ্র মনে অনিষ্টকর পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অথচ ইহা দেখিয়া কোন সমালোচক যদি বলে, দেখ, কেমন বেপরোয়া লোক! নিরীহ গোলামটিকে ঘরের বাহিরে নির্জনে রাখিয়াছে, তাহার এরূপ মন্তব্যে কি আপনি বলিবেন না যে, মিঞা! আমি তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহাকে ঘরের বাহিরে পৃথক নির্জনে রাখিয়াছি? একটু পরেই আবার আমাদের সঙ্গে বাস করিবে।

অতএব, দেখুন, আপনিও আপনার ব্যবহার সম্বন্ধে এতটুকু মন্তব্যই নাপছন্দ করিলেন। যে খোদা সর্বদা নিজের বান্দাগণের অবাধ্যতা এবং নাফরমানী সত্ত্বেও তাহাদের মঙ্গল ও শান্তির ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তাহাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের দয়া ও অনুগ্রহ করিতেছেন, তিনি কি বান্দার এরূপ কৃতঘ্নতা ও বাড়াবাড়ি নাপছন্দ করিবেন না? তুমি কি জান? যাহাকে তুমি অমনোযোগিতা ও বেপরোয়াভাব মনে করিতেছ, উহাই হয়তো তাহার প্রতি প্রত্যক্ষ মনোযোগ হইতে পারে। আল্লাহ্‌র হেকমত কেহ জানিতে পারে না।

মোটকথা, اِسْتِغْنَاءٌ -এর অর্থ লক্ষ্যহীনতা এবং বেপরোয়াভাব মনে করা মহাভুল। এই ভুলের মূল কারণ শুধু এই যে, اِسْتِغْنَاءٌ শব্দটি আরবী ও উর্দু উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরবী ভাষায় ইহার অর্থ শুধু অমুখাপেক্ষী। এই অর্থে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর অন্যতম। আর উর্দু ভাষায় ইহার অর্থ বেপরোয়াভাব, অমনোযোগ ও লক্ষ্যহীনতা। আপনারা কোরআন শরীফে غَنِىٌّ এবং اِسْتَغْنَى اللّٰهُ প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া উর্দু ভাষার প্রচলিত অর্থ অনুসারে ইহার অনুবাদ করিয়া লইয়াছেন এবং লোকে اِسْتِغْنَاءٌ অর্থ বেপরোয়াভাব এবং লক্ষ্যহীনতা বুঝিয়া বসিয়াছে, কিন্তু ইহা ভুল। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে যেমন غَنِىٌّ حَمِيْدٌ বলিয়াছেন, তদ্রূপ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ও বলিয়াছেন। যদি غَنِىٌّ শব্দের অর্থ বেপরোয়া, লক্ষ্যহীন ও বিশৃঙ্খল বলা হয়, তবে رَءُوْفٌ -এর কি অর্থ হইবে? رافة এবং بے پروائی -এর মধ্যে তো বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, رافة শব্দের অর্থ চরম অনুগ্রহ এবং দয়া; আর بے پروائی এবং অমনোযোগিতা ও লক্ষ্যহীনতা নিষ্ঠুর এবং অবিচারক লোকের কাজ। সুতরাং বুঝা গেল, اِسْتِغْنَاءٌ -এর অর্থ বেপরোয়াভাব নহে; বরং খোদার اِسْتِغْنَاءٌ -এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ মানুষের কাজের মুখাপেক্ষী নহেন। সুতরাং তাহাদের কাজ তাঁহার কোন হিতও করিতে পারে না, অহিতও করিতে পারে না। তোমরাও আল্লাহ্‌র কোন উপকার বা অপকার করিতে পার না।

যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসী হইতে অভাবশূন্য" আয়াতের সঙ্গে বলিয়াছেন, مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ "যে কেহ পরিশ্রম সহকারে নেক আমল করে সে নিজের লাভের জন্যই করিয়া থাকে।" এইরূপে আরও বলিয়াছেনঃ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ "তোমরা যদি কুফরী কর, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন।" ইহাতে বলা যায়, যে ব্যক্তি 'শেরেকী' করে সে নিজেকেই ক্ষতি ও অপমানের গহ্বরে নিক্ষেপ করে এবং দোযখের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যায়। তিনি যেমন মানুষের নেক আমলের মুখাপেক্ষী নহেন, তদ্রূপ তাহাদের কুফরী এবং শেরেকীও তাঁহার ক্ষতির কারণ নহে। ইহাই استغناء -এর অর্থ। আপনি যদি বলেন, মাতৃহারা ছোট ছোট শিশুর পিতারও

যখন রূহ্ কবয করিয়া লন, আমার বুঝে আসে না, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার চরম অনুগ্রহ কিরূপে হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অধিক বিশৃঙ্খলা এবং লক্ষ্যহীনতা, দয়াহীনতা কি হইতে পারে?

মিঞা, আপনার এমন বুদ্ধির প্রতি আফসোস! আপনি কি জানেন? প্রকৃতপক্ষে এই শিশুরাও তাঁহারই, তাহাদের পিতাও তাঁহারই। উভয়েই তাঁহারই স্বত্বাধীন। তাহাদের সুবিধার চিন্তা আপনি অধিক করিতে পারেন, না তিনি? তিনি তাহাদের পিতাকে যেমন লালন-পালন করিয়া এত বয়স্ক করিয়াছেন, শিশুদিগকেও প্রতিপালন করিয়া বড় করিতে পারিবেন। তুমি তাহাদের কে? মধ্যস্থলে আসিয়া হস্তক্ষেপ এবং মন্তব্য করিতেছ? কি সাংঘাতিক হঠকারিতা! মানুষ কেমন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার অমনোযোগিতা ও দয়াহীনতা প্রমাণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে? অথচ সেই দরবারের নিয়ম এই যে, তাঁহার জন্য পূর্ণতাসূচক কোন গুণ প্রমাণ করিতেও প্রয়োগবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। তাঁহার গুণ-গান এবং প্রশংসার ক্ষেত্রেও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য খুব কড়া নির্দেশ রহিয়াছে।

কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছিলেনঃ বৃষ্টি হইতে লাগিল। তীব্র গরম পড়িতেছিল। মানুষ পানির জন্য ব্যাকুল ছিল। এমন সময়ে বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই অকস্মাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, সোব্‌হানাল্লাহ্! আজ কেমন উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র দরবার হইতে ধমক আসিল, বেআদব? কোন্ দিন অনুপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হইয়াছে যে, কেবল আজই তুমি উপযুক্ত সময় দেখিলে? মোটকথা, সেই দরবারে কোন পূর্ণতা গুণারোপেও প্রয়োগবিধির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সত্য কথা এই যে, আমরা তো কোন প্রকারেই তাঁহার প্রশংসা করিতে পারি না। ইহাও তাঁহার অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি প্রশংসার নিয়মও আমাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছেন। অন্যথায় আমাদের প্রশংসার স্বরূপ তো এইঃ

شاہ را گوید کسے جولا یہ نیست – ایں نہ مدح ست او مگر آگاہ نیست

"কেহ বাদশাহ্‌র উদ্দেশে বলে, ইনি জোলা নহেন। ইহা প্রশংসা হইল না। কিন্তু তাহার চৈতন্য নাই।"

বন্ধুগণ! উক্ত বুযুর্গ লোক প্রশংসাই করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কার-বর্জিত বেমানান শব্দ প্রয়োগের দরুনই ধমক দেওয়া হইয়াছিল। সেই দরবারে খুব সাবধানতার সহিত পা রাখিতে হয়। বাস্তবিক, কতক শব্দ এমন আছে, যাহা প্রকাশ্যে তেমন কর্কশ মনে হয় না, কিন্তু কখনও স্থানোচিত না হওয়ার কারণে এবং কখনও সম্বোধিত জনের মর্যাদানুরূপ না হওয়ায় তাহা বেআদবী ও অশিষ্টাচারের মধ্যে গণ্য হয়। বস্তুত উক্ত বুযুর্গ লোককেও কেবল 'আজ' শব্দটির জন্য এমন কঠিন ধমক দেওয়া হইয়াছিল। অথচ আমাদের ধারণায় এই শব্দটির মধ্যে বেআদবীর কিছুই ছিল না।

অতএব, যখন একটুখানি নিয়ম পরিবর্তনে এবং শব্দ বেমানান হওয়ার কারণে এমন ধমক দেওয়া হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কোন দোষারোপের জন্য যতই ধমক দেওয়া হউক, তাহা খুবই কম হইবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার শানে ত্রুটি বাহির করা বড় অপরাধ এবং ভীষণ বেআদবী। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বলিয়া ফেলে, "নিন্, সামান্য একটি কথার উপর কেমন কঠিন ধমক দেওয়া হইল। এমন কি-ইবা জঘন্য কথা ছিল?" অথচ তাহারা চিন্তা করিয়া কাজ করে না। অন্যথায় তাহারা বুঝিতে পারিত যে, তাহাদের এরূপ উক্তিও মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা,

এসমস্ত উক্তি সামান্য নহে। ইহা সেই শ্রেণীর কথা—আমাদের কথাবার্তায়ও আমরা এই জাতীয় কথার প্রতিবাদ করিয়া থাকি।

মনে করুন, আপনি প্রত্যহ ঠিক সময়ে অফিসে যান। একদিন যদি আপনার অফিসার আপনাকে বলেনঃ "আজ তো আপনি খুব ঠিক সময়ে অফিসে আসিয়াছেন।" তবে আপনার নিকট কেমন খারাপ বোধ হইবে। আপনি মনে করিবেন, "আমি প্রত্যেক দিনই তো ঠিক সময়েই আসিয়া থাকি। তিনি বলিলেন যে, আমি আজ খুব ঠিক সময়ে আসিয়াছি। আমি যেন আর কোন দিন সময়মত আসিই নাই।"

এইরূপ কোন প্রভু যদি তাহার চাকরকে কোন কাজের জন্য পাঠান, সে কাজ করিয়া আসিলে যদি তিনি তাহাকে বলেনঃ "আজ তো খুব কাজ করিয়াছ।" আপনিই বুঝিতে পারেন, উক্ত চাকরের মনে কেমন কষ্ট হইবে।

অতএব, আমাদের যখন এই অবস্থা—এই শ্রেণীর কথায় মনে কষ্ট পাই, এই শ্রেণীর শব্দ এমন কষ্টদায়ক হয়, তবে এই জাতীয় শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় কেন হইবে না? তাঁহার নিকট এরূপ কথা অপরাধ কেন হইবে না? যদিও আমরা জানি যে, 'আজ' শব্দটি এরূপ ক্ষেত্রে অনিচ্ছাক্রমে হঠাৎও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তথাপি যেহেতু শব্দটি অশোভনীয়, কাজেই এসমস্ত শব্দ মনে বিঁধে। সামান্য মানুষেরই যখন এরূপ অবস্থা, তখন আহ্‌কামুল হাকেমীনের দরবারের কি অবস্থা হইবে, সহজেই অনুমেয়।

لو, অব্যয়টি প্রসঙ্গে এত কথা বলিয়া ফেলিলাম। অর্থাৎ, এস্থলে আকাঙ্ক্ষাসূচক অব্যয় ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এমন দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে যে, আমাদের জ্ঞান লাভ করাতে তাঁহার কোন লাভ নাই। তথাপি আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক অব্যয়ের সহিত উহা প্রকাশ করিয়াছেন।

দুনিয়া ও আখেরাতের স্বরূপ বুঝাঃ এখন كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন। কোরআন শরীফের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিষয়গুলি কেমন বিচিত্র। প্রত্যেকটি শব্দে এল্‌মের সমুদ্র। এই আয়াতে لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ বাক্যের দ্বারা একটি সূক্ষ্ম ও মনোরম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, দুনিয়ার লোক দুনিয়ার অন্বেষণে এত মশ্‌গুল হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে তো অজ্ঞ আছেই, দুনিয়া সম্বন্ধেও অজ্ঞ। এই জন্য এক আয়াতে আখেরাতের সাথে দুনিয়ার স্বরূপ চিনিয়া লওয়ার প্রতিও উৎসাহিত করা হইয়াছে।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটিকে এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিয়াছেন, যেন তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের স্বরূপ সম্বন্ধে খুব গভীরভাবে চিন্তা কর।" ইহাতে বুঝা যায়, যে দুনিয়ার জন্য তোমরা প্রাণপাত করিতেছ, তাহা তামাশা মাত্র। তোমরা উহার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ। আস, উহার স্বরূপ আমার নিকট হইতে শুনিয়া লও, উহার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং উহার সুন্দর ও প্রশংসনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা কর তৎসঙ্গে আখেরাতের তথ্যও অবগত হও, যাহার প্রতি তোমাদের আদৌ মনোযোগ নাই । অতঃপর দেখ, এখন পর্যন্ত তোমরা এমন উপকারী ও লাভজনক বস্তু হইতে অমনোযোগী ছিলে এবং এক অনর্থক ও বেদরকারী বস্তুর পশ্চাতে ঘুরিতেছিলে। অতএব, এখন দুনিয়ার মোহ ত্যাগ কর ও উহার চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহে পদাঘাত কর এবং চিরস্থায়ী বস্তু আখেরাতের প্রতি আগ্রহশীল হও। তথা পর্যন্ত পৌঁছিবার চেষ্টায় লাগিয়া যাও।

এই কারণে لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ বলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার স্বরূপ বলিয়া দেওয়ার মধ্যে এক উপকারিতা ইহাও আছে যে, প্রত্যেক বস্তুকে উহার বিপরীতের সাহায্যে উত্তমরূপে জানা যায়। অর্থাৎ, দুনিয়ার স্বরূপ ভালরূপে জানিতে পারিলেই তোমরা আখেরাতের স্বরূপ পূর্ণ ও বিস্তারিতরূপে অবগত হইতে পারিবে।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি বোরকা পরিহিতা একজন বিশ্রী রমণীকে দেখিল এবং তাহার বাহ্যিক সুডৌল গঠন ও চলার ভঙ্গি দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। এখন তাহার আসক্তি নিবারণ করার এক কার্যকরী উপায় এই হইতে পারে যে, তাহাকে বিবাহ করাইয়া বোরকা পরিহিতা রমণী অপেক্ষা বহুগুণে অধিক সুন্দরী নববিবাহিতা বধূর চেহারা দেখাইয়া দেওয়া হয়। তদ্রূপ উক্ত উপায়কে পরিপূর্ণ করার জন্য ইহাও উত্তম উপায় যে, বোরকা মুক্ত করিয়া সেই বিশ্রী রমণীর কদর্য চেহারাও তাহাকে দেখান হয়। তখন তাহার এই অনুভূতি জন্মিবে যে, ইহার তুলনায় আমার স্ত্রী বহুগুণে সুন্দরী ও সুশ্রী। অন্যথায় বিবাহের পরেও তাহার এই সন্দেহ থাকিয়া যাইবে যে, না জানি সেই বোরকা পরিহিতার বিশ্বদাহী সৌন্দর্যের কি অবস্থা! মোটকথা, বোরকাবৃতা থাকা পর্যন্ত সেই রমণীর প্রতি তাহার আসক্তির মূল পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইবে না। অথচ বোরকা উঠাইতেই উক্ত রমণীর সৌন্দর্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে। অতঃপর তাহার প্রতি আসক্তির পরিবর্তে ঘৃণা এবং মহব্বতের পরিবর্তে বিরক্তি আসিয়া পড়িবে। এইরূপে আখেরাতরূপী নববধূর মূল্য তখনই হইবে যখন এই ডাইনী দুনিয়ার ঘৃণিত আকৃতিও ভালরূপে দেখিতে পাইবে এবং ইহার কদর্যতা জানিতে পারিবে। যদি দুনিয়ার কৃত্রিম রূপ খুলিয়া দেখান না হইত এবং শুধু আখেরাতের সৌন্দর্যই বর্ণনা করা হইত, তবে আখেরাতের এত গুরুত্ব হইত না এবং দুনিয়ার খেয়াল অন্তর হইতে দূর হইত না। এই কারণেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও ইহার অনিষ্টকারিতার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন এবং আখেরাত ও উহার লাভ এবং উপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার ফলে দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হইতে পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া উহাতে আখেরাতের অনুরাগ জন্মে। ইহাও আল্লাহ্ তা'আলার খাছ অনুগ্রহ এবং রহমত। তিনি শুধু আমাদের হিতের জন্য এই ঘৃণিত দুনিয়ারও উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ বাহ্যদৃষ্টিতে অনুপম কালামের মধ্যে ঘৃণিত পদার্থের উল্লেখ থাকা জ্ঞানের বাহিরে এবং অযৌক্তিক।

এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী মনে পড়িয়াছে। একবার হযরত রাবেয়া বছরীর (রঃ) দরবারে কয়েকজন বুযুর্গ লোক দুনিয়ার নিন্দাবাদ এবং ইহার দোষ-ত্রুটির কথা বর্ণনা করিতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেনঃ قُوْمُوْا عَنِّیْ فَاِنَّكُمْ تُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا "তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও। তোমরা দুনিয়াকে ভালবাস।" তাঁহারা বলিলেনঃ "আমরা তো দুনিয়ার নিন্দাই করিতেছি।" তিনি বলিলেনঃ مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ "দুনিয়ার আলোচনায় তোমাদের মশ্‌গুল হওয়া, যদিও নিন্দার আকারে হইয়া থাকে, ইহা অনুরাগেরই লক্ষণ।" কেহ কোন যালেম বাদশাহ্‌র সহিত কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকিলে তাহার আলোচনা করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে কোন চামারের সঙ্গে তাহা করিলে কখনও আলোচনা করে না। ইহার কারণ এই যে, বাদ্‌শাহ্‌কে প্রতাপশালী মনে করিয়া তাহার সহিত বীরোচিত কথাবার্তা বলাকে গৌরবের বিষয় মনে করে। সুতরাং তাহা লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায়। পক্ষান্তরে চামারের বেলায় তাহা করে না। বুঝা গেল, নিন্দাবাদও মর্যাদাসম্পন্ন বস্তুরই করা হয়। এইরূপে দুনিয়ার নিন্দা করিয়া বেড়াইলে

প্রকারান্তরে ইহাই প্রকাশ পায় যে, "আমরা দুনিয়ার ন্যায় শ্রেষ্ঠ বস্তুর নিন্দাবাদ করিতেছি।" দুনিয়ার শ্রেষ্ঠত্বকে মনে স্থান দেওয়ার অর্থই হইতেছে দুনিয়াকে ভালবাসা।

দেখুন, ওলীআল্লাগণের দরবারেও এই ঘৃণিত দুনিয়ার আলোচনা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলার কালামে ইহার আলোচনা তো আরও অসঙ্গত হওয়ার কথা। তথাপি আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। বলিয়া দেওয়া ব্যতীত আমরা ইহার স্বরূপ জানিতে পারি না। প্রতিমার দৃষ্টান্ত বর্ণনার উদ্দেশ্যে যেমন মাছি-মশার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর উল্লেখ কোরআন শরীফে করা হইয়াছে, তদ্রূপ নিন্দা ও ঘৃণা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঘৃণিত দুনিয়ারও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাচাই করিয়া দেখার উদ্দেশ্যে বিপরীত পথে আখেরাত সম্বন্ধেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

এখানে কেহ যদি প্রশ্ন করে যে, খোদা তা'আলা দুনিয়ার উল্লেখ করার পশ্চাতে যেমন একটি যুক্তি দেখান হইল, তদ্রূপ রাবেয়া বছরী উক্ত বুযুর্গ লোকদের দুনিয়ার আলোচনাকে এই যুক্তি অনুসারে সঙ্গত মনে করিলেন না কেন? তবে উত্তর এই দেওয়া হইবে যে, কোরআনে দুনিয়ার উল্লেখের এই যুক্তি তো স্পষ্ট কথা। কেননা, আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বুযুর্গদের কথায় এই যুক্তি না থাকার কারণ এই যে, তাঁহাদের নিকট দুনিয়াদার কেহ ছিল না, যাহাদের মনে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বিরাগ উৎপাদন উদ্দেশ্য হইত। সুতরাং তাঁহাদের দুনিয়া সম্বন্ধে আলোচনার অর্থ হইবে তাঁহারা দুনিয়াকে বড় বস্তু মনে করিয়া উহা বর্জন করার জন্য গৌরব প্রকাশ করিতেছেন। যেমন, কোন দরবেশ দরবেশী প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন দরবেশী কাজের বর্ণনা করিয়া থাকেন। যেমন বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এত এত টাকা লইয়া আসিয়াছিল। আমি এক কপর্দকও গ্রহণ করি নাই, সমস্তই ফিরাইয়া দিয়াছি। ইহা বড় রকমের পদস্খলন। ইত্যাকার পদস্খলন অনুভবও করা যায় না।

এক বুযুর্গ লোক অপর এক বুযুর্গ লোকের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। গৃহস্বামী তাঁহার চাকরকে নির্দেশ দিলেন, আমি দ্বিতীয় হজ্জের সময় যেই সোরাহীটি মক্কা শরীফ হইতে আনিয়াছি, মেহ্‌মানকে উহাতে পানি দিও। মেহ্‌মান বলিলেনঃ "তুমি রিয়াজনক কথা দ্বারা তোমার উভয় হজ্জের সওয়াব নষ্ট করিয়া দিলে।"

পদস্খলন সকলেরই হইয়া থাকে। কেননা, ফেরেশ্‌তা ও নবী ছাড়া আর কেহই নিষ্পাপ নহে। কিন্তু পদস্খলন উপলব্ধি করিতে পারাও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মঞ্জিল। এমন অতি অল্প লোকই আছে যাহারা নিজের পদস্খলন সম্বন্ধে অবহিত হয়। সুতরাং রাবেয়া বছরী (রঃ)-এর দরবারস্থ উক্ত বুযুর্গ লোকগণ এই রোগেই হয়তো আক্রান্ত ছিলেন, তাহাতে বিচিত্র কি? এই কারণেই তাঁহাদের মুখ হইতে দুনিয়ার নিন্দা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং হযরত রাবেয়া বছরী (রঃ) তাঁহাদের রোগ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে ঘৃণিত বস্তুর আলোচনায় অন্তরে সঙ্কীর্ণতা আসিতে পারে আশঙ্কায় তিনি শয়তানের প্রতিও লা'নত করিতেন না। এতক্ষণ শয়তানের পাছে পড়িয়া কে সময় নষ্ট করিতে যাইবে? ততক্ষণ মাহ্‌বুবের যেকের কেন করি না এবং ইহাও ভাবিতেন যে, শয়তানকে লা'নত না করিলেও জবাবদিহি করিতে হইবে না। কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদও হইবে না, কিন্তু মাহ্‌বুবের যেকের না করিলে উহার হিসাব-নিকাশ হইবে। সারকথা এই যে, যতক্ষণ আমি শয়তানের উপর লা'নত করিব, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র যেকেরে সময় কাটানই উত্তম হইবে, তাহাতে খোদার দরবারে হিসাব-নিকাশ হইতে অব্যাহতি পাইব। ইহাও সম্ভব যে, এইরূপে তিনি উক্ত বুযুর্গ লোকদিগকে

দুনিয়ার আলোচনা করা হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতে তত ফায়দা নাই, আল্লাহ্‌র যেকেরে যত ফায়দা আছে। কাজেই বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ?

অতএব, খোদার প্রিয় বান্দারা যখন দুনিয়াকে এত ঘৃণিত মনে করেন যে, নিজেদের মজলিসে ইহার আলোচনাও পছন্দ করেন না। নাম লওয়াও সময় নষ্ট হওয়ার কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন, তখন ইহা আল্লাহ্‌র কালামে আলোচিত হওয়ার যোগ্য কেমন করিয়া হইবে? তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার আলোচনা করিয়াছেন, যাহাতে আমাদের চেতনা হয় এবং আমরা সতর্ক হই। ইহা তাঁহার পূর্ণ অনুগ্রহ যে, স্বীয় বান্দাগণের জন্য একটি ঘৃণিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মোটকথা, ছোট একটি আয়াত, অথচ তাহাতে কত রকমের দয়া এবং অনুগ্রহ রহিয়াছে। প্রত্যেকটি অংশ দ্বারাই আমাদিগকে সচেতন এবং সতর্ক করিয়াছেন।

নফ্‌সকে পবিত্র করিবার উপায়ঃ উপরোল্লিখিত পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, শুধু দুইটি বস্তুকে সর্বদা নিজের লক্ষ্যস্থল করিয়া রাখ। প্রথমত, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব স্মরণে রাখিয়া উহার প্রতি মনের অসন্তোষ উৎপাদন। দ্বিতীয়ত, আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিয়া উহা লাভ করার উপায় অন্বেষণ। সাধারণভাবে দুনিয়ার অস্থায়িত্ব স্মরণ রাখাও প্রতি মুহূর্তের ওযীফাবিশেষ। কিন্তু বিশেষভাবে স্মরণ করার জন্যও প্রতিদিন অন্তত একবার অবশ্যই একটি সময় নির্ধারিত করিয়া লওয়া উচিত। তাহা এইরূপে করিবে—প্রত্যহ ঘুমাইবার উদ্দেশ্যে যখন বিছানায় শয়ন করিবে, তখন নিজের সারাদিনের ভাল-মন্দ কার্যসমূহ, এবাদত এবং নাফরমানীকে সম্মুখে রাখিয়া তন্মধ্য হইতে মন্দ কার্য ও নাফরমানীমূলক কার্যগুলিকে পৃথক করিবে এবং ভাল কার্যগুলিকেও পৃথক করিবে। অতঃপর যে সমস্ত গুনাহের কাজ করা হইয়াছে উহাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি ও আযাবের ধ্যান করিবে এবং মনে করিবে যে, আমি খোদার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি, আমার হিসাব-কিতাব হইতেছে। আমার এই পরিমাণ গুনাহ্ আছে, তজ্জন্য আমার এই পরিমাণ শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাই দুনিয়া আখেরাতের বিশেষ রকমের স্মরণ।

এইরূপে স্মরণ করার পর আরও দুইটি কাজ করিবেঃ (১) খোদার সহিত ওয়াদা করিবে যে, ভবিষ্যতে পাপকার্য হইতে দূরে থাকিবে। (২) আর উক্ত তওবা ও ওয়াদার উপর দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করিবে—"হে খোদা! আমাকে তওফীক দাও, যেন তওবা ও ওয়াদার উপর দৃঢ়পদ থাকিতে পারি।" এই তওবার প্রয়োজনীয়তা তো প্রকাশ্যেই বুঝা যায়। দো'আর প্রয়োজন এই জন্য যে, খোদার অনুগ্রহ এবং দয়া ব্যতীত কোন ওয়াদা পালন করা কিংবা কোন দাবী পূরণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন এই স্মরণের সাথে ইহাও করিবে যে, সারা দিবসে খোদার যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ করিয়াছ, বিস্তারিতভাবে উহাও হিসাব করিয়া দেখিবে এবং মনে করিবে—আমার এত নাফরমানী সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এত দয়া করিয়াছেন, এত নেয়ামত দান করিয়াছেন, আমি এসমস্ত নাফরমানী হইতে দূরে থাকিলে না জানি কত অনুগ্রহ এবং নেয়ামত দান করা হইবে? ইহার ফলে পরবর্তী দিন হইতেই এবাদতের প্রতি খুব বেশী আগ্রহ জন্মিবে। এই কার্যধারা সর্বদার জন্য স্থির করিয়া লইবে এবং তদনুযায়ী স্থায়ীভাবে আমল করিতে থাকিবে।

ইহার সঙ্গেই আরও একটি খাছ সময় নির্ধারিত করিয়া লইবে। যাহাতে দৈনিক কিছু কিছু যেকের করিবে। ইহার ফলে অন্তর তাজা ও উৎফুল্ল থাকিবে। আত্মার মধ্যে এক রূহানী জীবন অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু স্মরণ রাখিবে, কেবল যেকেরই যথেষ্ট নহে; বরং কোন বুযুর্গ লোকের

সঙ্গে সম্বন্ধ এবং সম্পর্কও রাখা উচিত, যাহাতে নফ্‌সের পবিত্রতা সাধন হয় এবং উক্ত বুযুর্গ লোকের সাহায্যে সর্বপ্রকারের পদস্খলন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন সফলতা লাভ করা কঠিন; কোন বুযুর্গের সংশ্রব-সাহচর্যের অভাবে সরল পথ হইতে সরিয়া পড়িয়া বাহুল্য কিংবা ত্রুটিপূর্ণ পথে লিপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা রহিয়াছে। জীবিত বুযুর্গানের মধ্যে কাহারও প্রতি আস্থা না হইলে মৃত বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী এবং কিতাব পাঠ করা উচিত। প্রথমত ইহাতেই ফল হইবে, না হইলে অন্তত আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইবে এবং অবশ্যই ক্রমশ তরীকতের কোন কামেল পীরের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হইয়া সফলতালাভের পথ মুক্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান এবং মোরাকাবা তাহাই যাহা আমি প্রথমে বর্ণনা করিয়াছি। আবার বলিতেছি, সর্বক্ষণ এই ধারণা মনে রাখিবেন যে, আমি এখন আখেরাতের মুসাফির, বহু দূর-দারাযের পথ আমার সম্মুখে। তাহা বড়ই দুর্গম এবং নানাবিধ বিঘ্নসঙ্কুল। ইহার কারণে সফরের পথ বৃথাই দীর্ঘ হইয়া যায়। সুতরাং উক্ত পথের যাবতীয় সহায় ও হিতকর বিষয় অবলম্বন এবং যাবতীয় ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর বিষয় বর্জন করা উচিত।

কিন্তু ইহার সবকিছুই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌ তা'আলা দয়ার দৃষ্টি অর্পণ করিলে সমস্ত মুশ্‌কিল আসান এবং সমস্ত কঠিন কাজ সহজ হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলে সহজতম কার্যও কঠিন এবং অসহনীয় হইয়া পড়িবে। সুতরাং অবশ্যই খোদার দরবারে তওফীক বা সাহায্যের প্রার্থনা করা উচিত। এপথে খোদার সাহায্য এমন বস্তু যে, তরীকতপন্থীরা ইহার চিন্তাই অধিক করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চক্ষু উজ্জ্বল। তাঁহারা মনে করেন যে, আল্লাহ্‌র দয়া ব্যতীত এ পথে আমাদের চলিবার উপায়ই নাই।

পীরের হাল্‌ক্বা এবং তাওয়াজ্জুহের তথ্যঃ হযরত মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

ایں همه گفتیم ولیك اندر پیچ   بے عنایات خدا هیچم وهیچ
بے عنایات حق وخاصاں حق   گر ملك باشد سیاه هستش ورق

"আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার খাছ বান্দাগণের অনুগ্রহ ব্যতীত সমস্ত কামনা-বাসনাই নিষ্ফল। ফেরেশ্‌তা হইলেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং মেহেরবানী ব্যতীত সম্মানহীন থাকিবে।" দ্বিতীয় পদে মাওলানা (রঃ) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহলাভের উপায় বলিয়া দিয়াছেন যে, আগে খোদার খাছ বান্দাগণের অনুগ্রহ লাভ কর। ইহাকে বিফল মনে করিও না এবং এরূপ ধারণা করিও না যে, একজন মানুষের অনুগ্রহ লাভ করিলে কি হইবে? বন্ধুগণ! ইহাও খুব হিতকর। অনেক ক্ষতি হইতে রক্ষা করে। তাঁহাদের পরম মনোযোগ ইহাই যে, তাঁহারা নিজেদের মুরীদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ মনোযোগ রাখেন। সর্বক্ষণ তাহাদের প্রতি খেয়াল রাখেন এবং তাহাদিগকে ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার উপদেশ দান করেন। লাভবান হওয়ার উপায় বলিয়া দেন। মোটকথা, প্রত্যেক সময় তাহাদিগকে দৃষ্টির মধ্যে রাখেন। সম্মুখে আসিয়া বসিলে খাছ দৃষ্টি অর্পণ করেন। ইহাই অনুগ্রহ, ইহাই তাওয়াজ্জুহ।

আমাদের পীর ছাহেবানের প্রতি প্রশ্ন করা হয় যে, তাঁহারা মুরীদগণের প্রতি তাওয়াজ্জুহ্‌ বা অনুগ্রহ দৃষ্টি অর্পণ করেন না। কোন নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারণ করেন না এবং কোন হাল্‌ক্বা মিলাইয়াও বসেন না। কিন্তু ইহারা অজ্ঞ, কিছুই বুঝে না। আমাদের পীর ছাহেবানের তাওয়াজ্জুহ্‌ এবং অনুগ্রহ দৃষ্টি আমাদের প্রতি সর্বক্ষণ অর্পিত রহিয়াছে। যাঁহারা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করিয়া

থাকেন এবং হাল্‌কা মিলাইয়া বসেন, তাঁহাদের মুরীদানের প্রতি কেবল সেই নির্দিষ্ট সময়েই তাওয়াজ্জুহ্ থাকে। আমাদের পীর ছাহেবানের কৃপাদৃষ্টি সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গী থাকে। বাস্তবিকপক্ষে তাওয়াজ্জুহ্ প্রদানের জন্য হাল্‌কা বাঁধিয়া বসা কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের প্রয়োজন নাই। কেহ কি বলিতে পারেন যে, ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওয়াজ্জুহ্ ছিল না? অথচ সেখানে কোন হাল্‌কাও ছিল না এবং তাওয়াজ্জুহ্ প্রদানের নিমিত্ত কোন নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত ছিল না। ইহার জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা বা প্রচেষ্টাও ছিল না। এতদসত্ত্বেও হুযূর (দঃ)-এর তাওয়াজ্জুহ্ সর্বক্ষণ তাঁহাদের অবিচ্ছিন্ন সাথী ছিল। কোন সময়ই তাঁহারা হুযূরের তাওয়াজ্জুহ শূন্য থাকিতেন না। এইরূপে আমাদের পীর ছাহেবানও স্বীয় মুরীদগণকে নির্জনে কিংবা জনতার মধ্যে কখনও তাওয়াজ্জুহ্‌শূন্য রাখেন না। সর্বদা তাহাদের খেয়াল রাখেন।

একজন মেহেরবান ওস্তাদ যেমন সর্বক্ষণ নিজ শাগরেদের খেয়াল রাখেন, সে সম্মুখে বসিয়া বসিয়া পড়িতে থাকিলেও তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বাড়ীতে চলিয়া গেলে পরের দিন বিলম্বে আসিলে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকেন—এত বিলম্বে কেন আসিলে? কোথায় গিয়াছিলে? ইহাতে বুঝা যায় যে, শাগ্‌রেদ বাড়ী যাওয়ার পূর্বে এবং পরেও তাহার প্রতি ওস্তাদের খেয়াল ছিল। মাওলানা রূমী এই কথাটিই স্বীয় মস্‌নবীতে প্রকাশ করিতেছেন ঃ

دست پیر از غائباں کوتاہ نیست   قبضه اش جز قبضۂ الله نیست

"অনুপস্থিত মুরীদগণের জন্য পীরের হাত খর্ব নহে। তাঁহার ধরা যেমন খোদার ধরা। অর্থাৎ, কামেল পীরের তাওয়াজ্জুহ্ নিজের উপস্থিত অনুপস্থিত সর্বপ্রকারের মুরীদের প্রতি সমান থাকে।"

ফলকথা, পীরের অনুগ্রহ দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জুহ্ থাকা একান্ত প্রয়োজন। পীরের সঙ্গে এমন সম্পর্ক রাখা উচিত, যাহাতে তাঁহার সর্বপ্রকারের তাওয়াজ্জুহ্ বা অনুগ্রহ দৃষ্টি নিজের প্রতি অর্পিত থাকে এবং তাঁহার আগ্রহ নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু পীরের এই আগ্রহ এবং অনুগ্রহ দৃষ্টি তাঁহার খেদমত করা, পা টিপিয়া দেওয়া এবং হাদিয়া-তোহ্‌ফা প্রেরণের দ্বারা লাভ করা যায় না।

যেমন, কোন ছাত্র যদি নিজের নিঃস্বার্থ শিক্ষকের দরবারে সর্বদা মিঠাই-মণ্ডা লইয়া যায়; দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসে হাদিয়া-তোহ্‌ফা পাঠাইতে থাকে; আবার অষ্টম ও দশম দিবসে তাঁহাকে দাওয়াত করে, কিন্তু পড়ালেখায় বোকা হয়, পরিশ্রম দেখিয়া পলায়ন করে—এমন ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের মহব্বত কখনও হইবে না। পক্ষান্তরে যে ছাত্র মিঠাই-মণ্ডাও আনে না, দাওয়াতও করে না, উপহার-উপঢৌকনও পেশ করে না, কিন্তু খুব পরিশ্রম সহকারে সবক শিক্ষা করে, সর্বদা লেখাপড়ায় মশগুল থাকে, খেলাধুলাকে ঘৃণা করে, এরূপ ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের খাঁটি মহব্বত হইবে এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহার মনে আগ্রহ জন্মিবে। নিজেও পরিশ্রম করিবেন, তাহাকেও পরিশ্রম করাইবেন। তত্ত্বজ্ঞানী পীর ছাহেবানের অবস্থাও এইরূপ। সেই মুরীদকে তাঁহারা কখনও ভালবাসেন না—যাহারা পীর ছাহেবকে হাদিয়া-তোহ্‌ফা দিয়া থাকে, নজরানা পেশ করে; কিন্তু কাজ কিছুই করে না। এরূপ মুরীদের প্রতি তাঁহাদের তাওয়াজ্জুহ্ও হয় না, তাহাদের সংশোধনের জন্য খেয়ালও হয় না। অবশ্য তাঁহাদের তাওয়াজ্জুহ্ সে সমস্ত মুরীদের প্রতিই হইয়া থাকে, যাহারা সত্যের ও আল্লাহ্ তা'আলার অন্বেষণে মশ্‌গুল থাকে।

তাহাদের প্রতিই পীর ছাহেবগণের লক্ষ্য থাকে, যাহাদের অন্তরে খোদার মহব্বত থাকে এবং সত্যিকারের ধ্যান থাকে।

মোটকথা, উপরোক্ত দুই প্রকারের মোরাকাবায় পূর্ণ ফললাভের জন্য ইহাও অপরিহার্য যে, কোন পীরের সঙ্গ লাভ করিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত খাছ অনুসরণের সম্পর্ক রাখিতে হইবে। বাইআত হউক বা না হউক, মুরীদ শ্রেণীতে প্রবেশ করুক বা না করুক, শুধু অনুসরণের সম্পর্কই যথেষ্ট। ইন্‌শাআল্লাহ্‌! এইরূপে আমল করার পর 'নাজাত' অনিবার্য। উভয় জগতের মঙ্গল এবং মুক্তিলাভের উপায় শুধু ইহাই যে, উল্লিখিত উপায়ে খোদাপ্রাপ্তির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করিবে, তবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ অবশ্যই কৃতকার্য হইবে এবং উদ্দেশ্য সফল হইবে। যেমন, এই রুকূরই শেষভাগে আল্লাহ্‌ তা'আলা ওয়াদা করিতেছেনঃ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ, "যাহারা সত্য অন্বেষণের চেষ্টা করে এবং আমার সহিত মিলিত হওয়ার বাসনা রাখে, আমি তাহাদের জন্য নিজের পথ মুক্ত করিয়া দেই এবং চলার পথে তাহাদেরকে পথ দেখাই।" দুনিয়ার নিয়ম এই যে, অনেক সময়ে মানুষ পরিশ্রম করে, কিন্তু বিফল হয়, চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কৃতকার্যতার পরিবর্তে অকৃতকার্যতার অবস্থাই দেখা দেয়। পক্ষান্তরে আমার এখানে এরূপ নিয়ম নাই যে, কাহারও পরিশ্রমকে বিফল করিয়া দেই। আমার এখানে কেহ এ বিষয়ে পরিশ্রম ও চেষ্টা করিলে চাকুরী অবশ্যই পাওয়া যাইবে। নিযুক্তিপত্র আসুক বা না আসুক, কিন্তু পরিশ্রম করা অবধারিত।

ফলকথা, আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধু চেষ্টা ও পরিশ্রমের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ইহার ফল লাভ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হইতে। তিনি স্বয়ং এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ওয়াদা করিয়াছেনঃ তোমরা আমার জন্য চেষ্টা কর, আমি ইহার ফল অবশ্যই দান করিব। কিন্তু শর্ত এই যে, সেই চেষ্টা শুধু আমার জন্য হইতে হইবে।' فينا, শব্দে তাহাই বুঝা যায়। তাহাতে দুনিয়া অন্বেষণের গন্ধও না থাকা চাই। অন্যথায় চেষ্টার ফলে যদি হেদায়ত এবং আল্লাহ্‌র পথ লাভ না হয়, তবে বিচিত্র কিছুই মনে করিও না। কেননা, আমার ওয়াদা কেবল তখন পর্যন্তই, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সত্য অন্বেষণের জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং আমার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিবে। যদি তোমরা দুনিয়ার অন্বেষণ কর, তবে তোমরা জান আর তোমাদের কাজে জানে। ইহার সহিত আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। দুনিয়ার অন্বেষণে আমি কখনও তোমাদের সহায় ও সাহায্যকারী নহি। কেননা, দুনিয়া নিকৃষ্ট পদার্থ। নিকৃষ্ট পদার্থের অন্বেষণে আমি তোমাদের সাহায্যের ওয়াদা কেমন করিয়া করিতে পারি? যে দুনিয়াকে খেল-তামাশা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এখানে তাহাই উদ্দেশ্য। তাহা নিন্দনীয় বটে; প্রশংসনীয় নহে।

দুনিয়ার প্রকারভেদঃ আমার উপরোক্ত বর্ণনার প্রতি একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, আপনি তো বলিলেনঃ দুনিয়া তলব করা নিন্দনীয়, অথচ ওহুদের যুদ্ধে হযরত নবী করীম (দঃ) কতিপয় ছাহাবাকে ওহুদ পর্বতের গিরিপথ রোধ করিয়া থাকার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কোন অবস্থাতেই ইহা ত্যাগ করিবার অনুমতি ছিল না। কিন্তু কাফের সৈন্য পলায়ন আরম্ভ করিলে তাঁহারা গনীমতের মাল লাভ করার জন্য হুযূরের আদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গিরিপথ ত্যাগ করত গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য দৌড়াইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, শত্রু-সৈন্য যখন পলায়ন করিয়াছে, তখন আমাদের আর এখানে বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? গনীমতের মাল কেন হারাই? তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেনঃ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا

"তোমাদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে যাহারা দুনিয়া অন্বেষণ করে।" ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা দুনিয়া তলবকারী ছিলেন। তবে কি ছাহাবায়ে কেরামকে নিন্দনীয় কাজের তলবকারী বলা হইবে?

ইহার উত্তর এই যে, দুনিয়া দুই প্রকারঃ নিন্দনীয় এবং প্রশংসনীয়। নিন্দনীয় দুনিয়া অন্বেষণ করাও নিন্দনীয়। কেননা, এস্থলে দুনিয়ার জন্যই দুনিয়া তলব করা হয়। আখেরাতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা আখেরাত হইতে বহুদূরে। কিন্তু প্রশংসনীয় দুনিয়া আখেরাতের নিকটবর্তী, ইহার অন্বেষণ করাও প্রশংসনীয়। কেননা, এই দুনিয়া আখেরাতের জন্যই তলব করা হয়। যে দুনিয়া ছাহাবায়ে কেরাম তলব করিয়াছেন বলা হইয়াছে, তাহা আখেরাতের জন্য ছিল। মালে গনীমত লাভ করিয়া যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিবেন এবং তদ্দ্বারা ইস্‌লামের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজেদের অবস্থা শোধরাইয়া নিবেন আর ইস্‌লামের শক্তি ও প্রতাপ বৃদ্ধি করিবেন। কোরআন শরীফে শুধু يُرِيْدُ الدُّنْيَا "দুনিয়া তলব করে" বলা হইয়াছে। কিসের জন্য তলব করেন, তাহা বলা হয় নাই, কিন্তু ছাহাবাদের (রাঃ) অবস্থা হইতে তাঁহাদের তলব আখেরাতের জন্য ছিল বলিয়া বুঝা যায়। অতএব, প্রশ্নের জবাব হইয়া গেল।

ইহার উপর যদি আবার প্রশ্ন করা হয় যে, তবে তাঁহাদিগকে ধমক কেন দেওয়া হইল? তাঁহাদের দুনিয়া অন্বেষণ তো নিন্দনীয় ছিল না? তবে বলিব, ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা হুযূর (দঃ)-এর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নিজের মতানুযায়ী কাজ কেন করিলেন? এই কারণেই তাঁহাদিগকে ধমক প্রদান করা হইয়াছিল। তাঁহারা নিন্দনীয় দুনিয়া অন্বেষণ করিয়াছিলেন—সে জন্য নহে।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার জন্য পরিশ্রম কর। আমার নিকট পৌঁছিবার জন্য আমি তোমাদের পথ প্রদর্শন করিব। এই আমার ওয়াদা। اِنَّ اللهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।" খোদার দয়া, এত বড় ওয়াদা করিলেন যে, তোমরা কেবল চেষ্টা কর, উদ্দেশ্য সফল করিয়া দেওয়া আমার দায়িত্ব। অতঃপর আমাদের সঙ্কীর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। পাছে আমরা এত বড় ওয়াদা শ্রবণ করিয়াও নিশ্চিন্ত না হই। সুতরাং আমাদের শান্তির জন্য নিজের ওয়াদায় কতকগুলি 'তাকীদ' অর্থাৎ, নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অব্যয় সংযোগ করিয়াছেন। প্রথমে 'লামে তাকীদ' শেষে 'নূনে সকীলাহ্।' আবার বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের ভাষায়ও ক্ষমতাধীন বিষয়ের ওয়াদায় বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়।

আর একথার প্রতিও এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, "আমি এমন কাজ করিতে পারি, যাহা একদল লোক একত্রিত হইয়াও করিতে পারে না।" কখনও তোমাদের এরূপ কল্পনা হইতে পারে যে, চেষ্টা ও পরিশ্রমকারীর সংখ্যা তো শত শত হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা একাকী সকলকে কিরূপে পথ দেখাইবেন? অবশ্য কোন ঈমানদার মুসলমান এরূপ কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু কল্পনা পথে ইত্যাকার সন্দেহ আসিয়া পড়ে। তাহা দমনের জন্য এখানে বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ, যদিও আমি একা; কিন্তু আমি একাই এমন কাজ করিতে পারি, সারা জগত একত্রিত হইয়া যাহা করিতে পারে না।

আয়াতের سُبُلَنَا শব্দ হইতে তাসাওউফের একটি মাস্‌আলার প্রতি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাহা এইঃ طَرِيْقُ الْوُصُوْلِ اِلَى اللهِ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ অর্থাৎ, "সমস্ত সৃষ্টজীবের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা যত, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌঁছিবার পথসমূহের সংখ্যা তত।" কেননা, এখানে سُبُلَنَا শব্দটি বহুবচন। ঐদিকে نَهْدِيَنَّ 'পথ দেখাইব' ক্রিয়ার কর্মও বহুবচনের সর্বনাম।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়ঃ সুতরাং বহুবচনের মোকাবেলায় বহুবচনের শব্দ ব্যবহারে বুঝা গেল, আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছিবার পথ শুধু একটি নহে ; বরং বহুসংখ্যক পথ রহিয়াছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের জন্য পৃথক পৃথক পথ রহিয়াছে। যেমন, ব্যবস্থাপত্রে লিখিত ঔষধের যাবতীয় অংশ মূলত এক ; কিন্তু ডাক্তার রোগীর স্বভাবের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ-কম করিয়া কিংবা উল্টা-পাল্টা করিয়া বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। আবার কোন রোগীর জন্য এই ঔষধগুলির সঙ্গে يدرقه ব্যবহারের নিয়মাবলীরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আবার কোন রোগীকে শুধু ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন। মোটকথা, যাবতীয় অংশের মূল একই। কিন্তু চিকিৎসক রোগীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দিয়া থাকেন। এইরূপে শরীঅতেরও মূল উদ্দেশ্য এক, কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দরবার পর্যন্ত পৌঁছা। কিন্তু কোন কোন কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার পথ বিভিন্ন হইয়া থাকে।

যেমন, হযরত হাজী ছাহেবের (রঃ) নিকট এক রোগী আসিয়া আরয করিলঃ হুযূর, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আফসোস্! 'মসজিদে হারামে' নামায পড়িতে পারি নাই। তিনি তাহার জন্য আরোগ্যের দো'আ করিয়া বিদায় করিলেন। সে চলিয়া যাওয়ার পর বিশিষ্ট লোকদের মজলিস অবশিষ্ট রহিল। তিনি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌ওয়ালা হইলে কখনও অস্থির হইত না। কেননা, 'হরম' শরীফে নামায পড়াও যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌঁছিবার এক পথ, তদ্রূপ ওযরের সময় ঘরে নামায পড়িয়া হরমের জন্য ব্যাকুল থাকাও আর এক পথ। এই কারণে আল্লাহ্‌ওয়ালার দৃষ্টিতে উভয় অবস্থাই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিবার সমান উপায়। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ শুধু আল্লাহ্‌র সন্তোষই কামনা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শুধু নামায আদায় করা। মস্‌জিদে হারামে সম্ভব হইলে তথায় আদায় করিতেন, ওযর কিংবা রোগবশত তথায় সম্ভব না হইলে ঘরে পড়িয়া লইতেন।

সারকথা এই যে, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিবার রাস্তা বিভিন্ন। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন পথের ব্যবস্থা। এই কারণেই তরীকতের পীর (আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসক) এবং হাকীম (দৈহিক রোগের চিকিৎসক) যোগ্যতা অনুযায়ী কোন একটি পন্থা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। যাহাতে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত সহজে পৌঁছিতে পারা যায়। যেমন, মক্কা শরীফে যাওয়ার পথ বোম্বাই হইয়াও আছে, করাচী হইয়াও আছে। পথ পৃথক হইলেও গন্তব্যস্থান একই। যেদিক ইচ্ছা সেদিক দিয়া যাওয়া যায়। এইরূপ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা একমাত্র উদ্দেশ্য, তবে ইহার পথ বিভিন্ন।

পীরের দরবারে কোন মুরীদ আসিলে তিনি যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, অন্যান্য ওযীফা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত ইহার জন্য অধিক হিতকর হইবে, তিনি তাহাকে ইহাই বলিয়া দেন। অপর মুরীদ আসিলে দেখিলেন, ইহার মধ্যে অহংকার রোগ আছে, তখন যাহাতে অহংকার দূর হয়, তাহার জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অহংকার দূর করারও আবার বিভিন্ন উপায় আছে। দেখুন, সড়ক ঝাড়ু দেওয়ান অহংকার দূর করার একটি পন্থা। তদ্রূপ নামাযীদের জুতা সোজা করিয়া দেওয়াও আর একটি পন্থা। উভয় পন্থায়ই অহংকার দূর করা যায়। মোটকথা, পথ বিভিন্ন হইলেও গন্তব্যস্থান একই।

অতঃপর সম্মুখের দিকে ইহার ফলকথা বলিতেছেনঃ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা নেক্‌কার বান্দাগণের সঙ্গে আছেন।" এই বাক্যটি সংযোগে আয়াতের সারমর্ম এই হয়,

তোমরা আমার নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী আমল করিতে থাক, চেষ্টা ও পরিশ্রমে সাহস হারাইও না। ইহাতে তোমরা নেক্‌কারদের শ্রেণীভুক্ত হইবে। অতঃপর ইহার ফল এই পাইবে যে, নেক্‌কার বান্দাগণকে আমি আমার সঙ্গরূপ মহাধন দান করিব। সঙ্গ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ বলিয়াছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক স্বয়ং আসিয়া নেক্‌কারদের সঙ্গী হইবেন। إِنَّ الْمُحْسِنِيْنَ لَمَعَ اللّٰهِ অর্থাৎ, নেককারগণ আল্লাহ্‌র সঙ্গী হইবেন বলেন নাই। ইহাতে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যদ্যপি আমার নিকট পৌঁছিবার ইহাও একটি পন্থা যে, তোমরা আসিয়া আমার সহিত মিলিত হও, কিন্তু তাহা তোমাদের ক্ষমতার বাহিরে। যেমন কবি বলেনঃ

نگـردد قطع هرگــز جادۂ عشق از دویــدنهـا
که می بالد بخـود ایں راه چوں تاك از بریدنها

“এশ্‌কের পথ দূরত্ব অতিক্রমে কমে না; বরং আঙ্গুরের লতার ন্যায় কর্তিত হইয়াও বাড়িতে থাকে।” অতএব, আমি দ্বিতীয় পন্থার ব্যবস্থা করিয়াছি, আমি নিজেই অগ্রসর হইয়া নেক্‌কারদের সহিত মিলিত হইব।

এখন নেককারদের স্বরূপ বুঝিয়া লউন। প্রথমে وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا বাক্যে ইঁহাদেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। اِحْسَانٌ অর্থাৎ, নেক কার্যের স্বরূপ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ অর্থাৎ, এমন সুন্দরভাবে ও আদবের সহিত আল্লাহ্‌র এবাদত করিবে, যেন তুমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া এবাদত করিতেছ। ইহাতে এরূপ সন্দেহ হয় যে, আমরা যখন তাঁহাকে দেখিতেই পাই না, তবে এরূপ অবস্থার ফল আমরা কিরূপে লাভ করিতে পারি? সঙ্গে সঙ্গেই হুযূর (দঃ) ইহার উত্তর দিয়াছেনঃ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ “যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাও না, তিনি তো তোমাকে নিশ্চয়ই দেখিতেছেন।” শাসিত ব্যক্তি শাসককে দেখার যে ফল, শাসক শাসিতকে দেখারও সেই ফল। অর্থাৎ, একজন শাসিত ব্যক্তি যেমন স্বীয় শাসককে দেখিয়া খুব আদব ও নম্রতা সহকারে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় এবং যাবতীয় কার্য অতি সাবধানে সম্পন্ন করে, তদ্রূপ তুমিও স্বীয় আহ্‌কামুল হাকেমীন খোদার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতিশয় ভয় ও বিনয় সহকারে এবাদত কর। ইহা প্রথম বাক্যের অর্থ।

এখানে যদি বলা হয় যে, দুনিয়ার শাসক আমাদের চোখের সামনে দাঁড়ান থাকিলে তাঁহার প্রতাপ দেখিয়া ভয়ে খুব সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন করি, কিন্তু খোদাকে যখন আমরা দেখিতে পাই না, তখন আমরা মনে সেই ভয় কেমন করিয়া আনয়ন করিব?

হাদীসের দ্বিতীয় বাক্যে ইহার উত্তর রহিয়াছে। তোমাদের এবাদতের পরিপাট্য এবং আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য উপরোক্ত উপায়ের ন্যায় আরও একটি উপায় আছে। অর্থাৎ, খোদা তা'আলা তোমাদিগকে দেখাই যথেষ্ট। তিনি তোমাদিগকে সকল অবস্থায় দেখিতে পান। একথার প্রতি তোমাদের বিশ্বাসই তো রহিয়াছে। তোমরা সর্বদা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছ, ইহাও তোমরা বিশ্বাস কর। সুতরাং যদিও তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাও না, কিন্তু তোমাদের এবাদত যাঁহাকে দেখান উদ্দেশ্য, তিনি তো তোমাদিগকে দেখিতেছেন বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস আছে। কাজেই পূর্ণ ধীরস্থিরভাবে পরিপাট্যের সহিত নিজের কাজ করা উচিত।

ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন, কোন চাকরের যদি জানা থাকে যে, প্রভু পর্দার অন্তরাল হইতে আমার কার্য দেখিতেছেন। চাকর যদিও তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তথাপি সে তাহার যাবতীয় কার্য তদ্রূপ সাবধানতার সহিত করিবে, যেরূপ সে মনিব সম্মুখে থাকিলে করিত এবং তদ্রূপ

ভয়-ভীতিও থাকিবে, যেমন সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলে হইত। এহ্‌সান (احسان) -এর সারমর্ম ইহাই। এই এহ্‌সানকে 'মুজাহাদা' বা চেষ্টা ও পরিশ্রম নামে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, চেষ্টা ও পরিশ্রমই সেই এহ্‌সানের দরজা প্রাপ্ত হওয়ার উপায়। বস্তুত 'মুজাহাদা'র অর্থ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম ও সাধনা করা, কিন্তু এখানে সেই অর্থ উদ্দেশ্য নহে। কেননা এহ্‌সানের স্বরূপ যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা প্রথম দিনেই হাছিল হইতে পারে; অবশ্যই হাছিল হইতে পারে। কেননা, اِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের অবস্থা দেখিতেছেন" বলিয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই বিশ্বাস রহিয়াছে। কেবল ইহা স্মরণ রাখার প্রয়োজন আছে এবং এই স্মরণ রাখা নফ্‌সের আযাদীর বিরোধী বলিয়া তাহার উপর কষ্টকর হইয়া থাকে—ইহাই 'মুজাহাদা'।

অতএব, শুধু একথার জন্যই আফসোস, আমরা আকীদা ও বিশ্বাসকে শুধু জ্ঞানলাভের জন্যই রাখিয়া দিয়াছি। আমলের ক্ষেত্রে ইহা দ্বারা কোন কাজ লইতেছি না। এই কারণেই আমাদের এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতেছে। বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিলে 'হাল' উৎপন্ন হইবে। অতঃপর উক্ত অবস্থার মধ্যে দৃঢ়তা জন্মিয়া এমন এক স্বাদ পাইতে থাকিবে যে, কখনও আমল বাদ পড়িবে না, আমলে কখনও তৃপ্তিও হইবে না—যদি আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিয়াও যায়। যেমন, কবি বলেনঃ

دل آرم در بر دل آرم جوئے   لب از تشنگی خشک بر طرف جوئے
نه گویم که بر آب قادر نیند   که بر ساحل نیل مستسقی اند

"মাহ্‌বুব হৃদয়ে অথচ তাঁহার অন্বেষণ চলিতেছে। নদীর পাড়ে থাকিয়াও তৃষ্ণায় ঠোঁট শুষ্ক। এমন নহে যে, পানি পাইতেছে না। কিন্তু 'এস্তেস্কা' রোগের রোগীর ন্যায় নীল নদের তীরে থাকিয়াও পিপাসা থাকিয়াই যায়।"

এখন আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করিতেছি, সেই মহাশক্তিমান চিরঞ্জীব আমাকে এবং আপনাদিগকে তওফীক দান করুন, যেন আমি ও আপনারা ইহার উপর আমল করিতে পারি। আমীন!

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

* * *

নিজ বাড়ী
১৩৪৫ হিজরী ৫ই যিল্‌কা'দ,

হাম্‌মুল আখেরাহ্

[পরকালের চিন্তা]

◆

শুধু দুনিয়ার লোভ নিন্দনীয় নহে; বরং তদনুযায়ী কাজ করা নিন্দনীয়। এইরূপে ধন-সম্পদের অনুরাগও সর্বস্তরে নিন্দনীয় নহে; বরং ইহার কোন স্তর কাম্যও বটে। যেমন, যে পরিমাণ অনুরাগে মালের হেফাযতের প্রতি যত্ন নেওয়া হয় তাহা কাম্য। কেননা, মাল বিনষ্ট করা হারাম। এতটুকু অনুরাগ না থাকিলে মানুষ মালের প্রতি কোনই মর্যাদা দান করিবে না, এবং উহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে, অথচ শরীঅতে তাহা নিষিদ্ধ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ ○

মহান ভবিষ্যদ্বাণী

আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করিলাম, ইহা সূরা-রূম-এর একটি আয়াত। ইতিপূর্বে একটি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা, ভবিষ্যদ্বাণী এমন লোকের মুখ হইতে বাহির হওয়া, যিনি ভবিষ্যদ্বাণীর কোন উপকরণ লাভ করেন নাই এবং নবুওয়তের দাবী করেন। আবার ভবিষ্যদ্বাণীও অবিকল ঘটিয়া যায়। ইহা অদৃশ্য জগতের সহিত তাঁহার যোগাযোগের নিদর্শন। ভবিষ্যদ্বাণীর পরমুহূর্তে তদনুযায়ী ঘটনা ঘটিলে ইহা তাঁহার মো'জেযা বলিয়া গণ্য হইবে। বিশেষত ইহা এমন সাধারণ বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নহে, যাহা ডাক্তারগণ বাহ্যিক লক্ষণদৃষ্টে জানিতে পারে। বস্তুত আজকাল কোন কোন মূর্খ লোক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে, অমুক ব্যক্তি এত দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে কিংবা অমুক ব্যক্তি অমুক রোগে আক্রান্ত হইবে; বরং ইহা এমন ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার সম্পর্ক

দুই রাজ্যের সহিত। আর সম্বন্ধও এমন বিচিত্র যাহা বাহ্যজ্ঞানের বিপরীত ও বর্তমান লক্ষণসমূহ হইতে দূরবর্তী। আবার ভবিষ্যদ্বাণীও গোলমেলে নহে; বরং স্পষ্টভাবে সময় নির্ধারণ করত দাবী করা হয় যে, এখন যে রাজ্য জয় লাভ করিয়াছে, কয়েক বৎসর পরে ইহারা পরাজিত হইবে এবং পরাজিত রাজ্য তখন জয় লাভ করিবে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা ঘটিয়াও গেল। সুতরাং, ইহা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের সত্যতার নিদর্শন। নবুওয়তের সিল্‌সিলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকারের নিদর্শনে নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণ হইত। নবুওয়ত সমাপ্ত হওয়ার পর কেহ এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিলে তাহা যদি ভুল প্রমাণিত নাও হয়, তথাপি সে ব্যক্তিকে নবী বলা যাইবে না এবং ইহাও নবুওয়তের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে না; বরং তিনি যদি শরীঅতপন্থী ওলী হন, তবে ইহা তাঁহার কারামত বলিয়া গণ্য হইবে। শরীঅতপন্থী না হইলে ইহাকে 'এস্তেদ্‌রাজ' বলা হইবে। এখানে যদি এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, ভবিষ্যৎ বক্তা যদি নবুওয়তের দাবীও করে এবং তাহার ভবিষ্যদ্বাণী ভুলও না হয়, তথাপি কি তাহা নবুওয়তের নিদর্শন হইবে না?

তবে উত্তর এই দেওয়া যাইবে যে, ইহার সম্ভাবনা শুধু আনুমানিক এবং বাস্তববিরোধী। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা করিলে এরূপ করিতে পারেন এবং এরূপ আনুমানিক সম্ভাবনা প্রকৃত ব্যাপারের জন্য হানিজনক নহে। এই প্রশ্নটি ঠিক সেইরূপ, যেমন এক শাগ্‌রেদ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—যিনি পাঠের সময় সর্বদা নীরব থাকিতেন।

একদিন ইমাম ছাহেব বলিলেনঃ ভাই, তুমি কখনও কোন প্রশ্ন কর না, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিও। সে বলিলঃ আচ্ছা, এখন হইতে জিজ্ঞাসা করিব। একদিন ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) মাস্‌আলা বর্ণনা করিলেনঃ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফ্‌তার করা উচিত। তখন উক্ত শাগ্‌রেদ জিজ্ঞাসা করিলঃ হুযূর! যদি কোন দিন সূর্য অস্তমিতই না হয়, তবে কি করা হইবে? ইমাম ছাহেব হাসিয়া বলিলেনঃ ভাই, তোমার নীরব থাকাই ভাল।

অতএব, এই শাগরেদের প্রশ্নের ভিত্তি যেমন শুধু মনে করা এবং ধরিয়া লওয়ার উপর ছিল, তদ্রূপ আলোচ্য প্রশ্নের ভিত্তিও শুধু মানিয়া লওয়ার উপর। এরূপ অনুমান ও সম্ভাবনা লক্ষণীয় নহে। যদি অসম্ভব কিছু মানিয়া লওয়ার মত ইহাকে মানিয়াও লওয়া হয়, তবে উত্তর এই হইবে যে, ইহা তখনই নবুওয়তের আলামতরূপে গণ্য হইবে, যদি কোন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা নবুওয়ত প্রমাণ হইয়া থাকে। অন্যথায় উহা আলামত বলিয়া গণ্য হইবে না।

আল্লাহ্‌র ওয়াদা অলঙ্ঘনীয়ঃ আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে খুব উচ্চ পর্যায়ের একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ وَعْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "ইহা আল্লাহ্‌র ওয়াদা, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও ওয়াদা খেলাফ করেন না।" সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিকভাবে ঘটিয়া যাওয়ার ফলে সমস্ত মানুষ হুযূর (দঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু তবুও বহু লোক অবিশ্বাসী রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমোক্ত আয়াতে ইহার কারণ বর্ণনা করিয়াছেনঃ

وَعَدَ اللّٰهُ لَايُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○

ইহার সর্বশেষ বাক্যটিতে অভিযোগ করিতেছেন, "অধিকাংশ মানুষ খবরই রাখে না" (যে, মু'জেযাসমূহ নবীর নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ। বস্তুত ভবিষ্যদ্বাণীও গায়বী সংবাদ বলিয়া মু'জেযাবিশেষ) খবর না রাখার অর্থ এই যে, ইহারা একথার প্রতি বিশ্বাসই করে না কিংবা বিশ্বাস

থাকিলেও তদনুযায়ী আমল করে না। যেহেতু এলমের জন্য আমল অপরিহার্য, যদিও আমল কেবল অবশ্য করণীয় বলিয়া বিশ্বাসের পর্যায়েই হউক, কাজেই আমল না থাকিলে এল্‌মও নাই বলিয়া বুঝা যায়। বস্তুত কাফেরদের মধ্যে আমল কোন পর্যায়েই নাই। কাজেই বলিয়াছেন لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, "তাহারা খবরই রাখে না।" এখানে প্রশ্ন হইতে পারিত যে, অনেক মুসলমান নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, কিন্তু ইহা ফরয বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে কি আমল করে না বলিয়া ইহাদেরও এল্‌ম বা বিশ্বাস নাই বলিতে হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যই আমি "যদিও আমল অবশ্য করণীয় বলিয়া বিশ্বাসের পর্যায়েই হউক" কথাটি সংযোগ করিয়াছিলাম। অর্থাৎ, আমলকে অপরিহার্য কর্তব্য মনে করাও আমলের এক পর্যায় বটে। মুসলমান যদিও আমল করে না, কিন্তু আমলকে ফরয বলিয়া অপরিহার্যরূপেই বিশ্বাস করে; কাফেররা তাহাও করে না। মোটকথা, যাহাদের এই বিশ্বাস থাকিবে যে, ভবিষ্যদ্বাণী 'মু'জেযা এবং মু'জেযা নবুওয়তের আলামত। তাহারা ভবিষ্যদ্বাণীর উপর অবশ্যই ঈমান রাখিবে এবং ইহাই আমল বলিয়া গণ্য। কেননা, ঈমান অন্তরের আমল। অতএব, ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পূর্ব হইতে ঈমান থাকা বশত ভবিষ্যৎ বক্তা নবী (দঃ)-এর প্রতি নিশ্চয়ই ঈমান ও বিশ্বাস জন্মিবে। এই পর্যায়ে ঈমান ও আমলের অপরিহার্য সম্পর্ক সাব্যস্তই হইল।

অবশ্য মুখে ঈমান প্রকাশ করা ঈমানের অংশ নহে। কেননা, অন্তরের বিশ্বাস আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যস্থিত সম্পর্ক। মুখে প্রকাশ করা ঈমানের জন্য শর্ত কিনা, ইহাতে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু সঠিক মত এই যে, মুখে প্রকাশ না করিলে শুধু গুনাহ্ হইবে, যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মুখে প্রকাশ না করে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট সে মু'মেনই থাকিবে, কিন্তু গুনাহ্‌গার সাব্যস্ত হইবে।

মানুষের নিকট এবং দুনিয়ার বিচারে সে মু'মেন সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুখে স্বীকার করা শর্ত। কেহ মুখে নিজেকে মুমেন বলিয়া স্বীকার না করা পর্যন্ত আমরা তাহাকে কাফেরই বলিব। বিশেষত যখন সে মুখে স্বীকার করার ক্ষমতাও রাখে। মক্কার কাফেররা তো অক্ষম এবং পরাভূত ছিল না; বরং মুসলমানরাই তাহাদিগকে ভয় করিত। এমতাবস্থায় আমরা তাহাদের অন্তরে ঈমান থাকার সম্ভাবনা কিরূপে মনে করিতে পারি ? যদিও মানিয়া লওয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে কাহারও অন্তরে ঈমান ছিল। তথাপি হুযুর (দঃ) এবং মুসলমানদের সহিত তাহাদের ব্যবহার ঈমান অস্বীকৃতিরই পরিচায়ক ছিল। যেমন, কোরআন শরীফ অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করা উহার প্রতি অস্বীকৃতির চিহ্ন। এইরূপে রাসূল (দঃ)-কে কষ্ট দেওয়া এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাও অবিশ্বাসের আলামত। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের সেই অন্তরস্থ বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও ধর্তব্য হইবে না। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট মু'মেন হওয়ার জন্য কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নহে; বরং অবিশ্বাসের কোন আলামত না থাকাও শর্ত।

এখন আমি তালেবে এল্‌ম সুলভ একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করি। প্রশ্নটি এই, কোন কোন আয়াতে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নবুওয়ত সম্বন্ধে কাফেরদের এল্‌ম ছিল। যেমন, আল্লাহ্ বলিতেছেনঃ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ "তাহারা কি তাহাদের রাসূলকে চিনে না, যে কারণে তাহারা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছে ?" এখানে প্রশ্নটি নেতিবাচক বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নবুওয়ত সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল। অন্যত্র তিনি কিতাবী সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরিষ্কার বলিয়াছেনঃ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

"তাহারা নবী (দঃ)-কে সেইরূপই চিনে যেমন তাহাদের পুত্রদেরকে চিনে।" অতএব, দেখুন, নবীর পরিচয়লাভ তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। বাধ্যতামূলক বিশ্বাসকে ঈমান বলা যায় না। ইচ্ছাকৃত কার্যকেই ঈমান বলে।

اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও ইহার ফলাফলঃ বাধ্যতামূলক জ্ঞান-বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত যেমন, রৌদ্র দেখিয়া প্রত্যেকেই ইহাকে সূর্যের আলো বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এইরূপে হুযূর (দঃ)-কে দেখিয়া প্রত্যেক দর্শকই তাঁহার নবুওয়তে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইত। তথাপি সকল মানুষ ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। আর আল্লাহ্‌র তওহীদে বিশ্বাস করিতে তো সকলেই বাধ্য। প্রকৃতিপূজক, নাস্তিক, কাফের সকলের মনেই তওহীদের বিশ্বাস রহিয়াছে। ইহা اَلَسْتُ প্রতিশ্রুতিরই প্রতিক্রিয়া। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের হেকমত সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّاكُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ অর্থাৎ, "এই প্রতিশ্রুতি আমি এই জন্য গ্রহণ করিয়াছি, যেন তোমরা কিয়ামতের দিন বলিতে না পার যে, আমরা ইহা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলাম।" অতএব, বুঝা গেল, এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পরে তওহীদ সম্বন্ধে আর কেহ অজ্ঞ থাকে নাই। ইহার মূল বিষয়টি সকলেরই স্মরণ আছে। কেহ বলিতে পারেন, "কৈ, সেই প্রতিশ্রুতির কথা আমাদের তো স্মরণ নাই?" আমি বলিব, স্মরণ থাকার অর্থ ইহা নহে যে, সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশেষ ঘটনাও স্মরণ থাকিবে। অর্থাৎ, কোন্‌ সময়ে কোন্‌ জায়গায় এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল? তখন ডানে ও বামে কে ছিল? বরং স্মরণ থাকার অর্থ এই যে, মূল বিষয়টি মোটামুটিভাবে স্মরণ থাকা।

দেখুন, اٰمَدَنْ শব্দের অর্থ—'আগমন করা' اٰمَدْنَامَهْ কিতাব যাহারা পড়িয়াছে সকলেরই ইহা স্মরণ আছে। কিন্তু কোন্‌ ওস্তাদের নিকট কোন্‌ দিন কোন্‌ জায়গায় কিরূপে পড়িয়াছে সেই তফ্‌সীল স্মরণ নাই। কচিৎ কাহারও স্মরণশক্তি অত্যধিক প্রবল হইলে যদি কেহ বিস্তারিত বিবরণসহ স্মরণ রাখিয়া থাকে, তবে اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। বস্তুত কোন কোন কাশফের অধিকারী আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকেরও اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণসমূহ স্মরণ ছিল।

এক বুযুর্গ লোক বলিয়াছেনঃ আমাদের নিকট হইতে যে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছে, তাহা আমার খুব স্মরণ আছে। আল্লাহ্‌ পাক যখন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলিলেন, তখন আত্মাসমূহ হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহের দিকে তাকাইয়াছিল যে, "হুযূরই প্রথমে জবাব দিন, অতঃপর আমরা সকলে জবাব দিব।" হুযূর সর্বপ্রথম بَلٰى হাঁ বলিলেন। অতঃপর সকলেই بَلٰى হাঁ বলিল।

আর এক বুযুর্গ লোক বলিয়াছেনঃ হাদীস শরীফে আছে,

اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَاتَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ

অর্থাৎ, "আত্মাসমূহকে সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত করা হইয়াছিল। সেখানে যাহাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হইয়াছিল—ইহলোকে আসিয়া তাহারা পরস্পর বন্ধু হইয়াছে। আর যাহাদের মধ্যে তথায় পরিচয় হয় নাই, ইহলোকে তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়াছে।"

উক্ত বুযুর্গ লোক বলেন, সেখানে পরস্পর পরিচয় হওয়া এবং না হওয়ার অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, যখন আত্মাসমূহকে একত্রিত করা হইয়াছিল, তখন কোন কোন আত্মা পরস্পর

মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব হইয়াছে। আবার কেহ কাহারও পিঠের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাহার মুখ অপরের পিঠের দিকে ছিল, তাহার মনে অপরের প্রতি বন্ধুত্ব হইয়াছে এবং যাহার পিঠ অপরের দিকে ছিল, তাহার মনে অপরের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। আবার কেহ কেহ পরস্পরের প্রতি পিঠ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের উভয়ের মনেই উভয়ের প্রতি ইহলোকেও ঘৃণা জন্মিয়াছে। এই বুযুর্গ লোক তাঁহার সহচরবৃন্দের নিকট বলিতেনঃ তখন অমুক আমার ডান দিকে এবং অমুক আমার বাম দিকে ছিল।

এইরূপে হযরত সুলতান নেযামুদ্দীন (রঃ) বলিয়াছেনঃ প্রথমে যখন রূহকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল, তখন রূহ আল্লাহ্‌র সেই আদেশ শ্রবণ করিয়াছে। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আল্লাহ্ যেই লাহানে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহাও আমার স্মরণ আছে। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, সেই লাহানের মাধুর্যে মত্ত হইয়াই রূহ্ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা সেই দেহ, যাহাতে রূহ্‌কে প্রবেশ করাইয়া— اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল।

কেহ বলিতে পারেন, আল্লাহ্‌র কালাম স্বর হইতে মুক্ত। যেমন, হযরত শেখ ফরীদউদ্দীন আত্তার বলেনঃ قول او را لحن نے آواز نے "আল্লাহ্‌র কালামের লাহানও নাই, শব্দও নাই।" তবে রূহ তাহা শ্রবণ করিল কিরূপে?

কোন কোন নীরস বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোক শেখ ফরীদউদ্দীনকে 'শেখ' মনে করিতেন না; বরং শুধু গোঁড়া সূফী মনে করিতেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোন কোন কবিতা একটু বেশী তেজস্কর ছিল। যাহাতে বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তাঁহার পরিভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার কারণে ধোঁকায় পতিত হইয়াছিলেন। হযরত শেখ ফরীদের একটি অতি দীর্ঘ কাসীদা আছে। তন্মধ্যে প্রথম কবিতাটি এইঃ

چشم بکشا که جلوۂ دلدار ـ متجلی ست از در و دیوار

"চক্ষু খুলিয়া দেখ, মাহ্‌বুবের জ্যোতি ঘর ও দেওয়াল হইতে বিকীর্ণ হইতেছে।"

শেখ ফরীদ সম্বন্ধে তাহাদের এই ধারণা ভুল। তিনি বড় তত্ত্বজ্ঞানী আরেফ ছিলেন। মাওলানা রূমী তাঁহার খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ

هفت شهر عشق را عطار گشت ـ ماهنوز اندر خم يك کوچه ايم

"আত্তার এশ্‌কের সাতটি শহর ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু আমি ইহার একটি গলির মোড়েই রহিয়া গিয়াছি।"

তিনি খোদাপন্থীদের সংশোধক এবং অভিভাবকও ছিলেন। তাঁহার 'পান্দেনামা' কিতাবেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কিতাবেই তিনি কবরপূজকদের প্রতিবাদে বলিয়াছেনঃ

در بلا یاری مخواه از هیچ کس ـ زانکه نه بود جز خدا فریاد رس

"বিপদের সময় কাহারও নিকট হইতে বন্ধুত্বের আশা করিও না। ঐরূপ সময়ে খোদা ভিন্ন কেহ সাহায্যকারী নাই।"

এমন লোক তত্ত্বজ্ঞানশূন্য কিরূপে হইতে পারেন? এই তো হইল তাঁহার উক্তি; তওহীদ এবং শিরক সম্বন্ধীয় আমল ও বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য দেখুন, قول او را لحن نے آواز نے

“আল্লাহ্ তা'আলার কালামে লাহানও নাই শব্দও নাই”, ইহা সম্পূর্ণরূপে সুন্নী সম্প্রদায়ের মত। তবুও তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানশূন্য কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

আল্লাহ্‌র কালাম স্বর হইতে পবিত্রঃ মোটকথা, হযরত শেখ ফরীদের ন্যায় এমন একজন মহান তত্ত্বজ্ঞানীর মতে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম স্বর হইতে মুক্ত। দার্শনিক ওলামায়ে কেরামও এসম্বন্ধে একমত। এতদসত্ত্বেও হযরত নেযামুদ্দীন রাহেমাহুল্লাহ্‌র উক্তির কি অর্থ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে আল্লাহ্‌র কালামের তাজাল্লী মানুষের কালামের সাদৃশ্য পরিগ্রহণ করিয়াছিল এবং সাদৃশ্যময় কালামে একটি স্বর সমন্বিত ছিল। তূর পর্বতের বৃক্ষের উপর আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লীও তদ্রূপই ছিল বলিয়া বৃক্ষ হইতে আওয়ায আসিতেছিল। বস্তুত উক্ত আওয়াযও আল্লাহ্‌র কালামের আওয়ায ছিল না; বরং পরিগ্রহণকারী তাজাল্লীরই ফল ছিল। উহার ফলে বৃক্ষের মধ্যে আওয়ায উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে কালামের তাজাল্লীও ঠিক সেইরূপই বটে। বলাবাহুল্য, যদিও সাদৃশ্য পরিগ্রহণমূলক তাজাল্লী আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত গুণ নহে, কিন্তু অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থরাজির তুলনায় আল্লাহ্‌র গুণের সহিত ইহার এক বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং, পরোক্ষভাবে উহাকে আল্লাহ্‌র কালাম বলা ঠিক হইতেছে। এতদ্ভিন্ন উহাতে প্রকৃত কালামে এলাহীর যথার্থ লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তন্মধ্যে একটি লক্ষণ ইহাও যে, উহাতে অসীম ও অনুপম স্বাদ পাওয়া যায়। কেননা, যথার্থ কালামে এলাহীর সাথে ইহার চরম পর্যায়ের নৈকট্য রহিয়াছে। যাহাহউক, আশা করি, ইহাতে প্রশ্নের উত্তর হইয়া গিয়াছে। হযরত সুলতান নেযামুদ্দীন (রঃ)-এর সেই কালামে এলাহীর স্বাদ এখনও স্মরণ আছে। সোব্‌হানাল্লাহ্! এমন মহামানবদের সম্বন্ধেই শেখ সা'দী বলিতেছেনঃ

الست از ازل همچناں شان بگوش ـ بفریاد قالوا بلٰی در خروش

“যাহাদের কান الست -এর আওয়াযের সহিত পরিচিত। তাঁহাদের ঠোঁটের উপর قَالُوْا بَلٰے -এর ফরিয়াদ রহিয়াছে, তাঁহাদের অন্তরে সেই আওয়াযই গুঞ্জন করিতেছে।”

শিশুদের শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞ আলেম নিযুক্ত থাকা উচিতঃ কানপুরের এক ছাত্র ضَرْبٌ শব্দের অর্থ ‘দৃষ্টান্ত দেওয়া’ অস্বীকার করিয়া বসিল। আমি তাহাকে বলিলামঃ তুমি তো ضَرْبٌ শব্দের এই অর্থ পড়িয়াছ। সে বলিলঃ কোন্ কিতাবে? আমি বলিলামঃ মুনশাএ'বে। ইহাতে সে খুব বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলঃ “মুনশাএ'বে এই অর্থ কখনও উল্লেখ নাই।” আমি উক্ত কিতাব আনাইয়া তাহাকে বলিলামঃ ইহাতে ضَرْبٌ -এর অর্থ যাহা লিখিত আছে পাঠ কর। সে পড়িল اَلضَّرْبُ ‘প্রহার করা’, ‘যমীনের উপর চলা’ এবং ‘বর্ণনা করা’—বলিয়াই থামিয়া গেল। আমি বলিলামঃ পূর্ণ না করিয়া থামিলে কেন? সম্মুখের দিকে পড়। তখন সে সামনের দিকে পড়িতে আরম্ভ করিল, مثل تصریفه আমি বলিলামঃ مثل تصریفه কেমন করিয়া বলিলে? সে বলিলঃ “অমুক মৌলবী ছাহেব এরূপই তো পড়াইয়াছিলেন।” আমি বলিলামঃ খোদার বান্দা! তুমি চিন্তা করিয়া দেখ নাই যে, সব জায়গাই শুধু تصریفه এখানে مثل تصریفه কেন হইবে? তোমার مثل (দৃষ্টান্ত) শব্দটি বর্ণনা করার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ضَرْبٌ -এর তৃতীয় অর্থ হইবে, ‘দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা।’ সে বলিলঃ “হাঁ, এখন তো মনে হইতেছে—বড় ভুলের মধ্যে ছিলাম।” এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম, শিশুদের তা'লীমের জন্য উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ আলেম নিয়োগ করা উচিত। অন্যথায় অনেক কথা ভুল শিক্ষা দেওয়া হইবে। বস্তুত বাল্যকালে ভুল মনের মধ্যে বসিয়া যায়।

যাহাহউক, যাহা বিরল তাহা না থাকারই শামিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্টরূপে স্মরণ থাকে না। কেহই একথা বলে না যে, স্মরণ থাকার জন্য সমস্ত বিশেষ ও নির্দিষ্ট বিষয়সহ স্মরণ থাকা আবশ্যক ; বরং বিষয়টি মোটামুটিভাবে স্মরণ থাকাই যথেষ্ট মনে করা হয়।

বাধ্যতামূলক বিশ্বাস ধর্তব্য নহেঃ সুতরাং এইরূপে اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতির বিষয়টিও সকলেরই স্মরণ আছে, নাস্তিক যদিও মুখে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে সেও তাহা স্বীকার করে। যেমন, কোন কোন নাস্তিক পরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে।

এক নাস্তিক বলিয়াছেঃ “আমি আমার অন্তর হইতে প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব লোপ করিবার অভ্যাস আরম্ভ করিলাম। কিছু দিনের অভ্যাসে আমি যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব অন্তর হইতে লোপ করিতে সমর্থ হইলাম! ইহা শুধু অভ্যাসের কাজ, ইহাতে পারদর্শিতার কিছু নাই। কিছু দিন পরে আমার অনুভূতি জাগিল, সব কিছুকেই তো অন্তর হইতে লোপ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এবার নিজের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারি কিনা অভ্যাস করিয়া দেখা যাক। কিছু দিনের অভ্যাসে তাহাও করিতে সক্ষম হইলাম। আবার মনে জাগিল, এখন শুধু একটি বস্তু বাকী রহিয়াছে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব লোপ করা, দীর্ঘকালব্যাপিয়া সেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না। অবশেষে প্রত্যেক সৃষ্টিই যে মহাশক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্ট, তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। অতঃপর তাঁহার একত্ব অন্তর হইতে লোপ করিতে অভ্যাস ও চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তাহাতেও কৃতকার্য হইলাম না। অবশেষে আল্লাহ্‌র একত্বও মানিয়া লইতে হইল। অতএব, দেখুন, اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতির বিষয়টি এমনভাবে স্মরণ আছে যে, মানুষ অন্তর হইতে নিজের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁহার একত্বের বিশ্বাসকে মন হইতে লোপ করিতে পারে না। ইহার অধিক স্মরণ আর কি হইতে পারে?

কিন্তু এই বিশ্বাস বাধ্যতামূলক কার্য, ঈমানের জন্য ইহা যথেষ্ট নহে। ইচ্ছাকৃত বিশ্বাসের নাম ঈমান। অর্থাৎ, ইচ্ছা করিয়া অন্তরকে সে দিকে ঝুঁকাইয়া দিলেই তাহা ঈমান বলিয়া গণ্য হইবে। মক্কার কাফের এবং কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বাধ্যতামূলক জ্ঞানই বিদ্যমান ছিল। ইহাই اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ এবং يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ আয়াতদ্বয়ে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা ইচ্ছাকৃত বিশ্বাস ছিল না বলিয়াই তাহাদিগকে কাফের বলা হইয়াছে এবং এই কারণেই আমি বলিয়াছিলামঃ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ -এর মর্ম এই যে, ভবিষ্যদ্বাণী মু'জেযা হওয়া এবং মু'জেযা নবুওয়তের আলামত হওয়ার কথা কাফেরেরা জানে না, কিংবা জানিলেও তদনুযায়ী আমল করে না। অথচ এল্‌ম ও আমলের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রহিয়াছে। যদিও তাহা কেবলমাত্র অবশ্য করণীয় বলিয়া বিশ্বাসের পর্যায়েই হউক। সুতরাং, এই পর্যায়ের বিশ্বাসকেও ইচ্ছাকৃত বিশ্বাস বলা যায় এবং ঈমানের জন্য এতটুকুই শর্ত।

সারকথা এই যে, এই শেষোক্ত বাক্যের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কারণ বর্ণনা করিতেছেন যে, নবুওয়তের ভূরিভূরি প্রমাণ এবং মু'জেযা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কাফেরেরা হুযূর (দঃ)-এর নবুওয়তের প্রতি কেন বিশ্বাস স্থাপন করে না?

মু'জেযার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তাঃ বন্ধুগণ! এখানে আরও একটি কথা বুঝিয়া লউন, মু'জেযার প্রয়োজনীয়তা কেবল সাধারণ লোকেব জন্য। জ্ঞানবান লোকের জন্য সমষ্টিগতভাবে হুযূর (দঃ)-এর যাবতীয় অবস্থা এবং মহান ব্যক্তিত্বই এক অনুপম মু'জেযা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেনঃ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهٗ عَرَفْتُ اَنَّهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ

“আমি তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করা মাত্রই বুঝিতে পারিলাম যে, এই চেহারা মিথ্যাবাদী নহে।” নবীর চেহারা অসাধারণ কেন হইবে না ? যখন ওলীগণের চেহারার অবস্থা এইরূপ ঃ

مرد حقانی کی پیشانی کا نور ـ کب چھپا رهتاهے پیش ذی شعور

“জ্ঞানী লোকের দৃষ্টির সম্মুখে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের ললাটদেশের জ্যোতি গোপন থাকিতে পারে না।”

نور حق ظاهر بود اندر ولی ـ نیك بیں باشی اگر صاحب دلی

“আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের জন্য আল্লাহ্‌র নূর প্রকাশ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি তুমি সত্যদর্শী অন্তরের অধিকারী হও।” আর এই নূর দেখিয়াই উপলব্ধি করা যায়, বর্ণনায় আসে না। এক আল্লাহ্‌ওয়ালা বলেন ঃ

گر مصور صورت آں دلستاں خواهد کشید ـ لیك حیرانم که نازش را چناں خواهد کشید

“যদি চিত্রকর সেই চিত্তবিনোদী মাহ্‌বুবের চিত্র অঙ্কন করিতে চায়, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না—তাহার ভাব-ভঙ্গির চিত্র কিরূপে আঁকিবে।”

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলেমের “মু’জেযা নবুওয়তের প্রমাণ নহে” কথার অর্থ ইহাই। কেননা, জ্ঞানবান ও বোধমান লোকের পক্ষে মু’জেযাই নবুওয়তের একমাত্র প্রমাণ নহে। হুযূরের আখলাক এবং কার্যকলাপও তাঁহার নবুওয়তের প্রমাণ। তবে সর্বসাধারণ লোকের জন্য মু’জেযাই জরুরী, বস্তুত কাফেরেরা সাধারণ লোকই বটে। দুনিয়াতে জ্ঞানবান লোকের সংখ্যা কম এবং সাধারণ লোকের সংখ্যা বেশী। এই জন্যই নবীর জন্য মু’জেযার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সাধারণ লোকের জন্যই যখন মু’জেযা নবীর নবুওয়তের প্রমাণ, তবে জ্ঞানবান লোকের জন্য কেন হইবে না ? তাহাদের জন্য তো আরও উত্তমরূপে নবুওয়তের প্রমাণ হইবে।

মহান ভবিষ্যদ্বাণীর তফ্‌সীল ঃ এখন আমি সংক্ষেপে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধীয় ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। ইতিহাস গ্রন্থে তাহা বিস্তারিত বর্ণিত আছে। হিজরতের পূর্বে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে একবার পারসিক ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। পারসিকরা জয়লাভ করিল। ইহাতে মক্কার কাফেরেরা সন্তুষ্ট হইয়া মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিল ঃ “তোমরা কিতাবধারী হওয়ার দাবী করিতেছ। পারসিকরা তোমাদের মতে মুশ্‌রিক। আমরাও মুশ্‌রিক। কিতাবধারী রোমানদের উপর পারসিকদের জয়লাভ আমাদের পক্ষে শুভলক্ষণ বটে! অর্থাৎ, আমরাও অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর জয়লাভ করিব, ইহা তাহারই পূর্বাভাস।”

কাফেরদের মুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ পাক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, আগামী নয় বৎসরের মধ্যেই রোমানগণ পারসিকদের উপর জয়লাভ করিবে। ইহা অতিবড় ভবিষ্যদ্বাণী, সাধারণ কথা নহে। কেননা, দুইটি বিশাল রাজ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক। আবার ভবিষ্যদ্বাণীটিও বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত এবং সাধারণ জ্ঞানের বাহিরে। কেননা, পারস্য-রাজ্যের তুলনায় রোম-রাজ্য ক্ষুদ্রও বটে এবং নব-প্রতিষ্ঠিতও বটে। পারস্যের এই বিশাল সাম্রাজ্য আবহমানকাল হইতে একই বংশ কর্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন ঃ (আল্লাহ্‌ জানেন ইহার সত্যতা কতটুকু।) হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের পৌত্র কিংবা প্রপৌত্র কাইয়ুমরস এই

সাম্রাজ্যের প্রথম বাদশাহ্ ছিলেন। তখন হইতে শেষ পর্যন্ত রাজত্ব একই বংশের হাতে রহিয়াছে। কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণে ইহার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। সুতরাং, ইহার ধনভাণ্ডার অফুরন্ত। সহস্র সহস্র বৎসরের রাজত্বের ফলে ইহার ধনভাণ্ডার যে অফুরন্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার সেনাবাহিনী ছিল খুব সুদৃঢ় ও সুশিক্ষিত। তাহাতে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত বীর যোদ্ধাগণ বিদ্যমান ছিল। আবার রাজ্যের পরিধি সুপ্রশস্ত ছিল বলিয়া ইহার প্রজাসংখ্যা ছিল অগণিত। কাজেই সৈন্যসংখ্যাও অধিক হওয়া স্বাভাবিক। অতএব, এরূপ একটি বিরাট শক্তিশালী রাজ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যে, তাহা একটি নব-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যের নিকট পরাজয় বরণ করিবে, অতি বড় ভবিষ্যদ্বাণী বটে।

আবার কোরআনের ভাষা সুস্পষ্ট, কোন গোলমেলে ভবিষ্যদ্বাণী নহে। যেমন আজ-কাল জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে। প্রথমত, তাহারা সচরাচর সংঘটিত হয়—এমন ঘটনা সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে। যেমন বলেঃ "এই ব্যক্তি পথে কোথাও কিছু খাইয়াছে।" বলাবাহুল্য, ইহা হইতে কোন্ মানুষ মুক্ত আছে? সকলেই পথে কিছু না কিছু খাইয়াই থাকে। আর কিছু না হইলেও অন্তত পান খায়। অথবা বলেঃ "এই ব্যক্তি জঙ্গলে কোন স্থানে প্রস্রাব করিয়াছে।" সফরে এরূপ প্রায়ই ঘটে। আবার তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী কখনও নির্দিষ্টরূপে না হইয়া গোলমেলে ও অস্পষ্ট হইয়া থাকে।

কোন জ্যোতিষীকে যদি কেহ প্রশ্ন করে, "আমার স্ত্রী গর্ভবতী। বল তো ছেলে জন্মিবে না মেয়ে?" তখন সে মুখে কোন উত্তর না দিয়া একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দেয়, "ছেলে না মেয়ে।" যদি ছেলে সন্তান হয়, তখন সে বলেঃ আমি বলি নাই যে, "ছেলে হইবে, মেয়ে নহে।" আর মেয়ে সন্তান জন্মিলে বলে, আমি তো প্রথমেই বলিয়াছিলাম ছেলে নহে—মেয়ে জন্মিবে। আর গর্ভপাত হইয়া গেলে বলেঃ আমি তো ইহাই বলিয়াছিলাম যে, ছেলেও নহে মেয়েও নহে। লিখনে তো স্বর নাই। অতএব, সে ঘটনা ঘটিবার পরে লিখিত বাক্যের অনুকূলে স্বর প্রয়োগে উচ্চারণ করিয়া বলিয়া দেয়। স্বর এবং উচ্চারণ অর্থ বা ভাব প্রকাশে খুব সাহায্য করিয়া থাকে। এই কারণেই হানাফী মতে ছাহাবীর আমল তাঁহার রেওয়ায়তের বিপরীত হইলে সেই রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা, আমরা হুযূরের স্বর এবং লক্ষণাদি শুনিও নাই, দেখিও নাই। ছাহাবাগণ স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন। অতএব, সম্ভবত হাদীসের শব্দ হইতে আমরা যে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি তাহা ঠিক নহে। ইহা অপ্রাসঙ্গিকরূপে বলিয়া ফেলিলাম।

আমি বলিতেছিলাম, কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় গোলমেলে এবং অস্পষ্ট নহে। এতদ্ভিন্ন কিয়ামত পর্যন্ত ইহার সীমা নির্দেশ করেন নাই। سَيَغْلِبُوْنَ শব্দে س যোগ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—তাহা অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে। আবার فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ "ন্যূনাধিক নয় বৎসরের মধ্যে" বলিয়া ইহার সময় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নয় বৎসরের মধ্যেই রোমানগণ পারসিকদিগকে পরাজিত করিবে।

ইহা পাগলের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় নহে। এক পাগল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলঃ "অমুক স্ত্রীলোকের সহিত আমার বিবাহ হইবে। ঘটনাক্রমে তাহার বিবাহ অন্যত্র হইয়া গেল।" সে পুনরায় দাবী করিল, "সে বিধবা হইবে এবং আমার সহিত বিবাহিতা হইবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও হইল না। পাগলটি আক্ষেপ লইয়াই কবরে চলিয়া গেল। তখন তাহার অনুগামীরা এরূপ অর্থ করিল যে, উক্ত স্ত্রীলোকের সন্তানদের মধ্যে কেহ এই ভবিষ্যদ্বক্তার কোন সন্তানের বিবাহ অধীনে

আসিবে। সোব্‌হানাল্লাহ্‌! এমন উদ্ভট অর্থ গ্রহণেও যদি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়, তবে প্রত্যেকের ভবিশ্যদ্বাণীই সত্য হইয়া যাইবে। কাহারও কোন কথাই মিথ্যা হইবে না।

কাজেই বলি, কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী এরূপ নহে; বরং পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে রোমানদের বিজয়ী এবং পারসিকদের পরাজিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এই জন্য করিয়াছেন যে, মক্কার কাফেরেরা পারসিকদের জয়ে এই শুভ লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিল যে, আমরাও এইরূপে মুসলমানদের উপর জয় লাভ করিব। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের প্রমাণের অন্তর্গত বাক্যগুলির উপর কোন মন্তব্য করেন নাই যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর জয় লাভ করার দ্বারা তাহার সদৃশ সম্প্রদায়ের বিজয় অপর সদৃশ সম্প্রদায়ের উপর জয় লাভ করা অবধারিত নহে; বরং এরূপ বলিয়া দিয়াছেন যে, শীঘ্রই ইহার বিপরীত ঘটিবে। রোমানরা পারসিকদের উপর জয় লাভ করিবে। তখন তোমাদের ইহার বিপরীত লক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। সোব্‌হানাল্লাহ্‌! কেমন বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গি । ইহা তাহাদের জন্য দাঁতভাঙ্গা উত্তর।

অতঃপর মুসলমানদিগকে আর একটি প্রকৃত ও যথার্থ আনন্দ সংবাদ শুনাইতেছেন। রোমানদের জয়লাভে তোমরা তো এই জন্য আনন্দিত হইবে যে, তাহাতে কাফেরদের শুভ লক্ষণ বিবেচনা প্রকাশ্যভাবে নিরর্থক প্রমাণিত হইয়া যাইবে এবং এতদসঙ্গে সেই মুহূর্তেই তোমরা যথার্থ আনন্দও লাভ করিবেঃ

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ

"সেদিন মক্কার কাফেরদের উপর জয় লাভ করিয়া যথার্থ আনন্দও লাভ করিবে।" পক্ষান্তরে কাফেরেরা এখন শুধু কাল্পনিক আনন্দ ভোগ করিতেছে। আর ভবিষ্যতে তাহারা যথার্থ অপমানিত ও অপদস্থ হইবে। অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলার এখানে এক সঙ্গে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। (১) পারসিকদের উপর রোমানদের জয়লাভের। (২) এবং কাফেরদের উপর মুসলমানদের জয়লাভের। ইহা কাফেরদের মন্তব্যেরই উত্তর ছিল।

হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসাপদ্ধতিঃ কোরআন মজীদ যেহেতু রূহানী চিকিৎসা, সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বরং ইহার পরে বলিতেছেনঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী সংঘটিত হওয়ার ফলে কাফেরদের ঈমান আনয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু তবুও তাহারা অবিশ্বাসীই থাকিয়া যাইবে। ইহার কারণ জানিয়া লওয়া উচিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল লক্ষণেরই চিকিৎসা করেন না; মূল রোগেরও চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এই রূহানী চিকিৎসার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করি না। পক্ষান্তরে দৈহিক চিকিৎসার প্রতি তো আমরা এত গুরুত্ব প্রদান করি যে, স্বভাবের সামান্য একটু পরিবর্তন ঘটিলে চিকিৎসক খুঁজিতে আরম্ভ করি। কিন্তু রূহানী চিকিৎসা সম্বন্ধে এত অমনোযোগী যে, তৎপ্রতি লক্ষ্যই করি না। এ সম্বন্ধে মাওলানা রূমী বলিতেছেনঃ

چند خوانی حکمت یونانیاں   حکمت ایمانیاں را هم بخواں
صحت ایں حس بجوئید از طبیب   صحت آں حس بجوئید از حبیب

"ইউনানী চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়িয়াছ। ঈমানদারগণের চিকিৎসা বিজ্ঞানও পড়। দৈহিক সুস্থতা চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী, আর রূহানী সুস্থতা সেই প্রিয় হাবীবের (খোদার রাসূলের) মুখাপেক্ষী।"

তিনি দৈহিক চিকিৎসায় অভিজ্ঞ যিনি মূল রোগের চিকিৎসা করেন। আর যিনি লক্ষণের চিকিৎসা করেন তিনি অনভিজ্ঞ। কেহ কাশির অভিযোগ করিলে ‘মুলঠি’ এবং জ্বরের অভিযোগ করিলে ‘গুলে-গাওজবান’ ব্যবস্থা করিয়া দেন। কাশি ও জ্বরের মূল কারণ কি, চিন্তা করিয়া দেখেন না। আসলে সেই মূল কারণেরই চিকিৎসা হওয়া উচিত।

এই শ্রেণীরই এক চিকিৎসক আমাদের মহল্লার নিকটে বাস করেন। তিনি এলমে তিব্বের দুই-তিনখানি উর্দু কিতাব পড়িয়াই চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন! মজার ব্যাপার এই যে, তিনি রোগীদিগকে বলিয়াছেনঃ “অপর কোন হাকীম দ্বারা রোগ নির্ণয় করাইয়া আস। ঔষধ আমি ব্যবস্থা করিব।” কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারিত—আপনি রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে চিকিৎসা করিবেন কিরূপে? রোগ নির্ণয়ের পর রোগীর স্বভাব নির্ণয়েরও প্রয়োজন রহিয়াছে। চিকিৎসা গ্রন্থের ব্যবস্থাপত্র সকল রোগীর স্বভাবের অনুকূল হয় না, যদিও কোন বিশেষ অবস্থায় রোগের অনুকূল হয় বটে। রোগ নির্ণয়ের পর অভিজ্ঞ চিকিৎসকও চিকিৎসা পুস্তক হইতেই ব্যবস্থাপত্র দিবেন এবং তৎসঙ্গে তিনি রোগীর স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পুস্তকের ব্যবস্থায় কিছু রদবদল অবশ্যই করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আদৌ রোগ নির্ণয় করিতে পারে না, সে এসমস্ত বিষয়ের প্রতি কেমন করিয়া লক্ষ্য রাখিবে? তবে এতদসত্ত্বেও সর্বসাধারণ তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইবার কারণ এই যে, রোগ নির্ণয় ক্ষণেকের ব্যাপার। একবার শিরা দর্শনেই হইয়া যায়। আর চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। অভিজ্ঞ চিকিৎসককে বার বার ডাকাইলে ভিজিট-ফি এবং যাতায়াত খরচ অনেক লাগিয়া যায়। সুতরাং, অভিজ্ঞ চিকিৎসককে একদিনের জন্য ডাকাইয়া রোগ নির্ণয় করিয়া লয় এবং সস্তা মূল্যের হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে থাকে।

তরজমা পাঠ করিয়া চিকিৎসক হওয়া সম্বন্ধে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। কানপুরের নেযামী লাইব্রেরীতে একখানা পত্র আসিল, পত্রখানার বানানও শুদ্ধ ছিল না। ইহাতে লিখিত ছিল, “আমি একজন মুফ্‌তী, আমার নিকট শূরহে বাকিয়্যাহ্‌ (শরহে বেকায়াহ্‌) কিতাবের উর্দু তরজমা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি মাস্‌আলার জবাব দিয়া থাকি, ফতওয়াও লিখি, ওয়াযও করি। আমার নিকট ওয়াযের কিতাবও আছে। এখন জনসাধারণ অনুরোধ করিতেছে—“আপনার দ্বারা সর্বপ্রকারের ফয়েয ও উপকার হইতেছে। কিন্তু ‘তিব্ব’ সম্বন্ধে আপনি কোনই ফয়েয দিতেছেন না। ইহাও আরম্ভ করুন।” অতএব, যদি আপনার লাইব্রেরীতে ‘তিব্বে এহ্‌সানী’ নামক উর্দু কিতাব থাকে, তবে আমার নামে ইহার এক কপি প্রেরণ করুন। যেন এই ফয়েযটিও আমি জারি করিয়া দিতে পারি।”

তরজমা পাঠকারীদের আরও একটি গল্প বলিতেছি—জনৈক গায়রে মুকাল্লেদ্‌ (মায্‌হাবে আস্থাহীন) ব্যক্তি নামাযে ইমামতি করিলে হেলিয়া-দুলিয়া নামায পড়াইতেন। একাকী নামায পড়িলে একটুও নড়িতেন না। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেনঃ হাদীসে বর্ণিত আছে مَنْ اَمَّ مِنْكُمْ فَلْيُخَفِّفْ ইহার তরজমা লিখিত ছিল, “ইমাম হইলে هلكے (হাল্‌কে) অর্থাৎ, সংক্ষেপে নামায পড়িবে।” কিন্তু সেই ব্যক্তি শব্দটিকে هلكے (হেল্‌কে) অর্থাৎ, ‘নড়িয়া-চড়িয়া’ অর্থ করিয়াছেন। কাজেই তিনি ইমাম হইলে খুব ‘হেলিয়া-দুলিয়া’ নামায পড়াইতেন। এমন মূর্খতা হইতে খোদা রক্ষা করুন।

আর এক দুনিয়াদার মৌলবীর ফতওয়া আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, সে এক ব্যক্তিকে ফতওয়া লিখিয়া দিয়াছে, “শাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয।” দলিল পেশ করিয়াছেনঃ “বিবাহিতা স্ত্রীর

মাতাকে শাশুড়ী বলে ; যাহাকে জায়েয ও শুদ্ধরূপে বিবাহ করা হয়, সে-ই বিবাহিতা স্ত্রী হয়। এই ব্যক্তির স্ত্রী মূর্খ, অনেক সময় কুফরী কালাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। বিবাহের সময় তাহার ঈমান নূতন করিয়া লওয়া হয় নাই। অতএব, তাহার সহিত বিবাহ শুদ্ধ হয় নাই, কাজেই তাহার মাতাও শাশুড়ী নহে।” হতভাগা শুধু ধারণা-অনুমানের উপর বিবাহই নষ্ট করিয়া দিল। “সহবাসকৃতা স্ত্রীর মাতা হারাম হওয়ার” মাসআলাটিকে এই বলিয়া উড়াইয়া দিল যে, ইহা শুধু আবু হানীফার মত, আমি তাহা মানি না।

এই ঘটনাগুলি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া ফেলিয়াছি। আমার মূল বক্তব্য ছিল—সস্তা মূল্যের হাতুড়ে চিকিৎসক লক্ষণের চিকিৎসা করে, কারণের চিকিৎসা করে না।

ইহাদের দৃষ্টান্ত ঠিক সেইরূপ—যেমন কোন গ্রামে এক ব্যক্তি অতি উচ্চ এক তাল গাছে চড়িয়া বসিল। এখন নীচের দিকে দৃষ্টি করিয়া নামিতে ভয় হইতে লাগিল। সম্ভবত সে শুধু উঠিতেই জানে, নামিতে জানে না। তরীকতের পথেও এমন কতক লোক আছেন—যাঁহারা উন্নতি করিয়া যাইতেছেন বটে ; কিন্তু নিম্নগামী হন না। যেমন, ‘মাজযূব’ অর্থাৎ, আত্মহারা লোক ; ইঁহারা কামেল নহেন ; কামেল তাঁহারাই যাঁহারা ঊর্ধ্বগামীও হইতে পারেন, নিম্নগামীও হইতে পারেন। যাহাহউক, লোকটি গাছের উপর হইতে চীৎকার করিতে লাগিল ঃ “কোনরূপে আমাকে নামাও।” সমস্ত মানুষ অস্থির হইয়া পড়িল, কিরূপে নামাইবে। অবশেষে “বুদ্ধির ঢেঁকি”কে ডাকিয়া আনিল। গ্রামের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত ছিল। প্রথমত সে একবার গাছের আগাগোড়া দেখিয়া লইল এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল ঃ বস্‌, বুঝিতে পারিয়াছি। একটা লম্বা রশি আন এবং তাহার কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া তাহার কোমরের সহিত বাঁধিতে বল। কথামত কাজ করা হইল। অতঃপর সে বলিলঃ রশি ধরিয়া তোমরা জোরে হেঁচ্‌কা টান দাও। যেমন কথা তেমন কাজ। বেচারার দেহ তো টানের চোটে নীচে চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার প্রাণপাখী উপরের দিকে উড়িয়া গেল। লোকে বুদ্ধির ঢেঁকিকে বলিল ঃ ব্যাপার কেমন হইল ? সে বলিল ঃ “তাহার অদৃষ্ট, আমি তো এই উপায়ে অনেক মানষুকে কূপ হইতে বাহির করিয়াছি।” সেই সস্তা মূল্যের হাতুড়ে চিকিৎসকদের অবস্থাও এইরূপ। কেবল বাহ্যিক চিকিৎসা করিয়া থাকে। কারণের প্রতি লক্ষ্য করে না। যেমন, সেই বোকা একটিমাত্র উপায় মনে রাখিয়া উহাকে কূপেও ব্যবহার করিয়াছে—গাছেও ব্যবহার করিয়াছে।

এক হাতুড়ে বৈদ্য আমাকে হার্নিয়া রোগের ঔষধ দিল, তাহা কানের ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। আমি হাতুড়ে বৈদ্যের চিকিৎসা কখনও গ্রহণ করি না, কিন্তু তখন ধারণা করিলাম, বাহ্য প্রয়োগের ঔষধে ক্ষতি কি ? جوں قضا آید طبیب ابله شود “মৃত্যু যখন আসে, তখন চিকিৎসকও বুদ্ধিহীন হইয়া যায়।” আমি উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলাম, ফলে আমার সমস্ত দেহে শৈত্য এত প্রবল হইয়া পড়িল যে, আমার শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপও অনেক কমিয়া গেল। অবশেষে আমি ইহা ত্যাগ করিয়া হাকীমের আশ্রয় নিলাম। কয়েকদিন পর্যন্ত বিভিন্ন ঔষধ সেবনে আমার শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ নিজের অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

কামেল পীরের পরিচয় ঃ দৈহিক চিকিৎসাক্ষেত্রে যেমন কতক হাতুড়ে চিকিৎসক রহিয়াছে, তদ্রূপ তরীকতের পথেও কোন কোন পীর অশিক্ষিত এবং হাতুড়ে হইয়া থাকেন। এই কারণে আমি পীরে কামেলের পরিচয় বলিয়া দিতেছি। তন্মধ্যে এক পরিচয় পীরের সহিত সংস্রবের পূর্ববর্তী, আর এক পরিচয় পরবর্তী। সংস্রবের পূর্বে যাচাই করিয়া দেখা উচিত, যুগের অন্যান্য

কামেল লোকগণ তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন। যদি তাঁহারা কামেল বলিয়া মত প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে কামেলই মনে করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, সংশ্রবের পর লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখনই তাঁহার হাতে বাইআত করার জন্য তাড়াহুড়া করিবে না ; বরং তাঁহার নিকট নিজের অবস্থা ব্যক্ত করিয়া কার্য আরম্ভ কর। যদি তিনি বাইআত ভিন্ন কাজের নির্দেশ না দেন, তবে তাঁহাকে অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত মনে করিবে। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পীরের অনুসন্ধান করিতে থাক। অন্য পীরের দরবারেও প্রথমে কাজ আরম্ভ কর এবং নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত করিতে থাক। লক্ষ্য করিতে থাক—তাঁহার প্রদত্ত উত্তরে মনে শান্তি ও তৃপ্তি হয় কিনা ? শান্তি হইলে মনে করিবে, তিনি কামেল এবং মন্‌যিলে মক্‌ছুদ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন। আর শান্তি না হইলে মনে করিবে, ইনিও অপূর্ণ এবং অনভিজ্ঞ। সালেক বা খোদাপন্থীদের প্রকৃত অবস্থা বুঝেন না। এই মর্মেই মাওলানা বলিয়াছেন ঃ

وعدها باشد حقيقى دلپذير ـ وعدها باشد مجازى تاسه گير

"প্রকৃত ওয়াদা শান্তিদায়ক এবং অপ্রকৃত ওয়াদা অস্থিরকারক হইয়া থাকে।"

تاسه گير শব্দের অর্থ অস্থিরতা, অপ্রকৃত ওয়াদায় অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে সত্য ওয়াদা পাইলে মনে শান্তি আসে। হাদীস শরীফেও বর্ণিত আছে ঃ

اَلصِّدْقُ طَمَانِيْنَةٌ وَّالْكِذْبُ رِيْبَةٌ

"সত্যে শান্তি এবং অসত্যে অস্থিরতা।"

وعدهٔ اهل كرم گنج رواں ـ وعدهٔ نا اهل چوں رنج رواں

"দাতা ব্যক্তির ওয়াদা ধন দান, আর অমানুষের ওয়াদা কষ্টদায়ক হইয়া থাকে।" ইহার দ্বারা আরেফ শীরাযী এই শ্রেণীর অশিক্ষিত পীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিম্নের কবিতায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও এই শ্রেণীর পীরের তত্ত্বজ্ঞানহীন এবং ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার একটি প্রমাণ বটে।

خستگاں را كه طلب باشد وقوت نه بود ـ گر تو بيداد كنى شرط مروت نه بود

"যে সমস্ত দুরবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে কামনা আছে, কিন্তু শক্তি নাই, যদি তুমি তাহাদের প্রতি বে-ইনসাফী কর, তবে তাহা মনুষ্যত্ব বিরোধী হইবে।" কোন পীর প্রত্যেক মুরীদকে বলিয়া দেয়, আমার নিকটে ছয় মাস থাক। পরিবার-পরিজনবিশিষ্ট লোক হইলে তাহাকেও ছয় মাস থাকার জন্য বলা হয়। সে বলে ঃ "এতদিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।" তখন পীর ছাহেব বলেন ঃ "তবে আমার নিকট আসিয়াছ কেন ?" ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, এই পীর তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। কোন চিকিৎসক গরীব রোগীকে পঞ্চাশ টাকার ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। রোগী অপারকতা প্রকাশ করিলে যদি চিকিৎসক বলেন যে, "তবে আমার নিকট আসিয়াছ কেন ?" এমতাবস্থায় বুঝিতে হইবে, এই চিকিৎসক অভিজ্ঞ নহেন। তিনিই পূর্ণ জ্ঞানী চিকিৎসক, যিনি নামমাত্র মূল্যে গরীব লোকের চিকিৎসা করিয়া দেন।

আমাদের পীর ছাহেব (রঃ) জনৈক ধনী লোককে কোন রোগের চিকিৎসায় জামের কচি পাতা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। আর এক ধনীকে 'ওগাছ বেলের' পাতা দুধে সিদ্ধ করিয়া পান করিতে বলিয়াছিলেন। আর এক ব্যক্তিকে সেমাই বলক দিয়া খাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার

ব্যবস্থাপত্রে সর্বদা দুই-এক পয়সা মূল্যের ঔষধ থাকিত। কোন কোন সময় বিনামূল্যের বনজ ঔষধ বলিয়া দিতেন। দেওবন্দের চিকিৎসকগণ বলিতেনঃ ইহা চিকিৎসা নহে, মাওলানার কারামত। এমন সাধারণ ঔষধে ফল হইয়া যায়। মাওলানা তাহা শুনিয়া হাসিতেন এবং বলিতেনঃ 'ইহারা তিব্ব শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু জানেই না।'

অতএব, তত্ত্বজ্ঞানী লোকের সন্ধান কর। তত্ত্বজ্ঞানী লোক পাইলে তাঁহার আনুগত্য কর এবং তাঁহার সম্মুখে নিজের মতামতকে বিলুপ্ত করিয়া দাও। পূর্বে মুরীদদের আনুগত্যের এমন অবস্থা ছিল যে, যদি পীর ছাহেব কোন মুরীদকে বলিতেনঃ "তুমি অপর কাহারও নিকট হইতে তা'লীম হাসিল কর।" মুরীদ তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইয়া যাইত এবং পীরের কথা মান্য করিলে তাহার উপকার হইবে মনে করিত। মনে করিত, আমি তাঁহার নির্দেশে যাঁহার কাছেই যাই না কেন—তাঁহারই ফয়েয লাভ করিতে থাকিব।

এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা গঙ্গোহী রাহেমাহুল্লাহ্‌র নিকট বাইআতের আবেদন জানাইল। তিনি বলিলেনঃ "তুমি মাওলানা কাসেম ছাহেবের নিকট বাইআত হও, তিনি বেশী কামেল।" সে মাওলানা কাসেম ছাহেবের দরবারে গেল। তিনি বলিলেনঃ তুমি মাওলানা গঙ্গোহী ছাহেবের নিকট যাইয়া বাইআত হও, তিনি অধিক কামেল। সে পুনরায় হযরত গঙ্গোহীর দরবারে গেল, তিনি আবার মাওলানা কাসেম ছাহেবের দরবারে পাঠাইলেন, এইরূপে কয়েকবার বেচারাকে দৌড়াইলেন। অবশেষে একদিন গঙ্গোহ্‌ কিংবা নানুতায় উভয় মহাপুরুষের সম্মিলন হইল। উভয়ে মসজিদের দিকে যাইতেছিলেন, সেই লোকটি রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিলঃ "এখন তোমরা একত্রিত হইয়াছ, আমার সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া লও এবং যেকোন একজন আমাকে বাইআত কর। এবিষয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমি পথ ছাড়িব না।" তখন উভয়ের মধ্যে কোন একজন তাহাকে বাইআত করিয়া লইলেন।

কিন্তু আজ-কালের অবস্থা এই যে, কাহাকেও অন্য কোন পীরের নিকট তা'লীম হাসিল করিতে পরামর্শ দিলে সে তাহা মানে না; বরং মনে করে যে, আমার সহিত টালবাহানা করা হইতেছে এবং ভুল পরামর্শ দিতেছে। আনুগত্যের এরূপ অবস্থা হইলে ফল কিরূপে লাভ করিবে? প্রসঙ্গক্রমে মধ্যস্থলে এই আলোচনা আসিয়া গিয়াছিল। আমি বলিতেছিলামঃ "তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই, যিনি মূল কারণের চিকিৎসা করেন।" শুধু লক্ষণের চিকিৎসা করেন না। তত্ত্বজ্ঞানীর ও কামেলের চিহ্ন ইহাই বটে।

সংসারানুরাগ ও পরকালের প্রতি উদাসীনতাঃ আল্লাহ্‌র কালামের এত মহিমা—উহাতে রোগ নির্ণয়ও থাকে, রোগের কারণসমূহের উল্লেখও থাকে এবং কারণের চিকিৎসাব্যবস্থাও দেওয়া হয়। এখানে কোন রোগীকে নৈরাশ্যজনক উত্তর দেওয়া হয় না। আফসোস! এমন পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয়! আর ইহার এত অমর্যাদা! আমরা ইহা পড়াশুনার প্রতি একটুও গুরুত্ব প্রদান করি না। ভূমিকা অনেক দীর্ঘ হইল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, এই রোগের কারণ বড় কঠিন ও গুরুত্ব প্রদানের যোগ্য।

আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে কাফেরদের অস্বীকৃতি ও বিমুখতার কারণ বর্ণনা করিতেছেন যে, ইহারা নবুওয়তের এত প্রমাণ বিদ্যমান থাকা এবং এত মু'জেযা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনয়ন করে না। ইহার কারণ এই যে, ইহারা কেবল দুনিয়াকেই চিনে। অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রতি তাহাদের বিশেষ পর্যায়ের মনোযোগ রহিয়াছে। আর তাহারা আখেরাতকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া

রহিয়াছে। কারণের সারমর্ম দুইটি বিষয়। (১) দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ। (২) আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। এখন নিজের অন্তরে যাচাই করিয়া দেখুন, কেহ কি ইহাকে রোগ মনে করেন ? চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, কেহই উহাকে রোগ মনে করেন না। কেহ কেহ মনে করিলেও অতি সাধারণ রোগ মনে করিয়া থাকেন। বস্তুত যে রোগকে সাধারণ মনে করা হয়, তাহা বড় ভয়ঙ্কর। যদিও হালীর কবিতা পড়িতে ইচ্ছা হয় না, তথাপি এই কবিতাগুলিতে যথার্থ বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

کسی نے یه بقراط سے جاکے پوچھا   مرض تیرے نزدیك مهلك هے كیا كیا
کها دکهه نهیں کوئی دنیا میں ایسا   كه جس كی دوا حق نے كی نه هو پیدا
مگر وه مرض جسكو آسان سمجهیں   كهے جو طبیب اسكو هذیاں سمجهیں

“দার্শনিক বোক্‌রাতকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মতে মারাত্মক রোগ কি কি ? তিনি বলিলেন ঃ দুনিয়াতে এমন কোন রোগ নাই যাহার ঔষধ আল্লাহ্ তা'আলা পয়দা করেন নাই। কিন্তু ঐ রোগই মারাত্মক, মানুষ যাহাকে সহজ মনে করে এবং চিকিৎসকের পরামর্শকে প্রলাপ মনে করে।”

প্রকৃতপক্ষে কঠিন রোগের চিকিৎসাও গুরুত্বের সহিত করা হইলে তাহা সহজ হইয়া যায়। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

مَا مِنْ دَآءٍ اِلَّا وَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَهٗ دَوَآءً

“আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ নাযিল করিয়াছেন।” কেবল যাহেরী রোগের জন্যই নহে; বরং বাতেনী রোগের জন্যও বটে। অবশ্য কোন রোগকে সাধারণ মনে করিয়া এড়াইয়া গেলে এবং উহার চিকিৎসা না করা হইলে কিংবা গুরুত্বের সহিত করা না হইলে তাহা বড়ই মারাত্মক। কেননা, ইহা ভিতরে শিকড় গজাইবে। অতঃপর গুরুত্ব এবং মনোযোগ প্রদান করিলেও কোন ফল হইবে না। সংসারানুরাগ ও পরকাল বিস্মৃতি রোগের সহিতও আমাদের অনুরূপ অবস্থা চলিতেছে। আমরা ইহাকে খুবই সাধারণ মনে করিতেছি। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী বুঝা যায়, দুনিয়ার মোহ এবং আখেরাতের প্রতি বিরাগ ও অমনোযোগিতাই কাফেরদের ঈমান আনয়ন না করার মূল কারণ। অথচ আমরা ইহাকে মামুলী বা সাধারণ মনে করিতেছি।

বলাবহুল্য, যাহা মূল তাহা শাখা অপেক্ষা অধিক দৃঢ়। যদি কুফরীর মূল দুনিয়ার অনুরাগ এবং আখেরাতের প্রতি বিরাগকে সহজ মনে করা হয়, তবে কি এই নিয়ম অনুসারে (নাউযুবিল্লাহ্) কুফরীকেও সাধারণ এবং সহজ বলিতে হইবে ? কখনই না। অতএব, বুঝা গেল, সংসারানুরাগ ও পরকাল বিস্মৃতি রোগ কুফরী অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। যদিও আল্লাহ্‌র শোক্‌র, কাফেরদের মধ্যে আখেরাতের প্রতি যে পর্যায়ের অমর্যাদা ও উদাসীনতা রহিয়াছে—সেই পর্যায়ের অমনোযোগিতা আমাদের মধ্যে নাই এবং আখেরাতের প্রতি কাফেরদের উদাসীনতাই কুফরী অপেক্ষা অধিক কঠিন। কেননা, তাহারা তো আখেরাতের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, কেবল দুনিয়াকেই চিনে। পক্ষান্তরে আমরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী এবং দুনিয়া ভিন্ন আরও একটি জগৎ আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। অবশ্য এতটুকু ত্রুটি আছে যে, আমলের বেলায় সেই বিশ্বাসকে সম্মুখে উপস্থিত রাখি না। তজ্জন্য আসবাব-উপকরণ সংগ্রহেরও তত আয়োজন করি না। অতএব, আমাদের মধ্যে কাফেরদের ন্যায় সর্বোচ্চস্তরের উদাসীনতা না থাকিলেও যে পর্যায়েরই আছে, তাহাকে সাধারণ বলা যায় না। কেননা, এই নিম্ন পর্যায়ের অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া কি কঠিন ?

সর্দি-কাশি প্রথমত সাধারণভাবেই দেখা যায়। কিন্তু মামুলী মনে করিয়া অবহেলা করিলে ক্রমে ক্রমে ইহাই যক্ষ্মার আকার ধারণ করে। এইরূপে তামাক ও আফিম প্রথমত অল্প মাত্রায় সেবন আরম্ভ করা হয়। অতঃপর ইহা নিজেই উন্নতি করিতে চায়। এমন কি, শুরুতে এক রতি আফিম বা তামাক সেবনকারী এক বৎসরের মধ্যে কয়েক মাষা খাইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। কেননা, নেশাজনক বস্তুর বিশেষত্ব এই যে, ইহার চাহিদা নিজে নিজেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দুনিয়ার মধ্যেও যেহেতু এক প্রকারের মাদকতা রহিয়াছে। যেমন, প্রসিদ্ধ আছে যে, একশত টাকার মধ্যে এক বোতল মদের সমপরিমাণ মাদকতা রহিয়াছে। দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং অনুরাগ দিন দিন উন্নতি করার ইহাই একমাত্র কারণ। যে ব্যক্তির মাসিক বেতন ২০ টাকা, সে বলে, মাসিক ৫০ টাকা হইলে খুব ভাল হইত। যখন ৫০ টাকা হয়, তখন ৭০ টাকা হওয়ার তালে থাকে। ৭০ টাকা হইলে ১০০ টাকার আকাঙ্ক্ষায় থাকে। এইরূপে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নতি করার আকাঙ্ক্ষাতেই মত্ত থাকে। "মুতানাব্বী" এ সম্বন্ধে কেমন সুন্দর কবিতা বলিয়াছেন ঃ

رُبَمَا احْتَسَبَ الْاِنْسَانُ غَايَتَهَا وَفَاجَأَتْهُ بِاَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَسَبِ
وَمَا قَضٰى اَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهٗ وَلَا يَنْتَهِىْ اِرَبٌ اِلَّا اِلٰى اِرَبِ

"অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, মানুষ তাহার পার্থিব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা করে, কিন্তু অকস্মাৎ কল্পনার অতীত কিছু ঘটিয়া যায়। কেহই দুনিয়া হইতে নিজের মতলব সিদ্ধ করিতে পারে না। এক প্রয়োজন মিটিতে না মিটিতে আর এক প্রয়োজন আসিয়া দেখা দেয়।"

অতএব, দেখুন, দুনিয়ার জন্য মানুষের এত মোহ, কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে এরূপ অবস্থা—প্রত্যেকেই আখেরাতের জন্য অল্পতেই তৃপ্ত হইয়া যায়। আখেরাতের কাজে একটু উন্নতি করার জন্য কাহাকেও উপদেশ দিলে সে বলে, "পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো পড়িতেছি। আর কি প্রাণ বাহির করিয়া নিবেন ?" অনেকে তো এরূপও আছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার শান্তি ও উন্নতি নিরাপদে থাকে, ততক্ষণই আখেরাতের প্রতি মনোযোগী থাকে। কোন কারণে দুনিয়ার কিছুমাত্র ক্ষতি হইলে আখেরাতের কার্য ত্যাগ করিয়া বসে। যেন এতদিন একমাত্র পার্থিব কার্যের পরিপাট্য রক্ষার জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলার এবাদত করিতেছিল। এ সকল ধর্মীয় কার্য করিতে করিতে যদি ঘটনাক্রমে দুনিয়ার কাজের কোন ক্ষতি হইয়া যায়, তবে খোদার উপর রাগান্বিত হইয়া উঠে। যেমন, এক গেঁয়ো লোক রোযা রাখিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেইদিনই তাহার একটি মহিষ মারা গেল। হতভাগা তৎক্ষণাৎ লোটা মুখে লাগাইয়া পানি পান করিল এবং আসমানের দিকে মুখ উঠাইয়া বলিল ঃ "আর রাখিলাম রোযা। নেও তোমার রোযা!"

এইরূপে এক বৃদ্ধের ছেলেপিলেরা বৃদ্ধকালে তাহার সেবা-শুশ্রূষা না করার কারণে সে গৃহ ছাড়িয়া মসজিদে চলিয়া গেল এবং রীতিমত নামায-রোযা করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে ছেলেদের খেত-কৃষির ক্ষতি হইয়া গেল, পালের কতক গরু-ছাগল মরিল এবং শস্য নষ্ট হইয়া গেল। ছেলেরা বলাবলি করিতে লাগিল, এই বৃদ্ধের নামায-রোযার কারণেই এসমস্ত অমঙ্গল ঘটিতেছে (নাউযুবিল্লাহ্‌)। সকলে একত্রিত হইয়া তাহার নিকট গিয়া বলিল, "তুমি ঘরে যাইয়া বাস কর। আমরা রীতিমত তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিব। কিন্তু তুমি নামায পড়িও না।" সে বলিল ঃ "আচ্ছা। কিন্তু দেখিও, ওয়াদা ভঙ্গ করিও না। অন্যথায় আমি চাটাই-বদনা লইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিব।" সকলে পাক্কা ওয়াদা করিল। বৃদ্ধ নামায ছাড়িয়া দিল এবং প্রচুর পরিমাণে ঘি-দুধ খাইতে

লাগিল। অতঃপর যখনই ছেলেরা সেবা-শুশ্রূষায় ত্রুটি করিত, তখনই বৃদ্ধ বলিতঃ "আন্ তবে আমার ওযূর বদ্‌না।" ছেলেরা তখনই ভয় পাইয়া তাহার খোশামোদ আরম্ভ করিতঃ "তুমি নামায পড়িও না। এখন হইতে সেবা-শুশ্রূষায় আর ত্রুটি হইবে না।" ফলকথা, নামাযের ভয় দেখাইয়া বৃদ্ধ ছেলেদের নিকট হইতে খুব খেদমত আদায় করিয়া লইল।

বর্নিত রূপ আহ্‌মক আজকাল মুসলমানদের মধ্যে খুবই কম। কদাচিৎ কেহ এরূপ থাকিলে তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কেননা, যে ব্যক্তি নামায-রোযাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানই নহে। কিন্তু যে মুসলমান নামায-রোযাকে বরকতের বস্তু মনে করে, তাহাদের অবস্থাও তথৈবচ। প্রত্যেকে যে অবস্থায় আছে ইহাতেই তৃপ্ত রহিয়াছে। ইহা হইতে উন্নতি করার চিন্তাও নাই, চেষ্টাও নাই। এ সম্বন্ধে মহাত্মা ইমাম গায্‌যালী (রঃ) খুব সুন্দর লিখিয়াছেনঃ

اَرَى الْمُلُوْكَ بِاَدْنَى الدِّيْنِ قَدْ قَنَعُوْا ـ وَمَا اَرَاهُمْ رَضُوْا بِالْعَيْشِ بِالدُّوْنِ
فَاسْتَغْنِ بِالدِّيْنِ عَنْ دُنْيَا الْمُلُوْكِ كَمَا ـ اِسْتَغْنَى الْمُلُوْكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّيْنِ

"আমি বাদশাহ্‌দিগকে দেখিতেছি, তাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে অতি সামান্য বস্তুতেই তৃপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পার্থিব আড়ম্বরের ব্যাপারে অল্পতে সন্তুষ্ট হয় না।" পরবর্তী কবিতায় ধার্মিক লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেনঃ "তোমরাও বাদ্‌শাহ্‌দের দুনিয়া হইতে তেমনি বেপরোয়া হইয়া যাও, যেমন তাহারা দুনিয়া অবলম্বনপূর্বক ধর্ম হইতে বেপরোয়া হইয়া গিয়াছে।" তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে তাহাদিগকে হারাইতে পার না। অতএব, ধর্মের ব্যাপারে তাহাদিগকে হারাইয়া দাও। এই তো হইল ধর্ম বা আখেরাতের প্রতি অমনোযোগিতার কথা।

এখন দুনিয়ার মোহে মত্ত হওয়ার কথা শুনুন। আমাদের অবস্থা এই যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ অত্যধিক। যদিও কাফেরদের ন্যায় তত লিপ্ততা নাই। তাহারা তো সর্বক্ষণ দুনিয়াতেই মগ্ন রহিয়াছে। আখেরাতের অস্তিত্বে বিশ্বাসই নাই। আমাদের মধ্যে তত লিপ্ততা না থাকিলেও এক শ্রেণীর লিপ্ততা আমাদের মধ্যেও আছে। অর্থাৎ, আখেরাতের চেয়ে দুনিয়ার কামনা আমাদের মধ্যে অধিক এবং দুনিয়ার জন্য আখেরাতের চেয়ে অধিক চেষ্টা করিয়া থাকি। আমি আফিমের দৃষ্টান্তে একটু আগে বলিয়াছি যে, সামান্য রোগও কঠিন আকার ধারণ করিয়া থাকে; বরং কোন কোন সময় সামান্য মনে করিয়া অবহেলা করা হয় বলিয়া মারাত্মক হইয়া পড়ে। বস্তুত ঘুষঘুষে জ্বর অতিশয় মারাত্মক। তাহা স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত মিশিয়া যায়। টের করা যায় না। স্মরণ রাখিবেন, দুনিয়ার অনুরাগ কুফরীর মূল। ইহাকে কখনও সাধারণ মনে করিবেন না। একথাও স্মরণ রাখুন, মূলকে কখনও সহজ বা সাধারণ মনে করা উচিত নহে। আমি নিজে বানাইয়া বলিতেছি না; বরং বহু বুযুর্গ লোকের বাণী হইতে আমার এই উক্তির পোষকতা পাইবেন। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

علت ابلیس انا خیر بدست ـ ایں مرض در نفس هر مخلوق هست

"ইবলীসের রোগ انا خير (আমি উত্তম) অর্থাৎ, অহঙ্কার খুবই মারাত্মক। এই রোগ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইবলীস্ আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে বিতাড়িত হওয়ার মূল কারণ ছিল অহঙ্কার। বস্তুত এই রোগ হইতে কোন মানুষই মুক্ত নহে। যদিও ইবলীসের পর্যায়ের

নহে। কিন্তু শহরে আগুন লাগিলে ইহার আরম্ভ সামান্য বিষয় হইতেই হয়। একটি ম্যাচের কাঠিতেও কোন সময় গৃহে আগুন ধরিয়া যায়। কোন সময় সামান্য একটি অগ্নিকণা দ্বারাই বিরাট খড়ের ঘর ভস্ম হইয়া যায়। ইহা হইতে দালানেও আগুন লাগে। অতঃপর বায়ু আশেপাশের সমস্ত ঘরে আগুন পৌঁছাইয়া দেয়। এইরূপে সম্পূর্ণ বস্তি ঐ সামান্য অগ্নিকণার কারণেই পুড়িয়া ছারখার হয়।

দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়া অনুরাগের পার্থক্যঃ বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম হইতে কুফরীর কারণ জানিতে পারিয়াছেন। ইহাকে হাল্‌কা মনে করিবেন না। ইহার সর্বনিম্নস্তর হইতেও আত্মরক্ষার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করুন। আমি দুনিয়া উপার্জনে আপনাদিগকে নিষেধ করিতেছি না; বরং দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত হইতে নিষেধ করিতেছি। কেননা, ইহাই যাবতীয় গুনাহের মূল। হাদীস শরীফে আছেঃ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ "দুনিয়ানুরাগ সকল গুনাহ্‌র মূল।" আজকালকার নব্য-শিক্ষিতের দল দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়ার মোহের মধ্যে পার্থক্য করে না। এই কারণে তাহারা দুইটি ভুলের মধ্যে পতিত রহিয়াছে।

প্রথমত, আলেমদের উক্তিতে দুনিয়ার নিন্দাবাদ দেখিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করে যে, ইঁহারা দুনিয়া উপার্জনে নিষেধ করিতেছে। অথচ শরীঅতের দলিলে ইহার পরিষ্কার অনুমতি রহিয়াছে। আলেমগণ কেমন করিয়া নিষেধ করিতে পারেন?

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়া উপার্জনের স্বপক্ষে যে সমস্ত দলিল রহিয়াছে, এই বোকারা তৎসমুদয়কে দুনিয়ার প্রতি অনুরাগের স্বপক্ষে ব্যবহার করিতেছে। অথচ كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ فَرِيْضَةٍ "(শরীঅতের) ফরযসমূহের পর হালাল উপার্জনও একটি ফরয" যে রাসূলের বাণী, তাঁহারই বাণী حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেনঃ

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ
وَاِنْ مُنِعَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ ○

এই হাদীসে হুযূর (দঃ) বদ্‌দোআ করিয়াছেনঃ "দীনার, দেরহাম এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির দাস ধ্বংস হউক, লাঞ্ছিত হউক। তাহার কাঁটা বিঁধিলে খোদা করুন, খুলিয়া ফেলা ভাগ্যে না হয়।" কোন চিন্তাশীল এখানে প্রশ্ন করিতে পারেনঃ হুযূরের বদ্‌দোআও দোআরূপেই গৃহীত হয়, তবে ইহার ভয় কি? কেননা, হুযূর (দঃ) স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিয়াছেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَيُّمَا رَجُلٍ اٰذَيْتُهٗ اَوْ شَتَمْتُهٗ اَوْ لَعَنْتُهٗ فَاجْعَلْهَا لَهٗ صَلٰوةً
وَّ زَكٰوةً وَّقُرْبَةً تُقَرِّبُهٗ بِهَا اِلَيْكَ ○

"হে খোদা! আমি মানুষ। আমি যেকোন মানুষকে কষ্ট দেই, গালি দেই কিংবা অভিশাপ দেই, আপনি উহাকে তাহার জন্য রহমত, পবিত্রকরণ এবং এবাদত বলিয়া গণ্য করিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে আপনার নিকটবর্তী করিয়া নিন্‌।"

ইহার উত্তর এই হইবে যে, হুযূরের এই প্রার্থনা সেই বদ্‌দোআ সম্বন্ধে, যাহা হুযূর (দঃ) মানবসুলভ স্বভাবে ক্রোধপরবশ হইয়া করেন, শরীঅতসম্মত বদ্‌দোআ সম্বন্ধে এই প্রার্থনা নহে। এখানে দীনার এবং দেরহামের দাসকে যে বদ্‌দোআ করিয়াছেন তাহা মানবসুলভ স্বভাবের কারণে নহে; বরং তাহা শরীঅতসম্মত বদ্‌দোআ। এতটুকু বুঝিয়া লওয়ার পর এখন হুযূরের এই বদ্‌দোআকে খুব ভয় করা উচিত। কেননা, হুযূরের দো'আ এবং শরীঅতসম্মত বদ্‌দোআ খুব দ্রুত

কবূল হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ اِنِّىْ اَرٰى رَبَّكَ يُسَارِعُ فِىْ هَوَاكَ "আমি দেখিতেছি, আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, আপনার প্রভু তাড়াতাড়ি তাহা পূর্ণ করেন।"

এখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার কালাম হইতে দুনিয়ানুরাগের স্বরূপ বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি। কেননা, এ সম্বন্ধে অনেক মানুষ ভুল করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط

দুনিয়ার মহব্বত এবং লালসার স্তরঃ সোব্‌হানাল্লাহ্! আল্লাহ্ কেমন দয়ালু! তিনি বলিয়াছেন, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মহব্বত আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত অপেক্ষা অধিক যেন না হয়। ইহার লক্ষণ এই যে, দুনিয়ার মোহে আল্লাহ্‌র রাস্তায় চেষ্টা ও পরিশ্রমে ত্রুটি আসিয়া যায়। অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলী পালনে যেন ত্রুটি হইতে না থাকে। আমার মতে, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় পরিশ্রম ও চেষ্টা" পদটি পূর্ববর্তী শব্দের ব্যাখ্যাস্বরূপ। ইহাতে আল্লাহ্ ও রাসূল অপেক্ষা দুনিয়া অধিক প্রিয় হওয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ অধিক প্রিয় হওয়া সকল অবস্থায় নিন্দনীয় নহে। দুনিয়ার মহব্বত যদি স্বভাবগত হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় নহে; বরং জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিয়া যদি দুনিয়াকে মহব্বত করা হয়, তাহা নিন্দনীয়। কেননা, জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারে আল্লাহ্ এবং রাসূলই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হওয়া উচিত। ইহার মাপকাঠি এই—দুনিয়াকে ভালবাসিয়াও যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্‌কাম পালনে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় চেষ্টা ও পরিশ্রমে কোন ত্রুটি না হয়, তবে আল্লাহ্ ও রাসূলই অধিক প্রিয় বলিয়া বুঝাইবে। এই মাপকাঠি ঠিক থাকিলে দুনিয়া, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা অতিরিক্ত মাত্রায় হইলেও কোন ভয়ের কারণ নাই।

যদি কেহ তাহার পুত্রবিয়োগে অতিরিক্ত বিলাপ করে এবং হুযূর (দঃ)-এর এন্তেকালের ঘটনা শ্রবণ করিয়া না কাঁদে, তবে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না। কিন্তু দ্বীন ও দুনিয়ার স্বার্থের প্রতিঘাতের ক্ষেত্রে দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দান করিলে অবশ্যই জবাবদিহি করিতে হইবে। ইহা না করিয়া যদি দুনিয়ার লোভ-লালসাকে ধর্মের খাতিরে বলি দেওয়া হয়—যদিও দুনিয়া ত্যাগের জন্য মনে দুঃখ-কষ্ট থাকে, তবে জবাবদিহি করিতে তো হইবেই না; বরং ইহাতে আরও সওয়াব বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুত অন্তরে দুনিয়ার স্বাভাবিক মহব্বত এবং লালসা থাকা সত্ত্বেও ইহার বিরোধিতা করাই পূর্ণ পরহেযগারী। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

شهوت دنيا مثال گلخن ست ـ كه ازو حمام تقوى روشن ست

"দুনিয়ার কামনা-বাসনার দৃষ্টান্ত—যেমন, ধোপার ভাট্টি, তদ্দ্বারা পরহেযগারীর হাম্মামখানা উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত হয়।"

ফেরেশ্‌তাগণ ঘুষ গ্রহণ না করিলে তাহাতে বাহাদুরী কিছুই নাই। স্বভাবত তাহাদের মধ্যে ধন-দৌলতের লালসাই নাই। বাহাদুরী বলিতে গেলে ঐ সাব-জজের ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যাহার নিকট বাদী-বিবাদী উভয়েই সোয়া দুই লক্ষ টাকা ঘুষ পেশ করে। কিন্তু তিনি তাহা হইতে এক

পয়সাও গ্রহণ করেন নাই; বরং ক্রোধান্বিত হইয়া উভয়কে বাহির করিয়া দেন। অবশ্য মূর্খতাবশত উভয়ের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া এমন অন্যায় বিচার করিলেন, যাহাতে যালেম-মযলুম উভয়ের উপরই অবিচার হইয়া গেল এবং তিনি এরূপ করিবেন বলিয়া উভয়কে প্রথমে বলিয়াও দেন যে, তোমরা ঘুষ দিবার চেষ্টা না করিলে আমি ন্যায়বিচার করিতাম। কিন্তু যেহেতু তোমরা উভয়ে ঘুষ দিবার চেষ্টা করিয়া আমার মনে কষ্ট দিয়াছ, তাই আমি এমন মীমাংসা করিব, যাহাতে উভয়ের স্মরণ থাকে। ইহা অবশ্যই তাঁহার মূর্খতার পরিচায়ক। কিন্তু সোয়া দুই লক্ষ টাকা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করা সত্যই তাঁহার সৎ সাহসের পরিচায়ক এবং প্রশংসনীয়। তিনি তাহা গ্রহণ করিলে কোন অসুবিধা ছিল না। কেননা, একপক্ষ ঘুষ দিলে এবং অপরপক্ষ না দিলে ঘুষের ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ার আশঙ্কা ছিল। উভয়পক্ষ যখন ঘুষ দিতেছিল তখন প্রকাশ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তৃতীয় কেহ সংবাদ দিলেও প্রমাণ করিতে পারিত না। কেননা, রসিদ দিয়া ঘুষ লওয়া হয় না।

এসম্বন্ধে মাওলানা গাউস আলী পানিপথী ছাহেবের একটি মজার গল্প আমার মনে পড়িয়াছে। এক ব্যক্তি তাঁহার ভাইয়ের মাধ্যমে মাওলানার নিকট ১০ টাকা হাদিয়া প্রেরণ করিয়াছিল। সম্ভবত ভাইয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। কাজেই বলিয়া দিয়াছিল, রসিদ লইয়া আসিবে। সে মাওলানার হাতে টাকা দিয়া বলিলঃ ইহার রসিদ লিখিয়া দিন। মাওলানা বলিলেনঃ "টাকা ফেরত লইয়া যাও, ঘুষের টাকারও কখন রসিদ হয়?" সে বলিল, "হযরত! ইহা ঘুষ কিরূপে হইল? ইহা তো হাদিয়া।" তিনি বলিলেনঃ বিনাস্বার্থে কে কাহাকে দান করে? তোমরা আমাদের শুধু এই উদ্দেশ্যে দান কর যে, তোমাদের পার্থিব প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট কিছু সুপারিশ করিব। ইহা হাদিয়া হইল, না ঘুষ? ইহাতে কৌতুক তো ছিলই, তৎসঙ্গে ইহাও শিখাইয়া দিলেন যে, যে দানে শুধু গ্রহীতার সন্তোষ ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না থাকে, কেবল তাহাই হাদিয়া।

আমি বলিতেছিলাম—শুধু দুনিয়ার লালসা নিন্দনীয় নহে; বরং সেই লালসা অনুযায়ী আমল করা নিন্দনীয়। তত্ত্বজ্ঞানহীন পীর ইহাতে ভুল করিবেন। তাঁহার নিকট কেহ দুনিয়ার লালসার অভিযোগ করিলে তিনি কোন ওযীফা কিংবা মোরাকাবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পীর তাহাকে তৎক্ষণাৎ সান্ত্বনা দিয়া বলিবেনঃ দুনিয়ার লালসা হওয়া নিন্দনীয় নহে; বরং সেই লালসার বিপরীত কার্য করিতে পারিলে সওয়াব অধিক হইবে; বরং তখন শরীঅতের দৃষ্টিতে সেই লোভ, লোভ বলিয়াই গণ্য হইবে না, যাহার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা হয় না। শরীঅত সেই লোভকেই লোভ আখ্যা দেয়—যাহার ফলে ধর্মের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য হইতে থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ) লোভের স্বরূপ খুব পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। পারস্য সম্রাটের ধন-ভাণ্ডারসমূহ বিজিত হইয়া খলীফার দরবারে আসিলে দেখা গেল, বিরাট ধন-ভাণ্ডার। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, উহা সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন রাজ্য। প্রথম হইতে একই বংশ পরম্পরায় শাসিত। কাজেই চিন্তা করিয়া দেখুন, এত পুরাতন একটি বিশাল সাম্রাজ্যের ধন-ভাণ্ডার কত বিরাট হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহা দেখিয়া দো'আ করিলেনঃ হে খোদা! আমরা এমন প্রার্থনা করি না যে, ধনের প্রতি আমাদের আদৌ অনুরাগই না হউক এবং এই প্রার্থনাও করি না যে, ধনের আগমনে আমাদের মনে আনন্দ না হউক। কেননা, আপনিই বলিয়াছেনঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط

"সুশোভিত করা হইয়াছে মানুষের জন্য শোভনীয় বস্তুর প্রেম—যেমন, রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য·····" অর্থাৎ, আপনিই যখন ইহাকে আমাদের জন্য সুশোভিত ও লোভনীয় বানাইয়াছেন, তখন ইহার প্রতি আমাদের অনুরাগও হইবে এবং ইহার সমাগমে আনন্দও হইবে ; বরং আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি, ইহার প্রতি আমাদের মহব্বতকে আপনার সন্তুষ্টি লাভের উপায় করিয়া দিন।

হযরত ওমর (রাঃ) যাহা বলিলেন, বাস্তবিকপক্ষে ইহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন। তত্ত্বজ্ঞানহীন পীর ; বরং তত্ত্বজ্ঞানীও এরূপ মনে করিবেন যে, ধন-সম্পদ সকল অবস্থায় নিন্দনীয় ; আর কতক মূর্খ লোক তো বড়াই করিয়া বলে, আমাদের কোন পরোয়া নাই। রাজত্বেরও পরোয়া করি না, টাকা-পয়সারও পরোয়া করি না। কেহ কেহ তো বেহেশ্‌ত হইতেও নিজের বেপরোয়াভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বেপরওয়াভাব ততক্ষণ পর্যন্ত টিকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল-ভাতের ব্যবস্থা আছে। অন্যথায় এসমস্ত দাবীর স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান তাহাই যাহা হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন। ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তাও প্রকাশ করিয়াছেন। ধনের সমাগমে আনন্দও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসঙ্গে এই প্রার্থনাও করিয়াছেনঃ 'হে আল্লাহ্! ইহার মহব্বতকে আপনার সন্তুষ্টি লাভের উপায় বানাইয়া দিন।'

অতএব, ধনের মহব্বত সকল অবস্থায় নিন্দনীয় নহে ; বরং এক পর্যায়ে তাহা কাম্য এবং প্রার্থনীয়ও বটে। যেমন, এতটুকু মহব্বত কাম্য যাহাতে ধনের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কেননা, মাল নষ্ট করা হারাম। এতটুকু মহব্বতও যদি না থাকে, তবে মালকে বৃথা অপচয় করা হইবে এবং ধ্বংস ও বিনাশ করিয়া দিবে। অথচ হাদীসে ইহা নিষেধ করা হইয়াছে। যেমনঃ

اِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ ○

এই কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেনঃ ধনের প্রতি মহব্বত আমরা অস্বীকার করি না। এই দাবীও করি না যে, ধনের সমাগমে আমাদের আনন্দ হয় না ; স্বাভাবিক মহব্বতও আছে এবং আনন্দও আছে। কিন্তু কার্যত এবং জ্ঞানত আমাদের এই প্রার্থনাঃ "ইহাকে আপনার সন্তুষ্টিজনক কার্যসমূহের উছিলা বানাইয়া দিন।"

রাসূল (দঃ)-এর মহব্বতের মাপকাঠিঃ উপরোক্ত বর্ণনায়—

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

হাদীসের মর্মও পরিষ্কার হইয়া গেল। অর্থাৎ, এখানেও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী রাসূল সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হওয়াই উদ্দেশ্য। ইহার বিস্তৃত বিবরণ جهاد فى سبيله -এর তফ্‌সীরে বর্ণিত হইয়াছে। সারমর্ম এই যে, বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মহব্বত হুযূরের সহিতই সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। ইহার মাপকাঠি এই যে, যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালনে হুযূরের অনুসরণ করা এবং বিভিন্ন বিধান পরস্পর বিরোধী হইলে হুযূরের আদেশকে সমস্ত বিধানের উপর প্রাধান্য দেওয়া, যদিও তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক মহব্বত কম হউক। অবশ্য চিন্তা করিলে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির স্বাভাবিক মহব্বত নিজের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলের চেয়ে অধিকই আছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

জনৈক ধনী ও নেতৃস্থানীয় লোক মাওলানা মুযাফ্‌ফর হুসাইন ছাহেবের নিকট বলিলঃ হযরত, আমার সন্দেহ হয়, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) অপেক্ষা আমার পিতার প্রতি আমার মহব্বত অধিক। মাওলানা তখন শুধু এতটুকু বলিলেনঃ "হইতে পারে।" অতঃপর উক্ত সন্দেহের উত্তর কার্যত এইরূপে প্রদান করিলেন যে, কথায় কথায় হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত সকলেই বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। উক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও খুব মত্ত হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন। কেননা, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। কোন যালেম যদি বলে যে, এই মুসলমান ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-এর আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তবে তাহার অপেক্ষা মিথ্যাবাদী আর কেহ নাই। রাসূল (দঃ)-এর আলোচনা হইতেও কি কেহ নিষেধ করিতে পারে? তবে হাঁ, রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিষেধ করেন, যেন তাঁহার আলোচনা এরূপ না হয়, যাহাতে তাঁহার বিরোধিতা প্রকাশ পায়।

জনাব মাওলানা দেখিলেন যে, উক্ত রঈস্ ছাহেব খুব আনন্দের সহিত হুযূরের অবস্থা শ্রবণ করিতেছেন। অতএব, মধ্যস্থলে হঠাৎ বলিতে লাগিলেনঃ আচ্ছা, এই আলোচনা বন্ধ করিয়া এখন আপনার পিতার কিছু গুণগান ও প্রশংসা করা হউক। কেননা, তিনিও একজন গুণশীল লোক ছিলেন। এই কথা শুনিতেই রঈস্ ছাহেবের চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং বলিলঃ মাওলানা ! তওবা, হুযূর (দঃ)-এর সম্মুখে আমার পিতার কি অস্তিত্ব আছে যে, তাঁহার আলোচনা করার জন্য হুযূর (দঃ)-এর আলোচনা বন্ধ করা হইবে? না, তাহা কখনও হইতে পারে না। আপনি হুযূর (দঃ)-এর বর্ণনাই করিতে থাকুন। তখন মাওলানা ছাহেব বলিলেনঃ হুযূরের আলোচনার মধ্যস্থলে আপনার পিতার আলোচনা আপনার নিকট অপছন্দনীয় কেন হইল? আপনি তো বলিতেনঃ "আমার মনে হুযূর (দঃ)-এর চেয়ে আমার পিতার প্রতি অধিক মহব্বত অনুভব করিতেছি।" রঈস্ ছাহেব তখন তুলনামূলক চিন্তা করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেনঃ মাওলানা! আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আজ আমার একটি বড় সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন। বাস্তবিকপক্ষে হুযূরের সহিতই আমার মহব্বত অধিক। তৎতুলনায় পিতার সহিত আমার কিছুমাত্র মহব্বত নাই বলিলেও চলে।

যাহাহউক, স্বাভাবিক মহব্বতও প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে হুযূরের জন্যই বেশী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, স্বাভাবিক মহব্বত কম হইলেও ক্ষতি নাই। জ্ঞানানুগ মহব্বত হুযূরের জন্যই সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। কেননা, তাহা ভিন্ন শুধু স্বাভাবিক মহব্বত যথেষ্ট নহে। যেমন, কোন কোন লোক স্বভাবত হুযূরের সহিত যথেষ্ট মহব্বত রাখে। হুযূরের প্রশংসাসূচক 'কাসীদা' পাঠ করে। মৌলুদ শরীফের অনুষ্ঠান করে। হুযূরের নামে এবং আলোচনায় বেশ স্বাদও পায়। কিন্তু বিবেকসম্মত মহব্বত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—হুযূরের আদেশের বিরোধিতা করে। এরূপ ব্যক্তির অবস্থা ভাল নহে। তাহার অবস্থার সংশোধন হওয়া উচিত।

আবার কোন কোন মানুষ বিবেকানুযায়ী হুযূরকে ভালবাসে, অর্থাৎ, তাঁহার আদেশাবলীর বিরোধিতা করে না। কিন্তু নিজের অন্তরে তাহারা হুযূরের প্রতি স্বাভাবিক মহব্বত কম বলিয়া অনুভব করেন এবং তজ্জন্য বেশ অস্থিরও হন। আমি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছি যে, প্রথমত তাঁহাদের মধ্যে স্বাভাবিক মহব্বতও আছে। অন্যথায় ইহার অভাব অনুভব করিয়া চিন্তিত হইতেন না। স্বাভাবিক মহব্বত না থাকার ধারণা এই কারণে হয় যে, এখনও অন্যান্য মহব্বতের সহিত

হুযূরের মহব্বতকে তুলনা করিয়া দেখার সুযোগ ঘটে নাই। তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবিকপক্ষে স্বাভাবিক মহব্বতও হুযূরের জন্যই বেশী আছে। যেমন, উক্ত রঈসের ঘটনায় আমি এইমাত্র বর্ণনা করিয়াছি। দ্বিতীয়ত স্বাভাবিক মহব্বত কাম্যও নহে। অকাম্য বিষয়ে ত্রুটি থাকা ক্ষতিকর নহে। কাম্য মহব্বতে অর্থাৎ, বিবেচনাপ্রসূত মহব্বতে ত্রুটি হইলে ক্ষতি অবশ্যই হইবে। আপনাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ফযলে সেই ত্রুটি নাই। তবে অস্থির কেন হইতেছেন?

যাহারা স্বাভাবিক মহব্বতকে যথেষ্ট মনে করে, উপরোক্ত বর্ণনায় তাহাদের ভুল বুঝা গিয়াছে। বেরেলী শহরে একবার আমি জুমুআর নামাযের পরঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

আয়াতের বিষয়বস্তু অবলম্বনে ওয়ায করিয়াছিলাম। তাহাতে ঈমানের পূর্ণতালাভ এবং কামেল লোকের সংসর্গ অবলম্বনের জন্য উৎসাহ্ প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু পরবর্তী রাত্রে সেই স্থানেই ইহার বিপরীত বক্তৃতা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছেঃ "শ্রোতৃগণ! পরহেযগারীর প্রয়োজন নাই। নামায-রোযারও আবশ্যক নাই। কেবল রাসূল (দঃ)-এর মহব্বতের প্রয়োজন। অতঃপর শরাবই পান কর বা অন্য কিছু কর, অবশ্যই তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। আর এই ওয়াহাবীরা কখনও মুক্তি পাইবে না।"

ইহারা আমাকে জ্বালাইবার জন্য এই বক্তৃতা করিয়াছিল। বোকারা আমাকে জ্বালাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশাবলীর বিরোধিতা করিয়াছে এবং হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র আত্মাকে কষ্ট দিয়াছে। আচ্ছা, তাহাদের কথায় আমার জ্বলিবার প্রয়োজন কি? জ্বলিলে তাহারাই দোযখের আগুনে জ্বলিবে। আমি যাহাকিছু বর্ণনা করিয়াছি, নিজে বানাইয়া বলি নাই; বরং কোরআন-হাদীস হইতে বর্ণনা করিয়াছি। ইহার বিরোধিতা করিলে আমার কি ক্ষতি হইল? ক্ষতি হইলে তাহাদেরই হইল।

এই অবস্থা অবশ্য দুঃখজনক। শুধু মহব্বতের বুলি আওড়াইল এবং আনুগত্যের সময় আসিলে নবী (দঃ)-এর নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা আরম্ভ করিয়া দিল। মোটকথা, যে ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-এর আদেশ-নিষেধ পালন করে, কাম্য ও বাঞ্ছনীয় মহব্বত তাহার আছে। কোন কোন লক্ষণে ত্রুটি থাকিলেও চিন্তিত বা অস্থির হওয়া উচিত নহে।

কেহ কেহ আর একটি কথার কারণেও নিজেদের মধ্যে মহব্বতের ত্রুটি রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে। তাহা এই যে, তাহাদের মনে হুযূর (দঃ)-এর তেমন বেশী আকর্ষণ হয় না; বরং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকর্ষণ অধিক হয়। আবার কেহ কেহ ইহার বিপরীত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বতের ত্রুটি রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে। স্মরণ রাখুন, ইহা শুধু স্বাভাবিক মহব্বতের বিভিন্ন অবস্থার প্রভেদ মাত্র। আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিবেচনাপ্রসূত মহব্বত উভয়ের অন্তরেই আছে। অর্থাৎ, যাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক এবং হুযূরের প্রতি কম আকর্ষণ রহিয়াছে, আর যাহার অন্তরে হুযূরের প্রতি অধিক ও আল্লাহ্‌র প্রতি কম আকর্ষণ রহিয়াছে, এরূপ মহব্বত কম হওয়ার ধোঁকা হযরত রাবেয়া বছরীর মনেও হইয়াছিল। তিনি স্বাভাবিক এবং জ্ঞান-বুদ্ধিপ্রসূত মহব্বতের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই।

হযরত রাবেয়া বছরীর ঘটনা এইরূপ—একবার তিনি হুযূর (দঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়া লজ্জাবশত দৃষ্টি নিম্নমুখী করিয়া ফেলিলেন এবং আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার নিকট

খুবই লজ্জিত। আল্লাহ্‌ তা'আলার মহব্বত আমার অন্তরে এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, আপনার মহব্বতের জন্য একটুও জায়গা রাখে নাই। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেনঃ "হে রাবেয়া! খোদার সঙ্গে মহব্বত রাখাই আমার সহিত মহব্বত রাখা।" কেননা, খোদার সহিত মহব্বত রাখার নির্দেশ তো হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দিয়াছেন। আর আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত রাখাতে হুযূরেরই আদেশ পালন করা হয় এবং ইহাই জ্ঞানপ্রসূত মহব্বত।

আমি বলিতেছিলাম, কুফরীর কারণ দুইটি বিষয় বলিয়া কোরআন হইতে জানা যায়—(১) আখেরাতের প্রতি অমনোযোগিতা। (২) দুনিয়ার প্রতি অনুরাগ।

এতদপ্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলামঃ আমি দুনিয়া উপার্জন করিতে নিষেধ করি না; বরং দুনিয়ার মোহে মত্ত হইতে নিষেধ করি। আরও একটু বাড়াইয়া ইহাও বলিয়াছিলামঃ সকল অবস্থায় দুনিয়া প্রিয় হওয়া বারণ করি নাই; বরং একথা নিষেধ করিয়াছি যে, জ্ঞানের বিচারে যেন দুনিয়াকে অধিক প্রিয় সাব্যস্ত করা না হয়। দুনিয়ার প্রতি কাহারও স্বাভাবিক মহব্বত অধিক হইয়া গেলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু জ্ঞানত তাহা হওয়া উচিত নহে। প্রসঙ্গক্রমে স্বাভাবিক মহব্বত ও জ্ঞানানুগ মহব্বতের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া কথা লম্বা হইয়া গিয়াছে।

যাহাহউক, কাফেরদের কুফরীর কারণ হইল দুনিয়ার মহব্বত এবং দুনিয়ার মোহে মগ্ন হইয়া যাওয়া। এই কারণেই ইহুদীরা ঈমান আনয়ন করিতে পারে নাই। কেননা, তাহাদের সন্দেহ ছিল—আমরা তো এখন সমাজের পীর সাজিয়া বসিয়াছি। মুসলমান হইলে মুরীদে পরিণত হইব এবং হাদিয়া-নেয়ায যাহাকিছু এখন পাইতেছি বন্ধ হইয়া যাইবে। অথচ হুযূরের মুরীদান ইসলাম গ্রহণের পর এত প্রচুর হাদিয়া-নজরানা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, ঐ পীরদের বাপ-দাদা স্বপ্নেও তাহা কোনদিন দেখিতে পায় নাই। ছাহাবায়ে কেরাম পারস্যাধিপতি ও রোমানাধিপতির যাবতীয় ধন-ভাণ্ডার জয় করিয়াছিলেন এবং দুনিয়া তাঁহাদের পদলেহী চাকর-চাকরানী হইয়াছিল। যে দুনিয়ার মহব্বত এই কাফেরদিগকে ঈমান আনয়নে বারণ করিয়াছিল, তাহারাও ঈমানের বদৌলতে পূর্ব হইতে অধিক দুনিয়াকে লাভ করিতে পারিত, না পাইলেও খোদা তো তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইতেন। ইহারা খোদার সন্তুষ্টির মর্যাদা এই জন্য দিতে পারে নাই যে, তাহারা আখেরাতের প্রতি অমনোযোগী এবং অবিশ্বাসী ছিল। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের কি হইল? আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দিতেছি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মতি ও সন্তোষের অমর্যাদা করিতেছি। যেহেতু অদ্যকার অনুষ্ঠানের মূলে ছিল মহিলাদের অনুরোধ, কাজেই এখন আমি এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়াছি।

নারীর উপর সংসারাসক্তির প্রাধান্যঃ মেয়েলোকদের মধ্যে সংসারাসক্তি খুবই প্রবল। তাহাদের মধ্যে গহনাপত্র এবং সাজ-পোশাকের লোভ অনেক বেশী। তদুপরি অবস্থা এই যে, চারি জন স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া বসিলে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুনিয়ার আলোচনাই চলিতে থাকে। ধর্মের কোন আলোচনাই উঠে না। স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, তাহাদের মজলিসসমূহের কয়টি মজলিসে ধর্মীয় আলোচনা হইয়া থাকে। পাপজনক কথা হইতে বিরত থাকিয়া দুনিয়ার আলোচনা অধিক পরিমাণে করা যদিও জায়েয আছে, কিন্তু এই জায়েযের সীমারেখা পাপের সহিত মিলিত। যে ব্যক্তি দুনিয়ার আলোচনায় অধিক লিপ্ত থাকে, সে অবশ্যই পাপ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে।

হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

اَلَا اِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَّاِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهٗ وَمَنْ رَّتَعَ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّقَعَ فِيْهِ

"স্মরণ রাখুন, প্রত্যেক রাজার নিষিদ্ধ এলাকা আছে। আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ এলাকা তাঁহার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ এলাকার আশেপাশে ঘুরাফেরা করে, সে শীঘ্রই উহাতে পতিত হইবে।" বুযুর্গ লোকেরা বলিয়াছেনঃ জায়েয কার্যসমূহও নিষিদ্ধ এলাকার পার্শ্ববর্তী স্থান। অভিজ্ঞতায়ও তাহাই প্রতীয়মান হয়। কাজেই মুসলমানদের উচিত অধিকাংশ সময় এবাদতে মশ্‌গুল থাকা, মুবাহ্ কার্যেও অধিক লিপ্ত না হওয়া। সুতরাং দুনিয়ার আলোচনা অধিক করা—অর্থাৎ, মজলিসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই আলোচনাই চলিতে থাকা, অবশ্যই গুনাহের ভূমিকা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহার উৎস সেই সংসারাসক্তিই বটে, যাহা আজকাল মেয়েলোকদের মধ্যে অধিক প্রচলিত আছে। এই কারণেই স্ত্রীজাতির মধ্যে ধর্মপরায়ণা খুব কম হইয়া থাকে। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের মধ্যে ধার্মিকতা দেখা যায়, তাহা শুধু সংসারাসক্তি কম হওয়ার দরুন। আমাদের পার্শ্ববর্তী পানিপথের স্ত্রীলোকেরা অধিক ধর্মপরায়ণা বলিয়া শুনা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন মেয়েলোক হাফেযে কোরআনও রহিয়াছেন। কেহ কেহ সাত কেরাআতে পারদর্শিনী, প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোকই কোরআন শরীফ পড়িতে সক্ষম, নামাযীও তাঁহাদের মধ্যে খুব বেশী। এতদসঙ্গে দুনিয়ার দিক হইতেও তাঁহারা বেশ সচ্ছল অবস্থায় আছেন। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ভূসম্পত্তি আছে। খাওয়া-পরার দিক হইতে সকলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাঁহাদের এই সচ্ছলতা শুধু এই কারণে যে, তাঁহাদের মধ্যে দুনিয়ার লোভ অধিক নাই। যতটুকু জানিতে পারিয়াছি—তথাকার মেয়েলোকেরা খুব সাদাসিধা জীবন যাপন করেন। এমন কি, তাঁহাদের নব-বধূরাও গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া থাকে। মূল্যবান কাপড়ের প্রতি অধিক লোভ করে না। তাহা না হইলে সমুদয় জমিদারী গহনা-কাপড়ের দায়েই নিলাম হইয়া যাইত। ফলত যে সমস্ত মহল্লায় এসমস্ত ব্যাধি ঢুকিয়াছে, সেখানে দারিদ্র্য এবং অভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। খেতি-বাড়ী সবকিছুই মহাজনের নিকট রেহানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আচ্ছা! এমন গহনা-কাপড়ে কি আনন্দ পাওয়া যায়, যাহার দরুন একটা ঘরই বিনাশ হইয়া যায়? আমাদের এখানে তো এই অবস্থা যে, ঘরে খাওয়ার কিছু না থাকিলেও আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী যাইতে সম্মানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রেশমী বা জর্জেটের কাপড় এবং স্বর্ণের অলঙ্কার অবশ্যই চাই। অথচ দরিদ্র লোক কোন দিন মূল্যবান কাপড় পরিয়া সম্মানিত হইতে পারে না। কেননা, তাহার প্রকৃত অবস্থা সকলেরই জানা আছে।

কানপুরে এক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। তাহার মাথায় জরির কাজ করা টুপি এবং পরনে অতি আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক দেখিয়া আমি তাহাকে নবাব কিংবা উচ্চস্তরের নেতৃস্থানীয় লোক বলিয়া মনে করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, খুব সম্ভব ১০/১২ টাকা মাসিক বেতনের কনষ্টেবল। আমার খুব স্মরণ আছে, বেতনের কথা জানিবামাত্র লোকটি আমার দৃষ্টিতে নিতান্ত হেয় হইয়া গেল। যে পোশাকের কারণে এতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার দৃষ্টিতে কিছুটা সম্মানের পাত্র ছিল, তাহাই এখন তাহার অপমান এবং হীনতার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ইহা এমন একটি বিষয়, দুনিয়ার সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারে।

জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাকে একজন নেতৃস্থানীয় লোককে সুপারিশের জন্য সঙ্গে লইয়া চাকুরীর সন্ধানে কালেক্টরের নিকট গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যোগ্যতা কিছুই

নাই। কাজেই পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, “বড় দরের চাকুরীর যোগ্যতা নাই, নিম্নস্তরের চাকুরী তাহার মর্যাদাবিরোধী।” সুতরাং ঘৃণার সহিত উত্তর দিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

দুঃখের বিষয়, ইহারা এতটুকুও বুঝে না যে, যে সম্মানের জন্য তাহারা সম্পত্তি বিনাশ করিতেছে, উহা বিনাশ করিয়া তাহা লাভ করা যায় না, হাতে রাখিয়াই লাভ করা যাইতে পারে। অবস্থাপন্ন ভূস্বামী যত সাধারণ পোশাকেই থাকুক না কেন—সর্বত্র সম্মানিত হয়। পক্ষান্তরে কেহ জমিজমা হারাইয়া যত মূল্যবান পোশাকই পরুক না কেন, কোথাও সম্মান পায় না। অবশ্য উচ্চস্তরের চাকুরী কিংবা শিল্প-নৈপুণ্যের মত অন্য কোন কারণে সম্মান লাভের উপযুক্ত হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যোগ্যতার অভাবে মুসলমানদের পক্ষে চাকুরী লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে কোন শিল্প-নৈপুণ্য লাভেও তাহাদের কোন ঝোঁক নাই। সুতরাং কেবল পোশাকে কেমন করিয়া সম্মান লাভ হইবে? কেহ কোন প্রকার চাকুরী একটা পাইলেও তাহাতে আবার অপমানকর পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ, চাকুরী করে ৫০ টাকা বেতনে; কিন্তু ৫০০ টাকা বেতনের চাকুরিয়ার মত আড়ম্বর। কোথাও যদি কম বেতনের গোমর ফাঁক হইয়া যায়, তখন অন্য এক আবরণ চড়াইয়া প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিতে হয়।

কোন একস্থানে সমবেত কতিপয় স্ত্রীলোকের মধ্যে নিজ নিজ স্বামীর বেতন সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। কেহ বলিলঃ আমার স্বামীর বেতন ১০০ টাকা, কেহ বলিলঃ ২০০ টাকা। তথায় উপস্থিত ছিল খুব জাঁকজমকপূর্ণ গহনা-কাপড় পরিহিতা এক দরিদ্রা স্ত্রীলোক। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তোমার স্বামীর বেতন কত? তখন স্বামীর বেতন মাত্র ২০ টাকা প্রকাশ করিতেও তাহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল, আবার মিথ্যা বলিলেও পাছে লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা মনে করিল। কাজেই সে বলিলঃ বেতন তো মাসিক ২০ টাকাই বটে, কিন্তু ‘মাশাআল্লাহ্‌’ উপরি যথেষ্ট পায়। জনৈকা স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলঃ হতভাগী! তওবা কর। হারাম উপার্জনের উপর মাশাআল্লাহ্‌ বলিতেছিস। ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে, কাফের হইয়া যাইবি।

চিন্তার প্রয়োজনঃ আমি যথার্থ বলিতেছি, যাহারা দুনিয়া অন্বেষী, অথচ ইহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ, স্বরূপ না জানার কারণেই তাহারা ইহার প্রতি আসক্ত হইতেছে। স্বরূপ চিনিতে পারিলে আসক্তির পরিবর্তে ঘৃণা হইত। মনে করুন, ময়লার উপর চাঁদির পাত জড়াইয়া দেওয়া হইল এবং কেহ হালুয়া মনে করিয়া ইহার আশায় বসিয়া রহিল। কিংবা কোন বৃদ্ধা পেত্নীকে যদি লাল বর্ণের রেশমী কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয় এবং কেহ তাহাকে সুন্দরী ও রূপসী রমণী মনে করিয়া তাহার সহিত প্রেমের দাবীদার হয়, কিন্তু আবরণ উন্মোচন করিতেই তাহার মহব্বতের তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কবি বলেনঃ

بسے قامت خوش که زیر چادر باشد ـ چوں باز کنی مادر مادر باشد

“চাদরে আবৃতা অনেক সুঠাম-সুডৌল নারীর আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা যাইবে, সে ‘নানী।’ আর এক কবি বলেনঃ

عارفے خواب رفت در فکرے ـ دید دنیا بصورت بکرے
کرد از وی سوال کاے دلبر ـ بکر چونی بایں همه شوهر
گفت یك حرف با تو گویم راست ـ که مرا هرکه بود مرد نخواست
وانکه نامرد بود خواست مرا ـ زاں بکارت همیں بجاست مرا

"কোন একজন আল্লাহ্ওয়ালা লোক দুনিয়াকে স্বপ্নে দেখিল—বৃদ্ধা অথচ কুমারী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কেমন কথা? এত স্বামীর ঘর করিয়াও তুমি এখন পর্যন্ত কুমারী। সে বলিলঃ যাহারা পুরুষ তাহারা আমাকে স্পর্শ করে নাই। আর যাহারা আশেক ছিল তাহারা নামরদ, তাহাদিগকে আমি স্পর্শ করি নাই। এই কারণেই এখন পর্যন্ত আমি কুমারী।" বাস্তবিক, দুনিয়া তো এখন বৃদ্ধাই হইবে, যুবতী কিরূপে থাকিবে? হাজার হাজার বৎসর বয়স হইয়াছে, তথাপি আমরা তাহার জন্য প্রাণ দিতেছি এবং মনে করিতেছি, সে বড়ই সুন্দরী যুবতী।

বন্ধুগণ! আপনারা তো দুনিয়াকে বোরকার উপর হইতে দেখিয়াই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্ওয়ালাগণ বোরকা উঠাইয়া ইহাকে দেখিয়া লইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা দুনিয়াকে ঘৃণা করেন। ইহাও لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ আয়াতের অন্যতম তফসীর। অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখেরাতের স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা কর। উভয়টিকে বোরকা খুলিয়া ভালরূপে দেখিয়া লও, তবেই তোমাদের মনে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং আখেরাতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইবে। দুনিয়া বাহিরে নানা প্রকার সুন্দর সাজে সজ্জিত। কিন্তু ভিতর কলুষময়, সাপ এবং বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে আখেরাত বাহিরে অপ্রীতিকর পরিবেশ এবং নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টিত। কিন্তু ভিতরে অতিশয় সুন্দরী এবং মনমাতান মাহ্বুবা। তাহার একটি মাত্র দৃষ্টির সম্মুখে সপ্তখণ্ড বসুন্ধরা কিছুই নহে। আমাদের প্রতি দোষারোপ করা হয়, আমরা দুনিয়া সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমি বলি, আল্লাহ্র কসম, তোমাদের চেয়ে আমরা দুনিয়াকে ঢের বেশী চিনি। আমাদের প্রতি যে দুনিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করারই নির্দেশ রহিয়াছে, কাজেই আমরা দিবা-রাত্র দুনিয়া সম্বন্ধে চিন্তা করি। এমন কি আমরা ইহার তত্ত্বকথা পর্যন্ত জানিয়া ফেলিয়াছি। তোমরা কিছুই জান না, কেবল বোরকার উপর হইতে উহার সাজ-সজ্জা দেখিয়া প্রেমে মত্ত হইয়াছ।

আমি দুনিয়াকে অবহেলা করার তা'লীম দিতেছি না; বরং ইহাই বলি যে, দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ কর, পূর্ণ মনোযোগ দাও, যাহাতে ইহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পার। অপূর্ণ ও ভাসাভাসা মনোযোগ দিও না, যাহাতে কেবল বাহিরের সাজ-সজ্জায়ই মগ্ন থাক। আমি অদ্যকার ওয়াযের জন্য যে আয়াতটি মনোনীত করিয়াছি, তাহাতেও একথার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকেই কাফেরদের কুফরীর কারণ বলিয়াছেনঃ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا "কাফেরেরা কেবল দুনিয়ার বাহিরের অবস্থাই জানে", এ কারণেই তাহারা ঈমান আনয়নে বিরত রহিয়াছে। অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিলে তাহাদের এরূপ অবস্থা হইত না। এখানেও দুনিয়ার বাহ্যিক রূপকে নিন্দনীয় বলা হইয়াছে। প্রকৃত স্বরূপকে নিন্দা করা হয় নাই। দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ দুনিয়াদারগণ জানে না, কেবল ধার্মিক লোকেরাই জানে। আমি লক্ষ্ণৌ শহরে এক মজলিসে যাহা বলিয়াছিলাম, ইহা তাহারই সদৃশ। আমি সেখানে বলিয়াছিলামঃ লোকে বলে, আলেমগণ উন্নতির পথে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা হইতেছে। আমরা উন্নতি করিতে কেমন করিয়া নিষেধ করিতে পারি? কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে উন্নতি করার জন্য তো আদেশই করিয়াছেনঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ "নেক কাজে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা কর" এবং উন্নতির সার ইহাই। অতএব, আমাদের উপর উন্নতি করা তো ফরয। ইহাতে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে, আলেমগণ তোমাদের চেয়ে অধিকতর উন্নতিকামী। কেননা, আজ পর্যন্ত তোমরা উন্নতিকে শরীঅতের দৃষ্টিতে ফরয বলিয়া স্বীকার কর নাই। কোরআনের সাহায্যে ইহার

অবশ্য করণীয়তাও প্রমাণ কর নাই; বরং তোমরা পার্থিব জীবনের এবং সামাজিক সুবিধার্থে 'উন্নতি উন্নতি' বলিতেছ। অতএব, উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। কেবল প্রভেদ এতটুকু যে, আমরা বলিতেছি, নেক কাজে উন্নতি করা আবশ্যক। আর তোমরা নেক কাজের ধার ধার না। কিন্তু উন্নতি যে শুধু নেক কাজেই হওয়া উচিত তাহা তোমরাও অস্বীকার করিতে পার না।

প্রথমত, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং উন্নতিকে নেক কাজের সহিত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন— فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ দ্বিতীয়ত, নেক কাজের বিপরীতপক্ষে মন্দ কাজ। মন্দ কাজে উন্নতি করা উদ্দেশ্য বলিয়া কোন জ্ঞানবানই বলিতে পারে না। এখন মতভেদ শুধু একথার মধ্যে রহিল যে, তোমরা যে কাজে উন্নতির চেষ্টা করিতেছ তাহা নেক কাজ কিনা? তোমরা টাকা-পয়সার উন্নতি করিতেছ—ধর্ম ঠিক থাকুক বা না থাকুক। আর আমরা ধর্ম ঠিক না রাখিয়া আর্থিক উন্নতি করাকে স্ফীতির উন্নতি মনে করি। যাহার দেহের কোন স্থান ফুলিয়া যায়, বাহ্যদৃষ্টিতে তাহারও উন্নতিই হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অবনতির দিকে যাইতে থাকে। ধর্ম ছাড়িয়া টাকা-পয়সার উন্নতিরও এই অবস্থা। অতএব, এরূপ কখনও বলিও না যে, আলেমগণ উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী; বরং এরূপ বল যে, তাঁহারা বিশেষ ধরনের উন্নতি নিষেধ করিয়া থাকেন, যাহা স্ফীতির উন্নতি সদৃশ। অন্যথায় মূলত সত্যিকারের উন্নতি তোমাদের চেয়ে তাঁহারাই অধিক কামনা করেন।

এইরূপে আমি বলি যে, আমরা দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে নিষেধ করি না; বরং দুনিয়ার প্রতি অপূর্ণ মনোযোগ দিতে নিষেধ করিতেছি। আমরা বলিতেছি, দুনিয়ার অবস্থার প্রতি এমন পূর্ণ মনোযোগ দাও, যাহাতে ইহার প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পার। আমরা দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে কেমন করিয়া নিষেধ করিতে পারি? অথচ কোরআন আমাদিগকে দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করিতে আদেশ করিতেছে। ফলত আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ দুনিয়ার অবস্থার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অতএব, কোন এক বুযুর্গ লোক বলিয়াছেনঃ حَلاَلُهَا حِسَابٌ وَّحَرَامُهَا عَذَابٌ "দুনিয়ার অবস্থা এই যে, ইহার হালাল অংশ হিসাবমুক্ত নহে এবং ইহার হারাম অংশের জন্য আযাব হইবে।" অতএব, ইহার কোন অংশই কষ্টশূন্য হইল না।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেনঃ দুনিয়ার যাবতীয় স্বাদ খাদ্য-পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। খাদ্যের মধ্যে সর্বোত্তম মধু। ইহা মৌমাছির 'বমি।' পানীয় দ্রব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পানি। ইহা উপভোগে মানুষের সঙ্গে শূকর পর্যন্ত অংশীদার আছে। পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল রেশমী বস্ত্র। ইহা এক প্রাণীর মুখনিঃসৃত লালা। আর স্ত্রীলোকের অবস্থা এই যে,

تَرْبهُنَّ لِاَحْسَنِ مَوَاضِعِهَا ـ وَيُتَعَمَّدُ مِنْهَا اَنْتَنُ مَوَاضِعِهَا

"স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি করার সময় তোমরা তাহাদের সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি কর। অথচ তাহার দেহের সর্বাপেক্ষা অধিক পূতিগন্ধময় স্থান উদ্দিষ্ট বস্তু হইয়া থাকে।" এসমস্ত বিষয়ের প্রতি চিন্তা করিলে দুনিয়ার হাকীকত অন্যান্য সকলের উপরও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইমাম গায্‌যালী (রঃ) কোন এক বুযুর্গ লোকের উক্তির উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেনঃ আখেরাতের

তুলনায় দুনিয়া ঘৃণার পাত্র তো আছেই; এতদ্ব্যতীত দুনিয়া ইহার সত্তাগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও ঘৃণার যোগ্য। কেননা, দুনিয়া অন্বেষণকারী কোন শান্তির মধ্যে নাই।

দুনিয়াদার অস্থিরতা ও চিন্তামুক্ত নহেঃ বন্ধুগণ! আপনারা দুনিয়াদার লোকের বাহ্যিক সাজ-সজ্জার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না; বরং তাহাদের কাছে থাকিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা লক্ষ্য করুন। দেখিতে পাইবেন, তাহাদের কেহই শান্তিতে নাই। পক্ষান্তরে আখেরাত অন্বেষণকারিগণ সকলেই দিব্যি আরামে আছেন। তাহাদের অবস্থার নমুনা দেখুনঃ

نه باشتر بر سوارم نه چوں اشتر زیر بارم ـ نه خداوند رعیت نه غلام شهر یارم

“আমি উষ্ট্রারোহীও নহি, উষ্ট্রের মত ভারবাহীও নহি, প্রজাপালও নহি, বাদশাহর আজ্ঞাবহ গোলামও নহি।” অথচ দুনিয়াদারকে দেখুন, কোথাও সন্তানের চিন্তা, কোথাও স্ত্রীর চিন্তা, কোথাও অভাবের চিন্তা, কোথাও মোকদ্দমার ধান্দা, কোথাও জমিদারীর ঝামেলা, কোথাও উৎসবের বা শোকের অনুষ্ঠান। আর আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের এসব কোনই ঝামেলা নাই। আমি বলি না যে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা কিংবা অভাব-অভিযোগের সম্মুখীন হইতে হয় না। তাঁহারাও এসমস্ত বিষয়ের সম্মুখীন হন। তাঁহাদের মুখ হইতে আঃ! উঃ! শব্দও উত্থিত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ভিতরে ভিতরে তজ্জন্য খুশীও হইয়া থাকেন। আপনারা হয়তো বলিবেন, এই দুই বিপরীত অবস্থার সমাবেশ কিরূপে হয়? আমি বলি, হাসপাতালের একজন সাধারণ রোগীও এই দুই প্রকারের বিপরীত অবস্থাকে একত্রিত করিয়া দেখাইয়া দেয়। কোন রোগীর ফোড়া হইলে ডাক্তার কোন কারণে ক্লোরোফরম না শুঁকাইয়া যদি তাহার ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করে, তবে সে কান্নাকাটিও করিবে, চীৎকারও করিবে, ‘আঃ! উঃ’ও করিবে। কিন্তু পরে ডাক্তারকে ৫০ টাকা ভিজিট এবং কিছু পুরস্কারও দিয়া দিবে। অতএব, দেখুন, এই লোকটি আঃ! উঃ!-ও করিল, কান্নাকাটি এবং চীৎকারও করিল, কিন্তু মনে মনে এসব বিষয়ের জন্য খুশীও হইল। এই কারণেই তো ডাক্তারকে ফি ও পুরস্কার দিয়াছে। এইরূপ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অবস্থা। ইহা বাহ্যিক কষ্ট এবং খোদার মহব্বতের একত্র সমাবেশের প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত। তত্ত্বজ্ঞানী উভয়কে একত্রিত করিয়া দেখাইয়া দেয়। তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি এরূপ ক্ষেত্রে ঘাবড়াইয়া গিয়া বলেঃ

درمیان قعر دریا تختہ بندم کردۂ ـ باز میگوئی که دامن تر مکن هوشیار باش

“মধ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে নির্দেশ দিতেছ, সাবধান? আঁচল যেন না ভিজে।” এই কবিতাটি মূলে একটি আরবী কবিতার অনুবাদ। আরবী কবিতাটি হইল—

القاه فی الیم متکونا وقال له ـ ایاك ایاك ان تبتل بالماء

আল্লামা শা’রানী (রঃ) লিখিয়াছেনঃ আল্লাহ্ পাকের শানে এই কবিতাটি প্রয়োগ করা হারাম। কেননা, আল্লাহ্ তা’আলা কাহাকেও সাধ্যের বাহিরে কষ্ট দেন না। যেমন, এই কবিতায় সাধ্যাতীত কষ্টের দোষারোপ করা হইয়াছে। আর তত্ত্বজ্ঞানীরা যে কষ্ট ও সন্তোষকে একত্রিত করিয়া থাকেন, উহার প্রকৃত রূপ এই যে, তাঁহারা বিবেক অনুযায়ী সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং স্বভাবত যন্ত্রণা ভোগ করেন। ইহাকেই মাওলানা রূমী (রঃ) নিজ মস্‌নবীতে ব্যক্ত করিতেছেনঃ

نا خوش تو خوش بود بر جان من ـ دل فدائے یار دل رنجان من

কষ্টের ব্যাপারে স্বভাবত কষ্ট অবশ্যই হয় বটে; কিন্তু জ্ঞানত যেহেতু— هرچه از دوست می آید نیکوست “বন্ধুর পক্ষ হইতে যাহাকিছু আসে—ভাল।” কাজেই কষ্টও মধুর বলিয়া মনে হয়। অতএব, “দুনিয়া অন্বেষণকারিগণ দুঃখ-কষ্টে এবং আখেরাতকামীগণ শান্তিতে আছে”—কথাটি সম্পূর্ণ সত্য।

দুনিয়া কাম্য হওয়ার বিভিন্ন স্তরঃ বন্ধুগণ! সেই মহাপুরুষদের ন্যায় তোমরাও দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা কর। আলোচ্য আয়াতে যাহের (ظاهر) শব্দ যোগ করিয়া ‘বাতেনের’ প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অভ্যন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সারমর্ম এই যে, দুনিয়ার মধ্যে উহার কাম্য হওয়ার দুইটি দিক রহিয়াছে। প্রথমত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য হইতে পারে। দ্বিতীয়ত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য হইতে পারে; কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়া অস্থায়ী এবং আখেরাত স্থায়ী। স্থায়ীর মোকাবিলায় অস্থায়ী কখনও কাম্য হওয়ার যোগ্য নহে। আর উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি করিলে বুঝা যাইবে—যেই উদ্দেশ্যে মানুষ দুনিয়ার অন্বেষণ করিয়া থাকে—তাহাও দুনিয়া দ্বারা হাসিল হইতে পারে না; বরং তাহাও আখেরাতের দ্বারাই লাভ করা যায়।

এখন বুঝিয়া দেখুন, দুনিয়া কোন্ উদ্দেশ্যে কামনা করা হয়? বলাবাহুল্য, সুখ-শান্তির জন্যই দুনিয়া অন্বেষণ করা হয়। এখন চিন্তা করুন, সুখ-শান্তি কি? কেহ কেহ উত্তম পোশাক, উত্তম বাড়ী এবং উত্তম খাদ্যকে সুখ-শান্তি মনে করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা তো সুখ-শান্তির উপকরণমাত্র। সুখ-শান্তি প্রকৃতপক্ষে অন্য বস্তু।

দেখুন, যদি কাহারও ফাঁসির হুকুম হয় এবং এসমস্ত সুখ-শান্তির উপকরণ তাহার আয়ত্তে থাকে, এসমস্ত উপকরণে কি তাহার বিন্দুমাত্র আনন্দ হইতে পারে? কখনই না। যদি কোন অরাজকতার দেশে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় যে, তোমাকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে, ইচ্ছা করিলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবার জন্য অন্য কাহাকেও দিতে পার অথবা নিজে ঝুলিতে পার। এখন যদি এই লোকটি ঘোষণা করিয়া দেয় যে, “আমার পক্ষ হইতে যে ব্যক্তি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে স্বীকার করিবে, আমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাহাকে দান করিব।” বলুন, কোন দরিদ্র হইতে দরিদ্র ব্যক্তিও কি ফাঁসিকাষ্ঠ বরণ করিয়া লইবে? বলাবাহুল্য, কখনও করিবে না।

অতএব, বুঝা গেল, এসমস্ত উপকরণ দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ নহে; বরং দুনিয়ার বহিরাকৃতি মাত্র। প্রকৃত স্বরূপ অন্য কিছু—অর্থাৎ, অন্তরের শান্তি। আমি দাবী করিয়া বলি, ধর্মের অন্বেষণেই অন্তরের শান্তি হাসিল হইতে পারে, দুনিয়ার অন্বেষণে কখনও হইতে পারে না। আল্লাহ্ওয়ালাগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে আল্লাহ্ তা‘আলা মা’শুকানা শানে রাখিয়াছেন, বাদ্শাহী পোশাক, রাজকীয় খাদ্য এবং বহুসংখ্যক মুরীদ-মো’তাকেদ দান করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; বরং যে সমস্ত খোদাগতপ্রাণ মহাপুরুষ সর্বদ্বারে বিতাড়িত; পায়ে জুতাও নাই, কাপড়ও ছেঁড়া-ফাটা, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি দাবী করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহারাও অন্তরের শান্তির ব্যাপারে দুনিয়াদারদের চেয়ে অগ্রগামী রহিয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা এইঃ

رُبَّ اَشْعَثَ اِغْبَرَّ مَدْفُوْعٌ عَلَى الْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهٗ ○

“আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে তাঁহাদের এই আবদার আছে যে, তাঁহারা যদি কোন কথার উপর শপথ করিয়া বসেন যে, ‘এরূপ হইবেই।’ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহাদের কসম পূর্ণ করিয়া দেন।”

এই মর্মে আরেফ শীরাযী বলিতেছেনঃ

گدائے میکدہ ام لیك وقت مستی بیں ـ کہ ناز بر فلك وحکم بر ستارہ کنم

“শরাবখানার দ্বারের ফকীর আমি, কিন্তু মত্ততার সময় আসমান এবং নক্ষত্রকে স্বীয় আজ্ঞাবহ মনে করি।” তিনি নিজের এমন দুস্থ অবস্থায়ও আনন্দিত এবং মত্ত আছেন। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামের নিকট কেহ অভাব ও অনাহারের অভিযোগ করিলে তিনি বলিতেনঃ তুমি বিনা পরিশ্রমে ও চেষ্টায় যে অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইয়াছ, উহার মূল্য কি বুঝিবে? ইহার মূল্য ইব্রাহীম ইবনে আদ্‌হামের কাছে জিজ্ঞাসা কর, যে রাজ্য ছাড়িয়া অভাব-অনাহার খরিদ করিয়াছে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কষ্টকে কষ্টই মনে করে না। আর বলেঃ

نا خوش تو خوش بود بر جان من ـ دل فدائے یار دل رنجان من

দেখুন, মৃত্যুর কষ্টই দুনিয়াতে সবচাইতে বড় কষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ সেই মৃত্যুর জন্য পাগল। আরেফ শীরাযী বলেনঃ

خرم آں روز کہ زیں منزل ویراں بروم ـ راحت جاں طلبم وز پے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسر ایں غم روزے ـ تا در میکدہ شاداں وغزلخواں بروم

এখন বলুন, যাঁহারা মৃত্যুতেও এত আনন্দিত, তাঁহারা অপরাপর দুঃখ-কষ্টে কেমন করিয়া অস্থির হইবেন? যাহা বলিলাম, তাহা শুধু কথার কথাই নহে; বরং ঘটনাবলী হইতেও দেখা যায়, বাস্তবিকই মৃত্যুর সময় তাঁহাদের অবস্থা এরূপ আনন্দময়ই হইয়া থাকে। নক্‌শেবন্দিয়া তরীকার ওলীদের উপর শান্তভাব এবং চিশ্‌তিয়া তরীকার ওলীদের উপর চাঞ্চল্যভাব প্রবল থাকে। নক্‌শেবন্দিয়া তরীকার এক বুযুর্গ লোক এন্তেকালের সময় ওছিয়ত করিলেন যে, আমার জানাযার সহিত একজন মধুর স্বরবিশিষ্ট লোক এই কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে অনুগমন করিবেঃ

مفلسانیم آمدہ در کوئے تو ـ شیئا للہ از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما ـ آفریں بر دست وبر بازوئے تو

“অভাবগ্রস্তরূপে তোমার গলিতে আসিয়াছি। তোমার সৌন্দর্য ও মহিমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। তোমার হাত ও বাহুর মঙ্গল হউক। আমার থলিয়ার দিকে হস্ত প্রসারিত কর।”

কোন চিশ্‌তী ওলী এরূপ ওছিয়ত করিলে ‘হালের’ প্রাবল্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইত। কেননা, দগ্ধীভূত হওয়া এবং প্রজ্বলিত হওয়া তাঁহাদেরই বিশেষত্ব।

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ মৃত্যুকে ভয় করেন নাঃ কিন্তু সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালা মাত্রই মৃত্যুকে ভয় করেন না। বস্তুত নিশ্চিন্তভাব অবশ্যই কিছু ছিল, তাই এরূপ ওছিয়ত করিয়াছিলেন। কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, মৃত্যুর পরে কাহারও কবিতা পাঠে তিনি কি স্বাদ পাইয়া থাকিবেন? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঘটনাবলীদৃষ্টে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ মৃত্যুর পরেও স্বাদ পাইয়া থাকেন। হযরত সুলতান নেযামুদ্দীন রাহেমাহুল্লাহ্‌র জানাযার সহিত গমনকারী জনৈক মুরীদ শোকের আতিশয্যে এই কবিতাগুলি পড়িয়াছিলেনঃ

سرو سیمینا بصحرا می روی - سخت بے مہری که بے ما می روی
اے تماشاگاه عالم روئے تو - تو کجا بهر تماشا می روی

"হে আমার সুঠাম-সুডৌল মাহ্‌বুব! আপনি জঙ্গলের দিকে প্রস্থান করিতেছেন। কতই না নিষ্ঠুরতা! আমাকে সঙ্গে নিতেছেন না। আপনার চেহারা স্বয়ং জগতের তামাশা-স্থল। তবে আপনি আবার প্রমোদ-ভ্রমণে কোথায় যাইতেছেন?"

পীরের এন্তেকালে মুরীদানের অবস্থা যাহা হয় তাহা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে। উক্ত মুরীদ তেমন অবস্থার মধ্যেই উক্ত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ হযরত সুলতানজীর হাত কাফনের ভিতর হইতে উপরের দিকে উঠিল। ঠিক যেমন, 'ওয়াজ্‌দের' অবস্থায় হইয়া থাকে। সঙ্গীয় লোকেরা উক্ত মুরীদকে বারণ করিল, "গযল পড়া বন্ধ কর, বলা যায় না—কি হইতে কি হয়?" কিছুক্ষণ পরে হাত আবার কাফনের ভিতরে সোজা হইয়া গেল। নক্‌শেবন্দী পীর ছাহেবের ঘটনা মৃত্যুর পূর্ববর্তী আর হযরত সুলতানজীর ঘটনা পরবর্তী। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের 'আলমে বরযখের' অবস্থা সম্বন্ধে কোন বুযুর্গ বলিয়াছেনঃ

گر نکیر آید وپرسد که بگو رب تو کیست - گویم آنکس که ربود این دل دیوانۂ ما

"নাকীর আসিয়া আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার খোদা কে?' তখন আমি বলিবঃ "যিনি আমার উন্মত্ত হৃদয় ছিনাইয়া লইয়াছেন।"

তবে এসমস্ত মহাপুরুষ মৃত্যুর চিন্তা কেন করিবেন? কোন কোন তফ্‌সীরের বর্ণনা অনুসারে নিম্নোক্ত আয়াতে তাঁহাদের মৃত্যুর অনতিপূর্বকালের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَنْ لَّاتَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○ نَحْنُ اَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ ○ط نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ফেরেশ্‌তারা তাঁহাদিগকে সুসংবাদ শুনাইয়া দেন এবং শান্ত ও নিশ্চিন্ত করিয়া দেন। অতঃপর আসে কিয়ামতের পালা। ইহাও তাঁহাদের পক্ষে চিন্তার বিষয় নহে। যেমন, কোরআন ঘোষণা করিতেছেঃ

لَايَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

"কিয়ামতের মহা ভয় তাঁহাদিগকে চিন্তিত করিবে না এবং তাঁহাদের সহিত ফেরেশ্‌তাগণ সাক্ষাৎ করিবেন।"

হযরত মাওলানা শাহ্‌ ফযলুর রহমান ছাহেব হইতে এই মর্মে আমি একটি কবিতা শ্রবণ করিয়াছিঃ

عاشقاں را باقیامت روز محشر کار نیست - عاشقاں را جز تماشائے جمال یار نیست

" কিয়ামত এবং হাশরের দিনে আশেকদের কোন চিন্তা-ভাবনা নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্য শুধু বন্ধুর রূপ দর্শনের তামাশা ভিন্ন আর কিছু নহে।" এখন বলুন, যাহাদের নিকট হাশরের দিন

'দীদারে এলাহী' হাসিল হওয়ার দিন, তাঁহারা কিয়ামতের ভয়ে অস্থির হইবেন কেন? মাওলানা রূমী (রঃ) মস্‌নবীতে লিখিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ যখন দোযখের উপরিস্থ পুলছেরাত পার হইয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছিবেন, তখন তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিবেনঃ "আমরা শুনিয়াছিলাম, পুলছেরাত দোযখের উপরে অবস্থিত। কোথায়, আমরা তো পথে দোযখ দেখিলাম না?" তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলিবেনঃ "তোমরা পথে একটি উদ্যান দেখিয়াছিলে?" বলিবেনঃ হাঁ, ফেরেশ্‌তারা বলিবেনঃ "উহাই দোযখ ছিল। তোমাদের আমলের বদৌলত উহা উদ্যানের আকৃতিতে তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।" অতএব, তাঁহাদের জন্য তো দোযখও ইব্‌রাহীম খলীল আলাইহিস্‌সালামের অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় উদ্যানে পরিণত হইবে। সুতরাং তাঁহাদের চেয়ে অধিকতর আরাম কাহার ভাগ্যে জুটিবে?

হাদীস শরীফে আছেঃ মুসলমান যখন পুলছেরাত অতিক্রম করিবে, দোযখ তাহাদিগকে বলিবেঃ جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَاِنَّ نُوْرَكَ اَطْفَا نَارِىْ "হে মুসলমান! তাড়াতাড়ি অগ্রসর হও। তোমার জ্যোতি আমার আগুন নিভাইয়া দিয়াছে।" তফ্‌সীরকারকগণ ইহার তফ্‌সীরে বলিয়াছেনঃ মুমেন যেমন দোযখ হইতে 'পানাহ্‌' চাহিতেছে, দোযখও তদ্রূপ মুমেন হইতে 'পানাহ্‌' চায়। সমস্ত দুঃখ-কষ্টের সেরা দোযখই যাহার হইতে 'পানাহ্‌' চায়, তাঁহার খুশীর সীমা কোথায়? বাস্তবিকই দোযখ মুমেন হইতে 'পানাহ্‌' চাহিতেছে। কেননা, দোযখের সঙ্গে মুমেনের কোনই সম্পর্ক নাই। যেখানে সম্পর্কই নাই সেখানে উভয়পক্ষই অপরপক্ষ হইতে বিমুখ থাকিবে। কোন এক কবি এই মর্মটিকে অন্য ভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

میں جو ہوں قابل دوزخ توگناہوں کے سبب ۔ لیک دوزخ نے کیا کیا جو مرے قابل ہے

"আমি তো পাপের কারণে দোযখের উপযোগী হইয়াছি। কিন্তু দোযখের কি দোষ—যাহার ফলে আমাকে তাহার ভিতরে রাখার উপযোগী হইল?" বাস্তবিকই মুসলমান এক বিচিত্র বস্তু! দোযখ তাহা হইতে দূরত্ব কামনা করে এবং সে দোযখ হইতে দূরত্ব কামনা করে।

ঈমানের দৌলত মর্যাদার যোগ্যঃ বন্ধুগণ! ঈমানের দৌলতকে মর্যাদা দিন। ইহাতে বুঝা গেল, দুনিয়া অন্বেষণকারীরা দুনিয়া হইতে প্রকৃতপক্ষে কিছুই লাভ করিতে পারে না। তাহারা তো কেবল বাহ্যিক উপকরণ লইয়াই বসিয়া রহিয়াছে। দুনিয়ার প্রাণবস্তু তাঁহারাই ভোগ করিতেছেন যাঁহাদিগকে তোমরা দুনিয়া বর্জনকারী বলিয়া মনে করিতেছ। ইহাতে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার প্রাণবস্তু দুনিয়ার অন্বেষণে পাওয়া যায় না; বরং দুনিয়াকে ত্যাগ করিলেই পাওয়া যায়। সুতরাং আফসোসের বিষয়—যে বস্তুকে ঘৃণা করাই উহাকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা, মানুষ তাহার জন্য অনুরাগে আত্মহারা।

এ পর্যন্ত প্রমাণ করিয়াছি যে, দুনিয়ার প্রকৃত শান্তি আল্লাহ্‌ওয়ালাগণই ভোগ করিতেছেন। এখন কথা হইল, এই শান্তির রহস্য কি? তাহা এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ নিজেদের জন্য কোন নির্দিষ্ট অবস্থা স্থির করেন না। কেননা, কিছু স্থির করিলেই দাবী করা হয়, "আমাদেরও অস্তিত্ব আছে, আমরাও একটা কিছু বটে। আমাদের স্থির করারও মূল্য আছে।" বস্তুত তাঁহাদের রুচিই হইল নিছক আত্ম-বিস্মৃতি। তাঁহারা নিজদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, নিজেদের ইচ্ছা এবং মতামতকে লোপ করিয়া দিয়াছেন। যেমন, কবি বলেনঃ

خود ثنا کردن زمن ترک ثناست ۔ این دلیل هستی خطاست

"তাঁহারা তো নিজেদের মতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাও করেন না। কেননা, তাহাও নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ।" অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করিতেছি। আমি কোন্ যোগ্যতাসম্পন্ন যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করিতে পারি?

তবে আল্লাহ্ওয়ালা লোকের মুখে আল্লাহ্র প্রশংসা কেন এবং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বা আল্লাহ্র প্রশংসা কেন করিয়াছেন? ইহার উত্তর দার্শনিকগণ দিতে পারেন না। সূফিয়ায়ে কেরাম হাদীস দ্বারাই ইহার জওয়াব দিয়াছেন। হাদীসে কুদ্সীতে বর্ণিত আছে—— بِىْ يَسْمَعُ وَبِىْ يَنْطِقُ وَبِىْ يَبْصُرُ "আল্লাহ্ওয়ালাগণ আমারই দ্বারা শুনে, আমারই দ্বারা কথা বলে এবং আমারই দ্বারা দেখে।" কাজেই তাঁহাদের মুখে উচ্চারিত প্রশংসা তাঁহাদের কৃত নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং করিয়া থাকেন। যেমন, তূর পর্বতের বৃক্ষ হইতে আওয়ায আসিয়াছিলঃ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ তবে কি বৃক্ষ নিজেকে رَبُّ الْعَالَمِيْنَ বলিয়া দাবী করিয়াছিল? কখনই না; বরং কেহ বৃক্ষের দ্বারা বলাইয়াছিল এবং অন্য এক সত্তা ইহার বক্তা ছিলেন।

আফসোস! মুফ্তীগণ মানছুর হাল্লাজের اَنَا الْحَقُّ -কেও যদি তূর-এর বৃক্ষের اَنَا اللّٰهُ -এর ন্যায় মনে করিত, তবে বেচারাকে শূলিতে চড়ান হইত না। কিন্তু আলেমগণ মনে করিয়াছিলেন —তূর-এর বৃক্ষ বোধমান পদার্থ নহে এবং মানছুর বোধমান। অথচ বেচারা শুধু অপরের উক্তি অনুকরণ করিতেছিল। যেমন, আদালতের অর্ডার্লী মোকদ্দমার পক্ষগণকে ডাকার ব্যাপারে শুধু আবৃত্তিকারী। বড় হইতে বড় লোককেও নাম ধরিয়া ডাকেঃ "অমুকের পুত্র অমুক হাযির হ্যায়।" কেহ তাহার সে কথায় অসন্তুষ্ট হয় না। কেননা, সকলেই জানে ইহা তাহার নিজের উক্তি নহে; বরং সে আবৃত্তিকারী মাত্র, অন্য সময়ে তাহার সাধ্য কি উক্ত বড় লোকের সম্মুখে আসে কিংবা তাঁহার সহিত কথা বলে? নাম উচ্চারণ করা তো দূরেরই কথা। নাম লইয়া তাঁহাকে আহ্বান করাও তো অতি গুরুতর অপরাধ।

এইরূপে আল্লাহ্ওয়ালাগণ প্রশংসার সময় আল্লাহ্রই উক্তির আবৃত্তি করিয়া থাকেন। নিজেরা প্রশংসা করেন না। নিজদিগকে তাঁহারা সেই উপযুক্তও মনে করেন না। কেননা, তাঁহারা নিজেদের সত্তাকে বিলুপ্ত করিয়া রাখেন। বিলুপ্ত সত্তা মতামত স্থির করিতে পারেন কিরূপে? তাঁহাদের কোন আত্মীয়-স্বজন রুগ্ন হইলে যাঁহারা ঔষধও করেন এবং দো'আও করেন। কিন্তু অন্তরে উভয় অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, মৃত্যু ঘটিলে ইহার উপর তো পূর্ব হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক দুঃখ হইলে কোন ক্ষতি নাই। অন্তরে তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্টই থাকেন। বস্তুত যাবতীয় দুঃখের মূল——এই মতামত স্থির করা এবং আশা করাই বটে। যে ব্যক্তি মতামত ও আশাকে বিলোপ করিতে পারে, সে সকল অবস্থায় শান্তিতে ও আরামেই থাকে; বরং কোন দুনিয়াদার লোক যদি কোন আল্লাহ্ওয়ালা লোক হইতে অপূর্ণ সামঞ্জস্যও লাভ করিতে পারে, সেও অপর দুনিয়াদারগণ অপেক্ষা অধিক শান্তিতে থাকে।

এক মোল্লা ধরনের জেণ্টল্ম্যান ছিলেন, অর্থাৎ, স্বাধীন দুনিয়াদার। তিনি হ্যাটও পরিতেন, তৎসঙ্গে লুঙ্গিও পরিতেন। মানুষ হাসিত, হ্যাট আর লুঙ্গিতে কি সম্পর্ক! তিনি উত্তর করিতেনঃ "পোশাক শান্তির জন্য পরা হয়, প্যান্টে আরাম নাই; বরং ইহা মানুষকে আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধিয়া রাখে। অতএব, উহা ত্যাগ করিয়া লুঙ্গি পরিয়াছি। আর হ্যাট পরিধানে শান্তি আছে। ইহাতে রৌদ্র প্রভৃতি হইতে চক্ষুর হেফাযত হইয়া থাকে। অতএব, আমি আরামের বস্তু অবলম্বন করিয়াছি, সামঞ্জস্য থাকুক বা না থাকুক।" তাঁহার পিতার মৃত্যুর টেলিগ্রাম আসিলে বাবুর্চি খানা পাকাইল না।

আজ সাহেব খানা খাইবেন না। সময়মত তিনি খানা তলব করিলে সে বলিলঃ আজ পিতৃবিয়োগের শোকে আপনি খানা খাইবেন না ধারণা করিয়া আমি খানা পাকাই নাই। সাহেব তাহার পাঁচ টাকা জরিমানা করিলেন (ইহা ছিল পাগলামি) এবং বলিলেনঃ সোব্‌হানাল্লাহ্! তিনি নিজের নির্দিষ্ট সময়ে এন্তেকাল করিয়াছেন, আর তুমি আমাকে জীবিত অবস্থায় ক্ষুধার্ত রাখিয়া মারিতে চাহিতেছ? (ইহা বিবেচনাপ্রসূত কথা বটে; ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। ইহাতে সম্পূর্ণ শান্তিই শান্তি।)

বন্ধুগণ! ধর্মপরায়ণ লোকেরাই প্রকৃত দুনিয়াদার। দুনিয়ার প্রাণবস্তু অর্থাৎ, প্রাণের শান্তি তাঁহাদেরই নিকট রহিয়াছে। দুনিয়াদারদের নিকট সাজ-সজ্জার বাহার ছাড়া শান্তির কিছুই নাই। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ শান্তি ভোগ করিয়াও থাকেন, তবে তাহা শুধু আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সদৃশতাবশত ভোগ করেন। ফলকথা, দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ চিন্তা করাই দুনিয়ার প্রতি অমনোযোগিতা উৎপন্ন করার উপায়।

আখেরাতের সহিত মনোযোগ স্থাপনের উপায়ঃ এখন আখেরাতের সহিত মনোযোগ স্থাপনের উপায় শ্রবণ করুন। তাহা এই যে, আখেরাতের অবস্থাসমূহ চিন্তা করুন। আখেরাতের প্রথম অবস্থাঃ তাহাতে দুঃখ-চিন্তার নাম-গন্ধও নাই। বলাবাহুল্য, দুনিয়াতেই যখন আখেরাত তলব করার এই ফল, অর্থাৎ, আখেরাত প্রত্যাশী এখানেও অন্তরের শান্তি লাভ করিয়া থাকে; তখন আখেরাতে পৌঁছিয়া তাঁহাদের কেমন শান্তিময় অবস্থা হইবে! দ্বিতীয় অবস্থাঃ আখেরাত অনন্তকাল স্থায়ী। উহার নেয়ামতসমূহ অফুরন্ত ও অনন্ত। তৃতীয় অবস্থাঃ উহা যতটুকু কামনা করা হয়, তদপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়; বরং যতটুকু তোমরা কামনা করিতেও পার না, তাহাও পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে দুনিয়া কাম্য পরিমাণও পাওয়া যায় নাঃ

مَاقَضٰى اَحَدٌ مِّنْهَا لَبَانَتَهٗ ـ لَايَنْتَهِىْ اِرْبٌ اِلَّا اِلٰى اِرْبٍ

ইহা দৃষ্ট বিষয় এবং সকলেই জানে যে, কোন মানুষই দুনিয়া প্রত্যাশিত পরিমাণ পায় না। অথচ আখেরাতের অন্বেষণকারী সমুদয় কাম্যই লাভ করে। সে শান্তি কামনা করে, বেহেশ্‌তের প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি তলব করে। বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাৎলাভের আশা রাখে। অনেক কিছু সে দুনিয়াতেও পাইয়া থাকে। যেমন, মনের শান্তি এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ। অবশ্য দুনিয়াতে যাহাকিছু পাওয়া যায়, তাহা পরিবর্তনের আশঙ্কাও সর্বদা মনে লাগা থাকে। অথচ আখেরাতে সে চিন্তা নাই। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاۤءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ

يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

"যে ব্যক্তি আশু জীবন অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রত্যাশী, আমি যত পরিমাণ ইচ্ছা এবং যাহাকে ইচ্ছা এখানেই দান করিয়া থাকি। অতঃপর তাহার জন্য দোযখ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। যাহাতে সে লজ্জা ও অপমানের সহিত প্রবেশ করিবে।" সেই ব্যক্তি পাকা দুনিয়াদার, যাহার প্রত্যাশা কেবল দুনিয়া, অর্থাৎ কাফের। যাহারা আখেরাত চিনেই না, দুনিয়া লইয়াই ব্যস্ত। তাহারাও দুনিয়া যত চায় তত পায় না। আবার তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রত্যাশীও পায় না। অতঃপর বলেনঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا فَاُولٰۤئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

"আর যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রত্যাশা করে এবং উহার জন্য যথোপযোগী চেষ্টা করে।" এখানে سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا "উহার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা করে" বাক্যাংশকে اَرَادَ الْاٰخِرَةَ "আখেরাতের প্রত্যাশা করে" বাক্যের ব্যাখ্যারূপে সংযোগ করা হইয়াছে যাহাতে প্রত্যাশীদের প্রত্যাশারোধ করা যায়। কেননা অনেকে আখেরাতের প্রত্যাশা বলিতে শুধু মুখে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করে যে, "আমি আখেরাত তলবের নিয়ত করিতেছি।" আল্লাহু আকবার! অর্থাৎ, অনেকে শুধু আখেরাতের আকাঙ্ক্ষাকেই তলবে-আখেরাত মনে করিয়া থাকে। উহার কোন আসবাব বা উপকরণ অবলম্বন করে না। কেবল আখেরাতের বেলায়ই এই অবস্থা। দুনিয়ার সহিত এরূপ ব্যবহার কেহই করে না যে, কেবল আকাঙ্ক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। এই জন্যই مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ -এর সঙ্গে وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا বলেন নাই। কেননা, দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করার অর্থই সাধারণত এই যে, উহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। এখন এরূপ সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, আখেরাতের ক্ষেত্রে وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا যোগ করা হইয়াছে, দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাহা করা হইল না কেন? ইহাতে দুনিয়ার উপর আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণরূপে বুঝা গেল না। আখেরাতের বেলায়ও যদি শুধু প্রত্যাশা পর্যন্তই থাকিত, তবে বিরোধিতা পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হইত। সন্দেহ ভঞ্জনের সারমর্ম এই যে, سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য। কিন্তু দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, সেস্থলে মানুষ প্রত্যাশার অর্থে ভুল করে না।

আখেরাতের ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক ভুল করিতে দেখা যাইতেছে, কাজেই وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا যোগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আর سَعٰى لَهَا سَعْيَةً না বলিয়া سَعْيَهَا বলার তাৎপর্য এই যে, وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا -এর অর্থ "এবং আখেরাতের জন্য আখেরাতের উপযোগী চেষ্টা করে।" আর سَعْيَةً বলিলে অর্থ হইত, "এবং আখেরাতের জন্য নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে।" কাজেই سَعْيَةً বলিলে দুর্বলমতি লোকেরা সুযোগ পাইত। সামান্য কিছু কাজ করিয়াই বলিয়া দিত, "আমার সাধ্য এপর্যন্তই।" অতএব, তাহাদের এই টালবাহানার পথ বন্ধ করার জন্যই বলিয়াছেনঃ "আখেরাতের জন্য আখেরাতের উপযোগী চেষ্টা করে।" ইহার অর্থ সাধ্যের বাহিরে চেষ্টা করাও নহে। যেমন, আখেরাতের মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিলে বাহ্যত তাহাই বুঝা যায়; বরং উদ্দেশ্য ইহাই যে, নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিবে।

যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেনঃ "فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" "তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর।" অতএব, سَعْيَهَا এবং سَعْيَةً -এর সারমর্ম একই, কিন্তু سَعٰى لَهَا سَعْيَةً -এর পরে سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا -এর অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, "নিজের সাধ্যানুরূপ চেষ্টা শেষ করিয়া দিবে।" এরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে দুর্বলমতি লোকেরা বাহানা করিবার সুযোগ পাইত। খুব অনুধাবন করুন।

এই হেকমতের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ -কে প্রথম নাযিল করেন নাই; বরং প্রথমে নাযিল করিয়াছেনঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه অর্থাৎ, "ভয়ের হক আদায় করিয়া আল্লাহ্কে ভয় কর।" ইহা শুনিয়া ছাহাবায়ে কেরাম ঘাবড়াইয়া গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলার 'শান্' অনুযায়ী ভয় করা কাহার দ্বারা সম্ভব? তখন তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ নাযিল করিয়াছেন। এই বাক্যের দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম রহিত হইয়া যায় নাই; বরং ইহা দ্বারা উহার তফসীর করা হইয়াছে। অর্থাৎ, فَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه -এর অর্থ এই যে, নিজেদের

সাধ্য অনুযায়ী পরহেয্‌গারী অবলম্বন কর। পূর্বকালের তফ্‌সীরকারকদের মধ্যে কেহ مَااسْتَطَعْتُمْ কে حَقَّ تُقَاتِهٖ -এর হুকুম রহিতকারী বলিয়া থাকিলেও উদ্দেশ্য তফ্‌সীরই বটে। কেননা, পুরাতন যুগের তফ্‌সীরকারকদের কথায় পূর্ববর্তী হুকুমের পরিবর্তন এবং ব্যাখ্যা উভয়কেই 'রহিতকরণ' বলা হইয়া থাকে। যাহাহউক, সাধ্যানুরূপ 'তাক্‌ওয়া' অবলম্বনই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাকে فَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ -এর পরে উহারই ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ণনা করার ফলে দুর্বলমতি লোকদের টালবাহানা বন্ধ হইয়া গেল। আর প্রথমেই فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ নাযিল হইলে দুর্বল ঈমান লোকদের বাহানা করার সুযোগ থাকিয়া যাইত। এইরূপে এখানেও মনে করুন, سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا -কে فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ -এর সাথে মিলাইয়া দেখিলে সারমর্ম এই দাঁড়ায়, "নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা কর।" কিন্তু سَعٰى لَهَا سَعْيَهٗ প্রথমে না বলার হেকমত এইমাত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাতে দুর্বলমতি লোকেরা টালবাহানা করার সুযোগ পাইত। والله اعلم باسرار كلامه (ইহার গূঢ় রহস্য আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।)

যাহাহউক, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যাহারা আখেরাত অন্বেষণ করে এবং উহার জন্য যথোপযোগী চেষ্টা করে, اُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا "তাহাদের চেষ্টার মূল্য প্রদান করা হইবে।" প্রকাশ্যে এখানে নির্দিষ্ট পুরস্কারের উল্লেখ নাই। কিন্তু কোরআন বিশ্ব-অধিপতির কালাম, ইহাতে শাহী ভাব-ধরনের কথাবার্তা বলা হয় এবং শাহী ভাষায়—"তাহার চেষ্টার মূল্য দেওয়া হইবে" কথাটি খুব বড় কথা। ইহা হাজার হাজার তফ্‌সীল হইতেও অগ্রণী। বাদশাহ্ যদি বলেনঃ আমি তোমার খেদমতের মূল্য উপলব্ধি করিয়াছি, তখন তাহার বুঝা উচিত, অনেক কিছুই পাওয়া যাইবে এবং আশার অতিরিক্তই পাওয়া যাইবে। এখন বুঝিয়া লউন, যাহার চেষ্টার মূল্য আহ্‌কামুল হাকেমীন দান করিবেন, সে কি পরিমাণ লাভ করিবে?

এইরূপে কোরআনে যে জায়গায় لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ইত্যাদি আছে, ইহাও শাহী বাক্‌পদ্ধতি। বাদশাহ্‌দের রীতি, তাঁহারা এই জাতীয় শব্দেই ওয়াদা করিয়া থাকেন। 'আশান্বিত থাক,' শাহী কালামে এই শ্রেণীর ওয়াদা অপরের কথার 'কসম' হইতেও অধিকতর দৃঢ়। সুতরাং আখেরাতের অন্বেষণে আগ্রহ করার উপযোগী এই একটি বিষয় আছে যে, আখেরাতের অন্বেষণ কখনও বিফলে যায় না; বরং ফল অবশ্যই লাভ হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়ার বেলায় এমন কোন ওয়াদা নাই।

আর একটি কথা এই যে, আখেরাতের প্রত্যাশী আশার অতিরিক্ত পাইয়া থাকে। যেমন, একটি নেক আমলের ১০ গুণ সওয়াব প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত রহিয়াছেঃ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا আবার কেহ সাত শত গুণও প্রাপ্ত হইবে। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত আছেঃ

كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ○

"এক একটি নেক আমল একটি বীজের ন্যায়, যাহা হইতে সাতটি ছড়া উৎপন্ন হয়, প্রত্যেকটি ছড়ায় ১০০টি করিয়া দানা।" ইহার উপরেই শেষ করেন নাই; বরং অন্যত্র বলিয়াছেন— فَيُضَاعِفَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً "তাহাকে বহুগুণ দান করিবেন।" এখন তো আর কোন সীমাই নির্ধারণ করা হইল না। পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরে হুযূর (দঃ) যখন দো'আ করিলেন— اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ "হে খোদা! আমাকে আরও বেশী সওয়াব দান করুন।" তখন فَيُضَاعِفَهٗ الاٰية নাযিল হইয়াছে। (বহু হাদীসের কিতাবের বরাতে তফসীরে মায্‌হারীতে এরূপ আছে।) অতএব, নিশ্চিতরূপে সাত শত গুণ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে। তফসীরকারকগণ

প্রত্যেক গুণের মান সাত শত বলিয়াছেন। তাহা যদি নাও হয়, তথাপি অনেক বেশী হওয়াতে তো কোনই সন্দেহ নাই। কেননা, তাহা কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি খোরমা দান করিলে আল্লাহ্ তা'আলা উহা এত অধিক বাড়াইয়া থাকেন যে, ওহুদ পর্বত হইতে বড় হইয়া যায়। এই হাদীস অনুসারে তো সওয়াবের মাত্রা আরও অনেক বাড়িয়া যায়। কেননা, ওহুদ পাহাড়কে খোরমার পরিমাণ খণ্ডে পরিণত করিতে হইলে দুই শত বৎসরেরও অধিক সময় লাগিবে। অর্থাৎ, বেহিসাব বা অগণিত-অসংখ্য সওয়াব পাওয়া যাইবে। কোন কোন মূর্খ লোক ইহা শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছে।

এক মূর্খ আর্য লিখিয়াছেঃ মুসলমানদের সওয়াবের যে ধারা বর্ণিত আছে তাহা ঠিক নহে। কেননা, আমাদের আমল সসীম, ইহার সওয়াব অপরিসীম হওয়ার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন এক পোয়া খাদ্য গ্রহণকারীকে ৫০ মণ খাওয়াইয়া দেওয়া। সে তো ইহাতে মরিয়াই যাইবে। সসীমের মধ্যে অসীম সওয়াব লাভের শক্তি কোথায়? এই মূর্খতাপূর্ণ উক্তির উত্তর একেবারে পরিষ্কার। এক পোয়া পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে যদি ৫০ মণ খাদ্য একই সময়ে একেবারে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, তবেই সে মরিবে। কিন্তু যদি অসীম সওয়াব প্রদানের সাথে সাথে আয়ুষ্কালও সীমাহীন করিয়া দেওয়া হয় এবং অসীম আয়ুষ্কালে অনন্ত ও অফুরন্ত খাদ্য ক্রমে ক্রমে খাওয়ান হয় তাহাতে জটিলতা কিসের? উক্ত মূর্খ আর্য সওয়াবকে ধরিয়া লইয়াছে অসীম আর আয়ুকে ধরিয়াছে সীমাবদ্ধ। কাজেই বৃথা প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, মুসলমানরা পরলোকের আয়ুকে অসীম এবং অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু মূর্খ আর্যগণ অনন্তকালের জন্য 'নাজাত্' স্বীকার করে না। তাহাদের মতে পুণ্যবান ব্যক্তি আত্মার জগতে এক নির্দিষ্টকাল অবস্থানের পর অবতাররূপে কোন দেহ ধারণপূর্বক জগতে নামিয়া আসে। কাজেই সে কর্মফল লাভের মুদ্দতকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ধারণা করিয়া এই উদ্ভট সন্দেহ করিয়া বসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সন্দেহযোগ্য বিষয়ই নহে। গোঁড়ামি, পক্ষপাতিত্ব দোষে জ্ঞান-বুদ্ধি বিকল মস্তিষ্কে যাহা আসিয়াছে, বলিয়া দিয়াছে। আখেরাতে নেক আমলের সওয়াব অগণিত ও অসংখ্য পাওয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া মূর্খেরা ঘাবড়াইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে তথাকার অবস্থা এইরূপঃ

نیم جاں بستاند و صد جاں دهد   آنچه در وهمت نیاید آں دهد
خود که باید ایں چنیں بازار را   که بیك گل می خری گلزار را

"অর্ধেক প্রাণের বিনিময়ে শত শত প্রাণ বখ্‌শিশ্‌ করিয়া থাকেন। কল্পনার বাহিরে অতিরিক্ত দান করেন। এমন বাজার কোথায় আছে যেখানে একটি ফুলের বিনিময়ে পূর্ণ ফুলের বাগানই খরিদ করা যায়?"

অতএব, তাঁহার পক্ষ হইতে যখন এমনভাবে প্রাণ বখ্‌শিশের ব্যবহার, তখন আমাদেরও তাঁহার সহিত প্রাণদানের ব্যবহার রাখা উচিতঃ

همچوں اسماعیل پیشش سر بنه   شاد و خنداں پیش تیغش جاں بده

"ইসমাঈ'লের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে মাথা নত কর। তাঁহার তরবারির সম্মুখে হাসি-খুশীর সহিত প্রাণ দাও।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ বেহেশ্‌তে সকলের শেষে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিবেনঃ 'যা, বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।' সে বেহেশতে প্রবেশ করিয়া দেখিবে ভীড় ও হট্টগোল। আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করিবেঃ "এখানে তো জায়গা নাই।" আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেনঃ "তোকে আমি দুনিয়ার চেয়ে দশ গুণ অধিক পরিমিত স্থান বেহেশ্‌ত দান করিয়াছি।" সে বলিবে, اَتَسْتَهْزِءُ بِىْ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ "আপনি রাব্বুল আলামীন হইয়া আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন?" এখানে তো একটুও জায়গা নাই। আর আপনি বলেনঃ "দুনিয়ার চেয়ে দশ গুণ বেশী।" এই বেহেশ্‌তী মূর্খ ও গেঁয়ো, কাজেই এমন নির্ভীকভাবে কথাবার্তা বলিবে। বেহেশ্‌তে মূর্খ লোকও যাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল মোবারক নামাযের পরে নামাযীদিগকে মসজিদ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেনঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ্, ইহারা সকলে বেহেশ্‌তের 'ভর্তি।' কিন্তু কাজের লোক ইহাদের মধ্যে দুই তিন জনই হইবে। ভর্তি শব্দের অর্থ অতিরিক্ত বোঝা।

বেহেশ্‌ত ও দোযখের বিস্তৃতিঃ বন্ধুগণ! আপনারা বেহেশ্‌তের প্রত্যাশী। বেহেশ্‌ত ইনশাআল্লাহ্ আপনারা পাইবেনই। বেহেশ্‌ত আপনাদেরই জন্য—কাফেরদের জন্য কখনই নহে। এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। কেবল একটু কাজ করুন। মন্দ কার্যগুলি ছাড়িয়া দিন। কিন্তু আমার মনে আকাঙ্ক্ষা, আপনারা বেহেশ্‌তের 'ভর্তি' অর্থাৎ, অকেজো হইবেন না; বরং কাজের লোক হউন। এরূপ হইলে বেহেশ্‌তে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের মুসলমানদের জন্যও দুনিয়ার দশ গুণ পরিমিত স্থান দেওয়া হইবে।

কোন এক নাস্তিক প্রশ্ন করিয়াছিলঃ "আমরা এত ভূগোল পাঠ করিলাম, কোথাও তো বেহেশ্‌তের সন্ধান পাইলাম না।" উত্তরে আমি বলিয়াছিলামঃ "তুমি দৃশ্য জগতের ভূগোল পড়িয়াছ, অদৃশ্য জগতের ভূগোল পড় নাই। তাহা আমাদের নিকট আছে। তুমি যদি উভয় জগতের ভূগোল অর্থাৎ, কোরআন পড়িতে, তবে বেহেশ্‌তের সন্ধান পাইতে। যাঁহারা এই ভূগোল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বেহেশ্‌ত, দোযখ, পুলছেরাত, আরশ এবং মীযানের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐসমস্ত বস্তু দুনিয়াতেই খোলাখুলিভাবে দেখিতে পাইয়াছেন।"

শেখ আবদুল করীম জায়লী (রঃ) দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বেহেশ্‌ত এবং দোযখের জরিপ পর্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেননা, উভয় বস্তুই বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি সত্ত্বেও সীমাবদ্ধই বটে। সীমাবদ্ধ বস্তুর জরিপ করা অসম্ভব কিছুই নহে। কিন্তু দেহের ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতির সাহায্যে জরিপ করিতে হইলে তবুও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইত। তিনি যখন আত্মিক শক্তির সাহায্যে জরিপ করিয়াছেন, কাজেই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। কেননা, আত্মার ক্ষমতা অনেক বেশী। এতদ্ভিন্ন হযরত শেখ আবদুল করীম জায়লী (রঃ) দিব্য চক্ষুর সাহায্যে এক মহাসমুদ্রও দেখিতে পাইয়াছেন। উহার এক এক তরঙ্গ আসমান-যমীন অপেক্ষা দশ গুণ বড়। কিন্তু ফেরেশ্‌তারা সেই তরঙ্গরাজিকে রুখিয়া রাখিয়াছেন। অন্যথায় আসমান-যমীন সবকিছুই ডুবিয়া যাইত।

আবার কোন কোন মূর্খ এরূপ সন্দেহ করিয়াছে যে, বেহেশ্‌ত যখন এত বিশাল ও বিরাট, عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ "উহার পরিসর সমস্ত আসমান ও যমীনের সমপরিমাণ," তখন উহা কোথায় রাখা হইয়াছে?" তদুত্তরে আমি বলিঃ এই প্রশ্ন করিবার অধিকার কাহারও নাই। কেননা, তোমাদের বৈজ্ঞানিকদের মতে শূন্যমণ্ডল অসীম; সুতরাং অসীম শূন্যমণ্ডলের কোথাও বেহেশ্‌ত

অবস্থিত থাকিলে ক্ষতি কি? মঙ্গল গ্রহে তোমরা যেমন জনবসতি রহিয়াছে বলিয়া মনে কর, তদ্রূপ হয়তো কোন স্থানে জনবসতিপূর্ণ বেহেশ্‌তও গ্রহের মত বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অত্যধিক দূরত্বের কারণে তাহা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। মঙ্গল গ্রহের অবস্থিতি পৃথিবীর নিকটবর্তী বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস। কাজেই তোমরা তথাকার জনবসতি সম্বন্ধে জানিতে পারিতেছ। বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকদিগকে নিরুত্তর করার উদ্দেশ্যে এই উত্তর দেওয়া হইল। অন্যথায় আমাদের মতে আসমান-যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যমণ্ডলের বাহিরে সাত আসমানের উপরে বেহেশ্‌ত অবস্থিত। কোরআনের সাহায্যে জানা যাইতেছে যে, বেহেশ্‌ত আসমানসমূহের উপর। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط

"উষ্ট্র সূচের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কাফেরদের জন্য আসমানের দ্বারও খোলা হইবে না, তাহারা বেহেশ্‌তেও প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

আর হাদীস হইতে জানা যায় যে, বেহেশ্‌ত সাত আসমানের উপরে এবং আরশের নীচে। আরশ্‌ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহার চেয়ে বড় কোন সৃষ্টিই নাই। আবদুল করীম জায়লী (রঃ) দিব্য চক্ষে যে সমুদ্র দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার তরঙ্গ আসমান-যমীন অপেক্ষা দশ গুণ বড় ছিল, তাহাও আরশেরই নীচে অবস্থিত বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। আরশ যদিও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সৃষ্টি, তথাপি তাহাও সীমাবদ্ধ। কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান সত্তারই কোন সীমা নাই। একমাত্র তিনিই অসীম।

যাহারা আরশকে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাসস্থান মনে করে এবং বলে যে, (নাউযুবিল্লাহ্‌) আমরা যেমন ঘরে বাস করি, আল্লাহ্‌ তা'আলাও তেমনি আরশে অবস্থান করিতেছেন, উপরিউক্ত বর্ণনায় তাহাদের এই উক্তি প্রকাশ্য ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইল। কেননা, সসীম পদার্থ অসীমকে কোন মতেই বেষ্টন করিতে পারে না। অথচ বাসস্থান বাসিন্দাকে বেষ্টন করিয়া থাকা অনিবার্য।

এখন একটি কথা অব্যক্ত থাকিয়া যায়, তবে اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর অর্থ কি? সহজ কথায় এই প্রশ্নের উত্তর প্রাচীনকালের ওলামায়ে কেরাম এই দিয়াছেন যে, এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত, "আমরা ইহার অর্থ জানি না।"

অর্থ যাহাই হউক, ইহার উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের জন্য ফরয। যদি কেহ ব্যাখ্যা বুঝিতে চান, তবে ইহার ব্যাখ্যাও সহজ। আমি বার বার বর্ণনা করিয়াছি, اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ 'শাহী উক্তি', যেমন, ফারসী ভাষায় বলা হয়, 'তখ্‌ত নেশীনী' অর্থাৎ, সিংহাসনারোহণ। এখানে তখ্‌ত বলিতে রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ এবং আদেশ-নিষেধ প্রবর্তন। অন্যথায় তখ্‌ত-এর অর্থ কুরসী বলা হইলে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কেননা, কোন কোন বাদশাহ্‌ কুরসীতে না বসিয়া বিছানার উপর বসিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। আর আজকাল কুরসী বলিতে সিংহাসন মোটেই বুঝাইবে না। কেননা, ষ্টলে এবং সেলুনে রাজকীয় ধরনের কুরসী ব্যবহৃত হইতেছে। তথাপি সিংহাসনারোহণ শব্দটি আজকালও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব, সিংহাসনারোহণ বলিতে আজকাল যে অর্থ বুঝায়, অর্থাৎ, রাজ্য পরিচালনায় ক্ষমতার প্রয়োগ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর অর্থও তাহাই বটে। কোন কোন স্থানে اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর সঙ্গেই يُدَبِّرُ الْاَمْرَ বলা হইয়াছে। ইহাতে একথার পোষকতা পাওয়া যায় যে, اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর অর্থ শাসন, সংরক্ষণ এবং আদেশ-নিষেধ জারি করা।

বেহেশ্‌তের এত পরিসরতা দেখিয়া যদি কেহ সন্দেহ করে যে, এমন সুবিশাল বেহেশ্‌তে কেমন করিয়া থাকা যাইবে? ভয় করিবে না কি? তবে তদুত্তরে বলা হইবে—তথায় চাকর-নওকর এবং আয়েশ-আরামের সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে। তাহাতে বেহেশ্‌ত সরগরম থাকিবে। এই সমস্তের কারণে মন বসিয়া যাইবে।

যাহাহউক, বেহেশ্‌তের এসকল অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করুন। ইহাতে আখেরাতের প্রত্যাশা এবং তৎপ্রতি মনোযোগ উৎপন্ন হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে এমন বিরাট বেহেশ্‌ত দান করিবেন। অথচ দুনিয়ার প্রত্যাশার বিনিময়ে কোনই ওয়াদা নাই। এখানে কোন তালেবে এল্‌ম হয়তো প্রশ্ন করিবে, এক আয়াতে তো দুনিয়ার প্রত্যাশার বিনিময়ে ফল প্রদানের ওয়াদা আছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْلَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا

"যে ব্যক্তি আখেরাতের কৃষি কামনা করে, আমি তাহার কৃষিতে বরকত দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কৃষি প্রত্যাশা করে, তাহাকেও আমি উহা হইতে দান করি।" ইহার উত্তর এই—এখানে দুনিয়ার প্রত্যাশার বিনিময়ে যে ফল প্রদানের ওয়াদা রহিয়াছে, তাহাতে مِنْهَا শব্দ যুক্ত আছে। এখানে مِنْ অব্যয়টির অর্থ 'আংশিক।' কাজেই দুনিয়ার সকল প্রত্যাশার বিনিময় প্রদানের ওয়াদা হইল না। অন্যত্র এক আয়াতে অবশ্য আখেরাতের প্রত্যাশার সঙ্গেও مِنْهَا শব্দ যুক্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ

কিন্তু সেক্ষেত্রে من অব্যয়টি আংশিক অর্থে নহে; বরং স্থানীয় সঙ্কেতে বুঝা যায়, من 'আরম্ভ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, তাহাদের সওয়াব আখেরাত হইতেই আরম্ভ হইবে। কোরআন ও হাদীসের মর্ম বুঝিবার জন্য আরবী ব্যাকরণে বিশেষ দক্ষতা থাকার প্রয়োজন। শুধু শাব্দিক অর্থ পড়িয়া বুঝা যায় না।

আজকাল প্রত্যেক মূর্খই মুজ্‌তাহিদ্‌ঃ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়! আজকাল আরবী ব্যাকরণের জ্ঞানলাভ ব্যতীতই অনেকে কোরআন-হাদীস বুঝিতে চাহেন। নূতন নূতন মুজ্‌তাহিদগণ প্রাথমিক দুই-চারিটি কিতাব পড়িয়া মেশ্‌কাত এবং বোখারী শরীফের অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেঈ ছাহেবের উপর প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন। যেমন, এক মূর্খ বলিয়াছেঃ হাদীসে তো আসিয়াছে 'খেদাজুন' 'খেদাজুন', অথচ হানাফী মতাবলম্বীরা বলেঃ নামাযে সূরা-ফাতেহা পড়া ফরয নহে। বাস্তবিক ইহা এক বিচিত্র যমানা। এখন প্রত্যেক মূর্খই মুজ্‌তাহিদ। কিন্তু বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। আজকাল মুসলমান তো মুসলমানই, ইংরেজরাও ইসলামের মধ্যে এজ্‌তেহাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রামপুরের এক ইংরেজ মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলঃ কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, প্লেগ রোগ ছোঁয়াচে। কোরআনে উল্লেখ আছে—কোন স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে সেই স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। ইহার সঙ্গে একটি কথা সে নিজের তরফ হইতে লাগাইয়া দিলঃ "যাইতে নিষেধ করার কারণ এই যে, তাহাতে প্লেগ বিস্তার লাভ করে।" এই জন্যই নিষেধ করিয়াছেন, যেন এক স্থানের প্লেগ অন্যস্থানে ছড়াইতে না পারে। ব্যাস্! দাবী প্রমাণিত হইয়া গেল। অতএব, এই ইংরেজও ইসলাম ধর্মের মুজ্‌তাহিদ হওয়ার দাবীদার ছিল। কাজেই নিজের তরফ হইতে একটি বাক্য যোগ করিয়া দিয়াছে।

ইহার চেয়ে আরও মারাত্মক হইল, হিন্দুরাও ইসলামের মুজ্‌তাহিদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে জনৈক হিন্দু সম্বন্ধে খবরের কাগজে প্রচারিত হইয়াছিল যে, সে জেলখানায় কোরআন পাঠ করিতেছে। উদ্দেশ্য, মুসলমানদের জন্য কর্মপন্থা স্থির করিবে। অতঃপর সে জেলখানা হইতে বাহির হইয়াই ফতওয়া জারি করিল যে, কোরআনের কোথাও গাভী যবেহ্‌ করার নির্দেশ দেখিলাম না। সুতরাং মুসলমান এই কার্য বর্জন করুন। অতএব আজকাল কোন মূর্খ মুসলমানও যদি মুজ্‌তাহিদ হইয়া বসে, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু এসমস্ত মূর্খতার কারণে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ ইসলামের কোন ক্ষতি হইতে পারে না—

اگر گیتی سراسر باد گیرد - چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرد

"সমগ্র ভূমণ্ডল একেবারে বায়ুতে পরিণত হইলেও খোদার প্রিয় বান্দাগণের চেরাগ নিভিবে না।" কবি আরও বলেনঃ

چراغے را که ایزد بر فروزد - هر آنکس تف زند ریشش بسوزد

"খোদার জ্বালান প্রদীপ কেহ নিভাইতে পারে না; বরং উহা ফুৎকার প্রদানকারীর দাড়ি জ্বালাইয়া দেয়।" এই ইস্‌লাম ধর্ম মানুষের আয়ত্তে হইলে বহুপূর্বে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কেননা, মূর্খ এমন কি কাফেরেরাও মুজ্‌তাহিদ্‌ হওয়ার দাবী করিতেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌ ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌ বলেনঃ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ "আমি কোরআন নাযিল করিয়াছি, আমিই ইহার হেফাযত করিব।" এই কারণেই মুসলমান ধর্ম প্রচারের বিষয়ে মোটেই চিন্তা করে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন ইহার কন্ট্রাক্ট লইয়াছেন। অতএব, তাহারা আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এত নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নহে। ইহাতে ধর্মের কোনই ক্ষতি নাই, বরং আমাদেরই ক্ষতি। কেননা, আমরা ধর্মের খেদমতকারীদের তালিকা হইতে খারিজ হইয়া যাইব। অতএব, এত চিন্তিত হওয়ারও প্রয়োজন নাই, যেরূপ জাতির হিতাকাঙ্ক্ষিগণ গায়কের ন্যায় ধর্মের গল্প গাহিয়া ফিরিতেছে।

ধর্ম প্রচারের নিয়মঃ আমি দেওবন্দ মাদ্রাসায় একবার ওয়ায করিয়াছিলাম। উক্ত ওয়াযের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'তব্‌লীগের নিয়ম।' উক্ত ওয়াযগ্রন্থ পাঠ করিলে এবিষয়ে বিশেষ উপকার হইবে। উহাতে আমি বলিয়াছিঃ ধর্ম প্রচারে চিন্তার কোন্‌ স্তর কাম্য এবং কোন্‌ স্তর কাম্য নহে। তন্মধ্যে একটি বিষয় এই যে, তব্‌লীগের পর উহাতে ফল হইল কিনা তাহার অপেক্ষা করিও না। অর্থাৎ, এমন স্থির করিয়া লইও না যে, আমার প্রচারে শুদ্ধি আন্দোলন বন্ধ হইয়া যাইবে, কিংবা দশ হাজার হিন্দু মুসলমান হইয়া যাইবে। কেননা, এরূপ সিদ্ধান্ত করায় ও ইহার অপেক্ষা করায় ফল এই হয়—কিছুদিন পরে প্রচারের ফল ফলিতে বিলম্ব হইলে প্রচারকের সাহস এবং উৎসাহ্‌ কমিয়া যায়। ইহার রহস্য এই যে, প্রথমে কাজের গতিবেগ প্রখর হইলে অচিরেই মন্থর হইয়া যায়।

সূফিয়ায়ে কেরাম এই বিষয়টি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) যেক্ষেত্রে কাজ অধিক করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেখানে প্রকৃতপক্ষে কাজ অধিক করিতে নিষেধ করেন নাই; বরং আমল কম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, এই অতিরিক্ত কাজের পরিণাম হয় কাজ কম হওয়া। তবে সূফিয়ায়ে কেরামের কেহ কেহ অতিরিক্ত কাজ এবং অত্যধিক

পরিশ্রম করিতেন বলিয়া যাহা দেখা যায়—ইহার রহস্য এই যে, নেক আমল তাঁহাদের স্বভাবে এবং খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। কাজেই তাঁহাদের অতিরিক্ত আমল ক্লান্তি এবং পরিণামে আমল হ্রাস পাওয়ার কারণ হইত না।

এই কারণে যখন কোন নীরস দরবেশ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, এত অধিক পরিশ্রম করা নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া নহে কি? আল্লাহ্ لَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ "তোমরা নিজদিগকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করিও না" আয়াতে তাহা নিষেধ করিয়াছেন। তখন তাঁহারা জবাব দিয়াছেনঃ প্রত্যেকের ধ্বংস পৃথক। অতিরিক্ত কাজ করা যাহার জন্য ধ্বংসের কারণ, সে অতিরিক্ত কাজ করা ত্যাগ করুক। যাহার জন্য কাজ কমাইয়া দেওয়া ধ্বংসের কারণ, সে কাজ কম করা ত্যাগ করুক। আমাদের জন্য কাজ কম করাই ধ্বংসের কারণ। সুতরাং অতিরিক্ত এবাদত করিতে আমাদের জন্য নিষেধ নাই।

ফলকথা, ফলের অপেক্ষা করা ক্ষতিকর। ইহাতে কিছুদিনের মধ্যেই কাজের উৎসাহ্ ভাঙ্গিয়া যায়। কাজেই এমন কোন চিন্তা থাকা উচিত নহে, সর্বদা যাহার জন্য চিন্তিত থাকিতে হয় এবং ফলের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। সুতরাং, এত চিন্তাও হিতকর নহে। আবার নিশ্চিন্ত থাকাও ভাল নহে। যেমন, আজকাল আমাদের মধ্যে দেখা যায়। বস্! তোমরা এতটুকুই কর যে, নিজের তরফ হইতে তবলীগের চেষ্টা করিতে থাক এবং ফলের আশা রাখ। কিন্তু উহা ফলিবার প্রতীক্ষায় থাকিও না; বরং সেই ব্যাপার খোদার উপর সোপর্দ করিয়া দাও।

আমি বলিতেছিলাম—আজকাল ইস্‌লাম ধর্মে প্রত্যেকে এজ্‌তেহাদের দাবী করিতেছে। ইহাও এই যমানার একটি বিশেষত্ব। অনুপযুক্ত লোক নিজের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া যোগ্য লোকের স্থান অধিকার করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কবি বলেনঃ آدمیاں گم شدند ملک خدا خر گرفت
"মানুষ লোপ পাইয়াছে, খোদার রাজ্য গর্দভের শাসনাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে।"

এই আলোচনা কোরআন-হাদীস বুঝিতে আরবী ব্যাকরণের একান্ত প্রয়োজীনয়তা প্রসঙ্গে উঠিয়াছিল। শুধু অনুবাদ পড়িয়া কোরআন-হাদীস বুঝা যায় না। এই কারণেই আমি বলিয়াছিলাম—কোরআনের একটি আয়াত হইতেই বুঝা যায় যে, কোরআন বুঝিতে আরবী ব্যাকরণ প্রভৃতি জানা আবশ্যক। যে ব্যক্তি তাহা জানে না, শুধু অনুবাদ পড়িয়া সে কোরআন হাদীস বুঝিতে পারে না। যাহাহউক—ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, দুনিয়া যে পরিমাণ প্রত্যাশা করিবে ততটুকু পাইবে না। পক্ষান্তরে আখেরাত কামনার চেয়েও বেশী পাওয়া যায়।

আখেরাত অন্বেষণের নিয়মঃ আর একটি আয়াত বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা আবশ্যকঃ

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَاتَمَنّٰى فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ○

অর্থাৎ, "দুনিয়া এবং আখেরাত খোদার মালিকানাধীন, তোমার আকাঙ্ক্ষার বশীভূত নহে।" এখানে প্রশ্ন হয় যে, উভয়টিই যখন তাঁহার মালিকানাধীন, ইহা তো বুঝা গেল না যে, ইহা তিনি কাহাকে দিতে ইচ্ছা করেন। আর কাহাকে ইচ্ছা করেন না। এই প্রশ্নের উত্তর অপর আয়াতে পরিষ্কার প্রদান করিয়াছেন—দুনিয়া তিনি সকলকেও দিতে ইচ্ছা করেন না এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াও দিতে ইচ্ছা করেন না। অথচ আখেরাত তিনি প্রত্যেক অন্বেষণকারীকে দিবেন এবং যে পরিমাণ প্রত্যাশা করিবে তাহা অপেক্ষা অধিক দান করিবেন। অতএব, মানুষ দুনিয়ার প্রত্যাশী হইয়া আখেরাতের প্রতি অমনোযোগী হওয়া সাধারণ বিবেক হইতে বহু দূরে।

এখন কথা হইল, আখেরাত অন্বেষণ করার তথ্য কি? সাধারণত সকলে জানে যে, ফরয কার্যগুলি পালন এবং নিষিদ্ধ কার্যগুলি হইতে দূরে থাকাই আখেরাতের অন্বেষণ। কিন্তু এখন আমি এমন একটি তথ্য প্রকাশ করিতে চাই, যাহা وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ বাক্যের মর্মার্থ হইতে বুঝা যায়। কেননা, এখানে গাফ্‌লত অর্থাৎ, অমনোযোগিতার নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। কাজেই ইহার বিপরীত অর্থাৎ, যেকের-ফেকের কাম্য হইবে। যেকের-ফেকের অর্থ স্মরণ ও ধ্যান। অতএব, আখেরাতের অন্বেষণ অর্থ আখেরাতের চিন্তা অন্তরে হাযির রাখা এবং উহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা। ইহা কঠিন কিছুই নহে, ইহাতে কোন ওযীফা তেলাওয়াতেরও প্রয়োজন নাই। কেবল এতটুকু আবশ্যক যে, অন্তরে আখেরাতের কথা সর্বদা স্মরণ থাকে এবং সর্বদা সেই ধ্যানেই নিমজ্জিত থাকে। প্রথমত স্মরণ ও ধ্যানে থাকিলে তুমি কখনও আখেরাতের রাস্তা হইতে কোন দিকে সরিবে না। কচিৎ সরিয়া গেলেও তৎক্ষণাৎ সচেতন হইয়া পুনরায় পথে ফিরিয়া আসিবে। সেই যেকের-ফেকের লাভ করার সহজ পন্থা এই যে, আহ্‌লুল্লাহর সঙ্গ অবলম্বন কর। মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তাঁহার দরবারে বস, তাঁহার কথা শ্রবণ কর। তাঁহার সহিত সম্পর্ক রাখ। ইহা সম্ভব না হইলে আওলিয়ায়ে কেরামের জীবনচরিত পাঠ করিলেও সেই ফল পাওয়া যাইতে পারে। এই মর্মেই আরেফ শীরাযী বলিতেছেনঃ

دریں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل ست ۔ صراحی مے ناب وسفینۂ غزل ست

"আজকাল ত্রুটিমুক্ত বন্ধু—শরাবপূর্ণ সোরাহী এবং গযলের জাহাজ।" গযলের জাহাজ অর্থ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অবস্থা এবং উক্তিসমূহের কিতাব। কামেল পীর পাওয়া সম্ভব হইলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না! সম্ভব না হইলে কখনও অপক্ক পীরের সংস্রবে যাইবে না। ইহা খুবই ক্ষতিকর। অপক্ক পীরের সংসর্গে যাইয়া হারাম কাজের বা কথাবার্তার প্রতি আকৃষ্ট না হইলেও মুবাহ্‌ কার্যে বাড়াবাড়ি হইবে, অথচ মুবাহ্‌ কার্যে বাড়াবাড়ি সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। হাদীসে আসিয়াছে— اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الضَّحْكِ فَاِنَّهَا تُمِيْتُ الْقَلْبَ "অধিক হাসিও না, অধিক হাসি অন্তরকে মারিয়া ফেলে।" বস্তুত হাস্য করা মুবাহ্‌, কিন্তু ইহার আধিক্য মারাত্মক, হৃদয়কে মারিয়া ফেলে। হযরত শেখ ফরীদ (রঃ) বলেনঃ

دل ز پر گفتن بمیرد در بدن ۔ گرچہ گفتارش بود در عدن

"অধিক কথা বলিলে দেহের দিল্‌ মরিয়া যায়, যদিও সেই কথাবার্তা আদনের মোতি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কেন না হয়!" কথাবার্তা না হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে থাকিবে, অন্তত মন অনাবশ্যক তাহার প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে। গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি অনাবশ্যক মনকে মশ্‌গুল রাখাই কি কম ক্ষতি? এই ক্ষতি তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন, যাঁহারা খোদার সহিত মনকে যুক্ত রাখার স্বাদ উপভোগ করিয়াছেন। এই রহস্যের কারণেই আমাদের মুরশিদগণ প্রচলিত 'তাওয়াজ্জুহ্‌'কে পছন্দ করেন নাই। কেননা, তাহাতে শর্ত এই যে, পীরের দিকে মনে-প্রাণে মনোযোগী থাকিবে, তখন খোদার ধ্যানও যেন পীরের ধ্যানের চেয়ে অধিক না হয়। আমি বলিতেছি না যে, আমাদের বুযুর্গগণ কখনও অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করেন না। কোন কোন সময় খোদা ভিন্ন অন্য দিকেও মনোযোগ অধিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু একদিকে ঘটনাক্রমে অনিচ্ছা সত্ত্বে কাহারও প্রতি মনোযোগ অধিক হওয়া, আর অপর দিকে ইচ্ছাপূর্বক কাহারও প্রতি

এমনভাবে মনোনিবেশ করা যে, তখন খোদার কল্পনা আসিলেও উহাকে পরাভূত করিয়া দিতে হইবে। এতদুভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য। আমাদের বুযুর্গগণ ইচ্ছাপূর্বক এরূপ করা পছন্দ করেন না। অনিচ্ছাক্রমে অন্য কোন দিকে মনের ধ্যান চলিয়া গেলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। তাঁহাদের নিজেদের অভিলাষ সর্বদা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ থাকা উচিত, কোন কিছুই যেন সে পথে বাধা না হয়। তবে যাঁহারা প্রচলিত তাওয়াজ্জুহ্-এর তরীকা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার কোন প্রশ্ন নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল হইলে তাঁহারাও কিছু সওয়াব প্রাপ্ত হইবেন। সওয়াবমূলক উদ্দেশ্য এই হইবে যে, পীরের ধ্যান আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই করা হইতেছে। অতএব, আল্লাহ্‌র জন্য তাওয়াজ্জুহ্ আর আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ একই কথা। কিন্তু প্রেমিক কি কখনও প্রেমাস্পদ ছাড়া ইচ্ছাপূর্বক অন্য কাহারও প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারে? এতদসম্পর্কে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। কোন কবি এক মজলিসে একটি কবিতা পাঠ করিলেন ঃ

اس کے کوچہ سے جب اُٹھہ اہل وفا جاتے ہیں ۔ تا نظر کام کرے روبہ قفا جائے ہیں

"সত্যিকার প্রেমিক যখন তাহার (মাহ্‌বুবের) গলি হইতে উঠিয়া যায়, যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় পিঠপিছা হইয়া হাঁটিয়া যায়।"

সেখানে আরও একজন কবি ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিবাদ করিলেন ঃ

اس کے کوچہ سے کب اٹھہ اہل وفا جاتے ہیں ۔ وہ ہوسناك ہیں جو رو بقفا جاتے ہیں

অর্থাৎ, "সত্যিকারের প্রেমিক তাহার (মাহবুবের) গলি হইতে কি কখনও উঠিয়া যাইতে পারে? যাহারা পিঠপিছা হইয়া হাঁটিয়া যায় তাহারাও স্বার্থপর।"

এই কবি আশেক ছিলেন, পূর্বোক্ত কবিতার বিষয়কে আশেকই রদ করিতে পারে। অন্যথায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহার মর্ম তো ভালই ছিল, কিন্তু উহা প্রেমসুলভ রুচির বিপরীত ছিল। বন্ধুগণ! আশেকের অভিরুচি শুধু এই যে, এক মুহূর্তের জন্যও মাহ্‌বুব হইতে অমনোযোগী থাকাকে পছন্দ করে না। নিজের তরফ হইতে সে সর্বদা সেদিকেই মনোযোগী থাকে—মাহ্‌বুবের এদিকে লক্ষ্য থাকুক বা না থাকুক। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

ملنے کا اور نہ ملنے کا مختار آپ ہے ۔ پرتم کو چاہئے کہ تگ ودولگی رہے

"পাওয়া না পাওয়ার মালিক তিনি। তবুও তোমার উচিত দৌড়-ধাপ জারি রাখা।" মাওলানা রূমী বলেন ঃ

اندریں راہ می تراش ومی خراش ۔ تا دم آخر دمے فارغ مباش

"এই রাস্তায় ঘষা-মাজা করিতে থাক। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এক মুহূর্তও অবসর থাকিও না।" এখানে ঘষা-মাজার অর্থ স্মরণে ও ধ্যানে মশ্‌গুল থাকা। সর্বদা সে দিকেই মন লাগাইয়া রাখা, কেন? ঃ

تا دم آخر دمے آخر بود ۔ کہ عنایت با تو صاحب سر بود

"যেন শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তোমার সাথী থাকে।" আরও এক কবি বলেন ঃ

يك چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی ۔ شایدکہ نگاہے کند آگاہ نباشی

"সেই বাদশাহ্‌ হইতে এক পলকের জন্যও অমনোযোগী থাকিও না। এমনও হইতে পারে, তিনি কোন সময় তোমার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। অথচ তুমি টেরই পাইবে না।"

বরং আমি আরও একটু বাড়াইয়া বলিতেছি—কেহ যদি বিশৃঙ্খল হয়, নিয়মনিষ্ঠা রক্ষা করিয়া কাজ করিতে না পারে, কোন সময় আল্লাহ্‌র ধ্যান অধিক হয় আবার হয়তো কিছুই হয় না। অভ্যস্ত ওযীফাও রীতিমত আদায় করিতে পারে না। তাহারও ঘাবড়াইবার প্রয়োজন নাই। আমার ওস্তাদ রাহেমাহুল্লাহ্‌র নিকট কোন এক ব্যক্তি আসিয়া বিশৃঙ্খল এবং বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ করিল। হুযূর বলিলেনঃ প্রত্যেকের নিরবচ্ছিন্নতা পৃথক পৃথক। স্থায়িত্বের ইহাই এক অবস্থা যে, কখনও হইল কখনও হইল না। অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থার উপরই চলিতে থাকুক। 'যেকের-ফেকের' একদম যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয় ; বরং মাসে ২০ দিন কাজ কর, ১০ দিন করিও না; কিংবা ১০ দিনই কর ২০ দিন পরিত্যাগ কর। শেষ পর্যন্ত যদি এইভাবে চলিতে থাকে, তবে তাহার স্থায়িত্ব ইহাই। সেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে না।

একবার আমার এক বন্ধু কবিতায় আমার নিকট একখানা চিঠি লিখিলেন, উহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিয়মানুবর্তিতা এবং নিরবচ্ছিন্নতার অভাবই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইচ্ছা হইল, আমি ছন্দ অনুযায়ী কবিতায় উত্তর দেই। হঠাৎ মস্‌নবীর একটি কবিতা আমার মনে পড়িল। তাহাতে বন্ধুর পূর্ণ চিঠির উত্তর নিহিত ছিল। আমি আনন্দিত হইয়া লিখিলামঃ

دوست دارد دوست ایں آشفتگی - کوشش بیہودہ بہ از خفتگی

"বন্ধু এই বিশৃঙ্খলাই ভালবাসেন। নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা অপেক্ষা অনিয়মিত চেষ্টাও ভাল।" আমাদের হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) বলিয়াছেনঃ

بس ہے اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچے وہاں - گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ وفریاد ہم

"আমাদের একটি ক্রন্দনও যথেষ্ট, যদি আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে। যদিও বহু কান্না আমরা কাঁদিয়া থাকি।"

বরং আমি আরও একটু বাড়াইয়া বলিতেছি—অনিয়ম এবং অস্থায়িত্বের কথা কি? যদি গুনাহ্‌র কাজও করিয়া ফেলেন তথাপি মনে করিবেন না যে, আল্লাহ্‌র দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়া গেলেন; বরং ইহার পরেও আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই জড়াইয়া ধরুন এবং মনে করুন যে, গুনাহের প্রতিকারও তিনিই করিতে পারেন।

একবার হযরত মূসার (আঃ) নিকট ওহী আসিলঃ হে মূসা! সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় বান্দা, যে আমার সহিত এমন মহব্বত রাখে, যেমন শিশু তাহার মায়ের সহিত রাখে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "হে খোদা! সেই মহব্বত কিরূপ?" জবাব আসিলঃ "মাতা পুত্রকে মারধর করে, তবুও শিশু মাকেই জড়াইয়া ধরে।" অতএব, গুনাহ্‌ করিয়াও আল্লাহ্‌কে ছাড়িবেন না; বরং তাঁহাকেই জড়াইয়া ধরুন। এখন বলুন, ইহার চেয়েও কোন সহজ পন্থা সফলতা লাভের জন্য হইতে পারে? ইহাতে কোনই জটিলতা নাই, কোন ব্যয় নাই, ইহা অবলম্বন করুন। ইহার ফলে এবাদতের উপর স্থায়ী থাকা এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে দূরে থাকা সহজ হইয়া পড়িবে। কেননা, ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত আপনার মহব্বত হইয়া যাইবে। বস্তুত মহব্বত এবং কামনা তো এমন বস্তু যে, এক বেশ্যার মিলনপ্রার্থীও তাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয় এবং সমস্ত

ধন-দৌলত উহার পায়ে লুটাইয়া দেয়। তবে কি খোদার প্রার্থী তাঁহার জন্য জান-মাল লুটাইয়া দিতে ইতস্তত করিবে? বিশেষত যখন তিনি আপনার জান্-মাল বিনষ্ট করিতেও ইচ্ছুক নহেন; বরং তিনি সবকিছুকে নিরাপদে রাখিয়া তাহাতে আরও উন্নতি করিয়া দিবার ওয়াদাও করিতেছেনঃ

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ "আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।"

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তিনি স্বীয় প্রার্থীকে উভয় জগতে শান্তির আবাসেই রাখিতেছেন। অতএব, যদি আর কিছু নাও পারেন, তবে অন্তত এই সহজ কার্যই অবলম্বন করুন। কেবল আখেরাতের কল্পনা ও ধ্যান করুন; কিন্তু আফসোস্! সাধারণ লোক তো দূরের কথা, ওলামাও ইহাতে ত্রুটি করিয়া থাকেন। আলেমগণ নামায-রোযা তো করেন, কিন্তু ধ্যান, কল্পনা, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক, তাঁহার প্রতি মনোনিবেশ করা, আঁকড়াইয়া ধরা, জড়াইয়া ধরা, মহব্বতে নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়া—এসমস্ত নাই। অথচ ইহাছাড়া সফলতা লাভ হইতে পারে না। কেননা, ইহা ব্যতীত নামায-রোযার প্রতি দৃঢ়তা বিপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক সময় এবাদত-রিয়াযতের ক্ষেত্রে নফসের সঙ্গে সংঘর্ষ করিতে হয়। বলাবাহুল্য, প্রথমত সংঘর্ষের মধ্য দিয়া কাজ করাই কঠিন। দ্বিতীয়ত উক্ত কাজের উপর স্থায়িত্বের আশা বিরল। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিলে নফ্‌সের সংঘর্ষ শেষ হইয়া যায় এবং আমলের উপর স্থায়িত্বের আশা প্রবল হয়; বরং প্রায় সুনিশ্চিত হইয়া যায়। ইহাকেই জনৈক আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক কবিতায় বলিয়াছেনঃ

صنمـاره قلندر سزاوار بمن نمـائی ـ که دراز و دور دیدم ره ورسم پا رسائی

"রস্‌মে পারসাঈ" অর্থ শুষ্ক ও রসহীন দরবেশী। আর "রাহে কলন্দর" অর্থ প্রেমের পথ। কবি বলেন, "শুষ্ক এবং রসহীন দরবেশীর পথে উদ্দেশ্য সফল হওয়া বহু দূর। আমাকে প্রেমের পথে চালাইয়া নিন্।" অতঃপর দরবেশীর পথ দূর এবং প্রেমের পথ নিকটবর্তী হওয়ার কারণ বলিতেছেনঃ

بقمـار خـانه رفتم همه پاکباز دیدم ـ چو بصومعه رسیدم همه یافتم ریائی

"জুয়ার আড্ডায় যাইয়া দেখিলাম, সকলেই অকপটতার সহিত খেলিতেছে। যখন এবাদতখানায় গেলাম, দেখিলাম সকলেই কপট এবং রিয়াকার।" অর্থাৎ, প্রেমিকদের মধ্যে অন্তরের রোগ অহঙ্কার, রিয়াকারী ইত্যাদি থাকে না। কেননা, প্রেম সবকিছুকেই জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে নীরস দরবেশদের মধ্যে অহঙ্কার, আত্মাভিমান, রিয়াকারী প্রভৃতি দোষ বহু থাকে। অতঃপর কবি বলেনঃ

بطواف کعبـه رفتم بحـرم رهم ندادنـد   که برون در چه کردی که درون خانه آئی
بزمیں چو سجده کردم ز زمیں ندا بر آمد   که مرا خراب کردی تو بسجـدهٔ ریـائی

"কা'বা শরীফের তওয়াফ করিতে গেলে আমাকে হরম শরীফের পথ ছাড়িল না। বলিল, বাহিরে এমন কি করিয়াছ যে, ঘরের ভিতরে আসিতে চাহিতেছ? যমীনের উপর যখন সজ্‌দা করিলাম, যমীন হইতে আওয়ায আসিলঃ তুমি রিয়াপূর্ণ সজ্‌দা দ্বারা আমাকে অপবিত্র করিয়াছ।" সুতরাং প্রেমের পথের প্রয়োজন, যাহার দ্বারা খোদার সহিত ধ্যান এবং মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে। কিতাব পড়িয়া ইহা হাসিল করা যায় না। ইহাব্ পন্থা জনৈক দুনিয়াদার জজ বলিতেছেনঃ

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا ـ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

"ধর্মানুরাগ কিতাবের দ্বারাও উৎপন্ন হয় না, ওয়াযের দ্বারাও না, টাকা-পয়সার দ্বারাও না। ইহা কেবল বুযুর্গ লোকের অনুগ্রহ দৃষ্টিতেই উৎপন্ন হইতে পারে।" ইহার জন্য প্রেমিক লোকের সংসর্গ লাভের প্রয়োজন রহিয়াছে।

এখন আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। এই বিষয়টি বর্ণনা করার প্রয়োজনও ছিল এবং মহিলাদের জন্য উপযোগীও ছিল। কেননা, বিষয়টি খুবই সহজ। ইহাতে অতিরিক্ত কাজ করার প্রয়োজন হয় না। এই জন্য আমি বিষয়টিকে বিস্তারিত বর্ণনা করিলাম, যদিও সময় অনেক নিয়াছি। ফলে অনেকে রৌদ্র-তাপে কষ্ট পাইয়াছেন। কর্তব্য বন্ধনে আবদ্ধ মহিলাগণ পাক-শাকের বিলম্ব হওয়ার কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু কষ্ট হইতেই শান্তি আসে। কোন ক্ষতি নাই। আসল কথা এই যে, বক্তব্য আসিতে থাকিলে আমি উহাকে রোধ করিতে পারি না। অতএব, আমি অপারক ছিলাম। এখন দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে আমলের তওফীক দান করুন। আমীন।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ
وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

* * *

নিজ বাড়ী,
৫ই জিল্‌কাদ, ১৩৪৫ হিজরী

তেজারাতে আখেরাহ্

[দৈহিক ও আর্থিক এবাদত সম্পর্কে]

■

'উন্নতি' একটি অতি মনোরম শব্দ। কিন্তু অধুনা ইহার সারমর্ম শুধু সুদূরপ্রসারী আশা এবং লালসা। অথচ পবিত্র শরীঅত ইহার মূল কাটিয়া দিয়াছে। ছাহাবায়ে কেরামের নিকট সুদূরপ্রসারী আশা এবং লালসার নাম-গন্ধও ছিল না। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল শুধু ধর্মীয় উন্নতি; ইহারই প্রসংগে তাঁহারা দুনিয়ায়ও এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন—যাহা আজকালকার লোকেরা স্বপ্নেও দেখে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ۔ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى ۔ اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

মুসলমানদের একটি ত্রুটি

আমার পঠিত আয়াতটি একটি বড় আয়াতের অংশবিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে মানুষের প্রয়োজনীয় ও নিত্যকরণীয় কার্যসমূহের মোটামুটি বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। এই আয়াতে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, আমাদের ভূরি ভূরি ত্রুটির মধ্যে একটি ত্রুটি তাহাও বটে, যাহা সংশোধনের জন্য এই আয়াতে বলা হইয়াছে। আমাদের মধ্যে ত্রুটি অনেক, ইহা অনস্বীকার্য। বহু বিষয়ে মুসলমান দ্বীন হইতে দূরে সরিয়া নিজেদের মনগড়া কাজে লিপ্ত হইয়াছে। 'মুসলমান' মনগড়া কাজে লিপ্ত আছে বলাতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, কেবল মুসলমানদের মধ্যেই এই দোষ সীমাবদ্ধ, অন্য জাতির মধ্যে ইহা নাই। বস্তুত কোন কোন নব্য অভিরুচির লোক এরূপ মনেও করিয়া থাকেন। কাজেই কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিন্দা করিতে গিয়া ইহারা অন্য জাতির প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে—অমুক জাতির মধ্যে এই গুণটি খুবই ভাল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তাহা নাই। ইহার মধ্যে কতক এমন গুণেরও উল্লেখ করা হয়, যাহা

বাস্তবিকপক্ষেও প্রশংসার যোগ্য এবং তাহা উল্লেখও করা হয় মুসলমানদের মনে আত্মানুভূতি জাগাইবার জন্য; অর্থাৎ, যাহাদের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের মধ্যে এসমস্ত প্রশংসনীয় গুণ বিদ্যমান। আর ধর্মের কারণে যাহাদের মধ্যে এসমস্ত গুণ পূর্ণমাত্রায় থাকা উচিত ছিল, তাহারা ইহা হইতে শূন্য। বিজাতির এই ধরনের প্রশংসায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অন্য জাতির এমন গুণসমূহের উল্লেখও করা হয়, যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসারই যোগ্য নহে। কিংবা যোগ্য হইলেও উল্লেখ করার উদ্দেশ্য শুধু মুসলমানদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করা, মনে কষ্ট দেওয়া এবং দোষ ব্যক্ত করা। মুসলমান হইয়া মুসলমানদের প্রতি এমন মনোবৃত্তি বড়ই আপত্তিকর। ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, অধিকাংশ মুসলমানেরই অভ্যাস এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এসমস্ত লোক মুসলমানদের প্রতি যেরূপ ঘৃণা পোষণ করে এবং যেরূপ হাবভাব দেখায়, তাহা দেখিয়া প্রত্যেক জ্ঞানীর পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, অন্য জাতির প্রশংসার মাধ্যমে মুসলমানদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তদুপরি আরও মজার ব্যাপার এই যে, যে সমস্ত প্রশংসনীয় গুণ মুসলমানদের মধ্যে নাই বলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসনীয়ও নহে। অর্থাৎ, পবিত্র শরীঅতের দৃষ্টিতে তাহা কাম্যই নহে। যদিও দুনিয়ার কোন স্তরে তাহা দুনিয়াদারগণের কাম্য হইতে পারে। কিন্তু মুসলমান হিসাবে মুসলমানের মুখ দিয়া এই জাতীয় গুণের প্রশংসা বাহির হওয়া ঠিক তেমনই বটে—যেমন কোন ব্যক্তি হাতীর প্রশংসা করিতে গিয়া বলিলঃ হাতী এত শক্তিশালী জন্তু, উহাকে ওজন করিলে অন্তত ৫০ মণ হইবে। যদিও ইহা প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম-সংশোধন ও প্রশংসার ক্ষেত্রে ইহার কোনই মূল্য নাই।

আজকাল যে সমস্ত গুণকে প্রশংসনীয় মনে করা হয়, তাহাও এই জাতীয়ই বটে, যদিও এসমস্ত গুণেরও কোন এক শ্রেণীর উপকারিতা অবশ্যই আছে। যেমন, হাতী ভারী ওজনের হওয়া। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা হাতীর এমন বিরাট দেহ বিনাকারণে সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু ইহাকে পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য গুণ বলিয়া নির্ণয় করেন নাই। মনগড়া প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্যে তথাকথিত "উন্নতি" করাও বটে। কেননা, ইহাকে খুবই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করা হয়। এইরূপে আত্মমর্যাদা প্রভৃতি। অতএব, চিন্তা করিয়া দেখুন, শরীঅত এসমস্ত গুণকে প্রশংসার যোগ্য মনে করে কিনা।

ইতিহাস এবং হাদীসের মধ্যে প্রভেদঃ উন্নতি খুবই মনোরম একটি শব্দ। অধুনা ইহার সারমর্ম শুধু সুদূরপ্রসারী আশা এবং লালসা, পবিত্র শরীঅত যাহার মূল কর্তন করিয়া দিয়াছে। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের নমুনা। তাঁহারা ইহাকে কখনও কল্পনায় স্থান দেন নাই। জনাব রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কখনও ইহার তা'লীম দেন নাই। হুযূর (দঃ)-এর জীবন-যাপন প্রণালীর এক একটি ঘটনা হাদীস শরীফে সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহা দেখুন। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোথাও আপনি ইহার তা'লীম দেখিতে পাইবেন না। তবে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলিবেন—তাহা হাদীসের অনুরূপ হইলে গ্রহণযোগ্য হইবে, অন্যথায় উহার কোনই মূল্য নাই। কেননা, ঐতিহাসিকদের বড় দোষ, তাঁহারা নিজের মত অনুযায়ী ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, এযুগের কোন কোন খেয়ালী লেখক মোহাদ্দেসীনে কেরামের উপর দোষারোপ করেন যে, তাঁহারা ঘটনাবলীর বর্ণনায় নিজেদের মত সংযোগ করিয়াছেন। কিন্তু মোহাদ্দেসীনের অবস্থা সম্পর্কে যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা খুবই অবহিত

আছেন যে,—মোহাদ্দেসীনে কেরাম (রঃ) কেমন আমানতদারীর সহিত হাদীসের খেদমত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগ ঐতিহাসিকদের উপরই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বন্ধুগণ! মোহাদ্দেসীনে কেরামের আমানতদারী ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? —তাঁহারা কোন বিষয়ের প্রমাণে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়া একটু পরেই অপর অধ্যায়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহার বিপরীত একটি বিষয় বর্ণনা করিয়া ইহার প্রমাণেও হাদীস পেশ করিয়া থাকেন। অতএব, বুঝা যায়, হাদীস সঙ্কলনে শুধু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা একত্রিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; নিজেদের মত প্রমাণিত করা কিংবা নিজেদের মতের পোষকতা করা উদ্দেশ্য নহে। কেননা, এক হাদীসের সহিত যখন বিরোধী আরও একটি হাদীস পেশ করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, উক্ত মোহাদ্দেস ছাহেবের নিজস্ব মত এই পরস্পর-বিরোধী হাদীসদ্বয়ের যেকোন একটির অনুকূলে অবশ্যই হইবে। এতদসত্ত্বেও তিনি যখন নিজ মতের বিরোধী হাদীসটিও বর্ণনা করিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এস্থলে তিনি কোন নির্দিষ্ট মত প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন? অতএব, বুঝিতে হইবে, এস্থলে নিজ মতের পোষকতা করা কখনও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; বরং হুযূরের সমস্ত হাদীস লোকের সম্মুখে পেশ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, যাহাতে লোকেরা হাদীসগুলিকে যাচাই করিয়া উত্তমরূপে বুঝিয়া লইতে পারে।

অবশ্য ইতিহাসে এরূপ অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক ঐতিহাসিক নিজ মতের পোষকতাকারী ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং অপর ঐতিহাসিক নিজ খেয়ালের অনুকূলে ঘটনা বর্ণনা করিয়া থাকেন। কাজেই হাদীস ও ইতিহাসের মধ্যে যখন এরূপ ব্যবধান দেখা যায়, তখন হাদীসকে নির্ভরযোগ্য এবং উহার প্রতিপক্ষে ইতিহাসকে নির্ভর ও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, ইতিহাসে বর্ণিত যে সমস্ত ঘটনা হাদীসের বিপরীত দেখা যাইবে, উহা কিছুই নহে এবং কখনও উহা গ্রহণযোগ্য নহে।

ছাহাবায়ে কেরামের লক্ষ্য ছিল ধর্মের উন্নতিঃ মোটকথা, হাদীস শরীফ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, হুযূরের (দঃ) জীবনপদ্ধতি কিরূপ ছিল এবং অবিকল সেই পদ্ধতিই ছাহাবায়ে কেরামের ছিল। কাজেই ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সুদূরপ্রসারী আশা এবং লালসার নাম-গন্ধও ছিল না। তাঁহারা যে উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন তাহা ছিল ধর্মীয় উন্নতি। অবশ্য সেই ধর্মীয় উন্নতির বশীভূত হইয়া যে সমস্ত পার্থিব উন্নতি তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল, তদ্রূপ পার্থিব উন্নতি আজকালকার লোকেরা স্বপ্নেও দেখিতে পায় না। কিন্তু পার্থিব উন্নতি তাঁহাদের কাম্য কখনও ছিল না। কেবলমাত্র ধর্মীয় উন্নতিই ছিল তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহাদের এরূপ বৈশিষ্ট্যই আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেনঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ○

"আমি যদি তাহাদের যমীনের অধিকারী করিয়া দেই, তখনও তাহারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, উত্তম কার্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং মন্দ কার্য হইতে বারণ করে।"

ইহাই তাঁহাদের মনোবৃত্তির ছবি। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এখন আপনারা তাঁহাদের মনোবৃত্তি স্মরণ রাখুন এবং নিজেদের মনোবৃত্তিকে ইহার সহিত মিলাইয়া

দেখুন। আল্লাহ্‌র শপথ ? এই মিল দেওয়া আপনাদের পক্ষে ঠিক তেমনই দুষ্কর হইবে, যেমন দুষ্কর সরল রেখাকে বাঁকা রেখার সহিত মিল দেওয়ার চেষ্টা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত সরল রেখার সরলতা এবং বক্র রেখার বক্রতা বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে ঐক্যসাধন কখনও সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে আমাদের মনোবৃত্তি বক্র রেখার ন্যায় এবং ছাহাবায়ে কেরামের মনোবৃত্তি সরল রেখার ন্যায়।

আল্‌হামদুলিল্লাহ্! এক বিশেষ দিক দিয়া এই দৃষ্টান্তটি স্থানোপযোগী হইয়া কল্পনায় আসিয়া পড়িয়াছে। কেননা, বক্র রেখা সরল রেখার সহিত মিলিত হওয়ার অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে যে, উহার কতকাংশ সরল রেখার উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং কতকাংশ সরল রেখা হইতে দূরে সরিয়া থাকে। আজকালকার হাল ফ্যাশনের লোকদের আবিষ্কৃত কল্পনা এবং ধারণাসমূহের অবস্থাও তথৈবচ। তাহাদের এক পা যদিও শরীঅত পথের উপর রহিয়াছে; কিন্তু অপর পা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যাহাকে কোন প্রকারের বর্ণনার সাহায্যে শরীঅত পথের সহিত মিল দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ইত্যাকার অবস্থা ও মনোবৃত্তি কেমন করিয়া প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে ? মোটকথা, আজকাল লোকেরা মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত প্রশংসনীয় গুণ নাই বলিয়া মত প্রকাশ করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে শরীঅত পথের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

জাতির প্রতি সমবেদনাশীলদের লোক দেখান সমবেদনা জ্ঞাপন ঃ বিজাতির মধ্যে বিদ্যমান কোন কোন বিষয় যদিও প্রকৃতপক্ষেই প্রশংসার যোগ্য—যেমন সমবেদনা জ্ঞাপন, স্বার্থ ত্যাগ প্রভৃতি। তথাপি এসমস্ত গুণ মুসলমানদের মধ্যে নাই বলার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছুই নহে। শোক কিংবা সমবেদনা জ্ঞাপন কখনও উদ্দেশ্য নহে; সমবেদনা হইলে অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁহাদের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইত। অথচ এই তিরস্কারকারীদের মধ্যেই এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা মুসলমানদের সহিত মেলামেশা করাও পছন্দ করে না। মুসলমানদের সালাম গ্রহণ করাও তাহারা পছন্দ করে না। অবস্থা যখন এইরূপ, সুতরাং কোনরূপেই বলা যায় না যে, মুসলমানদের প্রতি তাহাদের কোন প্রকার সমবেদনা আছে। ক্ষণেকের জন্য যদি তাহা মানিয়াও লওয়া যায়, তথাপি বলিতে হইবে, মুসলমানদেরকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্যই এইরূপ সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা সর্বসাধারণ মুসলমানের কোন প্রকার মঙ্গল বা উপকারের আশা কখনও করা যাইতে পারে না।

ইহা প্রকাশ্য কথা, চিকিৎসক রোগীর উপকার তখনই করিতে পারেন যদি রোগীর নিকট আসিয়া তাহার শিরা দেখেন, প্রস্রাব পরীক্ষা করেন, রোগীর মনে সান্ত্বনা প্রদান করেন। এরূপ না করিয়া যদি দূর হইতেই শুধু চেহারা দেখিয়া আজেবাজে ব্যবস্থাপত্র দিয়া চলিয়া যান, তবে কোন জ্ঞানবান লোকেই একথা বিশ্বাস করিবে না যে, এই চিকিৎসক এই রোগীর রোগমুক্তির কারণ হইতে পারে এবং এই রোগী উক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে পারে। দেখুন, প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যে চিকিৎসক রোগীদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকে, সেই চিকিৎসক দ্বারা কোন রোগী উপকৃত হইতে পারে কি ? কেহই পারে না। হাঁ, যে চিকিৎসক রোগীর রোগকে নিজের রোগ মনে করিয়া রোগীর সহিত মিশিয়া যায়, সে চিকিৎসক অবশ্যই রোগীর উপকার করিতে পারে।

কোন একজন চিকিৎসক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, একসময় তাঁহার শহরে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ৬৩ জন রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীন ছিল। তন্মধ্যে ৫৩ জন রোগীই আরোগ্য লাভ

করিয়াছিল; কেবল ১০ জন রোগী পরলোক গমন করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেনঃ “উক্ত ৬৩ জন রোগীর মধ্যে জনৈক রোগীর অবস্থা এইরূপ ছিল যে, নাড়ি পরীক্ষাকালে তাহার শরীরের অত্যধিক উত্তাপে আমার অঙ্গুলিতে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহার রোগমুক্তির জন্য চেষ্টা-তদ্‌বীরে আমি কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই।” মোটকথা, রোগীকে ঘৃণা করিলে কোন চিকিৎসকই রোগীর কোন উপকার করিতে পারেন না।

আজ দেখুন, জাতির চরিত্র সংশোধনের সেই দাবীদারগণ জাতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন; বরং আমি বলি, নিজেদের সহিতও তাহাদের কোন সহানুভূতি নাই এবং নিজেদের রোগের চিকিৎসার প্রতিও তাহাদের লক্ষ্য নাই। ইহাই জাতির প্রতি সমবেদনা না থাকার কারণ। কেননা, মানুষ স্বভাবত নিজের হিতই অধিক কামনা করিয়া থাকে; বরং পরের হিত কামনার মধ্যেও নিজের হিত কামনাই লুপ্ত থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি নিজের হিত কামনা করে না, সে পরের হিত কিরূপে কামনা করিবে? ইহাদের উচিত—প্রথমে নিজেকে সংশোধন করিয়া লওয়া, পরে অপরের সত্যিকারের সংশোধনের চিন্তা করা।

আজ দুনিয়ার অবস্থা এইরূপ—ইস্‌লামের সহানুভূতিতে বড় বড় সভা-সমিতি করা হয়; কিন্তু নামাযেরও চিন্তা নাই, রোযারও চিন্তা নাই। টাকা-পয়সার এত ছড়াছড়ি যে, দশ জন লোককে খরচ দিয়া নিজের সঙ্গে হজ্জে নিতে পারে, কিন্তু ইস্‌লামের প্রতি মহব্বতের অবস্থা এই যে, নিজেরও হজ্জ করার তওফীক হয় না। চেহারার প্রতি লক্ষ্য করুন, আপাদমস্তক ইস্‌লামের সম্পূর্ণ বিপরীত। কথাবার্তার প্রতি দৃষ্টি করুন, ধর্মও মযহাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব, নিজেদের রোগ দূরীকরণের চিন্তাই যখন তাহাদের নাই, তখন অপরের রোগে তাহাদের কি সমবেদনা হইতে পারে?

ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক যুগেরই একটা রীতি আছে। যুগের লোক সেই রীতির উপরই চলিয়া থাকে। বর্তমান যুগের রীতি এই যে, প্রত্যেক বিখ্যাত বা অবিখ্যাত লোক খ্যাতি অর্জনে কিংবা খ্যাতির পূর্ণতা লাভে চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং ইহারই উপায়-উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত হন। তন্মধ্যে একটি উপায় ইহাও যে, সভা-সমিতি কায়েম করিয়া কেহ গভর্ণর, কেহ সেক্রেটারী, কেহ এটা, কেহ ওটা ইত্যাদি যেকোন একটা পদ গ্রহণ করেন এবং সমাজে বিশিষ্ট লোক সাজিয়া সর্বসাধারণ লোক হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন।

আবার রীতিও যদি শরীঅত অনুরূপ হইত, তবুও কিছু লাভের আশা ছিল। কেননা, শরীঅতের সহিত সামঞ্জস্যের বদৌলত একদিন তাহা প্রকৃত রূপে পরিবর্তিত হইতে পারিত। কিন্তু উক্ত রীতি শরীঅতের সহিত যদি বাহ্যিক সামঞ্জস্যশীলও না হয়, তবে তাহা সম্পূর্ণ ক্ষতিকর এবং হলাহলস্বরূপ। এই কারণেই জাতির আভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসকগণ শুধু এতটুকুকে যথেষ্ট মনে করিয়াছেন যে, মানুষ কেবল প্রথমে নিজের আকৃতিকে বাহ্যিক শরীঅতের অনুরূপ করিয়া লইবে এবং বাহ্যিক এবাদত স্থায়ীভাবে পালন করিবে। কেননা, তাঁহারা জানেন, এই বাহ্যিক রূপই একদিন সত্যিকারের রূপে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

আমাদের হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) বলিতেনঃ এবাদতে ‘রিয়া’ অর্থাৎ, লোক দেখান মনোভাব আসিলেও তাহা করিতে থাক। ‘রিয়া’ সর্বদা ‘রিয়া’ থাকে না। অল্প দিনের মধ্যেই অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেই অভ্যাস হইতেই এবাদতের উৎপত্তি হয়। অতঃপর তাহা খোদার সান্নিধ্যলাভের উপায় হয়।

এই মর্মেই মাওলানা রূমী বলিতেছেনঃ

از صفت و از نام چه زاید خیال – واں خیالت هست دلّال وصال

“নাম ও গুণ হইতে কল্পনার উৎপত্তি হয় এবং উক্ত কল্পনা মিলনের প্রতি পথপ্রদর্শক হইয়া থাকে।” কিন্তু ইহা কেবলমাত্র বাহ্যিক অবস্থা, শরীঅতের সহিত সামঞ্জস্যশীল হইলেই হইতে পারে। যদি এতটুকুও না হয়, তবে সংশোধনের কোন পথই নাই।

এই কারণেই আমি বলিতেছিলাম, যদি উক্ত রীতি ও নিয়ম শরীঅতের সহিত বাহ্যিক সামঞ্জস্যশীল হইত, তবে তাহা পরিশেষে সত্যিকারের রূপে পরিবর্তিত হইতে পারিত। কিন্তু বাহ্যিক সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? সামঞ্জস্যের জন্যও অন্তরে শরীঅতের গুরুত্ব এবং মর্যাদা থাকা আবশ্যক। কিন্তু এখানে তাহা নাস্তি।

আলেমদের প্রতি প্রশ্নবাণের স্বরূপঃ আজকালের জ্ঞানিগণ সনাতন শরীঅতকে মৌলবীদের কল্পনাসমষ্টি মনে করে এবং তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের ইহা যথেষ্ট মনে করা উচিত যে, উক্ত জ্ঞানীরা অন্তত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের প্রশ্নবাণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যদিও আলেমদের প্রতি প্রশ্ন করার শেষফল প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই উপর যাইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তথাপি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো দেখা যায় যে, শুধু মৌলবীদিগকেই তিরস্কারের লক্ষ্যস্থল করা হইতেছে, এই জন্যও তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু প্রশ্নকারীদের অবশ্যই বুঝা উচিত, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রশ্নবাণের ক্রিয়া হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরই পতিত হয়। কেননা, ضَرْبُ الْغُلَامِ اِهَانَةُ الْمَوْلٰى “চাকরকে প্রহার করিলে মনিবের অবমাননা করা হয়।” যদিও বাহ্যত সে মনিবকে কিছু বলে নাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে মনিবেরও অপমান হইবে। কেননা, চাকর ও মনিবের মধ্যে ততটুকু ব্যবধান নাই, যতটুকু প্রহারকারী মনে করিয়াছে; বরং টেড়া চক্ষুবিশিষ্ট লোকের দৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান, ততটুকুই আছে।

কথিত আছে, কোন এক ওস্তাদ তাহার টেড়া চক্ষুবিশিষ্ট এক ছাত্রকে বলিলেনঃ অমুক তাকে রক্ষিত বোতলটি লইয়া আস। সে তাকের নিকটে যাইয়া একটি বোতলকে দুইটি দেখিতে পাইল এবং ওস্তাদ ছাহেবকে বলিলঃ এখানে দুইটি বোতল রহিয়াছে, কোন্‌টি আনিব? ওস্তাদ বলিলেনঃ দুইটি নহে, বরং একটি আছে। সে বলিলঃ “আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি, আপনি আমার চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা মনে করিতেছেন?” ইহাতে ওস্তাদ রাগান্বিত হইয়া বলিলেনঃ একটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অপরটি লইয়া আস। শাগরেদ বোতলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই দেখিতে পাইল, সেখানে একটিও নাই। বলিতে লাগিলঃ “এখন তো এখানে একটিও দেখিতে পাইতেছি না।”

কালামে মজীদে لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ আয়াতের তফসীরে মাওলানা (রঃ) এই কাহিনীটি উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ, যেকোন একজন রাসূলকে অবিশ্বাস করিলেই সমস্ত রাসূলকে অবিশ্বাস করা হয় এবং ইহাতে খোদা তা'আলার অস্তিত্বেরও অবিশ্বাস হইয়া যায়। সুতরাং নায়েবকে অবিশ্বাস করিলে মনিবকেও অবিশ্বাস করা হয়। কাজেই আলেমদিগকে অবিশ্বাস করিলে স্বয়ং হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করা হইবে। এমন কি ইহাতে শেষ পর্যন্ত খোদা তা'আলাকেও অবিশ্বাস করা হইবে। কিন্তু মানুষ এদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না; বরং নির্ভয়ে আলেমদের প্রতি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিতেছে।

সারকথা এই যে, আজকাল যে সমস্ত সভা-সমিতি কায়েম হইতেছে, তাহা নিরর্থক প্রথাবিশেষ। ইহার বাহিরের রূপও ঠিক নহে। মানুষ কেবল প্রথা মনে করিয়া উহা অবলম্বন করিতেছে। সমাজের হিতসাধন কখনও উদ্দেশ্য নহে। যেমন, আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছিঃ ইহারা যখন নিজেদের ধর্ম-কর্মই নষ্ট করিতেছে, তখন অপরের হিতসাধনের ইচ্ছা কেমন করিয়া করিতে পারে?

স্বার্থত্যাগের স্বরূপঃ যদি বলেন, ইহারা পরের ধর্মকে নিজের ধর্ম-কর্মের উপর অগ্রবর্তী রাখিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতেছে। এই কারণে নিজের ধর্ম-কর্ম দুরুস্ত না করিয়া অপরের ধর্ম-কর্ম সংশোধন করিয়া দিতেছে। তবে বুঝিয়া লউন, ত্যাগের অনুমতি কেবলমাত্র পার্থিব ব্যাপারে রহিয়াছে—ধর্মীয় ব্যাপারে নহে। অর্থাৎ, যদি আমরা নিজের কোন পার্থিব স্বার্থ নষ্ট করিয়া অপরের স্বার্থ করিয়া দেই, তবে ইহাকে 'ঈসার' বা ত্যাগ বলা হইবে এবং ইহার অনুমতিও আছে, প্রশংসনীয়ও বটে। কিন্তু নিজের কোন ধর্মীয় স্বার্থ নষ্ট করিয়া অপরের ধর্মীয় স্বার্থ করিয়া দিলে ইহাকে 'ঈসার' বলা যাইবে না। ইহা যদি "ঈসার" বলিয়া গণ্য হইত, তবে দেশদ্রোহী ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক পরার্থকামী হওয়া উচিত। তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গভর্ণমেন্ট হিতৈষী বলা উচিত। কেননা, তাহার মধ্যে এত বড় সহানুভূতি এবং পরার্থ কামনা রহিয়াছে যে, সে নিজের প্রাণও দান করিয়াছে এবং আনুগত্যের ফলে যে সমস্ত স্বার্থ লাভ করিত, তাহা অন্যান্য প্রজাদের জন্য ত্যাগ করিয়াছে।

বন্ধুগণ! ইহা সেই পরার্থ কামনা, যাহা ফেরআউনের মধ্যে ছিল। সে ধর্ম ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার উপর সন্তুষ্ট রহিয়াছে। এতদ্‌সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। নীল নদের জোয়ারের উপরই মিসরের কৃষিকর্ম নির্ভর করিত। একবার নীল নদে জলোচ্ছ্বাস হইল না। প্রজাবৃন্দ ফেরআউনের নিকট গিয়া বলিলঃ তুমি খোদায়ী দাবী করিয়া থাক, আর আমরা দুর্ভিক্ষে মরিতে বসিয়াছি। তোমার এই খোদায়িত্ব কোন্ দিন কাজে আসিবে? সে বলিলঃ আগামীকল্য নীল নদে জলোচ্ছ্বাস অবশ্যই হইবে। রাত্রে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিলঃ হে আল্লাহ্! যদিও আমি এমন উপযুক্ত নহি যে, আমার কোন দো'আ কবূল হইবে, কিন্তু আমার সাহস দেখুন, আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়াছি। বেহেশ্‌তের আশা বিসর্জন দিয়াছি। অনন্তকালের নরক-শাস্তিকে বরণ করিয়াছি। এই সমুদয়ের বিনিময়ে কেবল একটি প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার একটি দো'আ কবূল করুন। আমি নীল নদকে আদেশ করামাত্রই যেন উহার জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হয়। ফলত তাহার প্রার্থনা কবূল হইল এবং জলোচ্ছ্বাসও হইল।

এই দো'আ কবূল হওয়ায় কেহ এরূপ সন্দেহ করিবেন না যে, অভিশপ্ত কাফেরের দো'আ কেমন করিয়া কবূল হইল? আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকলের প্রার্থনাই শ্রবণ করেন। সর্বাপেক্ষা অধিক অভিশাপগ্রস্ত শয়তানের দো'আও আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিয়াছিলেন। সেই দো'আও আবার এমন সময়ের, যখন তাহার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণমাত্রায় রাগান্বিত ছিলেন। সাধারণত এরূপ সময়ের প্রার্থনা কবূল করা হয় না। প্রার্থনাও কেমন বিচিত্র! এমন প্রার্থনা আজ পর্যন্ত কেহই করে নাই। তাহা প্রকাশ্যত কবূল হওয়ার উপযোগীও ছিল না। সে দো'আ করিয়াছিল, رَبِّ اَنْظِرْنِیْٓ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ "হে খোদা! আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দান করুন।" অথচ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে তখন তাহার প্রতি এই অভিশাপ আসিয়াছিল اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْٓ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ "নিশ্চয় তোর প্রতি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমার

অভিশাপ।” এমন বিচিত্র সময়ে শয়তানের এমন বিচিত্র প্রার্থনা رَبِّ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ যখন কবূল হইয়া গেল, তখন ফেরআউনের দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়া এমন কি অসম্ভব?

শয়তানের এই ঘটনা হইতে কয়েকটি কথা জানা যাইতেছে—(১) তাহার নির্লজ্জতা। মাথার উপর জুতা পড়িতেছে, আর তখনও তাহার দো'আ করিবার সাহস হইতেছে। (২) তাহার দৃঢ়তা। এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও তাহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবেই। (৩) আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ। দো'আ করার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দো'আ মঞ্জুর করিয়া ফেলিলেন— فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ “তোমাকে অবকাশ দেওয়া হইল।” শত্রুর সঙ্গে যখন আল্লাহ্ তা'আলার এরূপ ব্যবহার, তখন তাঁহার অনুগত বান্দাগণকে কেমন করিয়া বঞ্চিত করিতে পারেন!

دوستاں را کجا کنی محروم - تو کہ با دشمناں نظر داری

“শত্রুদের প্রতিও যখন তোমার অনুগ্রহ দৃষ্টি রহিয়াছে, তখন বন্ধুদিগকে কেমন করিয়া বঞ্চিত করিতে পার?”

এই কাহিনীটি মুসলমানদের পক্ষে বড়ই আশাপ্রদ। কেননা, সেই দরবারে শত্রুর দো'আই যখন কবূল হইল, তখন আমাদের দো'আ কেন কবূল হইবে না? কিন্তু ইহা সত্য যে, শয়তানের ন্যায় জেদী হইতে হইবে। মোটকথা, ফেরআউনের যেমন সাহস ছিল, আজকালের পরার্থকামীদের সাহসও তেমনি। ফেরআউনের সেই সাহস যদি সাহস আখ্যা পাওয়ার উপযোগী না হয়, তবে আমাদের এই পরার্থ কামনাও সত্যিকারের পরার্থ কামনা নহে।

সুতরাং বুঝা গেল, যে ব্যক্তি নিজের হিতকামী নহে, সে পরের হিতকামীও নহে। অতএব, ইহারা যাহাকিছু করিতেছে, কেবল রীতি পালন করিতেছে। ইহাই সে সমস্ত গুণ, যাহাকে প্রশংসনীয় গুণ আখ্যা দেওয়া হইতেছে। এসমস্ত গুণ মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিয়া দোষারোপ করা এবং অপর জাতির প্রশংসনীয় গুণের মধ্যে গণ্য করা কোন্ পর্যন্ত সমর্থন করা যাইতে পারে? আমাদের মুখে এমন অনেক কথা উচ্চারিত হয়, যাহা প্রাণহীন দেহের মত। দিবা-রাত্র তাহা আওড়ান হইয়া থাকে। যাহাতে মনে হয়—ইহার সমকক্ষ দরদী আর কেহই নাই। কিন্তু হাদীসে যেমন বর্ণিত আছে— لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ “তাহাদের গলদেশ অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে না”, তদ্রূপ তাহাদের এসমস্ত বুলিও হৃদয়ে কিছুমাত্র ক্রিয়া করে না। বক্তার মনেই যখন ঐ সমস্ত উক্তির কোন ক্রিয়া নাই, তখন শ্রোতার মনে কি ছাই ক্রিয়া করিবে? মোটকথা, ইত্যাকার অপমানকরভাবে মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা নিতান্ত গর্হিত কার্য। ইহা হইতে বিরত থাকা ওয়াজেব। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক হইলে এমন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার আবশ্যকতা আছে এবং এই শুভেচ্ছায় কোন নির্দিষ্ট মুসলমানের এসমস্ত দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করিয়া তাহাকে সচেতন ও সংশোধন করিয়া দেওয়া দূষণীয় নহে। আমি যদি নির্দিষ্টতার সহিত এরূপ বলি, মুসলমানদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি আছে, তবে ইহাতে কোন নির্দিষ্ট মুসলমানকে বুঝাইবে। তখন আমার লক্ষ্যস্থল হইবে কোন নির্দিষ্ট মুসলমান। এরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাহাদের সংশোধনই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টিকে এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। প্রসঙ্গক্রমেই দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। আশা করি, ইনশাআল্লাহ্! ইহাতে উপকারই হইবে।

ধর্মকে বিভক্তিকরণের স্বরূপঃ এখন এস্থলে বর্ণনীয় একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিতেছি। বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে যত প্রকারের ত্রুটি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাও একটি ত্রুটি যে,

আমরা ধর্মকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি। অর্থাৎ, ধর্ম-কর্মের কোন কোন বিষয়কে নিজেদের জন্য মনোনীত করিয়া লইয়াছি। যেমন, পুরস্কারের ঘড়ি, রুমাল ইত্যাদি বস্তু বিতরণ আরম্ভ হইলে কেহ ঘড়ি গ্রহণ করে, কেহ এটা, কেহ ওটা। আমার ভাইয়েরা আজকাল ধর্ম-কর্মেও তদ্রূপ আরম্ভ করিয়াছে। কেহ ধর্মের এক অংশের উপর আমল করিতেছে, কেহ অন্য এক অংশের উপর আমল করিতেছে। ইহাকেই কোরআনে বলা হইয়াছেঃ وَجَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ "তাহারা কোরআনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে।" অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ "তোমরা কি কোরআনের এক অংশের উপর ঈমান আনিয়াছ এবং অপর অংশকে অবিশ্বাস করিতেছ?"

এই বিভক্তিকরণ নানা প্রকারের হইয়া থাকে। (১) এক অংশের উপর ঈমান আনিয়া অন্য অংশকে অবিশ্বাস করা। মুসলমান এই দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। (২) ধর্মের এক অংশকে বিশ্বাস করিয়াও বর্জন করা। ইহা আবার অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এখানে শুধু একটি প্রকার বর্ণনা করিব। কেহ কেহ শুধু দৈহিক এবাদতকে ধর্ম এবং আর্থিক এবাদতকে ধর্ম বহির্ভূত মনে করিয়াছে। ইহারা আবার নিজদিগকে ধার্মিক মনে করিয়া থাকে। তাহারা ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু অধিকতর দৈহিক এবাদতকেই মনে করিয়াছে। আবার কেহ কেহ শুধু আর্থিক এবাদত অবলম্বন করিয়া দৈহিক এবাদতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছে। একালে উভয় প্রকারের মানুষই বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন বিত্তশালী লোক দৈহিক পরিশ্রম কষ্টকর মনে করিয়া কেবল জনহিতকর কার্যে কিছু টাকা-পয়সা ব্যয় করাই ধর্মের জন্য যথেষ্ট মনে করিতেছেন এবং প্রমাণ এই পেশ করিতেছেন যে, স্থির হিত হইতে সংঞ্চারক হিত অধিক মঙ্গলজনক।

বন্ধুগণ! ইহা অবিকল সেই কথা— كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَبِهِ الْبَاطِلُ "হক কথা উচ্চারণ করিয়া উহার নাহক অর্থ করা।" আর্থিক এবাদত সম্পন্ন করিলে কি আর দৈহিক এবাদতের প্রয়োজন থাকিবে না? ইহার অবশ্য করণীয়তা (وجوب) কি রহিত হইয়া যাইবে? একটু কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করুন। যেখানে اٰتُوا الزَّكٰوةَ 'যাকাত দাও' আসিয়াছে, সেস্থানেই اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ 'নামায আদায় কর'ও আসিয়াছে। কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করিলে কোথাও একথার অবকাশ দেখিতে পাইবেন না যে, আর্থিক এবাদত পালন করিলে দৈহিক এবাদতের প্রয়োজন থাকে না।

তবে কেহ সন্দেহ করিতে পারে—যদি কোরআনে সেই অবকাশ না থাকিল, তবে এই ৭২ ফেরকা কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল?

ইহার উত্তর এই যে, এসমস্ত সম্ভাবনা বা অবকাশ চিন্তনীয় ব্যাপার। চিন্তা না করা পর্যন্ত কোরআন দাতা ব্যক্তির ন্যায়। সকলেই কোরআনের দান পাইতে পারে। মু'তাযেলা সম্প্রদায় কোরআন দ্বারাই নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করিতেছে। কাদ্‌রিয়া, মুজাস্‌সেমা এবং মুআ'ত্তেলা সকলে কোরআন দ্বারাই নিজ নিজ উদ্ভট মতবাদের প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে—সত্য মযহাব ভিন্ন অন্য কোন মতবাদেরই প্রমাণ দানের অবকাশ কোরআনে নাই।

يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ

আয়াতের অর্থঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ○

"তাহারা কি কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? যদি ইহা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও কালাম হইত, তবে তাহারা ইহাতে বহু বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাইত।" বুঝা গেল, চিন্তা করার পরেই ইহা

হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে যে, কোরআনে কোন বৈসাদৃশ্য নাই। চিন্তা না করিয়া ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখার কারণেই বৈসাদৃশ্য দেখা যায় এবং চিন্তাও সেই ব্যক্তিরই ধর্তব্য হইবে, যাহার নিকট চিন্তার সামগ্রী ও উপকরণ রহিয়াছে। প্রত্যেকের চিন্তা নির্ভরযোগ্য হইবে না। এই যুগের জ্ঞানীদের চিন্তা তদ্রূপই হইবে যেমন 'গুলিস্তাঁ' কিতাবের নিম্নলিখিত বয়েতের অর্থ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি চিন্তা করিয়াছিল ঃ

دوست آن باشد که گیرد دست دوست - در پریشاں حالی و در ماندگی

"সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু যে ব্যক্তি বিপদে ও দুঃখের সময় বন্ধুর সাহায্য করে।" একদা সেই ব্যক্তির বন্ধুকে কেহ প্রহার করিতেছিল। বন্ধুও দুই একটি আঘাত করিতেছিল। সেই ব্যক্তি তথায় যাইয়া তাহার বন্ধুর উভয় হস্ত ধরিয়া ফেলিল। ফলে সে পূর্ব হইতেও অধিক মার খাইল। ইহার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর করিল, আমি শেখ সা'দী রাহেমাহুল্লাহ্‌র কথার উপর আমল করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন ঃ

دوست آں باشد که گیرد دست دوست - در پریشاں حالی و در ماندگی

এই ব্যক্তি গুলিস্তাঁ যেমন বুঝিয়াছে—আমার ভাইয়েরাও কোরআনের মর্ম সম্বন্ধে তদ্রূপই চিন্তা করিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদের মঙ্গল করুন, কিন্তু বাতেনী কল্যাণের ছায়া অবলম্বনে।

পাঞ্জাবে এক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন ঃ "নূতন অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে—বীজের মধ্যেও একটি নর এবং একটি নারী হইয়া থাকে।" আমি বলিলাম ঃ "আচ্ছা তেমনই হউক। কিন্তু তাহাতে কি অনিবার্য হইয়া পড়ে যে, কোরআনেও এই বিষয়টির উল্লেখ থাকুক?" কিন্তু তিনি বলিলেন ঃ "আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম—কোরআনের কোথাও ইহার উল্লেখ আছে কিনা।" কয়েক মাস পর্যন্ত চিন্তা করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহা পাইলাম না। সোবহানাল্লাহ্! বন্ধুগণ! কোরআনে এই মাস্‌আলাটি তালাশ করা আর 'তিব্বে আকবর' কিতাবে জুতা নির্মাণপ্রণালী তালাশ করা সমান কথা। আপনারাই বলুন, কেহ এরূপ করিলে বর্তমান যমানার জ্ঞানিগণ তাহার সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিবেন? সে ব্যক্তি সম্বন্ধে একথাই তো বলা উচিত যে, সে তিব্বে আকবর কিতাবে জুতা নির্মাণপ্রণালী খুঁজিতেছে। যাহাহউক, তিনি বলিলেন, কিছুদিন পর একদিন আমার স্ত্রী কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতে করিতে এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ

"সেই খোদার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা যমীন হইতে উৎপন্ন হয়।" ইহা শ্রবণ করিয়া আমি আনন্দিত হইলাম—কোরআনে এই বিষয়টিও স্পষ্ট ভাষায়ই উল্লেখ রহিয়াছে।

উক্ত ভদ্রলোক ازواج (আযওয়াজ) শব্দের অর্থ স্বামী-স্ত্রী এবং নর-মাদী মনে করিয়াছেন। অথচ ইহার আভিধানিক অর্থ 'জোড়া', যেকোন বস্তুর জোড়াই হউক না কেন। এমন কি زوجی الخف والنعل 'জুতা ও মোজার জোড়াও' বলা হয়। زوج (যওজ) শব্দের অর্থ ফার্সী ভাষায় جفت, উর্দু ভাষায় جوڑا এবং বাংলাভাষায় যুগল বা জোড়া। স্বামী-স্ত্রীকে زوج (যওজ)

এই জন্য বলা হয় যে, তাহারা পরস্পর মিলিয়া এক জোড়া হয়। সকল জায়গায়ই زوج (যওজ)-এর অর্থ স্বামী-স্ত্রী নহে। কেহ যদি বলেঃ میرا جفت پاپوش اُٹھا لاؤ কিংবা میرا جوتے کا جوڑا اُٹھا لاؤ তবে কি ইহার অর্থ এই হইবে যে, "আমার পাপোশ ও জুতার স্বামী-স্ত্রী লইয়া আস?"

অতএব, আয়াতের অর্থ এই হইবে যে, আমি উদ্ভিদ জাতির প্রত্যেক প্রকারকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি। আনার ফলের একটি টক হইলে অপরটি মিষ্ট হয়। এইরূপে অনুমান করিয়া লউন। কিন্তু উক্ত মুজ্‌তাহিদ ছাহেব زوج শব্দের অর্থ স্বামী-স্ত্রী মনে করিয়া নিজের মনগড়া এই মাস্‌আলাটি কোরআনে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। অতএব, এই শ্রেণীর লোক কোরআনের মধ্যে চিন্তা করিলে কোরআনের যে দুর্দশা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্বকালের লোকদের মধ্যেও ছিলেন।

আমার এক ওস্তাদ বর্ণনা করিতেনঃ তাঁহার দরবারে একদিন এক দর্জি বসিয়াছিল। সে প্রথমত পাঠ করিলঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ○

অতঃপর একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে লাগিলঃ "মৌলবী ছাহেব! আফসোস, মেঘেরও মৃত্যু আছে?" بَعْدَ الْمَوْتِ শব্দে ع কে (আলিফ) পড়িয়াই এই দুর্দশা ঘটাইয়াছে। অর্থাৎ, بادل موت পড়িয়াই এই বিটকেল অর্থ বাহির করিয়াছে।

আজকাল অনেকে কোরআনের তফসীর লেখা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের তফসীরও ঠিক এই ধরনেরই। কারণ এই যে, তাঁহাদের নিকট চিন্তার সামগ্রী ও উপকরণের অভাব। অর্থাৎ, এল্‌মও নাই, পরহেযগারীও নাই। অতএব, বুঝা যায়, চিন্তারও প্রয়োজন আছে—যাহা আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছেঃ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ অতঃপর تَدَبُّرْ অর্থাৎ, চিন্তার জন্য চিন্তার উপকরণেরও প্রয়োজন। তাহা অতিশয় স্পষ্ট কথা। এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোরআনের মধ্যে চিন্তা করিলে কোন মতভেদের অবকাশ থাকে না। আর যেখানে অর্থ পরিষ্কার বোধগম্য হয় সেখানে তো চিন্তারও প্রয়োজন নাই।

দৈহিক এবাদত ও আর্থিক এবাদতের মধ্যে পার্থক্যঃ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দৈহিক এবং আর্থিক এবাদতের মধ্যে পার্থক্য করা মহাভুল। কেননা, যেখানে যাকাত দেওয়ার আদেশ করা হইয়াছে, সেখানেই নামায কায়েম করার নির্দেশও রহিয়াছে। এই তো গেল দুনিয়াদার আমীর লোকের অবস্থা।

আর এক প্রকারের লোক আছেন, যাঁহাদের উপর ধর্মপ্রবণতা খুব প্রবল। তাঁহারা নিজেদের রুচি অনুসারে আর একটি মনগড়া পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, শরীর খাটাইয়া এবাদত করার মধ্যেই ধার্মিকতা সীমাবদ্ধ। তাঁহারা আর্থিক এবাদত ছদ্‌কা-খয়রাত একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। যেমন, আমি আমার কথাই বলি, কেহ আমার জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিলে সে সহজে খোঁজ করিয়া সন্ধান পাইবে না যে, আমি অমুক জায়গায় দশ টাকা দান করিয়াছি। অনুরূপভাবে আমাদের অনেকের অবস্থাই এইরূপ। মোটকথা, এই বিস্তৃত বিবরণ হইতে বুঝা গেল যে, আমরা ধর্মের বিভিন্ন অংশগুলিকে বিভক্ত করিয়াছি। কেহ কতক

অংশ গ্রহণ করিয়াছে, আর অপর অংশগুলিকে অন্যান্য লোকে অবলম্বন করিয়াছে। ইহা একটি প্রকাশ্য ত্রুটি। আবার ইহার অধীনে বহু শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে।

অর্থাৎ, আবার দৈহিক এবাদতের মধ্যেও পার্থক্য করা হইয়াছে। কেহ শুধু ওযীফা গ্রহণ করিয়াছে। কেহ শুধু কোরআন শরীফ তেলাওয়াত অবলম্বন করিয়াছে। এক ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ "আমি আমার মুরশিদের তা'লীমকে এমন কঠোরতার সহিত মানিয়া চলিতেছি যে, নামায ক্বাযা হইলেও মুরশিদের তা'লীম অনুযায়ী ওযীফা কখনও ক্বাযা হয় না।" এইরূপে এবাদতে মালিয়ার মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। কেহ কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করে। এই কারণেই কোন কোন জায়গায় নামাযী অপেক্ষা মসজিদের সংখ্যা অধিক। আনুলা গ্রাম সম্বন্ধে শুনিয়াছি—তথায় অসংখ্য মসজিদ রহিয়াছে। মজার ব্যাপার এই যে, মসজিদের এত আধিক্য সত্ত্বেও কেহ যদি মনোযোগী হয়, তবে নিজের মসজিদ পৃথকই নির্মাণ করার চিন্তা করিবে। আরও মজার কথা এই যে, নূতন মসজিদ নির্মাণ করিয়া পুরাতন মসজিদের আসবাবপত্র অপসারণের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। কেননা, চাঁদা এত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। তখন মৌলবী ছাহেবদের অনুমতি গ্রহণের চেষ্টায় লাগিয়া যায়। "হুযূর! পুরাতন মসজিদ সম্পূর্ণ অনাবাদ, পুনরায় আবাদ হওয়ার আশা নাই। ইহার আসবাবপত্র নূতন মসজিদে লাগাইতে পারি কি?"

আমি আমার মহল্লায় দেখিয়াছি—মানুষ একটি পুরাতন মসজিদ ত্যাগ করিয়া দশ পনর কদম দূরে আর একটি নূতন মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে। এখন কিছুদিন হইতে লোকেরা সেই পুরাতন মসজিদের মেরামতের প্রতিও মনোযোগ দিয়াছে। ফল এই দাঁড়াইবে—যেকোন একটি অনাবাদ হইয়া পড়িবে কিংবা উভয় মসজিদের জামাআত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কানপুরে এক ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করিল। অন্য সমাজের কোন একজন লোক ইহার মোকাবেলায় আর একটি মসজিদ প্রস্তুত করিল। উভয় মসজিদই যখন প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন নামাযী সংগ্রহের চিন্তা হইল। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হইল যে, নামাযের পর মিষ্টি বিতরণ করা হইবে, যেন নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ শুধু এই যে, এসমস্ত লোক মসজিদ নির্মাণকেই অধিক সওয়াবের কার্য মনে করিয়া থাকে এবং একাজে টাকা ব্যয় করিলেই অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করে।

অধিকাংশ সময় দেখা গিয়াছে, এক ব্যক্তি তৈল নিয়া আসিলে তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ইহা কি তালেবে এল্মদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিব, না মসজিদের উদ্দেশ্যে আনা হইয়াছে? তখন সে মসজিদে দেওয়াই স্থির করিয়া দেয়; বরং অধিকাংশ লোকের ধারণা, মসজিদে প্রদীপ জ্বালিলে কবর আলোকিত হয়। এই কারণে কেহ মরিয়া গেলে তাহাকে সওয়াব পৌঁছাইতে হইলে মসজিদে খাদ্যদ্রব্য পাঠান হয়। অন্যত্র দান করা তদ্রূপ সওয়াব মনে করে না।

ইহাতে আরও একটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে যে, সেই খাদ্যদ্রব্যও রাত্রে মসজিদে পাঠান হয়। সম্ভবত তাহারা মনে করে, দিনে তো সূর্য রহিয়াছে, ইহার আলো কিছু না কিছু কবরের মধ্যে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে রাত্রে কবর সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে। কাজেই এই খাদ্য এবং প্রদীপের আলো কবরে যাইয়া পৌঁছিবে। দিনে পাঠাইলে তাহা রাত্রেও কাজে লাগিবার আশা আছে। কিন্তু উহাকে এই জন্য পছন্দ করা হয় না যে, খোদা জানেন, তথাকার ব্যবস্থা যথেষ্ট হইবে কিনা। তথাকার কর্মকর্তাগণ কোথাও রাখিয়া দিবেন, পরে ভুলে হয়তো আর কবরে পৌঁছানই

হইবে না এবং সারারাত্র ব্যাপিয়া মুর্দা অন্ধকারে থাকিবে। কাজেই এমন সময়ে মসজিদে খাদ্য ও প্রদীপ দান কর যেন তৎক্ষণাৎ কবরে যাইয়া পৌঁছে।

মুর্দার উদ্দেশ্যে গুড় বিতরণের প্রথাও প্রায় এইরূপই। মনে করা হয়, মৃত্যুকালীন কষ্টের তিক্ততা ইহাতে দূর হইবে। বন্ধুগণ! গুড় তো কখনও কবরে পৌঁছে না এবং এই প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় নাই যে, মিষ্টদ্রব্যের সওয়াবও মিষ্টই হয়।

মোটকথা, এই শ্রেণীর বহু অর্থহীন প্রথা লোকের মধ্যে রহিয়াছে এবং ইহার জন্য মসজিদকেই উপযুক্ত স্থান মনোনীত করা হইয়াছে। কেননা, তাহাদের বিশ্বাস, মসজিদে পাঠাইলে সওয়াব অধিক হয়। আবার মসজিদে নিয়াও খাছ করিয়া মিম্বরের উপর রাখাকে অধিক সওয়াবের কারণ মনে করা হয়। কিন্তু তাহাও আবার ফাতেহা পড়াইয়া দিতে হইবে। তাহাদের ধারণা—অন্যথায় এতগুলি খাদ্যদ্রব্য বিনষ্টই করা হইল।

কতিপয় মেয়েলোক একদিন এশার পরে কিছু মিষ্টি লইয়া কানপুরের জামে মসজিদে আসিল। সেখানেই মাদ্রাসার তালেবে এল্‌মগণ থাকিত। আমি তখন নিজ গৃহে চলিয়া গিয়াছিলাম। কেবল তালেবে এল্‌মগণই মসজিদে ছিল। তালেবে এল্‌মের দল সাধারণত স্বাধীনচেতাই হইয়া থাকে। তাহারা মেয়েলোকদের নিকট হইতে মিষ্টি লইয়া ফাতেহা না পড়িয়াই খাইয়া ফেলিল। ইহাতে উক্ত মেয়েলোকেরা খুব হট্টগোল বাধাইয়া দিল। তাহাদের চীৎকার শুনিয়া তাহাদের ঘরের পুরুষেরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। এই গোলযোগ দেখিয়া জনৈক তালেবে এল্‌ম আমার নিকট দৌড়িয়া আসিল এবং বলিলঃ এই এই কারণে মসজিদে ভীষণ গোলযোগ শুরু হইয়াছে।

আমি মসজিদে আসিয়া দেখিলাম, অনেক লোক একত্রিত হইয়াছে। অবশেষে আমি তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তালেবে এল্‌মদিগকে তিরস্কার করিলাম, কয়েকজনকে প্রহারও করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তালেবে এল্‌মদের দ্বারা মিষ্টির মূল্য দেওয়াইলাম। স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, আর কোন দিন এই মসজিদে মিষ্টি আনিও না। মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মাত্র দশ পয়সার মিষ্টি ছিল। অথচ ইহার পরিমাণ এত অধিক ছিল না, যাহা লইয়া এমন গোলযোগ বাধিতে পারে। বিশেষত মিষ্টিগুলি সেই তালেবে এল্‌মদের জন্যই আনা হইয়াছিল। কিন্তু শুধু 'ফাতেহা' না হওয়ার কারণে স্ত্রীলোকেরা মনে করিয়াছে, মুর্দার রূহের উপর সওয়াবই পৌঁছে নাই। কাজেই ব্যাপার এই পর্যন্ত গড়াইয়াছে। অথচ আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, যদি দশবারও ফাতেহা পড়া হয়, কিন্তু সেই খাদ্য কাহাকেও দান করা বা খাওয়াইয়া দেওয়া না হয়, তবে মুর্দার নিকট কোন সওয়াবই পৌঁছিবে না। পক্ষান্তরে একবারও ফাতেহা না পড়িয়া যদি কোন উপযুক্ত লোককে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, তবে যথাযথভাবে সওয়াব পৌঁছিয়া যায়।

জনৈক কৌতুকপ্রিয় দরবেশ বলিয়াছেনঃ কোন একস্থানে ফাতেহার ব্যবস্থা ছিল। আমাকেও দাওয়াত করা হইল। খাদ্য হাযির করিয়া ফাতেহা আরম্ভ করা হইল। ফাতেহা পাঠকারী হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া নাম গুণিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক বিলম্ব হইলে আমি বলিলামঃ জনাব, সারা দুনিয়ার নাম গুণিতে আরম্ভ করিলেন। আমার নামটাও তৎসঙ্গে গণনা করুন না কেন? কেননা, আমি না খাওয়া পর্যন্ত আপনার উচ্চারিত নামসমূহের কেহই তো সওয়াব পাইবে না। ইহাতে তাহারা খুবই রাগান্বিত হইল এবং বলিল, এই ব্যক্তি 'ওয়াহাবী।' কিন্তু ফাতেহা পড়ার দীর্ঘ শৃঙ্খলের অবসান ঘটিল। মোটকথা, সাধারণত লোকের ধারণা, ফাতেহা

পড়া না হইলে সওয়াব মুর্দার নিকট পৌঁছে না। আবার এই ফাতেহা পড়ার বিভিন্ন রকমের কায়েদা-কানুনও আবিষ্কার করা হইয়াছে।

কোন এক শাহ্ ছাহেব আমাকে বলিয়াছেনঃ গেয়ারবী শরীফের (১১ই তারিখের) অনুষ্ঠান ১৮ তারিখ পর্যন্ত করা জায়েয আছে। ইহার পরে জায়েয নাই। যেন ইহা নামাযের সময়। অমুক সময় পর্যন্ত থাকিবে, অতঃপর আর জায়েয হইবে না। বন্ধুগণ! দেখুন, এসমস্ত আকীদা পরিত্যাগ করা উচিত কিনা? যদি কেহ বলেন, আমরা এরূপ বিশ্বাসে এসমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি না, তবে মনে রাখিবেন, আপনাদের কার্য দেখিয়া মানুষ এই প্রকার বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া লইবে।

শরীঅত হইতে দূরে সরিয়া থাকাঃ বন্ধুগণ! সাধারণ শ্রেণীর লোক এতটুকু সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে যে, শরীঅত হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। সর্বনাশের ব্যাপার এই যে, কোন কোন স্থানে “খোদার রাত্রি” পালন করা হয় এবং প্রাতঃকালে খোদার নিরাপত্তার গীত গাহিতে গাহিতে মসজিদে আসিয়া প্রবেশ করে এবং মাথা নোয়াইয়া সালাম করে। মোটকথা, মসজিদ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা, নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্ পাক যেন এখানে বসিয়া রহিয়াছেন। এই কারণেই কেহ কেহ টাকা-পয়সা ব্যয় করার উপযুক্ত ক্ষেত্র মসজিদকেই সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ সমিতি কিংবা মাদ্রাসাকে টাকা-পয়সা ব্যয়ের ক্ষেত্র মনোনীত করিয়াছে। চাই কি তাহা ধর্মীয় মাদ্রাসাই হউক কিংবা দুনিয়াবী শিক্ষাগারই হউক। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা দুনিয়াবী শিক্ষাগারকে নির্ধারণ করিয়াছে, তাহারা তো অনিচ্ছাক্রমে পা উপড়াইয়াও কোন সময় মসজিদের দিকে পতিত হয় না। তাহারা মসজিদ ত্যাগ করিয়া শিক্ষাগারকে ধরিয়াছে। তাহাদের কার্যই হইল শুধু যেই উপায়েই হউক—চাঁদা উসুল করা, অথচ তাহা শরীঅত অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম। তদুপরি আরও সর্বনাশ এই করে যে, কোন গরীব লোক চারি আনা মূল্যের কিছু দান করিলে ইহার প্রতি লোক দেখান মর্যাদা এইরূপে প্রদান করা হয় যে, ইহাকে নিলামে চড়ান হয়। বাহিরে তো দেখান হয় যে, ইহাতে গরীবের দানের সম্মান করা হইল; অথচ ইহাতে উদ্দেশ্য হয়—এই অজুহাতে বড় অঙ্ক উসুল করা। বন্ধুগণ! এসমস্ত লোক গরীবের মর্যাদা কি বুঝিবে? গরীবের মর্যাদা সে ব্যক্তিই দান করিতে পারে, যে ব্যক্তি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করিয়াছে।

এক সময়ে হযরত মাওলানা গঙ্গোহী (রঃ) পীড়িত অবস্থা হইতে (আরোগ্য লাভ করিলে) তাঁহার পুত্র শোকরানাস্বরূপ বহু লোককে খাওয়ার দাওয়াত করিলেন। মাওলানা (রঃ) নিজের এক খাছ খাদেমকে বলিলেনঃ “গরীব লোকদের আহার শেষ হইলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত খাদ্য, যাহা ভিস্তিদিগকে দেওয়া হয়, তাহা আমার সম্মুখে লইয়া আসিও। আমি সেই ‘তাবাররুক’ খাইব। মনে সন্দেহের স্থান দিও না যে, তাহাদের শরীর পরিষ্কার নহেঃ কাপড় পরিচ্ছন্ন নহে।” তিনি গরীবদের উচ্ছিষ্টকে ‘তাবাররুক’ এই জন্য বলিয়াছেন যে, প্রথমত তাহারা মু’মেন, দ্বিতীয়ত তাহাদের সম্বন্ধে হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ “আমি ভগ্নহৃদয় গরীবদের সঙ্গে আছি।” এই কারণেই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলিয়াছেনঃ يَاعَائِشَةُ قَرِّبِى الْمَسَاكِيْنَ “হে আয়েশা! মিস্কীনদিগকে নিকটে স্থান দাও।” যাহাহউক, গরীবদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য হযরত মাওলানার নিকট আনা হইলে অতিশয় আগ্রহের সহিত তিনি তাহা আহার করিলেন। গরীবদের প্রতি এমন সম্মান কেহ কখনও দেখাইয়াছে কি?

আজকাল এই মর্যাদা প্রদানেরও নূতন নূতন প্রতারণামূলক উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। এমন কি গরীবের প্রদত্ত একটি সিকিকে শত শত টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। অথচ ইহাতে ধোঁকাবাজি ছাড়া সুদও হয়। কেননা, এমতাবস্থায় একই জাতীয় বস্তু কম দিয়া অধিক গ্রহণ করা হয়, ইহাই সুদ। আচ্ছা! যদিও সুদের কোন প্রতিকার করিয়াও লওয়া হয়, ধোঁকাবাজির কি প্রতিকার করা যাইবে?

কোন এক স্থানে একটি সিকি নিলামে বিক্রয় হইতেছিল, একজন গরীব লোক যাহাকে শিখান হইয়াছিল, সে উহার মূল্য হাজার টাকা হাঁকিল। নিলামকারীরা তাহার নামের উপরই নিলাম শেষ করিয়া দিল। গরীব লোকটি যখন জানিতে পারিল যে, সিকির নিলাম তাহার নামের উপরই শেষ হইয়াছে, তখন সে কাঁদিতে লাগিল। লোকে তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমার কাছে তো কিছুই নাই। আমি তো শুধু এই জন্য হাজার টাকা ডাকিয়াছিলাম যে, আমার ডাকা শুনিয়া লোকে আরও অধিক ডাকিবে এবং তাহাতে সমিতির লাভ হইবে।" অবশেষে এক বক্তা উঠিয়া বলিতে লাগিলেনঃ "সমাজে কি এমন কেহ নাই, যিনি এই উচ্চমনা অসম সাহসী দরিদ্র ব্যক্তির ঋণ নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করিতে পারেন?" অবশেষে, এই দরিদ্র ব্যক্তির জন্য পুনরায় চাঁদা উসুল করা হইল এবং এই উপায়ে হাজারের অঙ্ক পূর্ণ করা হইল।

চিন্তার বিষয়—ইত্যাকার আচরণ সততা হইতে কোন্ পর্যায়ের দূরবর্তী। বন্ধুগণ! সততা এমন বস্তু যাহা আজকাল মুসলমানদের মধ্যে মোটেও নাই। আজকাল তাহাদের প্রত্যেক কথা ও ব্যাপারে অন্য একটি দিক থাকে। অবশ্য অকপট মুসলমানদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ্! এখনও সততা অবশিষ্ট রহিয়াছে। মোটকথা, চাঁদা আদায়ের এই অবস্থা এবং এই ধরনের রুচিসম্পন্নদের এই অবস্থা। তাহারা মনে করে, প্রতারণা ও ধোঁকার সাহায্যে কাজ সমাধা করিয়া ধর্মের উপর পুরাপুরি আমল করিয়াছে। অতঃপর তাহাদের নামাযেরও প্রয়োজন নাই, রোযারও আবশ্যক নাই। নামায যদি পড়েও, তবে নিজ গৃহে। মসজিদে আগমন করা যেন তাহাদের জন্য মাফ।

বড়লোকদের দুর্বল বাহানাঃ কোন একজন বড়লোক বলিতে লাগিলেন, মসজিদে কেমন করিয়া যাই। সেখানে বিছানাপত্র ঠিক নাই। ফরাশ-পাখারও ব্যবস্থা নাই। স্থানে স্থানে শেওলা জমিয়া রহিয়াছে। নিজের ঘরে সকল বিষয়েই শান্তি। আমি বলিলামঃ একটু সামলাইয়া অভিযোগ করুন। আপনার অভিযোগ কাহার বিরুদ্ধে? গরীবদের বিরুদ্ধে, না খোদার বিরুদ্ধে? গরীবদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ এই কারণে করিতে পারেন না যে, গরীবদের পক্ষে এতসব আসবাব সংগ্রহ করার সাধ্যই নাই। আর খোদার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই কারণে করিতে পারেন না যে, প্রথমত ইহা খোদার কাজ নহে—আপনাদের কাজ। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা কি ফেরেশ্‌তাদের দ্বারা এই কাজ করাইয়া দিবেন? ইহাও খোদার কাজ যে, তিনি আপনাদিগকে মসজিদের খেদমত করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং তজ্জন্য আর্থিক সামর্থ্যও দান করিয়াছেন। অতএব, বুঝা গেল, আপনাদেরই ত্রুটি। সুতরাং আপনি নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। যদি আপনি মসজিদে যাইতেন, তবে এই অভাব অনুভব করিতেন এবং পূরণের চিন্তা হইত। মজার ব্যাপার এই যে, কোন কোন লোক মসজিদের সাহায্য তো করেই না; বরং মসজিদের আসবাবপত্র নিজের অধিকৃত বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। কেহ নিষেধ করিলে বেচারার উপর রাগান্বিত হইয়া বলে, মসজিদ কি তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আমি বলি, না সাহেব; মসজিদ তোমারই স্বত্বাধীন সম্পত্তি, ইহার আসবাবপত্র খুব ব্যবহার কর। জীবনে কখনও মসজিদে কিছু দান করারও তওফীক

হইয়াছিল কি? এসমস্ত লোকের অবস্থা অবিকল সেই কসাইয়ের ন্যায়, যাহার এক আত্মীয় কসাইয়ের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিল—আহা! তোমার ছুরি কে গ্রহণ করিবে? তোমার জন্তুগুলি কে নিবে? সে ব্যক্তি প্রত্যেক কথার জবাবে বলিতেছিল, 'আমি গ্রহণ করিব।' ইহাতে ক্রন্দনরত অবস্থায়ই উক্ত স্ত্রীলোকটি বলিলঃ 'তোমার ঋণ কে পরিশোধ করিবে?' সে ব্যক্তি তখন বলিলঃ 'বল, ভাই এখন কাহার পালা?'

আমাদের মসজিদগুলিরও ঠিক একই অবস্থা, খেদমতের বোঝা অপরের উপর এবং মসজিদের দ্রব্যাদি ব্যবহারের বেলায় তিনি। এমন কি, কেহ কেহ মসজিদের তক্তাও লইয়া যায়। আবার ধার্মিকদের মধ্যেও একটি রোগ আছে—মসজিদের গরম পানি ওযূ করার জন্য নিজের ঘরে লইয়া যান।

মোটকথা, আমি তাহাকে বলিলামঃ 'তোমার কারণেই তো মসজিদের এই অবস্থা।' বলিতে লাগিল, 'মৌলবীরা মসজিদে পাখা লাগাইতে নিষেধ করিয়া থাকে।' আমি বলিলামঃ 'আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি পাখা লাগাও।' সে বলিল, মানুষ হট্টগোল করিবে এবং আমার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিবে। আমি বলিলামঃ দুই চার দিনে যখন নামাযের কারণে দাসত্বের ক্রিয়া হইবে, ইন্‌শাআল্লাহ্ তখন তুমি নিজেই সেবা গ্রহণের মনোভাব ত্যাগ করিবে। কোন মৌলবীর তোমাকে নিষেধ করার প্রয়োজন হইবে না।

সারকথা এই যে, এই শ্রেণীর লোকেরা কেবল কিছু টাকা-পয়সা খয়রাত করাকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে। আর কেহ কেহ আছে ইহাদের সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র। দৈহিক এবাদতও করে না, আর্থিক এবাদতও করে না। তাহাদের হাতে কিছু টাকা-পয়সা আসিলে তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া দেয়। ইহাদিগকে বারণ করিলে তাহারা বারণকারীদিগকে অন্ধকার যুগের মানুষ বলিয়া আখ্যা দেয়।

এক ব্যক্তি এই শ্রেণীর কোন এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলঃ "আমি শুনিতে পাইলাম, তুমি সুদ গ্রহণ করিতেছ।" সে উত্তর করিল, "তুমি আমার ব্যক্তিগত কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ?" সোব্‌হানাল্লাহ্! সদুপদেশ প্রদান করা হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ হইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত সে অনেকক্ষণ বুঝাইবার পর লোকটি বলিলঃ "ভাই, এখন জায়েয না-জায়েযের বিচার করার সময় নহে। এখন যে প্রকারেই হউক, শুধু টাকা উপার্জন করা দরকার।"

উপরিউক্ত বিবরণ ঐসমস্ত লোকের অবস্থা, যাঁহারা পার্থিব শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা ধর্মীয় শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন, তাঁহারা মনে করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমরা যখন ওয়ায-নছীহত দ্বারা অন্যান্য লোকদিগকে সৎকার্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিতেছি, তখন আমি নিজে কোন টাকা-পয়সা দান করার প্রয়োজন নাই। اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه "সৎকার্যের প্রতি পথ প্রদর্শনকারী সৎকার্যকারীর ন্যায় সওয়াব পাইয়া থাকে।" ইহাতেই যথেষ্ট সওয়াব হইয়াছে। মোটকথা, প্রত্যেক দল নিজ নিজ ধারণানুযায়ী ধর্মের এক সারমর্ম আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। অতএব, বন্ধুগণ! ভাবিয়া দেখুন, ইহা কত বড় ত্রুটি।

আল্লাহ্‌র রাস্তার ব্যয় করা সম্বন্ধে ত্রুটিঃ কিন্তু আমি এখন উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকারের ত্রুটি হইতে স্থানীয় প্রয়োজনে বিশেষ করিয়া একটি ত্রুটি বর্ণনা করিতেছি। ইহা সর্বক্ষেত্রে প্রবল আকারে দেখা যায়। মানুষ টাকা-পয়সা লিল্লাহ্ খরচ করাকে বড় কঠিন মনে করে। যেখানেই টের পায় যে, এখন দুই চারি পয়সা দান করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া

পালাইবার চেষ্টা করে। এই নির্দিষ্ট ত্রুটির বিষয় বর্ণনা করাতে সম্ভবত কেহ মনে করিতে পারেন, শুধু চাঁদা সংগ্রহের জন্য ওয়ায করা হইতেছে। বন্ধুগণ! যদি আপনারা চাঁদা পছন্দ না করেন, তবে আমি বলিব, হাঁ, নিশ্চয় আমি এখন চাঁদার উৎসাহ প্রদানের জন্যই ওয়ায করিতেছি এবং তাহাই এখন প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু উৎসাহ প্রদান করাকে আমি অপছন্দ করি না। খোদা তা'আলা স্বয়ং কালামে মজীদের মধ্যে স্থানে স্থানে দান করার প্রতি উৎসাহ দিয়াছেন। অবশ্য কালামে মজীদে ইহাকে এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ, এবাদত দুই প্রকার। তন্মধ্যে একটি মাল-দৌলত দান করা। অতএব, কালামে মজীদে ইহার যে সম্পর্ক রহিয়াছে, কাহারও ওয়াযের মধ্যে ইহার ততটুকু সম্পর্ক থাকিলে ক্ষতি কি? কালামে মজীদের এই সম্পর্কটুকু বহাল রাখার পন্থা এই যে, হয়তো ওয়াযের মধ্যে উভয়বিধ এবাদতেরই বর্ণনা করা হউক। অথবা কোন ওয়াযে দৈহিক এবাদত সম্পর্কেও বর্ণনা করা হউক। বস্তুত আমার অদ্যকার ওয়াযে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদানই প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও অধিকাংশ ওয়ায়েযদের অভ্যাস, চাঁদার উৎসাহ দিতে হইলে প্রথম হইতে চাঁদার উৎসাহসূচক ওয়ায করেন না; বরং ইহাকে শ্রোতা সাধারণের ঘাবড়াইয়া যাওয়ার কারণ মনে করিয়া অন্য কোন বিষয় অবলম্বনে ওয়ায আরম্ভ করেন এবং মধ্যস্থলে একসময় চাঁদার বিষয় সংযোগ করিয়া এই ওয়াযের শামিল করিয়া লন। আমি এই পন্থার বিরোধী নহি। কেননা, ইহার পাছেও যুক্তি আছে। কিন্তু ইহাতে এতটুকু কথা অবশ্যই আছে যে, এরূপ ওয়াযের প্রত্যেক ওয়াযেই শ্রোতাগণ আশংকা করে যে, হয়তো এখন চাঁদার উল্লেখ করা হইবে। সুতরাং আমি প্রথম হইতেই এই বিষয়টি গ্রহণ করিয়াছি এবং পুনরায় বলিয়া দিতেছি, এখন শুধু চাঁদার বিষয়ে ওয়ায করা হইবে। যাহার ইচ্ছা শুনুন, যাহার ইচ্ছা চলিয়া যান। যিনি শুনিবেন, নিজের হিতের জন্যই শুনিবেন, আমার ইহাতে কোন লাভ নাই। লাভ বা হিতের অর্থ এই নহে যে, শ্রোতাগণ এখনই এক গাঁঠরি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু কোরআনে পরিষ্কার ঘোষণা রহিয়াছেঃ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَمَا تُنْفِقُوْا
مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

"তোমরা যাহাকিছু খরচ কর, তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য কর; আর তোমরা অন্য কোন উদ্দেশেই ব্যয় করিওনা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। যে ধন-দৌলত তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করিতেছ তাহা তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। ইহাতে তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।" এই আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলিতেছেন?

আপনারা বলিতে পারেন, "আপনার মুখেই আমরা বহুবার শুনিয়াছি, চাঁদা ভিক্ষা করা নিষেধ।" আমার পূর্ণ বক্তব্য-বিষয় মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ না করার কারণেই আপনারা আমার কথা হইতে বুঝিয়া লইয়াছেন—চাঁদা চাওয়া নিষেধ। উপরিউক্ত আয়াতে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, দান-খয়রাতও ধর্মের একটি বিশিষ্ট অংশ।

অবশ্য চাঁদা চাওয়ার কয়েক অবস্থা আছে। তন্মধ্যে যে অবস্থা শরীঅতের সহিত সামঞ্জস্যশীল হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। সামঞ্জস্যশীল হইলে নিন্দনীয় হইবে না। এই নীতি শুধু চাঁদার জন্যই নির্দিষ্ট নহে; বরং নামায-রোযায়ও এই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যে নামায শরীঅত অনুযায়ী আদায় করা হইবে, তাহা প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়, অন্যথায় নিন্দনীয়। মনে করুন, যদি কেহ

ওযূ না করিয়া নামায আদায় করে কিংবা কেবলা পশ্চাতে রাখিয়া নামায পড়ে, তবে তাহার নামায নাজায়েয এবং নিন্দনীয়। এইরূপে এই নীতি আর্থিক এবাদতেও রহিয়াছে। চাঁদা দেওয়া জায়েয হওয়ারও কতকগুলি শর্ত আছে। উক্ত শর্ত অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করিলে জায়েয হইবে, অন্যথায় নাজায়েয। তাহাও শুধু চাঁদার সহিত নির্দিষ্ট নহে, 'হাদিয়া-তোহ্ফার' ক্ষেত্রেও এসমস্ত শর্ত মানিয়া চলিতে হইবে।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ত্রুটি দেখা যায় যে, শর্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং এই ত্রুটি চাঁদা গ্রহণকারীদের মধ্যেই অধিক। দাতাদের যেহেতু দেওয়ার অভ্যাসই কম, সুতরাং এসমস্ত দোষ-ত্রুটি হইতে তাহারা রক্ষিত আছেন। অবশ্য গ্রহণকারীরা এসমস্ত দোষে খুবই লিপ্ত রহিয়াছেন। এই দোষ-ত্রুটি দুই জায়গায় প্রকাশ পাইয়া থাকে।

হাদিয়া কবূল করার শর্তঃ কেননা, লেনদেনের মোআমালা দুই প্রকারে হইয়া থাকে—(১) বিনিময় গ্রহণে দান। (২) এবং বিনিময়বিহীন দান। বিনিময়ে দান করার মধ্যেও আজকাল দোষ-ত্রুটি অনেক হইতেছে। তথাপি ইহার মধ্যে জায়েযের অবস্থাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু বিনিময়বিহীন দানের মধ্যে কোনই পরোয়া করা হয় না। বিনিময়বিহীন দান দুই প্রকার। হাদিয়া ও চাঁদা। উভয় প্রকারের দানেই মানুষ বিশেষ বেপরোয়া।

হাদিয়ার ক্ষেত্রে এক বেপরোয়াভাব এই যে, কখনও কোন হাদিয়া ফেরত দেওয়া হয় না। যে কেহই হাদিয়া পেশ করুক না কেন, তৎক্ষণাৎ কবূল করা হয়। কেহ কেহ ফেরত দিলেও তাঁহাদের দুর্নাম করা হয় এবং নানাপ্রকার প্রশ্ন করা হয়। বন্ধুগণ! রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহের মধ্যে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন, নির্বিচারে সর্বপ্রকারের হাদিয়া কবূল করাও অপছন্দনীয়। হুযূর (দঃ) বলেনঃ

مَاآتَاكَ مِنْ غَيْرِ اِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ○

"যে হাদিয়া আগমনের প্রতীক্ষায় তুমি ছিলে না, তাহা আসিলে গ্রহণ কর, না আসিলে ইহার চিন্তায় লাগিও না।" এই হাদীসেই হুযূর (দঃ) হাদিয়া কবূল করা সম্পর্কে একটি শর্তের কথা বলিয়াছেন। ইহাকে হাদিয়ার আদবও বলা যাইতে পারে কিংবা শর্তও বলা যাইতে পারে। আমি এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না। যাহাই হউক, হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ নফসের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষমাণ অবস্থা না হওয়া উচিত। আমি ইহা হইতে একটি বিষয় আবিষ্কার করিয়াছি। আবিষ্কার ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। আমি এই বাণী হইতে এই নীতি বুঝিয়াছি যে, কাহারও দরবারে যাতায়াত থাকিলে সদা-সর্বদা হাদিয়া লইয়া যাওয়ার নিয়ম করিয়া লইও না; বরং কখনও কখনও হাদিয়া ছাড়াও চলিয়া যাও। কেননা, অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, নিয়ম করিয়া লওয়ার অবস্থায় সেই ব্যক্তির চেহারা দেখামাত্র স্বভাবত মনে এই কল্পনার উদয় হয় যে, "খোদা জানেন, কোন হাদিয়া আনিল কিনা।" ইহাকে اشراف অর্থাৎ, প্রতীক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা বলে। ইহার প্রতিকার এই যে, নফ্সকে এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত, যেন ইহাতে প্রতীক্ষা বা আকাঙ্ক্ষাই না থাকে, কিংবা আগন্তুককে হাদিয়া আনয়নের বাধ্যবাধকতা হইতে নিষেধ করা উচিত। আমি নিজের জন্য এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছি; বরং হাদিয়া অধিকাংশ সময় না আনাই উত্তম।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছেঃ تَهَادَوْا تَحَابُّوْا “পরস্পরে হাদিয়ার আদান-প্রদান কর, মহব্বত বৃদ্ধি পাইবে।” হুযূর (দঃ) হাদিয়ার আদান-প্রদানকে মহব্বত বৃদ্ধির কারণ বলিয়াছেন। হাদিয়া পাইয়া মন খুশী হইলেই মহব্বত বৃদ্ধি পায়। আবার মনে পূর্ব হইতে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেই তবে হাদিয়া পাইয়া মন খুশী হয়। অন্যথায় আনন্দ পাওয়া যায় না; বরং শুধুমাত্র প্রতীক্ষার কষ্ট দূরীভূত হয়। অতএব, এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, হাদিয়ার জন্য নফ্‌সের মধ্যে প্রতীক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা না হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, হাদীস হইতে আরও একটি কথা বুঝা যায় যে, বাইআত গ্রহণের সময় হাদিয়া না নেওয়া উচিত। কেননা, ইহাতেও সেই প্রতীক্ষার অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যেমন, হযরত মাওলানা গঙ্গোহী (রঃ) বলিয়াছেনঃ “ভাই, আজকালকার পীরদের অবস্থা এইরূপ যে, কোন গ্রাম্য লোক তাঁহাদের সম্মুখে মাথা চুলকাইলেও পীর ছাহেব মনে করেন, হয়তো পাগড়ির ভিতর হইতে টাকা বাহির করিতেছে।” ইহা একান্ত সত্য কথা।

বাতিল পীরের দৃষ্টান্তঃ লোভ-লালসা আমাদের অবস্থা এরূপ করিয়া দিয়াছে। এক মুরীদ স্বীয় পীরের নিকট একটি স্বপ্ন বর্ণনা করিল যে, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার হাতের অঙ্গুলিসমূহে অপবিত্রতা রহিয়াছে এবং আপনার অঙ্গুলিতে মধু লাগিয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পীর ছাহেব বলিয়া উঠিলেনঃ “তা'বীর তো প্রকাশ্য। তুমি দুনিয়ার কুত্তা এবং আমি আল্লাহ্‌ওয়ালা।” মুরীদ বলিলঃ হুযূর, আমার স্বপ্ন এখনও শেষ হয় নাই। আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, আপনার অঙ্গুলি আমি চুষিতেছি আর আমার অঙ্গুলি আপনি চুষিতেছেন। ইহাতে পীর ছাহেব অতিশয় চটিয়া গেলেন। মোটকথা, এই স্বপ্ন সত্য হউক কিংবা মিথ্যা হউক, কিন্তু মুরীদ ইহাতে যেই অবস্থার ছবি আঁকিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ। ইহার সারমর্ম এই যে, মুরীদ ধর্মলাভের জন্য পীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেছে এবং পীর মুরীদ হইতে দুনিয়ারূপ মৃতদেহ সঞ্চয়ের ফিকিরে রহিয়াছে। এই শ্রেণীরই এক পীরের এক মুরীদকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলঃ “তুমি পীর হইতে কোন ফল লাভ করিয়াছ কিনা?” মুরীদ উত্তর করিলঃ “মিঞা! চৌবাচ্চায় পানি না থাকিলে লোটায় কোথা হইতে আসিবে?”

এই মর্মের একটি গল্প মনে পড়িয়াছে। বিলগ্রামে একজন বুযুর্গ লোক বাস করিতেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট পড়িতে আসিত। অভ্যাস অনুযায়ী একদিন সে পড়িতে আসিয়া দেখিতে পাইল, ওস্তাদ ছাহেবের চেহারায় দুর্বলতার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, আজ ওস্তাদজীর বাড়ীতে খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। অবশেষে সে আজ পড়িবে না বলিয়া ওস্তাদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং খাদ্য-সামগ্রী পাকাইয়া ওস্তাদের সমীপে নিয়া হাযির করিল। ওস্তাদ বলিলেনঃ খাদ্য-দ্রব্য অবশ্য ঠিক প্রয়োজনের সময়েই আসিয়াছে; কিন্তু একটি শরীঅতগত কারণ ইহা গ্রহণের পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা এই যে, তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই আমার মনে ধারণা হইয়াছিল, তুমি আমার জন্য খাদ্য আনিতেই যাইতেছ। সুতরাং এই খাদ্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষার পরে আসিয়াছে সুতরাং ইহা গ্রহণ করা হাদীস-বিরোধী। সেই শাগরেদও বেশ শিষ্টাচারী ছিল, বাড়াবাড়ি করিল না। তৎক্ষণাৎ বারকোশ লইয়া চলিয়া গেল। কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলঃ হযরত! এখন তো আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতীক্ষা থাকে নাই। কেননা, আমি চলিয়া গেলে নিশ্চয়ই আপনার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, খাদ্য-দ্রব্য চলিয়া গিয়াছে। অতএব, তজ্জন্য আকাঙ্ক্ষা বা প্রতীক্ষা ছিল না। কাজেই এখন অনুগ্রহপূর্বক ইহা কবূল করুন। তখন তিনি উক্ত খাদ্য কবূল করিলেন।

সোব্‌হানাল্লাহ্! অন্তরে মহব্বত থাকিলে খেদমতের নিয়ম আপনাআপনিই বুঝে আসিয়া যায়। যেমন, কোন কবি বলিয়াছেনঃ

شوق در هر دل که باشد رهبرے درکار نیست

“অন্তরে মহব্বত থাকিলে পথপ্রদর্শকের আবশ্যক হয় না।” পক্ষান্তরে আজকাল কোন পীর মুরীদের হাদিয়া গ্রহণ না করিলে মুরীদ তবুও তাঁহাকে অস্থির করিয়া তোলে।

হাদিয়ার নিয়মাবলীঃ হাদিয়া প্রদানের আর একটি নিয়ম এই যে, ইহাতে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যের মিশ্রণ যেন না হয়। কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে—হাদিয়া প্রদান করিয়া পরে তাবিয লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে। এই শ্রেণীর হাদিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়া উচিত।

হাদীসে বর্ণিত আছেঃ এক ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-কে একটি উট হাদিয়াস্বরূপ দান করিলে তিনি তদ্‌বিনিময়ে তাহাকে কয়েকটি উট দান করিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি ইহাতে সম্মত হয় নাই। ফলে হুযূর (দঃ) খুবই দুঃখিত হইলেন এবং তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেনঃ ‘অমুক অমুক বংশ ব্যতীত কাহারও হাদিয়া গ্রহণ করিব না।’

কারণ এই যে, সে ব্যক্তি পার্থিব উদ্দেশে উক্ত হাদিয়া দিয়াছিল। এই হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ লোক হইতে প্রথম সাক্ষাতে হাদিয়া কবূল করা উচিত নহে। কেননা, প্রথম সাক্ষাতে বুঝা যায় না যে, হাদিয়া প্রদানকারীর নিয়ত কি? এই কারণে আমি এই প্রথা নির্ধারণ করিয়া লইয়াছি যে, নবাগত কাহারও নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করি না। অবশ্য সঠিক লক্ষণে যদি নিঃস্বার্থতা বুঝা যায়, তবে নবাগত ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণেও ক্ষতি নাই। প্রথার পূজারী লোকেরা হাদিয়া প্রদানের কারণ এই আবিষ্কার করিয়াছে যে, পীরের নিকট খালি হাতে গেলে খালি হাতেই ফিরিয়া আসিতে হয়। এ সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্যও প্রচলিত রহিয়াছেঃ “খালি গেলে খালি আসিতে হয়।” এই কারণে যাওয়ামাত্রই পীর ছাহেবের মুষ্টি গরম করিয়া দাও। একটি মূলের উপর ভিত্তি করিয়াই এই মুষ্টি গরম কথাটি প্রচলিত হইয়াছে। তাহা এই যে, পীরযাদাগণ নিজেদের এই রহস্য গোপন রাখার জন্য মুরীদদিগকে তা’লীম দিয়াছেন যে, ‘মুছাফাহা’ করার ভিতরে যেন হাদিয়া প্রদান করা হয়, তাহাতে অপর লোক জানিতে পারিবে না।

বন্ধুগণ! প্রথমত, মুছাফাহা একটি স্বতন্ত্র এবাদত। ইহার সহিত দুনিয়া মিশ্রিত করার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়ত, প্রথম ব্যক্তির ন্যায় আরও মানুষ আসিয়াও তো পীর ছাহেবের সহিত মুছাফাহা করিবে। তখন এই ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে যে, পীর ছাহেবকে হাদিয়া প্রদান করা হইয়াছে, তবে গোপন রহিল কোথায়? আর যদি অন্যান্য লোককে মুছাফাহা করিতে নিষেধ করা হয়, তবে তো মুছাফাহা করার মধ্যে কারণ আছে বলিয়া এমনিতেই সন্দেহ হইবে। কেননা, কোন কোন সাবধানতা অসাবধানতার কারণ হইয়া পড়ে।

কথিত আছে, এক ব্যক্তির বিবাহ স্থির হইয়াছিল। সে বিবাহ বাড়ীতে বর সাজিয়া যাওয়ার জন্য অপর এক ব্যক্তির আলোয়ান ধার লইল। বরযাত্রীরা বিবাহআসরে উপস্থিত হইলে লোকে বর দেখিবার জন্য আসিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলঃ বর কে? আলোয়ানের মালিক বরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলঃ বর তো এই ব্যক্তি, কিন্তু আলোয়ানখানা আমার। বর বলিলঃ বন্ধু, তুমিও আশ্চর্য মানুষ! ইহা প্রকাশ করার কি প্রয়োজন ছিল? সে বলিলঃ আর এরূপ বলিব না।

একটু পরেই আর একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেনঃ বর ইনি, কিন্তু আলোয়ান আমার নহে। ইহাতে বর আরও রাগান্বিত হইয়া বলিলঃ খোদার বান্দা। আলোয়ানের উল্লেখ করারই তোমার কি দরকার ছিল? সে বলিলঃ আর এরূপ করিব না। একটু পরে আর একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিলঃ বর এই ব্যক্তি, আলোয়ানের কোন উল্লেখ করিব না। অবশেষে বর রাগান্বিত হইয়া আলোয়ান তাহার মাথার উপর ছুঁড়িয়া মারিল। অতএব, যেমন এই ব্যক্তির উক্তি—"আলোয়ান আমার নহে, কিংবা আলোয়ানের কোন উল্লেখ করিব না" বাহ্যত সাবধানতা ছিল, কিন্তু পরিণামের দিক দিয়া ইহা পূর্ণ অসাবধানতা ছিল। এইরূপে একজনের সঙ্গে মুছাফাহা করিয়া সাবধানতার জন্য অপরের সহিত মুছাফাহা না করাতে হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারটা প্রকাশই যখন হইয়া পড়িল, তখন আর গোপনীয়তা কোথায় রহিল? এতদ্ভিন্ন অপরের সঙ্গেও যখন মুছাফাহা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন মুরীদের মনে এই ভয়ও হওয়া উচিত—যদি কেহ পীরের হাত হইতে আমার দেওয়া হাদিয়া মুছাফাহা করার কালে লইয়া পলায়ন করে, তবে তিনি কি করিতে পারিবেন? কেননা, গোপনে লেনদেন হইয়াছে। কাজেই আমার হাতে কিছু ছিল বলিয়া কোন প্রমাণই তো আমার নিকট নাই। যদি বলেন যে, পীর ছাহেব অপরের সহিত মুছাফাহা করার পূর্বে পূর্ব মুছাফাহায় গৃহীত টাকা পকেটে রাখিবেন, তাহাতে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। আমি বলি, ইহাতে মুছাফাহায় আদান-প্রদানের উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইবে। কেননা, পকেটে রাখিতে গেলেই তো গোমর ফাঁক হইয়া যাইবে। আমার এই মন্তব্য ভুল হইলে ঐ ভুল ধরিয়া দেওয়া হউক।

মোটকথা, কেহ কেহ তালীম দিয়া থাকেন, পীরের কাছে যাইতে অবশ্যই কিছু সঙ্গে লইয়া যাইও। অন্যথায় 'যে খালি যায়, সে খালিই আসে।' এই প্রবাদ বাক্যটি অবশ্য সত্য; কিন্তু মানুষ ইহার অর্থ ভুল বুঝিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি এখলাস হইতে খালি হইয়া পীরের নিকট যাইবে, সে পীরের নিকট হইতে খালিই ফিরিবে। পীরকে টাকা দিলেও কোন ফল হইবে না। অর্থাৎ, এখলাস বা খাঁটি নিয়ত না থাকিলে পীরের ফয়েয হইতেও শূন্য থাকিবে। আবার টাকা দিলে পকেটও খালি হইল।

হাদিয়া সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। অনেক সময়ে হাদিয়ার পরিমাণ এত অধিক হয় যে, তাহা গ্রহণ করা মুশ্‌কিল হইয়া পড়ে। যেমন, কোন ব্যক্তি দশ টাকা পেশ করিল, অনেক সময়ে কোন কারণে ইহা গ্রহণ করা স্বভাবের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এ সম্বন্ধে আমি বহুদিন যাবত চিন্তা করিতেছিলাম যে, উহা প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিলে শরীঅত বিধানের অধীন ইহাকে দাখিল করিয়া লইতে হয়। الحمد لله ইহাও হাদীস হইতে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ لَايُرَدُّ الطِّيْبُ فَاِنَّهٗ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ —যাহা স্বভাবের নিকট কঠিন বোধ হয় না, তাহা গ্রহণ করা সহজ। এই হাদীসে হুযূর (দঃ) হাদিয়া প্রত্যাখ্যান না করার যেই কারণ বলিয়াছেন ইহাতে বুঝা যায়, যেখানে এই কারণ না পাওয়া যায়; বরং স্বভাবের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা মুশ্‌কিল বোধহয়, তেমন হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করা জায়েয। আমি ইহার একটি আনুমানিক পরিমাণ স্থির করিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি হইতে তাহার এক দিনের আয়ের অধিক হাদিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। আর একদিনের আয়ের সমপরিমাণ হাদিয়া একবার গ্রহণ করা হইলে পুনরায় এক মাস অতীত হওয়ার পূর্বে তাহার হাদিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। কোন ব্যক্তির মাসিক বেতন ৩০ (ত্রিশ টাকা) হইলে তাহা হইতে মাসিক শুধু এক টাকা হাদিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যদি বলেন, কেহ স্বাভাবিক উৎসাহে তদপেক্ষা অধিক দান করিলে তাহা গ্রহণে ক্ষতি কি? মনে করুন, যেই উত্তেজনায় সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য থাকে না তাহা উৎসাহ নহে, পাগলামি, ইহার সংশোধন ওয়াজেব। এস্থলে হাদিয়া, ছদ্‌কা ইত্যাদি আর্থিক এবাদত সম্পর্কিত আরও একটি বিষয় জানিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা এই যে, হাদিয়া, ছদ্‌কা, চাঁদা, করযে হাসানা প্রভৃতি যাহাকিছু লেনদেনের নিয়ম রহিয়াছে, কোনটিই হারাম মালের দ্বারা না হওয়া চাই। কেহ হারাম মাল হইতে দান করিতে চাহিলে পরিষ্কার নিষেধ করিয়া দিতে হইবে। যাহাকিছু বর্ণনা করিলাম, তাহা হাদিয়া সংক্রান্ত কথা ছিল।

চাঁদা আদায় করার শর্তসমূহঃ যে সমস্ত বিষয়ে অসাবধানতা অবলম্বন করা হয় তন্মধ্যে আর একটি বিষয় চাঁদা। ইহাতে প্রথম কর্তব্য—কাহারও নিকট হইতে সাধ্যের অতিরিক্ত চাঁদা গ্রহণ না করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন ব্যক্তি হইতে তাহার সাধ্যের অধিক দান গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য যাঁহাদের তাওয়াক্কুলের শক্তি সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁহাদের সাধ্যের অতিরিক্ত দানও গ্রহণ করিতেন; যেমন, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দান। হুযূর (দঃ) তাঁহার সম্পূর্ণ পুঁজিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর একটি শর্ত এই যে, চাঁদাদাতার মনে কষ্ট বা অসন্তোষ আসে এমন পন্থায় তাহা হইতে চাঁদা আদায় করিবে না। কেননা, হাদীসে আসিয়াছে— لَايَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِهٖ “কোন ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে দান না করিলে তাহার দান গ্রহণ করা হালাল নহে।”

আর একটি শর্ত এই যে, চাঁদা গ্রহণকারী যেন লোকচক্ষে হীন বা হেয় না হয়। কেননা, চাঁদা গ্রহণের কোন কোন পন্থা এমনও আছে যে, তাহাতে দাতার পক্ষে অবশ্য কষ্টকর হয় না, কিন্তু লোকের দৃষ্টিতে গ্রহণকারী হেয় হইয়া যায়। হাদীস শরীফে এই কারণেই সওয়াল করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং যেখানে দাতার পক্ষেও কষ্টকর না হয় এবং গ্রহণকারীকেও লোকচক্ষে হেয় হইতে না হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনের সময় চাঁদা চাওয়া জায়েয। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ “চাহিবার প্রয়োজন হইলে আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের নিকট চাও।” আমরা যাহারা আল্লাহ্ওয়ালা হওয়ার দাবীদার, এই হাদীসটি শ্রবণ করিয়া খুবই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িব। খোদা মঙ্গল করুন, এখন প্রার্থীরা আসিয়া ভিড় করিবে। হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, “অথবা রাজা-বাদ্‌শাহ্‌দের নিকট চাহিও।”

সারকথা এই যে, “আল্লাহ্ওয়ালাদের নিকট চাহিও কিংবা খুব বড় ধনবান লোকের নিকট চাহিও।” ইহার রহস্য এই যে, সওয়াল করা হারাম হওয়ার দুইটি কারণ। একটি প্রার্থীর হীন হওয়া, দ্বিতীয়টি প্রার্থিত ব্যক্তির পক্ষে কষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা। এই দুইটি কারণ একত্রে সমাবিষ্ট হইলে সওয়াল করা তো হারাম হইবেই; ইহাদের যেকোন একটি কারণ পাওয়া গেলেও তথায় সওয়াল করা নিষিদ্ধ। বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করিলে তাহার পক্ষে দান করা কষ্টকর হইবে না। কেননা, যাঁহার নিকট কোটি কোটি টাকা রহিয়াছে, দশ-পাঁচ টাকা দান করা তাঁহার পক্ষে কিসের কষ্ট? প্রার্থীকেও হীন হইতে হইবে না। কেননা, বাদশাহ্‌র মর্যাদা এত অধিক যে, প্রার্থী তাঁহার দৃষ্টিতে সম্মানিতই কখন ছিল, যাহাতে আজ প্রার্থনার ফলে হীন হইয়া যাইবে? আর আল্লাহ্ওয়ালা লোকের নিকট প্রার্থনা করার নির্দেশও এই জন্যই হইয়াছে যে, বুযুর্গ লোকেরা নিজদিগকে সর্বাপেক্ষা ছোট মনে করিয়া থাকেন, কাজেই কেহ তাহাদের নিকট কিছু চাহিলে প্রার্থী তাঁহাদের দৃষ্টিতে হীন হওয়ার আশঙ্কা নাই। আবার তাঁহাদের অন্তরে দয়া অধিক। সকলের প্রতি তাঁহাদের

দয়া অবারিত। কাজেই তাঁহারা কাহাকেও হীন মনে করিবেন কেন? আর দান করা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর এই জন্য নহে যে, তাঁহারা সকল ব্যাপারেই স্বাধীন। না দিতে হইলে স্বাধীনভাবেই নিষেধ করিয়া দিবেন। কাহারও নিকট তাঁহারা দমিবেন কেন? কাজেই মনঃকষ্ট তাঁহাদের কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। তাঁহাদের সরলতা ও স্বাধীনতার অবস্থা নিম্নোক্ত বয়েতগুলি হইতে বুঝিতে পারিবেন ঃ

دل فریباں نباتی همه زیور بستند   دل بر ماست که با حسن خدا داد او آمد
زیر بارند درختاں که ثمرها دارند   اے خوشا سرو که از بند غم آزاد آمد

“সমস্ত উদ্ভিদ ফল ও ফুলের অলঙ্কারে সুসজ্জিত। কিন্তু আমার প্রিয়জন খোদাদত্ত সৌন্দর্যের অধিকারী। তাঁহার অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই। সমস্ত বৃক্ষরাজি ফলের ভারে অবনত। কিন্তু ‘বেদ’ বৃক্ষ এই চিন্তার বেড়ি হইতে মুক্ত।” আর এক কবি তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ

گر دوصد زنجیر آری بگسلم - غیر زلف آں نگارے دلبرم

“আমার মা’শুকের চুলের রশি ব্যতীত যদি দুই শত শিকলও আন, আমি সহজেই ছিঁড়িয়া ফেলিব।” অর্থাৎ, খোদার নির্দেশ বা বিধানের বেড়ি ব্যতীত অপর কোন বেড়িই তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে না। দুনিয়াতে মান-সম্মানের বেড়িই কঠিন শৃঙ্খল। তাহা তো তাঁহারা নির্মূলই করিয়া দিয়াছেন। ইহার পন্থা নিম্নোক্ত বয়েত হইতে বুঝিয়া লউন ঃ

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما   اے طبیب جمله علتهائے ما
اے دوائے نخوت وناموس ما   اے تو افلاطون جالینوس ما

“হে আমার শুভ লক্ষণ প্রেম! তুমিই আমার সর্ববিধ রোগের চিকিৎসক, তুমি গর্ব-অহঙ্কারের ঔষধ, তুমিই আমার আফ্‌লাতুন, তুমিই আমার জালীনূস্‌।” আর এক করি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

هرکرا جامه ز عشق چاك شد - او ز حرص وعیب کلی پاك شد

“এশ্‌কের উন্মাদনা যাহার পোশাক ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে, সে লালসা ও কামনারূপ দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছে।” ইহাতে তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ হয় ঃ

ساقیا برخیز در ده جام را   خاك بر سر کن غم ایام را
گرچه بد نامی ست نزد عاقلاں   ما نمی خواهیم ننگ ونام را

“সাকী! যমানার চিন্তার মাথায় ধূলি নিক্ষেপ কর। উঠ এবং আমাকে শরাব ও পেয়ালা দান কর। জ্ঞানীদের নিকট যদিও ইহা দুর্নামের কারণ; কিন্তু আমি সুনাম ও সম্মান চাই না।”

মোটকথা, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁহাদের উপর কোন কিছুর প্রভাব পড়িতে পারে না। এই কারণেই কেবল আল্লাহ্‌ওয়ালা এবং বাদ্‌শাহ্‌দের নিকট সওয়াল করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যখন সওয়াল নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ জানা গিয়াছে, তখন যদি ইঁহাদের মধ্যেও কোন সময় উক্ত কারণ পাওয়া যায়, তবে তাঁহাদের নিকট সওয়াল করাও জায়েয নহে। আর এই কারণেই আমিও চাঁদা আদান-প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। অন্যথায় সকল অবস্থায় নিষেধ করা

উদ্দেশ্য ছিল না। ইহাও বুঝিয়া লউন, ধর্ম সকল সময়ই মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে আলেমের সম্মানে ধর্মের সম্মান বুঝা যায়। যদি আলেমগণ সাধারণের দৃষ্টিতে হেয় হইয়া পড়েন, তবে মনে করিবেন যে, ধর্মও লোকের নিকট হেয় হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে ধর্ম যে লোকের নজরে হেয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহার কারণ শুধু আমরাই এবং অভাবগ্রস্তের আকারে আমাদের সমাজের মুখাপেক্ষী হওয়া। যদি মানুষ আমাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বয়ং ধর্মীয় শিক্ষাকে হীনতার কারণ বলিয়া মনে করে, তবে আমরাই এই হীন মনে করার কারণ হইলাম। পক্ষান্তরে এই মুখাপেক্ষিতা আমাদিগকেও এমন অবস্থায় পৌঁছাইয়াছেঃ

آنکـه شیـــراں را کنـد روبـه مزاج   احتیاج است احتیاج است احتیاج

"অভাব ব্যাঘ্রকে শৃগালে পরিণত করে।" কিন্তু কেহ কেহ এমন সাহসীও আছেন যে, অভাব সত্ত্বেও কাহারও নিকট ছোট হওয়া পছন্দ করেন না। ইরানের এক শাহযাদা কোন কারণে ভবঘুরে হইয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় জনৈক আমীর লোক মুসাফিররূপে বাস করিতেছিলেন। শাহ্যাদা তাঁহাকে দাওয়াত করিলেন। অপর এক সময়ে শাহ্যাদা সফরের অবস্থায় অস্থির হইয়া ঘটনাক্রমে সেই আমীরের গৃহে যাইয়া পৌঁছিলেন। তিনি একটি জীর্ণ-শীর্ণ টাট্টু ঘোড়ার উপর আরূঢ় ছিলেন। আমীর লোকটি এই অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতির সুরে বলিলেনঃ

آنکہ شیراں راکند روبه مزاج ۔ احتیاج است احتیاج است احتیاج

শাহ্যাদা ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেনঃ

شیر نرکے می شود روبه مزاج ۔ میزند برکفش خود صد احتیاج

"পুরুষ সিংহ শৃগাল স্বভাব কেমন করিয়া হইতে পারে? শত অভাব হইলেও সে তাহা পাদুকার উপর ছুড়িয়া মারে।" আরও বলিলেনঃ তুমি আমাকে দারিদ্র্যের কারণে হীন মনে করিতেছ? এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

যাহারা সমাজে বরেণ্য বলিয়া পরিচিত, তাহাদের একান্ত প্রয়োজন সাধারণের দৃষ্টিতে হেয় না হওয়া। অভাবশূন্যতা হইতে ইহা লাভ হয়। অবশ্য চাঁদার প্রয়োজন হইলে সর্বসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করায় ক্ষতি নাই। ব্যক্তিগতভাবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট যাজ্ঞা করাতে যদি মনে বিশ্বাস হয় যে, আমিও হেয় হইব না এবং যাচ্যমানের পক্ষেও কষ্টকর হইবে না, তখন জায়েয হইবে। আর যদি ইহার কোন একটিরও সম্ভাবনা থাকে, তবে জায়েয হইবে না। আর আমি যে চাঁদা আদায়ে নিষেধ করিয়া থাকি, তাহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট চাঁদা চাহিয়া নিজে হেয় হওয়া কিংবা তাহার মনে কষ্ট দেওয়ার অবস্থায়। এ সম্বন্ধে আমার যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ইহা তাহারই বিশ্লেষণ।

তবে আমল করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, চাঁদার জন্য সর্বসাধারণের নিকট ব্যাপক আবেদনে বাধা দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাহারও নিকট উপরোক্ত দুই অবস্থায় চাঁদা চাওয়া পরিত্যাগ করা উচিত। এখন আমি সর্বসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি। আল্হাম্দুলিল্লাহ্, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। ইহা সওয়ালও নহে; বরং ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করা।

শরীঅতানুগ চাঁদার প্রতি উৎসাহ প্রদানঃ এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে যথেষ্ট মীমাংসা রহিয়াছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

إِنْ يَّسْأَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ

“যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিকট মাল চান এবং পীড়াপীড়ি করিয়া চান, তবে তোমরা কার্পণ্য করিতে আরম্ভ করিবে। আর তিনি তোমাদের বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।” সম্মুখের দিকে আরও বলিতেছেনঃ

هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاۤءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ج فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ج وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط وَاللهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَايَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ ○

দেখুন, একদিকে সওয়াল করিতে নিষেধ করিতেছেন। অপর দিকে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার এবং ব্যাপকভাবে তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদানকে অনুমোদন করিতেছেন। আবার সওয়াল করার পর কার্পণ্য করিলে তাহার বিশেষ নিন্দাবাদও করিতেছেন না; বরং তাহাতে এক প্রকার মা'যুর বা অক্ষম মনে করা হইতেছে। যেমন فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا বাক্যে গভীর চিন্তা করিলে বুঝা যায়। আবার দান করার প্রতি আহ্বান করিলে কার্পণ্য প্রকাশের নিন্দা করিয়া বলিতেছেনঃ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন পরোয়া নাই। কেননা, اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ অর্থাৎ, যদি তোমরা দান করিতে অস্বীকৃত হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের স্থানে অপর জাতি সৃষ্টি করিবেন। তাহারা তোমাদের ন্যায় কৃপণ এবং পশ্চাদপসরণকারী হইবে না। সকল বিষয়ে তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হইবে। দেখুন, উৎসাহ প্রদান করিয়া আবার কৃপণতার জন্য কেমন ধমক প্রদান করিলেন, কেবল তোমাদের টানেই গাড়ী চলে না। আরও সহস্র সহস্র খেদমতগার বিদ্যমান আছেঃ

منت منه که خدمت سلطان همی کنی ـ منت شناس ازو که بخدمت بداشتت

“বাদশাহের সেবা করিতেছ বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিতেছ; বরং তিনি যে তোমাকে খেদমতের সুযোগ দিয়াছেন ইহাকেই তোমার প্রতি অনুগ্রহ মনে কর যে, আমার দ্বারা এমন মহৎ কাজ করাইয়া লইয়াছেন।” অতএব, খোদারই অনুগ্রহ আমাদের প্রতি রহিয়াছে। ফলকথা, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে, সওয়াল করা স্বতন্ত্র ব্যাপার। অর্থাৎ, যাহাতে যাচ্যমান ব্যক্তির উপর চাপ দেওয়া হয়। চাপ দেওয়া দুই প্রকার। বাহ্যিক চাপ প্রয়োগ আর অজ্ঞাতসারে বা প্রকারান্তরে চাপ প্রদান। যেমন, মর্যাদার প্রভাবে আদায় করা। ইহাও চাপ প্রয়োগেরই প্রকারবিশেষ। মোটকথা, যাহাতে যাচ্যমান ব্যক্তির মনে ব্যথা দেওয়া হয় তাহাই চাপ প্রদান করা। এমতাবস্থায় কার্পণ্য করা বিচিত্র নহে। আর এক প্রকার চাঁদা আদায় করা হয় উৎসাহ প্রদান করিয়া। তদবস্থায় যাচ্যমান ব্যক্তি কার্পণ্য করিলে তাহা নিন্দনীয়। আমি মনে করি, শরীঅত বিগর্হিত যত উপায়ে চাঁদা আদায় করা হয়—তাহা সওয়ালের অন্তর্গত। আর শরীঅতসম্মত উপায়ে যাহা আদায় করা হয়, তাহা তরগীব (উৎসাহ)-এর অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মানুরাগের দৃষ্টান্তঃ সারকথা, আমি আপনাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছি; কিন্তু এই উৎসাহ প্রদান সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু এ মুহূর্তে খুব একটা আমার স্মরণ নাই। হাঁ, কেবল এই আয়াতটি মনে পড়িয়াছেঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

“যাহারা নিজেদের মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্য-বীজের ন্যায়, যাহা হইতে সাতটি ছড়া উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেক ছড়ায় একশতটি বীজ থাকে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন—ইহার অধিক দান করেন। আল্লাহ্‌র দান খুব প্রশস্ত এবং তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।” এস্থলে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার রাস্তায় ব্যয় করার হুকুমই বর্ণনা করিয়াছেন। এই তৃতীয় পারার এক-চতুর্থাংশ দানেরই ফযীলত সম্বন্ধীয় বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহাতে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা অতি বড় প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু আফ্‌সোস! আমাদের অবস্থা এইরূপঃ

گر جاں طلبی مضائقه نیست ـ گر زر طلبی سخن دریں ست

“প্রাণ চাও ক্ষতি নাই, যদি টাকা-পয়সা চাও তাহাতে কথা আছে।” আমাদের মনে ধর্মের প্রতি যে অনুরাগ আছে—ইহার সারমর্ম তাহাই যাহা মাওলানা রূমী (রঃ) মস্‌নবীতে বলিয়াছেন। এক মুসাফির ব্যক্তি পথ চলাকালে দেখিতে পাইল, একটি কুকুর মুমূর্ষু অবস্থায় শ্বাস টানিতেছে এবং একটি লোক উহার নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছে। মুসাফির তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিলঃ “এই কুকুরটি আমার অতিশয় প্রিয় বন্ধু ছিল। আজ সে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। আমি সেই দুঃখে ক্রন্দন করিতেছি।” পথিক জিজ্ঞাসা করিলঃ “ইহার রোগ কি?” বলিলঃ “শুধু ক্ষুধার জ্বালা।” এই ঘটনা শুনিয়া মুসাফিরের সেই লোকটির এবং কুকুরটির অবস্থার প্রতি দয়া হইল। নিকটেই একটি ভর্তি থলিয়া দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ “ইহাতে কি?” সে বলিলঃ “রুটি ভর্তি রহিয়াছে।” পথিক বলিলঃ “যালেম! কুকুরের মৃত্যুর জন্য কাঁদিতেছ; অথচ এতটুকু করিতে পার না যে, থলিয়া হইতে একটি রুটি বাহির করিয়া উহাকে খাইতে দাও।” সে বলিতে লাগিলঃ “জনাব! উহার সহিত আমার এই পরিমাণ বন্ধুত্ব নহে যে, তাহার জন্য রুটিও খরচ করিতে আরম্ভ করিব। রুটির মূল্য দিতে হইয়াছে, কিন্তু অশ্রুবিন্দু বিনা পয়সার!”

অনুরূপ আরও একটি কাহিনী আছে। এক ব্যক্তির পুত্র পীড়িত হইল, কেহ কোরআন শরীফ খতম করাইবার পরামর্শ দিল। অপর এক ব্যক্তি কিছু দান-খয়রাত করার পরামর্শ দিল। সে কোরআন শরীফ পড়াইল, কিন্তু খয়রাতের এক পয়সাও দিল না। এইরূপে আমরা মহব্বতের দাবী অবশ্য করিয়া থাকি, কিন্তু পয়সা ব্যয় করার প্রয়োজন হইলে মহব্বত উঠিয়া যায়।

আর আমি যে এখন আপনাদিগকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ দিতেছি, ইহার অর্থ এই নহে যে, আপনাদিগকে দান করিতেই হইবে। কেননা, ধর্মের কাজ ইনশাআল্লাহ্ আপনারা না দিলেও অবশ্যই চলিয়া যাইবে। আপনাদের তাহা জানা আবশ্যক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দানের ক্ষেত্রও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু তাহা বলার পূর্বে প্রকাশ করিয়া দিতেছি যে, আমি যাহাকিছু বলিলাম, কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বলি নাই। সম্মুখেও যাহা বলিব, কাহারও অনুরোধে বলিব না। হাঁ, আমি জানি না,

কোন কামেল লোক আধ্যাত্মিক প্রভাবে আমার অন্তরে এই দান-খয়রাতের কথা জাগাইয়া দিয়াছেন কিনা। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত একথাও অস্বীকার করিতেছি। কেননা, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্! আমাদের বুযুর্গানের মধ্যে এরূপ কেহ নাই যিনি এরূপ আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রয়োগে কাজ উদ্ধার করিবেন। বিশেষত যেখানে তাঁহাদের মরজীর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, খোদা তা'আলা মনে জাগাইয়া দিয়াছেন এবং আমি বর্ণনা করিয়াছি।

যাহাহউক, দান-খয়রাতের ক্ষেত্র সম্বন্ধে মীমাংসা এই যে, সমাজের হিতকর সমিতি, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রভৃতি সবগুলিই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন যাহার প্রয়োজন অধিক দেখা যায়, সেদিকেই অধিক লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমার বিবেচনায় বর্তমানে মাযাহারে উলূম মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। পরিমাণেও, রকমেও; বরং সকলে উহার প্রয়োজন স্বচক্ষে দর্শন করুন। সকলে দর্শন করিলেই ইন্‌শাআল্লাহ্ বরকত হইবে।

ছাত্রাবাসের ফযীলতঃ দ্বীনী এল্‌ম অন্বেষণকারীদের ছাত্রাবাস সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছেঃ اَوْبَيْتًا لِّاَبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ 'মুসাফিরের জন্য কোন ঘর নির্মাণ করা' যদিও সেই মুসাফির গুনাহ্‌গার ফাসেক হয়, তবুও অবশ্য নির্মাণকারীর সওয়াব হইবে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, যেই মুসাফির দ্বীনী এল্‌মের তালেব (অন্বেষণকারী), যাঁহারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মেহ্‌মান, তাঁহাদের জন্য ঘর নির্মাণ করিলে কি পরিমাণ সওয়াব হইবে? আবার এমনও নহে যে, তাহারা উক্ত গৃহে নীরবে শুইয়া-বসিয়া থাকিবেন; বরং সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র কালাম এবং রাসূলের হাদীস শরীফ পাঠ করিতে থাকিবেন। যাহার সমতুল্য দুনিয়াতে কোন কাজই নাই। হাদীস শরীফে আছেঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنٌ وَّمَا فِيْهَا مَلْعُوْنٌ اِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ اَوْ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ ○

"দুনিয়া এবং ইহার মধ্যস্থিত সবকিছুই অভিশপ্ত—আল্লাহ্‌র যেকের এবং ইহার দোস্তদার কিংবা আলেম এবং তালেবে এলম ব্যতীত।"

দ্বীনী এল্‌ম আল্লাহ্‌র যেকেরও বটে; ইহাতে আলেম, তালেবে-এল্‌মও এবং আল্লাহ্‌র ধর্ম ও যেকেরের দোস্তদারগণও একত্রিত রহিয়াছেন।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র যেকের, উহার দোস্তদারগণ, আলেম এবং তালেবে-এলমগণ লা'নত হইতে বাদ রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দুনিয়ার আর সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হইতে দূরে পতিত হওয়ার কারণ। ইহাতে কোন কোন খাঁটি বান্দা নিজের দুনিয়াবী সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে চিন্তিত হইতে পারিতেন; কিন্তু হুযূর (দঃ) ইহার কেমন সুন্দর সমাধান করিয়া দিয়াছেন! যেন একটি পবিত্র স্পর্শমণি। অর্থাৎ, মানুষ যদি দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জামকে খোদার যেকের, দ্বীনী এলমের সাহায্য ও ভালবাসার কাজে লাগাইয়া দেয়, তবে সবকিছুই নৈকট্যের কারণ হইয়া যাইবে এবং এবাদতে গণ্য হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক স্পর্শমণি আর কি হইবে? লা'নত এবং দূরত্বের কারণকে নৈকট্য ও এবাদতের উপকরণে পরিণত করিয়া দিলেন, তাহাও আবার সামান্য একটু আঁচ দ্বারা। মাওলানা এই বিষয়টিই বলিতেছেনঃ

عین آں تخییل را حکمت کند ـ عین آں زهر آب را شربت کند

"মহব্বত কল্পনাকে জ্ঞানে এবং বিষাক্ত পানীয়কে শরবতে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।"

آں گماں انگیز را سازد یقین ـ مهرها رویاند از اسباب کین

"ইহার বদৌলত ধারণা বিশ্বাসের অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শত্রুতা মিত্রতায় পরিবর্তিত হয়।"

ছদ্‌কায়ে জারিয়ার ফযীলত্ঃ এই ভাবিয়া মানুষের গর্বিত হওয়া উচিত নহে যে, আমরা তো এই সমস্ত কার্যে দান করিয়া থাকি। এইমাত্র মাদ্রাসায় দান করিলাম। অতএব, আমরা সর্বপ্রথম দাতা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছি। তাঁহারা যাহাকিছু দান করিয়াছেন, আমার উৎসাহ প্রদানে দান করেন নাই। উৎসাহ প্রদানে দান করিয়াছেন বলিয়া তখনই বুঝা যাইবে, যাঁহারা মাদ্রাসায় ইতিপূর্বে কিছু দান করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই পরিমাণ এখন দারুত তোলাবায়ও দান করেন। যাঁহারা এখন পর্যন্ত কিছু দান করেন নাই, তাঁহারাও যখন ইচ্ছা হয় দান করেন। আর যাঁহারা সঙ্গে কিছু আনেন নাই, তাঁহারা ওয়াদা করেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ওয়াদা যেন শুধু মৌখিক না হয় ; বরং পূর্ণও করেন। কেহ বেশী বা কমের চিন্তা করিবেন না। ইহা ছদকায়ে জারিয়া। যাহাকিছু সাধ্য হয়, শরীক হওয়াকে গনীমত মনে করিবেন। ছদ্‌কায়ে জারিয়া এই যে, মানুষ মৃত্যুর পরে যখন সামান্য একটু নেকীর জন্য অস্থির থাকে এবং চিন্তা করিতে থাকে ; আহা ! যদি এখন কেহ অন্তত "সোব্‌হানাল্লাহ্" পড়িয়া ইহার সওয়াব আমাকে দান করিত। বড় বড় ওলীআল্লাহ্‌গণও এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন ওলী পরলোকে বলেনঃ

اے که بر ما می روی دامن کشاں – از سر اخلاص الحمد مے بخواں

"ওহে ! যাহারা আমার কবরের নিকট দিয়া সানন্দে চলিয়া যাইতেছ, খাঁটি মনে অন্তত একবার 'আল্‌হাম্‌দু' পড়িয়া যাও।" অর্থাৎ, আর কিছু না হইলেও অন্তত একবার 'আল্‌হামদু' পড়িয়া সওয়াব বখশাইয়া যাও। আজ যেই 'আল্‌হামদু' আমরা সহস্রবার নিজে পড়িতে পারিতেছি, মৃত্যুর পরে তাহা পরের মুখে অন্তত একবার পড়িবার জন্য ব্যস্ত থাকিব। এই ছদ্‌কায়ে জারিয়া তখন কাজে আসিবে, যখন কিয়ামতের দিন আমল সম্মুখে ধরা হইবে এবং দেখিবে যে, আমার নিকট কোন নেকী নাই, তখন পাতা উল্টাইলে দেখিতে পাইবে—কোন স্থানে বোখারী শরীফের সওয়াব লিখিত রহিয়াছে, কোন স্থানে মুসলিম শরীফের সওয়াব লিখিত রহিয়াছে, কোথাও বা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সওয়াব লেখা দেখা যাইতেছে ইত্যাদি।

বন্ধুগণ ! আজ হইতে সহস্র বৎসর পরে কিয়ামত আসিলে তখন পর্যন্ত এখানে কিংবা এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ওলামাদের মধ্যে যতবার বোখারী শরীফ খতম হইবে এবং যতবার মুসলিম শরীফ পড়ান হইবে, ততবারই দাতার রূহের উপর সওয়াব পৌঁছিতে থাকিবে এবং কিয়ামতে তাহার চরম অস্থিরতার সময়ে ইনশাআল্লাহ্ বলা হইবেঃ

جمادت چند دادم جاں خریدم – بحمد الله زهی ارزاں خریدم

তুমি দারুত্ তোলাবায় সাহায্য করিয়াছিলে, আজ উহারই বদৌলত তুমি এই রাশি রাশি সওয়াব লাভ করিতেছ। তখন আনন্দিত হইয়া অবস্থার ভাষায় বলিতে থাকিবেঃ

"ইট-পাথরের কয়েকটি খণ্ডের বিনিময়ে আমি প্রিয়জনের সন্তুষ্টি খরিদ করিয়াছি। সোব্‌হানাল্লাহ্ ! কেমন সস্তার সওদা খরিদ করিয়াছি !"

আর তখন বুঝিতে পারিবে, এক টাকা কিংবা দুই টাকা দান করার ফলে কত বড় মুনাফা করিয়াছ। বন্ধুগণ ! খোদা তা'আলার শোকর করা উচিত যে, এত বড় সম্পদ বিনামূল্যে হস্তগত হইতেছে। সম্ভবত কোন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক সন্দেহ করিতে পারেন, যখন এই স্থানে এই তা'লীমের কাজ কিংবা স্বয়ং এই স্থান থাকিবে না, তখন সওয়াব কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে ? প্রথমত, এমন ধারণা করাই অন্যায়। দ্বিতীয়ত, মনে রাখিবেন, নেক কাজের ধারা কখনও বন্ধ হয় না।

اگر گیتی سراسر باد گیرد ـ چراغ مقبلاں ہرگز نمیرد

“সমস্ত ভূমণ্ডল পুরাপুরি বায়ুতে পরিণত হইলেও আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের চেরাগ নিভে না।”

মোটকথা, নেক কাজের ধারা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। যদি মনে করা হয় যে, বন্ধ হইয়াই গেল, তবে এই নীতি নির্ধারিত রহিয়াছে যে, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ “কার্যের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হইয়া থাকে।” দাতাগণ সর্বদার জন্য ইহার সাহায্যকল্পেই দান করিয়া থাকেন। যদি ইহাই হয়, যতদিন পর্যন্ত এখানে শিক্ষাকার্য চলিয়াছে ততদিনই সওয়াব পাওয়া যাইবে। তবে অনন্ত বেহেশ্‌তের সুখ ভোগের অধিকার কেমন করিয়া থাকিবে? কেননা, পূর্ণ একশত বৎসরই যখন নেক কাজ করা হয় নাই, তখন একশত বৎসরের অধিককাল বেহেশ্‌তে কেমন করিয়া থাকিবে? অথচ বেহেশ্‌তীরা বেহেশ্‌তে অনন্তকাল অবস্থান করিবে বলিয়া প্রমাণিত রহিয়াছে। বস্তুত শুধু নিয়তের কারণেই অনন্তকাল অবস্থানের অধিকার পাওয়া যায়। কেননা, প্রত্যেক মুসলমানেরই নিয়ত এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকিলে এই ধর্মের উপরই স্থায়ী থাকিবে। এই কারণেই অনন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এস্থলেও নিয়তের বদৌলতই কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব পাওয়া যাইবে। অতএব, এরূপ সন্দেহ অমূলক। সারকথা এই যে, ধর্ম-কর্মের মধ্যে দৈহিক এবাদত এবং আর্থিক এবাদতে পার্থক্য করা ভুল। কেননা, আল্লাহ্ পাক বলেনঃ “আল্লাহ্ তোমাদের জান এবং মালকে খরিদ করিয়াছেন বেহেশ্‌তের বিনিময়ে।” কাজেই শুধু অর্থ দানকারীদেরও গর্বিত হওয়া উচিত নহে এবং শুধু পরিশ্রম সহকারে দৈহিক এবাদতকারীদেরও গর্বিত হওয়াও অনুচিত; বরং উভয়বিধ এবাদত একত্রিত হইলে বেহেশ্‌তে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যাইবে। অতএব, বন্ধুগণ! বেহেশ্‌ত এত সস্তা নহে। খুব অনুধাবন করুন। اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللهِ هِيَ الْجَنَّةُ “মনে রাখিবেন, আল্লাহ্‌র পণ্যদ্রব্য খুবই দুর্মূল্য। মনে রাখিবেন, আল্লাহ্‌র পণ্যদ্রব্য হইল বেহেশ্‌ত।”

এখন আমি তালেবে এল্‌ম্‌দের উদ্দেশে একটি কথা বলিতেছি—এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, জান্ খাটাইয়া পরিশ্রম করা তো নির্দিষ্ট কতিপয় কার্যে হইয়া থাকে। যেমন, যুদ্ধ করা। আলোচ্য আয়াতে সম্মুখের দিকে উল্লেখও রহিয়াছে يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ তবে পরিশ্রম সকল এবাদতে ব্যাপক কেমন করিয়া হইল?

ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা আরও একটু সম্মুখের দিকে বলিয়াছেনঃ اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الخ ○ এই আয়াতে উপরোক্ত সন্দেহের অপনোদনপূর্বক বলিতেছেন—এই সমুদয় কার্য নফ্‌সের শ্রমমূলক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, সম্মুখের দিকে আরও বলিতেছেনঃ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط এই اَلْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতের প্রথম ভাগের مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -এরই পুনরুক্তি। অতএব, এই কার্যগুলি উল্লেখের পর হুযূর (দঃ)-কে এই নির্দেশ দেওয়া “আপনি উপরোক্ত মুমেনদিগকে খোশখবরী দিন।”—প্রকাশ্যভাবেই বুঝাইতেছে যে, যেই জান-মাল খরিদের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এসমস্ত কার্যেই বটে; সুতরাং এসমস্ত কার্যই নফ্‌সের শ্রমমূলক কাজ। এই বর্ণনা হইতে আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সমগ্র শরীঅত শুধু দৈহিক এবং আর্থিক এবাদতের বিস্তারিত বিবরণ। অদ্য এই বিষয়টি বর্ণনা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দান করুন।

اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

সাহারানপুর জামে মসজিদ
২৭শে রবিউল আউয়াল, ১৩৩০ হিজরী

— ■ —

তায্‌কীরুল্‌ আখেরাহ্‌

[পরকালের আলোচনা]

◆

“কোরআন মজীদকে বিজ্ঞানের গ্রন্থ মনে করা, ইহাতে বিজ্ঞান এবং দর্শনের বিধানাবলী তালাশ করা, গ্রহ-নক্ষত্রাদির তথ্য অনুসন্ধান করা অবিকল সেইরূপ—যেমন ‘তিব্বে আকবর’ নামক চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থে জুতা সেলাইয়ের প্রণালী খুঁজিয়া দেখা।” —“কোরআন মজীদে তো কেবল আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং নফসের সংশোধন ব্যবস্থাই পাওয়া যাইবে, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সহিত ইহার কি সম্পর্ক?”

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ط

উপক্রমণিকা

আমি এখন যে বিষয়টি বর্ণনা করিতে মনস্থ করিয়াছি তাহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। মৌলবী শাব্বীর আহ্‌মদ ছাহেব পরকাল সম্বন্ধে যে ওয়ায করিয়াছেন—আমার অদ্যকার ওয়ায হইবে উহার পরিশিষ্টস্বরূপ। মৌলবী ছাহেব নিজের ওয়াযে আখেরাত সম্বন্ধীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি আখেরাত সম্বন্ধীয় আমলের বর্ণনা করিব। আমি এখন যে আয়াতটি পাঠ করিলাম, উহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভীতি প্রদর্শন ও ধমক প্রদান করিয়া বলিয়াছেনঃ ‘তোমরা যাহা নগদ তাহা পছন্দ কর। আর আখেরাতকে ছাড়িয়াই দিতেছ।’ ইহার সারমর্ম এই যে, যাহারা দুনিয়া গ্রহণ করিয়াছে, দুনিয়াতে লিপ্ত রহিয়াছে এবং আখেরাতকে ত্যাগ করিয়া বসিয়াছে, এই আয়াতে তাহাদের প্রতি সতর্কবাণী রহিয়াছে। মৌলবী শাব্বীর আহ্‌মদের এতদসম্পর্কীয় ওয়ায ছিল বিশ্বাস সংক্রান্ত। আর আমার ওয়ায হইবে আমল সংক্রান্ত। যেহেতু এল্‌ম বা বিশ্বাসের উদ্দেশ্য আমলই বটে; সুতরাং আমার অবলম্বিত বিষয়টি হইবে তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের পরিপূরক।

যদিও কতক এল্ম এমনও আছে যে, তদনুযায়ী আমল করার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু জ্ঞানলাভ বা বিশ্বাস করার পরিপ্রেক্ষিতেও তাহা উদ্দেশ্যযুক্ত। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকেরাও নিজ নিজ বিষয়ের দুইটি অংশ নির্ধারণ করিয়াছেন। এল্ম—জ্ঞানলাভ সম্বন্ধীয় এবং কর্ম সম্বন্ধীয়। যথা, তিব্ব শাস্ত্রেরই ধরুন, সমগ্র জগতই এই বিভাগ স্বীকার করিতেছে এবং এই উভয় অংশই কাম্যও বটে ; কিন্তু তথাপি গভীর দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, সেই কাম্য এল্মও প্রকারান্তরে কোন না কোন আমলের সহিত অবশ্যই সম্পর্ক রাখিতেছে। মনে করুন, খোদার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু আমলেও ইহার এমন বিশেষ ক্রিয়া রহিয়াছে যে, এই বিশ্বাস যেই স্তরের হয় আমলের সওয়াবও সেই স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

আরেফ এবং সাধারণ লোকের এবাদতের পার্থক্যঃ আরেফ অর্থাৎ, ওলীয়ে কামেল ও ছাহাবায়ে কেরামের এবং আমাদের এবাদতের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার ইহাই রহস্য। আওলিয়ায়ে কেরাম ও ছাহাবায়ে কেরামের এবাদত চাই কি আর্থিকই হউক কিংবা দৈহিক, উহার সমকক্ষ অন্য কাহারও এবাদত হইতে পারে না। ছাহাবায়ে কেরামের এবাদতের মধ্যে আমাদের তুলনায় কোন্ বিষয়টি অতিরিক্ত আছে? তাহা বিশ্বাস এবং খাঁটি নিয়ত ছাড়া আর কিছুই নহে। আওলিয়ায়ে কেরামের দুই রাকাআত নামায আমাদের দুই লক্ষ রাকাআতের চেয়ে উত্তম। কেননা, সেই দুই রাকাআতে বিশ্বাস ও খাঁটি নিয়ত এই পরিমাণ পাওয়া যায়, যাহা আমাদের এবাদতে কখনও উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। আমার হযরত পীর ছাহেব কেবলা বলিয়াছেনঃ “একজন ওলীর দুই রাকাআত নামায সাধারণ লোকের এক লক্ষ রাকাআত হইতে উত্তম।” হযরত ইহা ভুল বলেন নাই এবং ইহাতে বাড়াইয়া বা অতিরঞ্জিত করিয়াও কিছু বলেন নাই।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ “আমার কোন ছাহাবী আধা সের পরিমাণ খাদ্য-শস্য খয়রাত করিলে উহা ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ খয়রাত করার চেয়েও অধিক সওয়াবের উপযোগী হইয়া থাকে।” যদি এই হাদীসের ভিত্তিতে আধা সের শস্যের মোকাবেলায় আধা সের স্বর্ণ লওয়া যায় এবং তুলনায় ওহুদ পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তখন উহার তুলনা বুঝিতে পারা যাইবে। আর যদি এইরূপে তুলনা করা হয় যে, অর্ধ সের শস্যের পরিবর্তে ইহার মূল্য সম্মুখে রাখিয়া স্বর্ণের মূল্যের সহিত তুলনা করা হয়, তবে তুলনায় আরও অধিক হইবে। আর এই সওয়াবের আধিক্য এল্মে মা'রেফাতের আধিক্যের কারণেই বটে। এই তুলনার সাহায্যে ছাহাবায়ে কেরামের এবাদত এবং আমাদের এবাদতের তুলনাও বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কেহ কেহ হয়তো বলিবেনঃ মৌলবী ছাহেবানও বিচিত্র মানুষ। কখনও এই হাদীসের কারণ মহব্বত এবং খাঁটি নিয়ত বলেন, আবার কোন সময় এল্ম ও মারেফাত বলেন, একই হাদীস দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতলব উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে বলিতেছি যে, মহব্বত ও খাঁটি নিয়তের প্রেরণা এল্ম এবং মা'রেফাত হইতেই হাছিল হয়। আর তাহা ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যেই পাওয়া যাইত। সুতরাং মূল একই। ইচ্ছা হয় ইহাকে খাঁটি মহব্বত বলেন, ইচ্ছা হয় এল্ম ও মারেফাত বলেন। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

عِبَارَاتُنَا شَتّٰى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ ـ وَكُلُّنَا اِلٰى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيْرُ

“আমাদের বর্ণনাভঙ্গি পৃথক, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য মাধুর্য একই এবং আমাদের সকলে একই সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি।” এই এল্ম ও মারেফাতের ফলেই তাঁহাদিগকে এমন বোধশক্তি

দান করা হইয়াছিল যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে সালাম (রাঃ) যখন হুযূর (দঃ)-কে প্রথমবার দেখিয়াছিলেন, যদিও তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে সংসর্গ লাভের পরবর্তী কালের ন্যায় হুযূরের প্রতি খাঁটি মহব্বত ছিল না, কিন্তু সত্যের অন্বেষণে যে পরিমাণ অকপট আগ্রহ ছিল, তাহারই ফলে দেখামাত্রই বলিয়া উঠিয়াছিলেনঃ هٰذَا لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ "ইহা মিথ্যাবাদীর চেহারা নহে।"

نور حق ظاهر بود اندر ولی ـ نیك بیں باشی اگر اهل دلی
مرد حقانی کی پیشانی کا نور ـ کب چهپا رهتا هے پیش ذی شعور

"ওলী লোকের ললাটে আল্লাহ্র নূর দীপ্তিমান থাকে। স্বচ্ছ হৃদয় লোক তাহা পরিষ্কার দেখিতে পান।"

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط

"তাঁহাদের চেহারায় অজস্র সজ্দার ফলে উজ্জ্বল নিদর্শন জ্বলজ্বল করিতেছে।" সেই ওলী কামেল ও খাঁটি হইয়া গেলে তখন কি অবস্থা হইবে?

جرعه خاك آميز چوں مجنوں کند ـ صاف گر باشد ندانم چوں کند

"অপরিষ্কার পানির এক ঢোক পান করিয়া পাগল হইয়াছি। পরিষ্কার হইলে না জানি কি হইতাম!"

ছাহাবায়ে কেরামের এলমের স্বরূপঃ মোটকথা, ছাহাবায়ে কেরামের এলম ছিল খাঁটি। সুতরাং তাঁহাদের অনুসরণ করাই আমাদের পূর্ণ সৌভাগ্য। ছাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের কেন চলা উচিত? তাঁহাদের কর্মজীবন আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক কেন? একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

জগত জানে, রেলগাড়ী কিরূপে চলে। রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে ইঞ্জিনের গতি আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটি বগির সঙ্গে ইঞ্জিন থাকে না। তদ্রূপ হইলে গাড়ী চলিতে পারিত না; বরং এক সঙ্গে যুক্ত বহুসংখ্যক বগির জন্য একটিমাত্র ইঞ্জিন থাকে। ইহা পূর্ণ লাইনের জন্য যথেষ্ট হয়। নিয়ম এই যে, প্রথমে একটি বস্তুর মধ্যেই প্রাথমিক গতি আরম্ভ হয় এবং আরও অনেকগুলি বস্তুকে উহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়। যেমন, রেলগাড়ীর সারিতে প্রথমে ইঞ্জিনের মধ্যে গতি আরম্ভ হয়; আর বহুসংখ্যক বগি উক্ত ইঞ্জিনের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর প্রাথমিক গতিবিশিষ্ট ইঞ্জিনটি একা শক্তিতে বহুদূর বিস্তৃত দীর্ঘ সারিটিকে কালকা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

একটি গতিশীল ইঞ্জিন যখন প্রাথমিকভাবে বহুসংখ্যক গাড়ীকে সহস্র সহস্র ক্রোশ টানিয়া লইয়া যায়, তখন ছাহাবায়ে কেরামের সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, ইহাতে বিচিত্র কিসের? অতএব, খোদার দরবারে পৌঁছিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত, ছাহাবায়ে কেরামের সহিত নিজকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া।

بود مورے هوسے داشت که در کعبه رسد ـ دست بر پائے کبوتر زد وناگاه رسید

"একটি পিপীলিকা কা'বা গমনের জন্য আগ্রহান্বিত ছিল। সে কবুতরের পা জড়াইয়া অকস্মাৎ কা'বা শরীফে পৌঁছিয়া গেল।"

একটি পিপীলিকা দরিদ্র এবং দুস্থ। হজ্জ করিতে যাওয়ার ইচ্ছা করিল। কিন্তু তাহার নিকট পথের সম্বল কিছুই ছিল না। এই চিন্তায় সে অস্থির ছিল। হাজীদের নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিল। হাজীরা বলিলঃ জাহাজে এত দিন ভ্রমণ করিতে হয়। আবার উটের পিঠে এতদিন সফর করিতে হয়। তারপরে সহস্র সহস্র মাইলের সফর শেষ হয়। ইহাতে বড়ই কষ্ট করিতে হয়। সহস্র মাইলের সফর। শত শত টাকা ব্যয়। চোর-ডাকাতের ভয়। জীবনের আশঙ্কা। মোটকথা, ভীষণ কষ্ট সহ্য করার পরেই হজ্জ করা ভাগ্যে জোটে। বেচারা ইহা শুনিয়া একান্ত অস্থির ও নিরাশ হইয়া পড়িল। একদিকে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ, অপর দিকে নানাবিধ চিন্তা। এমতাবস্থায় হঠাৎ একজন পথপ্রদর্শক দেখিতে পাইল, যাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারেঃ

ایے لقائے تو جواب هر سوال ـ مشكل از تو حل شود بے قيل وقال

“তোমার সাক্ষাৎলাভই আমার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর; নিঃসন্দেহে তোমার দ্বারাই মুশ্‌কিল আসান হইবে।”

সে জিজ্ঞাসা করিলঃ বল—কেমন অবস্থা? বেচারা দুঃখ-চিন্তায় জর্জরিত অবস্থায় বসিয়া ছিল। একজন ব্যথার দরদী পাইয়া কিঞ্চিৎ শান্তি পাইল এবং বলিলঃ হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অন্তর মহব্বতে ও আগ্রহে পরিপূর্ণ। কিন্তু পথের সম্বল বলিতে কিছুই নাই। এই কারণেই চিন্তান্বিত ও অস্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। আপনি যদি কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বলিয়া দিন। সে বলিলঃ “আচ্ছা, আমি একটি উপায় বলিয়া দিতেছি। তুমি গর্ব-অহংকার করিও না। গর্ব-অহংকারে উদ্দেশ্য সফল হয় না; বরং এরূপ জন সর্বদা বিফল হইয়া থাকে।” পিপীলিকা বলিলঃ আমি আপনার কথায় সর্বপ্রকারেই সম্মত আছি। ইতিমধ্যে একটি কবুতর জঙ্গলে আসিয়া শস্যবীজ আহরণ করিতে লাগিল। সে ব্যক্তি জানিত, এই কবুতরটি হরম শরীফে গমন করিবে। সে পিপীলিকাটিকে বলিলঃ যদি তুমি কা'বা শরীফে যাইতে চাও, তবে এই কবুতরের পা জড়াইয়া ধর। গর্ব-অহঙ্কার করিও না। হরম শরীফে যাইতে পারিবে।

بود مورے هوسے داشت كه در كعبه رسد ـ دست بر پائے كبوتر زد وناگاه رسيد

অনুসরণে লজ্জার কারণঃ ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনে কাহারও সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে কিংবা অনুসরণে লজ্জা, গর্ব বা অহংকারবোধ করিও না। ইহা বিফলকাম হওয়ার প্রমাণ। কোন পথপ্রদর্শকের সহিত সংযোগ স্থাপনে লজ্জা বা অহংকারবোধ করিলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। বিফলকাম হইয়া অর্ধ পথেই থাকিয়া যাইবে। মুসলমানদের মধ্যে এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অপরের অনুসরণে লজ্জাবোধ করিতে অনেককে দেখা যায়। ইহার কারণ আর কিছু নহে—তাহারা নিজকে বড় মনে করে, ধনী এবং সম্মানী ধারণা করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ প্রায়ই দরিদ্র এবং দুস্থ হইয়া থাকেন। কাজেই সাধারণ লোকেরা মনে করে—ইহাদের পদমর্যাদা নিম্ন। অর্থে দরিদ্র, অবস্থায় দুস্থ, পোশাক-পরিচ্ছদে মলিন। পক্ষান্তরে আমরা শ্রেষ্ঠ ধনী, মান-সম্মানের অধিকারী, আমাদের সঙ্গে ইহাদের সংযোগ কিরূপে সম্ভব? আমরা তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংযোগ কেমন করিয়া স্থাপন করিব? আফসোস! এই ছোট-বড়র কল্পনাই শয়তানকে আল্লাহ্‌র দরবার হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। এক্ষেত্রে শয়তান তো কেবল ইহাই বলিয়াছিল যে, “আমার চেয়ে নিম্ন মর্যাদার একটি অস্তিত্বকে, যাহা আমার চেয়ে হেয় এবং নীচ, কেন আমি সজদা করিব?” এই গর্ব এবং অহংকারই তো

তাহার সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল। ইহাই তাহাকে ধ্বংস করিয়াছে এবং তাহাই আমাদিগকেও বিনাশ করিতেছে। আজ মুসলমান সমাজে এই ব্যাধি অতিশয় ব্যাপক। প্রত্যেকটি মানুষ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত দেখা যায়।

আমি অভিযোগস্বরূপ বলিতেছি না; বরং সমাজের প্রতি স্নেহ ও মহব্বতবশত মন-দুঃখেই বলিতেছি। ভাই মুসলমান! এই ধারণা পরিত্যাগ করুন। আমাদের বিফলতার কারণ একমাত্র ইহাই, বিনাশের কারণও ইহাই। বাহিরের আকৃতির মোহই আমাদিগকে ধ্বংস করিতেছে। তত্ত্ববিদগণ বহিরাবয়ব সম্বন্ধে বলেনঃ

گر بصورت آدمی انساں بدے   احمد وبو جهل هم یکساں بدے
اینکه می بینی خلاف آدم اند   نیستند آدم غلاف آدم اند

“মানব-আকৃতিই যদি মনুষ্যত্বের মাপকাঠি হইত, তবে আহমদ (দঃ) এবং আবু জাহ্‌ল সমান হইতেন। বাহিরে যে আকৃতি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা মনুষ্যত্বের বিপরীত। ইহা মানুষ নহে; বরং মানুষের খোলস মাত্র।” পোশাক-পরিচ্ছদকে ছোট-বড় হওয়ার মাপকাঠি করিও না। পোশাক দেখিয়া ছোট-বড়র বিচার করিও না। মৌলবী ছাহেব দশ টাকা বেতনে চাকুরী করেন। ময়লা ও টুটা-ফাটা কাপড় পরিধান করেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিও না। পোশাকের ভাল-মন্দের দ্বারা মানুষের ভাল-মন্দ বুঝা যায় না। শরীঅত বাধ্য না করিলে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ এবং মা'রেফতদারগণ পায়জামাও পরিতেন না। দেহের সাজ-সজ্জার সহিত তাঁহাদের কোনই সম্পর্ক নাই।

نباشد اهل باطن درپے آرائش ظاهر - بنقاش احتیاجے نیست دیوار گلستاں را

“ফুলের বাগানের প্রাচীর যেমন চিত্রকরের মুখাপেক্ষী নহে, তদ্রূপ আহ্‌লে বাতেন (আত্মিক উন্নতিকামী)-দের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রয়োজন হয় না।”

উর্দু কবি ‘যওক’ কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

عریاں هی دفن کرنا تھا زیر زمیں مجھے - لیك دوستوں نے اور لگادی کفن کی شاخ

“আমাকে মাটির নিম্নে খালি দেহে দাফন করাই উচিত ছিল, কিন্তু বন্ধুরা আবার কাফনের ঝামেলা লাগাইয়া দিয়াছে।”

এস্থলে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। কোন এক জাঁকজমক সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী বাদশাহ্‌র ভাই লুঙ্গি পরিয়া ঘুরাফেরা করিত। বাদশাহ্‌ ইহাতে লজ্জাবোধ করিতেনঃ “আমি এত বড় বাদশাহ্‌! আর আমার ভাই শুধু একখানা লুঙ্গি পরিয়া চলাফেরা করিতেছে।” বাদশাহ তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেনঃ “ভাই, তুমি পায়জামা পরিধান কর। তোমার লুঙ্গি পরা দেখিয়া আমার লজ্জা-বোধ হয়।” সে বলিলঃ “আমি পায়জামা পরিতে রাজী আছি যদি ইহার সহিত কোর্তাও হয়।” বাদ্‌শাহ্‌ বলেনঃ “কোর্তা অনেক আছে।” সে বলিলঃ “কোর্তার সহিত টুপিও চাই।” বাদশাহ্‌ বলিলেনঃ “টুপিও যথেষ্ট আছে।” সে বলিলঃ “তৎসঙ্গে জুতাও আবশ্যক।” উত্তর হইলঃ “জুতারও অভাব নাই।” সে বলিলঃ “এসমস্ত পোশাক পরিধান করিলে একটি ঘোড়ারও প্রয়োজন।” বাদশাহ্‌ বলিলেনঃ “ঘোড়াও অনেক রহিয়াছে।” সে বলিলঃ “ঘোড়ার জন্য আস্তাবলের দরকার এবং একজন সহিসও থাকা চাই।” বাদশাহ্‌ বলিলেনঃ “সবকিছুই প্রস্তুত রহিয়াছে।” সে আবার

বলিল ঃ "থাকার জন্য একটি বাড়ীও আবশ্যক।" উত্তর হইল, "জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট অট্টালিকাও তোমার জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে।" সে বলিল ঃ "তারপর একটি রাজত্বও হওয়া দরকার।" বাদশাহ্ বলিলেন ঃ "রাজত্বও হাযির, সিংহাসনে বস এবং সানন্দে রাজকার্য পরিচালনা কর।" ভাই এসমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বাদশাহ্‌কে বলিল ঃ "তবে আমি পায়জামাই কেন পরিব? এক পায়জামা পরিধানেই যখন এত ঝামেলা, তখন তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি বেশ আরামে আছি।" ফলকথা, যাঁহারা আল্লাহ্ওয়ালা, তাঁহারা এসমস্ত বহিরাড়ম্বরের ধার ধারেন না। সাদাসিধা জীবন যাপন করিয়া এবাদতে মশ্‌গুল থাকেন। তাঁহাদের অন্তরে এসমস্ত সাজ-সরঞ্জামের কোন মর্যাদাই নাই।

কোন এক বুযুর্গ লোক জনৈক বাদশাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যদি আপনি কোন স্থানে যাইয়া পথ ভুলেন এবং দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়েন, তখন কোন একজন লোক যদি আপনাকে বলে, আমি এক গ্লাস পানি অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে পারি। আপনি তদবস্থায় তাহা খরিদ করিবেন কি? বাদশাহ্ বলিলেন ঃ "নিঃসন্দেহ, আমি তখন অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়েই তাহা খরিদ করিব।" বুযুর্গ লোক আবার বলিলেন ঃ আচ্ছা, যদি এইরূপে কোন দিন আপনার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া আপনি মরণাপন্ন হইয়া পড়েন এবং কেহ তখন আসিয়া আপনাকে বলে, "আমি অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে প্রস্রাব খোলাসা করিয়া দিতে পারি, আপনি কি তাহাতে সম্মত হইবেন?" বাদশাহ্ বলিলেন ঃ "নিশ্চয়।" বুযুর্গ লোক তখন বলিলেন ঃ এখন ভাবিয়া দেখুন, আপনার রাজত্বের মূল্য কতটুকু—এক গ্লাস পানি এবং একবারের প্রস্রাব। এই মূল্যের বস্তু লইয়া এত গর্ব ও অহংকার করা এবং অন্যান্য লোককে ঘৃণার চক্ষে দেখা ও হীন মনে করা কতটুকু সঙ্গত বলা যাইতে পারে?

এখান হইতেই আজকালের উন্নতির অবস্থা হয়তো বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি উন্নতি করিতে নিষেধ করিতেছি না; বরং উন্নতি আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু একজন মুসলমানের পক্ষে যেরূপ উন্নতি করা উচিত, আমি তদ্রূপ উন্নতি চাই। এমন উন্নতি আমি কখনও পছন্দ করি না, যাহার পশ্চাতে পড়িয়া ধর্মকেই ভুলিতে হয় এবং আল্লাহ্‌র কল্পনাও আসে না। যাহারা আল্লাহ্‌কে চিনিয়া লয়, তাহারা দুনিয়াকে মোটেই ভালবাসে না।

آں کس که ترا شناخت جاں را چه کند ـ فرزند وعزیز وخانماں را چه کند

"যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহার আবার জীবন, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের সহিত কি সংস্রব?"

আল্লাহ্ওয়ালার দৃষ্টিতে দুনিয়া ঃ তাঁহাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অস্তিত্ব তৃণখণ্ডের চেয়ে অধিক নহে। শিশুরা মাটির খেলাঘর এবং বিভিন্ন প্রকার খেলনা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বোধমানগণ ইহা দেখিয়া হাসেন এবং বালক-বালিকাগণকে দেখাইয়া বলেন ঃ এই পাগলদের কাণ্ড-কারখানা দেখ। এইরূপে আল্লাহ্ওয়ালা আরেফগণ আপনাদের সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহ দেখিয়া আপনাদিগকে ইহার মোহ ত্যাগপূর্বক পরলোকের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। আপনাদিগকে ইহার মোহ ত্যাগপূর্বক পরলোকের প্রতি লক্ষ্যহীন দেখিলে আপনাদের অবস্থার প্রতি তাঁহারা হাসেন এবং আফসোস করিয়া বলেন ঃ

دلا تاکے دریں کاخ مجازی ـ کنی مانند طفلاں خاکبازی

"হে মন! এই মিথ্যা প্রাসাদে শিশুদের মাটির খেলার ন্যায় আর কতকাল খেলা করিবে?"

توئی آں دست پرور مرغ گستاخ ـ بودت آشیاں بیروں ازیں کاخ

“হে আমার নিজ হস্তে প্রতিপালিত অবাধ্য পাখী ! তোর বাসা এই মাটির ঘরের বাহিরে ছিল।”

چرا زاں آشیاں بیگانه گشتی ـ چو دو ناں چغدایں ویرانه گشتی

“তুই নিজের সেই বাসাকে কেন ভুলিয়া রহিয়াছিস ? পেঁচকের ন্যায় পোড়োবাড়ীতে ঘুরিতেছিস ?”

অতএব, এই বিলাসের সামগ্রীকে নিজের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কাম্য করিয়া লইও না এবং দরিদ্র ও দুস্থ, অপরিষ্কার ও ছেঁড়া-ফাটা পোশাকধারী ওলামাকে ঘৃণা ও অবহেলার চক্ষে দেখিও না। তাঁহারাই খোদার দরবারের বিশিষ্ট লোক, তাঁহারাই সঙ্গে কিছু লইয়া সেই দরবারে যাইবেন। আমি বলিতেছি না যে, দুনিয়া ছাড়িয়া দাও এবং সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেল; বরং আমার উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার মোহে এত গভীরভাবে মত্ত থাকিও না যে, একেবারে খোদাকেই ভুলিয়া যাও; বরং দুনিয়াকে ঘৃণার চক্ষে দেখ এবং খোদার বিশিষ্ট ও প্রিয় বান্দাগণকে সম্মান কর। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ রাজত্ব এবং শাসন-ক্ষমতার কোন পরোয়া করেন না; বরং তাঁহারা ইহাকে জানের জন্য বোঝাস্বরূপ মনে করিয়া থাকেন।

কথিত আছে, হযরত গাউছে আ'যমের সমীপে সান্‌জারের সুলতান চিঠি লিখিয়াছিলেন, আপনার দরবারের সেবকবৃন্দের জন্য আমার রাজ্যের এক অংশ আপনাকে দান করিতেছি। তিনি উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেনঃ

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد ـ در دل اگـر بود هوس ملك سنـجـرم
زانـگـه که یافتم خبـر ملك نیم شب ـ من ملك نیـم روز بیـك جو نمی خرم

“যদি সান্‌জার রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে উদিত হয়, তবে আমার ভাগ্যাকাশ সান্‌জারের রাজছত্রের ন্যায় কাল হউক। যখন হইতে আমি মধ্যরাত্রির রাজত্বের সন্ধান পাইয়াছি, তখন হইতে অর্ধ দিবসের রাজত্বকে একটি যবের বীজের বিনিময়েও খরিদ করি না।”

কোন এক আল্লাহ্‌ওয়ালা বলেনঃ

بفـراغ دل زمـانے نـظـرے بـمـاهـروئے ـ به ازاں که چتر شاهی همه روز هائے وهوئے

“এই রাজছত্র এবং দিবা-রাত্রির শোরগোল অপেক্ষা যমানার দুঃখ-কষ্ট হইতে অবসর থাকা, প্রিয়জনের সুন্দর মুখশ্রীর প্রতি একটিবার দৃষ্টি করা বহুগুণে উত্তম।”

যেই দুস্থ অবস্থাকে তোমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ, তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলেনঃ
اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ “আমি ভগ্নহৃদয় দুস্থ লোকদের সঙ্গে আছি।” এই দুস্থ অবস্থা বরণ করা খোদার সহিত মিলনের শর্তও বটে। মাওলানা রূমী বলেনঃ

فهم وخـاطر تیـز کردن نیست راه ـ جز شکستـه می نگیـرد فضل شاه
هرکجـا پستی ست آب آنجـا رود ـ هرکجـا مشکـل جواب آنجـا رود
هـرکـجـا دردے شفـا آنـجـا رود ـ هـرکـجـا رنـجے دوا آنـجـا رود

“হৃদয় ও জ্ঞানের প্রখরতা পথ পরিচয়ের প্রমাণ নহে; দুস্থ অবস্থার লোকই রাজকীয় সম্মান লাভ করিয়া থাকে। নীচু স্থানের দিকেই পানি গড়ায়, যথায় মুশ্‌কিল তথায় আসান। যথায় ব্যথা তথায়ই আরোগ্য, যেখানে দুঃখ-কষ্ট, সেখানেই ইহা মোচনের ব্যবস্থা।”

খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার সঠিক পন্থাঃ আমাদের মনে চাহিদা বা কামনা নাই, তাহা থাকিলে আনুগত্য অবলম্বনে বা অনুসরণে নিজকে হেয় করাকেও গৌরবের বস্তু মনে করা হইত। কেহ কাহারও প্রতি আশেক হইলে প্রেম-পাত্রী যদি প্রেমিককে বলেনঃ "সর্বাঙ্গের কাপড়-চোপড় খুলিয়া লেঙ্গুট পরিধান কর, তবেই মিলন হইবে।" আল্লাহ্‌র শপথ, তৎক্ষণাৎ সে তাহা করিবে; লেঙ্গুট পরিধান করিতে তাহার কিছুমাত্র দ্বিধা হইবে না। সমস্ত লজ্জা-শরম ত্যাগ করিয়া বসিবে, কিন্তু খোদার জন্য কেহ এরূপ করিতে প্রস্তুত হয় না। অথচঃ

عشق مولٰی کئے کم از لیلٰے بود - گوئے گشتن بهر او اولٰی بود

"মাওলার প্রেম কি লায়লার প্রেম হইতে কম? তাহার প্রেমে বলের মত দলিত হওয়াও উত্তম।"

ইহার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখুন, রাসায়নিকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। সকলেই জানে, তাহারা বিবস্ত্র ও অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর লোক ছাড়াও রাজা-বাদশাহগণ পর্যন্ত একটি পুরাতন ও অপরিষ্কার হুক্কা হস্তে তাহাদের পাছে পাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, যদিও তাহারা সত্যিকারের রাসায়নিক নহে। "আল্লাহ্ আকবর!" এই স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালীর জন্য তাহারা নিজের সুখ-শান্তি এবং মান সম্মান পর্যন্ত বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে! কিন্তু যে সমস্ত মহাপুরুষ প্রকৃতপক্ষে লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহাদের কাছেও কেহ ঘেঁষিতে চায় না। তাঁহাদের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইলে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কেননা, স্বর্ণ প্রস্তুতকারক বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারাই।

সারকথা এই যে, আপনারাও ছাহাবায়ে কেরামের সহিত সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক তাঁহাদের উছিলা অন্বেষণ করিলে নির্ঘাত কৃতকার্য হইবেন। কেননা, খোদার দরবার পর্যন্ত পৌঁছিবার সঠিক পন্থা-প্রদর্শক একমাত্র তাঁহারাই। যদ্রূপ পিপীলিকা কবুতরের পা ধরিয়া পবিত্র কা'বা শরীফে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিল, তদ্রূপ আমরাও ছাহাবায়ে কেরামের পা ধরিয়া আল্লাহ্‌র দরবার পর্যন্ত কেন পৌঁছিতে পারিব না? পৌঁছিতে পারিব—অবশ্যই পৌঁছিতে পারিব। ছাহাবায়ে কেরামের উছিলা হাছিল করিলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উছিলা লাভ করা যায়। সুতরাং সফলতা লাভ করা স্থির নিশ্চিত।

বস্তুত মা'রেফাত এবং এল্‌মের বদৌলতই ছাহাবায়ে কেরাম এরূপ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। এল্‌ম ও মা'রেফাতের মর্যাদা অনেক উচ্চ। এল্‌ম ও মা'রেফাত বস্তু বলিয়া গণ্য না হইলে জগতে কোন বস্তুই নাই বলিতে হইবে। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার সম্পর্কও আমলেরই সহিত। আমল ব্যতিরেকে এল্‌ম ও মারেফাতের এমন কোন উপকারিতা নাই। কিন্তু আজকাল তালেবে এল্‌মদের মধ্যে কিছু কিছু এল্‌মের অহংকার দেখা যাইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, অর্জিত এলম তাহাদের বিরাট সম্পদ। এল্‌মের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা যেন এক বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছে। আক্বীদা তাহাদের অবশ্যই নিখুঁত আছে, কিন্তু আমল ঠিক নাই। মহা প্রমাদ এই যে, তাহারা শুধু জ্ঞান এবং বিশ্বাস অর্জন করাকেই প্রধান বিষয় মনে করিয়া থাকে। আমলের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি তাহাদিগকে বলিঃ "তোমরা আক্বীদা ও বিশ্বাসের গৌরবে আমল ঠিক করিতেছ না। বস্তুত এল্‌ম এবং মারেফাতের পরে হইলেও আমলই মুখ্য বিষয়।

সবকিছুই আমলের উপর নির্ভরশীলঃ কনৌজে এক আহ্‌লে-হাদীস ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে সে বলিতে লাগিলঃ "জনাব! আমরা শুধু নামাযের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি

মাস্আলাতেই হাদীস অনুযায়ী আমল করিয়া থাকি। অন্যান্য ব্যাপারে হাদীসের নামও লই না। দেখুন, আমি একজন আতর ব্যবসায়ী; উহার সহিত তেলও মিশাইয়া থাকি। ফলকথা, আমলের দিক হইতে আমরা খুবই দুর্বল।" এইরূপে মনে করুন, আমরা হানাফী, আমাদের আক্বীদা ঠিক আছে। কিন্তু আমলের ত্রুটি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছে। অথচ আমল সেই বস্তু, যাহার উপর অন্যান্য সমস্ত বস্তুই নির্ভরশীল। যদ্যপি কতিপয় এল্ম ও মা'রেফাত এমনও আছে, যাহাদের সহিত আমলের তেমন সম্পর্ক নাই; বরং সে সমস্ত বিষয়ে কেবল জ্ঞান লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু কোরআন ও হাদীস শরীফ দেখিলে বুঝা যায়, উহাদের লক্ষ্য আমল হইতে শূন্য নহে।

তক্দীর সম্বন্ধে তা'লীমের ফলঃ আল্লাহ্ পাক স্বীয় কালামে মজীদে বলিতেছেনঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ
نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتَاكُمْ ط

অর্থাৎ, "তোমাদের প্রতি যে সমস্ত আনুষঙ্গিক কিংবা ব্যক্তিগত বিপদ-আপদ আসিয়া থাকে, তাহা বহু পূর্বেই আমি এক দফতরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।" এই আয়াতটিতে আল্লাহ্ পাক তক্দীর সম্বন্ধে তা'লীম দিয়াছেন। ইহা একটি শিক্ষা, কিন্তু এই শিক্ষার মধ্যে একটি কর্মগত উদ্দেশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "আমি তক্দীরের তা'লীম কেন দিলাম? এই জন্য যে, যাহা তোমাদের হস্তচ্যুত হয় তজ্জন্য দুঃখ করিও না, আর যাহা হস্তগত হয় তাহাতে গর্বিত হইও না।" এই তা'লীমের মধ্যে এক সৌন্দর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে মানুষের স্বভাব অনুযায়ী কথাটি বলিয়া দিয়াছেন। কেননা, দুঃখ-কষ্ট মানবের স্বভাবগত বিষয়। এই তা'লীমের ফলে দুঃখ-কষ্টের ক্ষেত্রে স্বভাবত সান্ত্বনা ও শান্তি পাওয়া যাইতে পারে এবং নানাবিধ বিপদে এই তা'লীম শান্তি লাভের কারণ হইতে পারে। দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানী লোক একত্রিত হইলেও এমন সুন্দর উপায় বলিয়া দিতে পারিবে না। ফলকথা, তক্দীরের মাসআলা শিক্ষা দেওয়ার একটি উদ্দেশ্য সান্ত্বনা, শান্তি এবং ধৈর্যধারণও বটে। যেমন, لِكَيْلَا تَاْسَوْا বাক্যে তাহা পরিষ্কার বলা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যের সার্থকতা দিবালোকের মত স্পষ্ট। একটি কল্পিত ঘটনা হইতে আপনারা এই কথাটি বুঝিতে পারিবেন।

মনে করুন; দুইজন লোক একই স্থানের অধিবাসী এবং সর্বপ্রকারে দুইজনের একই রকমের অবস্থা। কিন্তু পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একজন তকদীরের প্রতি বিশ্বাসী, অপরজন তকদীর বিশ্বাস করে না। দুইজনের দুইটি ছেলে একই বর্ণের, একই গুণের এবং একই শিক্ষায় শিক্ষিত। দুইজনের পিতা-মাতাই ছেলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে বহু উচ্চ আশা পোষণ করিতেছেন। ঘটনাক্রমে দুইটি ছেলেই ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। দুইজনকেই একই চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন রাখা হইল। কিন্তু চিকিৎসকের ভুলক্রমে তাহার চিকিৎসা একজনের পক্ষেও হিতকর হইল না, ফলে দুইটি ছেলেই মরিয়া গেল। এমতাবস্থায় উভয়ের পিতা-মাতাই অতিশয় দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইবেন। কিন্তু ইহাদের দুঃখ-কষ্টের তারতম্য এখানে কেবল তকদীরের মাসআলা দ্বারাই হইবে। যিনি তকদীরের প্রতি বিশ্বাসী, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহির হইয়া পড়িবে— لَنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا 'আমাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্‌র তরফ হইতেই আসিয়া থাকে।' فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَايَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ 'খোদার কার্য হেকমত বা যুক্তিশূন্য নহে।'

হযরত খেযের (আঃ) যেই ছেলেটিকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা শুধু হিতের জন্যই ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা কোন মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য ভিন্ন কোন কাজ করেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমার পিতা মরহুমের এন্তেকালের পর একজন বেদুইন আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলঃ

اِصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِيْنَ اِنَّمَا ـ صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّاْسِ

"আপনি ধৈর্য ধরুন, আপনি বড়, আমরা ছোট, আপনার ধৈর্য দেখিয়া আমরা ধৈর্যধারণ করিব।"

خَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ اَجْرُكَ بَعْدَهٗ ـ وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْكَ لِلْعَبَّاسِ

"আপনার পিতার মৃত্যুতে আপনাদের মধ্যে কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই; বরং আপনারা উভয়েই উপকৃত হইয়াছেন। আপনি ধৈর্যধারণের সওয়াব প্রাপ্ত হইবেন, যাহা আব্বাসের চেয়ে উত্তম। আর আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি তাঁহার জন্য আপনার চেয়ে উত্তম। যখন এই মৃত্যুতে আপনাদের মধ্যে কাহারও কোন ক্ষতি হইল না, তখন ইহার জন্য দুঃখ কিসের?" তকদীরের প্রতি বিশ্বাসী জনৈক বেদুইনের এই উক্তি দেখুন, ইহা হইতে কেমন সুন্দর সান্ত্বনা লাভ করা যাইতে পারে!

অপর ব্যক্তি—যিনি তকদীর বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেনঃ চিকিৎসকের চেষ্টার অভাবেই আমার ছেলেটি মারা পড়িল। ডাক্তার যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিলে ছেলেটি কখনই মরিত না, ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করিব। যেমন চিন্তা তেমন কাজ, ডাক্তারের বিরুদ্ধে কেস করা হইল। ফলে ডাক্তার বেচারার জেল হইল, কিন্তু তবুও মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার অন্তর হইতে সেই শোক-তাপ দূরীভূত হইল না যে, ডাক্তারের চেষ্টার ত্রুটি না হইলে ছেলেটি মরিত না। ইহাতে বুঝা যায় যে, তক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাস করিলে শোক-দুঃখের আয়ু দুই-এক সপ্তাহের অধিক হয় না। কেননা, তক্‌দীরের প্রতি বিশ্বাসের কারণে সে যেই সান্ত্বনা লাভ করে, তাহাতেই শোক-তাপ দূরীভূত হয়। পক্ষান্তরে তক্‌দীর অবিশ্বাসকারীর দুঃখ চিরস্থায়ী থাকিয়া যায়। এইরূপে প্রত্যেক এল্‌মে এবং প্রত্যেক আক্বীদায় একটি কর্মগত উদ্দেশ্য আছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ ভাগে প্রথম আসমানে অবতরণ করিয়া থাকেন।" ইহার উপর প্রশ্ন করা হয়; "গতিশীলতা আল্লাহ্ তা'আলার শান-বিরোধী।" প্রকৃতপক্ষে এই হাদীসের উদ্দেশ্যগত আমলের প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে না; বরং হাদীসটি শ্রবণ করা মাত্রই মনে এই সঙ্কল্পের উদয় হইত যে, শেষ রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার জন্য অধিকতর চেষ্টা ও গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কেননা, তাহা নৈকট্য ও কবূলিয়তের সময়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি হইতে বিষয়টি বুঝিতে পারিবেন।

কোন শাসক বা অফিসার ভ্রমণে বাহির হইয়া কোন স্থানের নিকটবর্তী হইলে যদি লোকে আসিয়া সংবাদ দেয় যে, অমুক অফিসার এখান হইতে ৬ মাইল নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, শীঘ্রই এখানে আসিবেন। ইহা শুনিয়া তথাকার কর্মচারিগণ যদি বলে যে, গতকল্য এতদূরে ছিল, আজ এতদূর পথ অতিক্রম করিয়া এত নিকটে কেমন করিয়া আসিলেন? তবে বুঝা যাইবে যে, তাহারা ঠিকমত নিজের কর্তব্য কাজ করে না। অন্যথায় নিকটে আসার উপায় অনুসন্ধান না করিয়া নিজেদের কাজ-কর্ম দুরুস্ত করার চেষ্টায় লাগিয়া যাইত।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এত নিকটবর্তী হওয়ার কথা হাদীসে এই উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়—যেন তাঁহার নিকটে আসার কথা জানিতে পারিয়া মানুষ নিজ নিজ কর্তব্যের প্রতি সচেতন ও সতর্ক হয় এবং তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়া অবস্থার ভাষায় বলিতে থাকে ঃ

امروز شاه شاهاں مهماں شده است ما را - جبرائیل با ملائك درباں شده است ما را

"আজ সমস্ত বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্ আমাদের এখানে অতিথি হইয়াছেন এবং জিব্রাঈল তাঁহার সমস্ত ফেরেশ্‌তা সঙ্গীগণসহ আমাদের দ্বারবান হইয়াছেন।"

প্রসঙ্গক্রমে হযরত মাওলানা ইয়াকূব মরহুমের একটি কাহিনী আমার মনে পড়িল। তিনি হাদীস পড়াইতেছিলেন ঃ "যে ব্যক্তি নূতন ওযূর সহিত দুই রাকাআত নামায পড়ে এবং তাহাতে নামাযের সহিত সম্পর্কহীন কোন চিন্তা না করে, তবে তাহার অতীতকালের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইয়া যায়।" জনৈক তালেবে এল্‌ম বলিয়া উঠিল ঃ "হযরত! নামাযের মধ্যে কোন প্রকার চিন্তা না আসে, ইহাও কি সম্ভব?" তিনি বলিলেন ঃ "কখনও চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছ, না এমনিই সন্দেহ করিতেছ?"

ফলকথা, শব্দের কারণ অনুসন্ধান রোগের আলামত, এসমস্ত ত্যাগ করিয়া শুধু কাজ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম কোন সময় হুযূর (দঃ)-কে এই জাতীয় বিষয় জিজ্ঞাসাও করেন নাই, প্রশ্নও করেন নাই।

বিজ্ঞান এবং দর্শনের তথ্যানুসন্ধান ঃ কোন এক ব্যক্তি এক বুযুর্গ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিল ঃ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মে'রাজ শরীফে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কি কি আলাপ করিয়াছিলেন? উক্ত বুযুর্গ লোক কেমন সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন ঃ

اکنوں کرا دماغ که پرسد ز باغباں - بلبل چه گفت وگل چه شنید وصبا چه کرد

"এখন কাহার এত সাহস যে, বাগানীকে জিজ্ঞাসা করিবে—বুলবুল কি বলিয়াছে, ফুল কি শুনিয়াছে এবং প্রাতঃসমীরণ কি করিয়াছে?"

আর একজন কবি বলিয়াছেন ঃ

تو نه دیدی گهے سلیمان را - چه شناسی زبان مرغاں را
عنقا شکار کس نه شود دام بازچیں - کیں جا همیشه دام بدست است دام را

"তুমি কখনও সোলায়মান (আঃ)-কে দেখ নাই, পাখীর ভাষা কেমন করিয়া জানিবে? আনকা পক্ষী কাহারও ফাঁদে ধরা দেয় না। ফাঁদ তুলিয়া লও। এখানে সর্বদা ফাঁদে বায়ু ভিন্ন আর কিছুই ধরা পড়ে না।"

কারণ, তোমাদের বুদ্ধির দৌড় যতটুকু, আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা তাহা অপেক্ষা অনেক অনেক বেশী। اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ "আল্লাহ্‌র ক্ষমতা যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।" বেষ্টনকৃত বস্তু বেষ্টনকারীকে কেমন করিয়া বুঝিবে? পানির কোন পোকা মাথা তুলিয়া দুনিয়ার বড় বড় সরঞ্জাম দেখিতে পাইবে এবং খোদার হেকমতে দুনিয়া পরিপূর্ণ দেখিবে; কিন্তু এই সমুদয়ের রহস্য ও তথ্য সে কেমন করিয়া বুঝিবে? এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞানীদের উপদেশ ঃ

حدیث مطرب می گو وراز دهر کمتر جو - که کس نه کشود و نه کشاید بحکمت ایں معمار را

"গায়ক এবং শরাবের আলোচনা কর, কিন্তু যমানার রহস্যসমূহের অনুসন্ধান করিও না। এই ধাঁধা কেহই বুদ্ধিবলে খুলিতে পারে নাই। কাহারও দ্বারা কোন সময় ইহা খোলা সম্ভবও হয় নাই।" ইহার চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি—কোরআন ও হাদীসের সাহায্যে পার্থিব বিদ্যার প্রমাণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাওয়া। আজকাল বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন মাসআলা শুনিলেই তাহা কোরআন মজীদের সঙ্গে মিল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কোরআনে মজীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিষয় অনুসন্ধান করা এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির তথ্য খোঁজ করা বাতুলতা বৈ আর কি হইতে পারে ? গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কোরআনে যাহাকিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল তওহীদের প্রমাণের জন্যই আসিয়াছে। ইহা সম্বন্ধে কোরআনে অধিক বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। মোটামুটি জ্ঞানই যথেষ্ট। যেমন, একজন নিরক্ষর বেদুইন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছিল ঃ

اَلْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ وَالْاَثْرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيْرِ فَالسَّمَآءُ ذَاتُ الْاَبْرَاجِ وَالْاَرْضُ
ذَاتُ الْفِجَاجِ كَيْفَ لَايَدُلَّانِ عَلَى اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ ○

"উটের বিষ্ঠা উটের সন্ধান দেয়, পদচিহ্ন কাহারও হাঁটিয়া যাওয়ার প্রমাণ দেয়। তবে এই কক্ষপথবিশিষ্ট আসমান, প্রশস্ত গিরিপথবিশিষ্ট যমীন আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবে না কেন ?" কোরআন মজীদে বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুসন্ধান করা ঠিক 'তিব্বে আকবর' গ্রন্থে জুতা সেলাইয়ের প্রণালী অনুসন্ধান করারই অনুরূপ। কোরআন মজীদ "তিব্বে আকবর।" ইহা জুতা সেলাইয়ের কিতাব নহে। কোরআন মজীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং নফসের সংশোধন-প্রণালী পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের অনর্থক আলোচনার সহিত কোরআনের কি সম্পর্ক ? 'তওহীদ' প্রমাণের উদ্দেশে যদি কোন বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাস্‌আলা লইয়া প্রয়োজন পরিমাণ আলোচনা কোরআনের মধ্যে হইয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধে কোন কথা নাই। কিন্তু কোরআন মজীদকে বিজ্ঞানের গ্রন্থ মনে করা মহাভুল। খোদার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে এবং জগতের যাবতীয় পদার্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে ছাহাবায়ে কেরাম কোন প্রকার আলোচনা না করাতেই বুঝা যায়, এসমস্ত বিষয় প্রয়োজনের বাহিরে। কোন সত্যিকারের মুসলমানের সঙ্গে এসমস্ত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং সে সমস্ত এল্‌মই কাম্য, যাহার পরিণামে কোন কর্মগত উদ্দেশ্যও রহিয়াছে। যেমন, তকদীরের মাস্‌আলা এবং আল্লাহ্ তা'আলার অবতরণ সম্বন্ধীয় হাদীসে আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন। তওহীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী হইতেও এইরূপ বুঝা যাইতেছে ঃ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ এই সূরার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যখন খোদা তা'আলাকে এইরূপে বুঝিতে পারিবে, তখন লোভে কিংবা ভয়ে খোদা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিবে না। অফিসারের নৈকট্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন প্রজাসাধারণকে ভয় করে না, তদ্রূপ এক খোদার উপাসক খোদা ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না।

এক সময় জঙ্গলের মধ্যে ভ্রমণকালে কোন এক গ্রাম্য লোকের সহিত আকবর বাদশাহের বন্ধুত্ব হইয়া গেল। আকবর তাহাকে বলিলেন ঃ কোন সময় প্রয়োজনবোধ করিলে দ্বিধাহীনভাবে আমার বাড়ীতে চলিয়া যাইও। একদা সে কোন প্রয়োজনে আকবরের দরবারে আসিয়া দেখিল, তিনি নামায পড়িতেছেন এবং নামাযান্তে দোআ করিতেছেন। গ্রাম্য লোকটি যখন দেখিল যে, বাদশাহ স্বয়ং খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। তখন সে ভাবিল, তবে আমি বাদশাহের নিকট না চাহিয়া

খোদার নিকট চাহিতে পারি না কি? সে আকবর বাদশাহ্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলঃ "তোমার দয়ার প্রয়োজন নাই, আমি তাঁহার নিকট হইতেই চাহিয়া লইব। তিনি তোমাকে লাখে লাখে দিতেছেন—আমাকে দিবেন না কেন?" প্রকৃত তওহীদের ইহাই ফলঃ

موحد چه بر پائے ریزی زرش - چه فولاد هندی نهی بر سرش
امید وهراسش نه باشد ز کس - همیں است بنیاد توحید وبس

"তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির পদতলে ধন-সম্পদ স্তূপীকৃত রাখিয়া দাও না কেন, হিন্দী তরবারি তাহার মাথার উপর ধারণ কর না কেন, সে ধন-সম্পদের লোভও করিবে না এবং তরবারির ভয়েও কম্পিত হইবে না। ইহাই তওহীদের ভিত্তি।"

চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, আক্বীদা সম্বন্ধীয় মাসআলাসমূহে নাজাতের উদ্দেশ্য ছাড়া আরও অনেক উদ্দেশ্য কর্ম সম্বন্ধীয়ও রহিয়াছে। সুতরাং আমলের সঙ্গে যখন এল্‌মের এরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে, অতএব, মৌলবী শাব্বীর আহমদ ছাহেব আখেরাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তৎসঙ্গে আমলের বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়াও প্রয়োজন মনে করিতেছি।

আলেমদের সংসর্গের প্রয়োজনীয়তাঃ আলেমদের সংশ্রব সংসর্গের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার উদ্দেশেই আমি আমার পঠিত আয়াতটি অদ্যকার ওয়াযের বিষয়বস্তুরূপে অবলম্বন করিয়াছি। এই আয়াতটি আমলকেও প্রয়োজনীয় বলিতেছে। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা অভিযোগ করিতেছেন, মানুষ দুনিয়ার মহব্বতে মত্ত রহিয়াছে এবং আখেরাতকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দুনিয়ার মহব্বতের অর্থ দুনিয়াকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করা এবং আখেরাতের চিন্তা আদৌ না থাকা। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত কেহ কেহ সাধারণত কেবল দুনিয়া অর্জনকেই সংসারাসক্তির অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া এই শিক্ষার প্রতিও বিদ্রূপ করে এবং এই শিক্ষাপ্রাপ্তদের দৃষ্টান্ত বর্ণনায় বলেঃ

কোন এক বাদশাহ্‌র দরবারে আলেমদের প্রাধান্য ছিল। বাদশাহ্‌ তাহাদের মরজী অনুসারে চলিতেন। একদিন মৌলবী ছাহেবগণ বাদশাহ্‌কে বলিলেনঃ "বাদশাহ্‌ নামদার! এই সৈন্য-সামন্ত ও আমলা-কর্মচারীর ঝামেলায় ফায়দা কি? অনর্থক ব্যয়বাহুল্য। সমস্ত সৈন্য বরখাস্ত করিয়া দেওয়া উচিত।" বাদশাহ্‌ তাহাই করিলেন। শত্রু-রাজা যখন জানিতে পারিল যে, অমুক বাদশাহ্‌ সৈন্যবাহিনীকে বরখাস্ত করিয়া দিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিল। বাদশাহ্‌ মৌলবী ছাহেবগণকে ডাকিয়া বলিলেনঃ "শত্রু-রাজা আমার রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" মৌলবী ছাহেবগণ বলিলেনঃ "কোন চিন্তা নাই, আমরা আপোষে মীমাংসা করিয়া দিব।" তাঁহারা যাইয়া শত্রুপক্ষকে বুঝাইলেনঃ "ইহা বড় নিন্দনীয় কাজ। পরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া ভয়ঙ্কর পাপজনক। এমন জঘন্য কাজ করা উচিত নহে।" শত্রু কি কখনও উপদেশ শুনিয়া রাজ্যলোভ ত্যাগ করিতে পারে? অগত্যা তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বাদশাহ্‌কে বলিলেনঃ "সে তো উপদেশ মানে না, আপনিই ছাড়িয়া দিন। আপনার রাজ্য গেল, তাহার ঈমান গেল।" এইরূপে মৌলবীদের কথামত চলিতে গেলে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বসিতে হইবে। আমি কসম করিয়া বলিতে পারি—এসমস্ত দুনিয়াদার লোক আলেমদের সংস্পর্শে আসিতেছে না বলিয়া তাঁহাদের প্রতি এমন দোষারোপ করিতেছে। আলেমদের সংসর্গে থাকার জন্য কিছু সময় বাহির করিয়া লও। অধিক নহে, অন্তত চল্লিশ দিনই হউক।

দুঃখের বিষয়, নিজেদের দৈহিক রোগের চিকিৎসার জন্য চাকুরী হইতে বিনা বেতনে ছুটি লইতেছ। গৃহকর্মের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া টাকা-পয়সাও ব্যয় করিয়া থাক। দৈহিক রোগের জন্য চাকুরীহীন থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও মঞ্জুর। ডাক্তারকে ১৬ টাকা ফি দেওয়া মঞ্জুর। কিন্তু আত্মিক রোগের জন্য কিছুই চেষ্টা-তদবীর করিতেছ না। আরবী শিক্ষাপ্রাপ্ত রূহানী রোগের সিভিল সার্জন মৌলবী ছাহেবদের নিকট অতি অল্পকাল মাত্র (৪০ দিন) অবস্থান করিয়া রূহানী রোগের চিকিৎসা করাইলে সমস্ত প্রশ্নের ও সন্দেহের উত্তর প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত কার্যই চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হইয়া থাকে। যেহেতু দৈহিক রোগ হইতে আরোগ্যলাভ কাম্য হয়। সুতরাং ইহার জন্য সর্বপ্রকার ক্ষতি এবং কষ্টবরণ করিয়া লওয়া হয়। পক্ষান্তরে রূহানী রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা নিজেদেরই কাম্য নহে। আফসোস! রূহানী রোগ দূরীকরণের নিমিত্তও যদি দৈহিক রোগের ন্যায় চেষ্টা করা হইত—কতই না মঙ্গল হইত! কোন একজন তত্ত্বানুসন্ধানবিদের সংসর্গে ৪০ দিন অবস্থান করা কি কোন কঠিন কাজ? ইন্‌শাআল্লাহ্ তাঁহার সাহচর্যই সর্ববিধ সন্দেহ অপনোদনের জন্য যথেষ্ট হইবে। কোন প্রকার আলোচনা-সমালোচনার প্রয়োজন হইবে না।

اے لقائے تو جواب ہر سوال ـ مشکل از تو حل شود بے قیل وقال

“কামেল পীরের সন্দর্শনই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার দ্বারা সর্ববিধ মুশ্‌কিল আসান হইয়া যায়।” ইহার প্রমাণ—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লও। মাওলানা রূমী বলেনঃ

آفتاب آمد دلیل آفتاب ـ گر دلیلت باید ازوی رو متاب

“সূর্যই সূর্যের প্রমাণ। যদি প্রমাণ আবশ্যক হয়—তাহা হইতে মুখ ফিরাইও না।” আমি যে আলেমের সংসর্গে নির্দিষ্ট করিয়া ৪০ দিন অবস্থান করার কথা বলিয়াছি, তাহা হাদীসের মর্মানুসারেই বলিয়াছি। এক হাদীসে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি খাঁটি নিয়তে ৪০ দিনব্যাপিয়া নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার কাজে উৎসর্গ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তর হইতে হেকমত বা তত্ত্বজ্ঞানের নহর জারি করিয়া দেন। কিন্তু মনে রাখিবেন, কোন পার্থিব উদ্দেশে আলেমের সংসর্গে থাকিলে তাহাতে আখেরাতের ফায়দা কিছুই হইবে না।

যেমন, কোন এক গ্রাম্য অসভ্য লোককে এক মৌলবী ছাহেব বলিয়াছিলেনঃ তুমি একাধারে ৪০ দিন নামায পড়িলে আমি তোমাকে একটি মহিষ দিব। সে বলিলঃ “বহুত আচ্ছা।” চল্লিশ দিন পরে গ্রাম্য লোকটি আসিয়া মৌলবী ছাহেবের নিকট চল্লিশ দিন একাধারে নামায পড়িয়াছে জানাইয়া মহিষ দাবী করিল। মৌলবী ছাহেব বলিলেনঃ “আমি তো শুধু এই জন্য তোমাকে মহিষ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, মহিষের আশায় নামায পড়িতে পড়িতে তোমার নামাযের অভ্যাস হইয়া যাইবে; অতঃপর তুমি নামায কখনও ত্যাগ করিবে না।” সে বলিলঃ “আচ্ছা, তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়াছ? তবে যাও, আমিও ওযূ ছাড়াই টুঁ মারিয়াছি এবং ফাঁকি দিয়াছি।”

মৌলবী ছাহেবের নিকটে থাকিতে হইলে রুটি খাওয়ার নিয়তে থাকিবে না; বরং রুটি নিজ নিজ ঘর হইতে খাইবে। তাহাতে মৌলবী ছাহেবের নিকটে থাকার কিছু কদর হইবে। সর্বসাধারণের হিতকর একখানি চটি কিতাব আমার হযরত পীর ছাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী আমি নিজে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল বিনামূল্যে বণ্টন করিয়া দিব। কিন্তু হযরত পীর ছাহেব বলিলেনঃ বিনামূল্যে নহে—মূল্য লইয়া দান কর। কেননা, বিনামূল্যের বস্তুর কোন কদর হয় না।

মোটকথা, খাঁটি নিয়তে সরল বিশ্বাসে এবং বাজে ঝামেলা হইতে মুক্ত থাকিয়া খোদার কাজ করা উচিত। তাহাতেই কিছু ফল পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে। মুযাফ্‌ফরনগর জিলার অন্তর্গত কীরানা নামক স্থানে জনৈক তহসীলদার এক ব্যক্তিকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলঃ "ইহার মনে ধর্মীয় ব্যাপারে জটিল জটিল সন্দেহ রহিয়াছে। হুযূর তাহাকে কিছু বুঝাইয়া দিলে মনে শান্তি পাইতে পারিত।" আমি বলিলামঃ সে আমার সঙ্গে চলুক এবং কিছুদিন আমার ওখানে থাকিলে তাহার সন্দেহ আপনা-আপনিই দূর হইয়া যাইবে। এই চল্লিশ দিনের উদ্দেশ্যেই আরেফ শীরাযী বলিয়াছেনঃ

شنیدم رهروے در سر زمینے - همیں گفت ایں معما باقرینے

"শুনিতেছি—মা'রেফাতের পথের পথিক কোন স্থানে বসিয়া এই ধাঁধাটি এই ইঙ্গিত সহকারে বলিয়াছেন।"

সুতরাং অন্তত চল্লিশ দিনের জন্য তোমার অন্তরের বোতলে খোদার প্রেমের শরাব ভরিয়া লও। তোমার অন্তরে শান্তি আসিবে। বড় ওলীআল্লাহ্‌গণের খেদমতে থাকার সাহস না হইলে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমারই নিকটে থাকিয়া বিনামূল্যের ব্যবস্থাপত্র দ্বারা উপকার লাভ করিয়া দেখ। ফলকথা, কামেল লোকের সংসর্গের ফলেই এই শ্রেণীর সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যাইবে যে, "মৌলবীরা দুনিয়া উপার্জনে কি বাধা প্রদান করিতেছে?" প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাহারা দুনিয়ার অনুরক্ত হইতে নিষেধ করিতেছে। আলোচ্য আয়াতেও ইহার নিন্দাবাদ করা হইয়াছে এবং উক্ত আয়াত দ্বারা حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ হাদীসটির ব্যাখ্যাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়ার অনুরাগঃ মোটকথা, দুনিয়া উপার্জন করা এক কথা এবং দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত হওয়া আর এক কথা। দুনিয়া উপার্জন করা জায়েয, কিন্তু দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত হওয়া নাজায়েয। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন—প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পায়খানায় যাইয়া বসা, আর পায়খানাকে প্রিয় স্থান মনে করিয়া তথায় মন লাগাইয়া বসা। প্রথম অবস্থা জায়েয এবং দ্বিতীয় অবস্থা নাজায়েয। এইরূপ দুনিয়া উপার্জন করা জায়েয; কিন্তু দুনিয়াকে কাম্য এবং প্রিয় মনে করা হারাম। অনুরূপ শব্দেই কোরআন শরীফে ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে— كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ, "নগদ দুনিয়াকে তোমরা প্রিয় মনে করিতেছ আর আখেরাতকে ছাড়িয়া দিতেছ।"

এই আয়াতটি কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে মনে করিয়া কেহ কেহ এস্থলে প্রশ্ন করিতে পারে, যে আয়াত কাফেরদের উদ্দেশে নাযিল হইয়াছে, আমাদের সহিত উহার সম্পর্ক কি? এইরূপে তরজমা-কোরআন দেখিয়া যখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ নহে, তখন তাহারা মনে করিতে পারে, অন্যত্র অবতীর্ণ আয়াতের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক? এই কারণে এস্থানে এসম্পর্কে কিছু বর্ণনা করা আবশ্যক। কাহারও সহিত আল্লাহ্ তা'আলার ব্যক্তিগত মহব্বত কিংবা শত্রুতা নাই; বরং বিশেষ বিশেষ আমলের ভিত্তিতেই কাহারও প্রতি তাঁহার মহব্বত কিংবা শত্রুতা হইয়া থাকে। যদিও কোন কোন নির্দেশ কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নাযিল হইয়া থাকে; কিন্তু শব্দের ব্যাপকতার কারণে নির্দেশটি ব্যাপক হইয়া যায়। সুতরাং কাফেরদের শানে অবতীর্ণ আয়াতগুলি যদিও অবতরণের ক্ষেত্র হিসাবে নির্দিষ্ট, কিন্তু শব্দের ব্যাপকতার কারণে সেইগুলির হুকুম সকল মানুষের জন্য ব্যাপক। কাজেই যে কাজের দরুন কাফেরদের

নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা আমাদের মধ্যেও পাওয়া গেলে উক্ত আয়াত হইতে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, তবুও যদি উক্ত আয়াতগুলিকে কাফেরদের জন্য নির্দিষ্টও বলা হয়, তবে আমাদের জন্য আরও অধিক আফসোসের বিষয় যে, আমরা মুসলমান হইয়াও আমাদের মধ্যে কাফেরদের স্বভাব ও কার্যকলাপ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এমতাবস্থায় "কাফেরদের সম্বন্ধীয় আয়াতের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক?"—এরূপ সন্দেহের কোন কারণই থাকে না; বরং কাফেরদের সম্বন্ধীয় আয়াতগুলির ক্রিয়া আমাদের মধ্যে অধিক হওয়া উচিত। মোটকথা, সকলেই জানে যে, ব্যক্তিগত কারণে কাফেরদের নিন্দাবাদ, তিরস্কার এবং তাহাদের সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় না; বরং তাহাদের কুকর্মের জন্যই তাহাদিগকে তিরস্কার, নিন্দাবাদ এবং অভিযুক্ত করা হইয়া থাকে। তোমরা যদি মুসলমান হও, তবে সেই আয়াতগুলিকে দেখিয়া—যাহা কাফেরদের ঘৃণ্য কাজের নিন্দাবাদ ও তিরস্কারের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে, অধিক উপদেশ লাভ কর এবং লক্ষ্য করিয়া দেখ, এক দিন যাহা কাফেরদের স্বভাব ছিল, তাহা আজ আমাদের মধ্যেও পাওয়া যাইতেছে। আফসোস! কি অন্যায় কথা!

দেখুন, যদি কোন ভদ্রলোককে চামার বলা হয়, তবে তাহার নিকট অত্যন্ত খারাপ বোধ হইবে। কিন্তু চামারকে চামার বলিলে তাহার মনে কোনই কষ্ট হইবে না। এইরূপে কাফেরকে কাফের বলিলে তাহার মনে যতটুকু ব্যথা লাগিবে, তাহার চেয়ে অধিক ব্যথা আমাদের লাগা উচিত। যেমন, হাদীসে বলা হইয়াছেঃ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ এই হাদীসেও মনে করা উচিত যে, এখানে كَفَرَ শব্দের শাব্দিক অর্থ (কাফের হইয়া গেল) গ্রহণ না করিয়া এর পরিবর্তে গৌণ অর্থ (কাফেরের ন্যায় কাজ করিল) গ্রহণ করিলে ইহার কঠোরতা লোপ পায় না; বরং ভীতি প্রদর্শন ও তিরস্কার আরও বৃদ্ধি পাইয়া যায়।

আরও একটি সন্দেহ হইতে পারে, আখেরাত ত্যাগ করার জন্য যে তিরস্কার করা হইয়াছে, সেখানে আখেরাতের বিশ্বাস ত্যাগ করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আখেরাতের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করা। আর আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা আখেরাতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সুতরাং শব্দই এখানে ব্যাপক নহে। কাজেই وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ বাক্যের উদ্দেশ্য আমরা নহি। ইহার উত্তর এই যে, প্রথমত, 'আখেরাত ত্যাগ করার অর্থ উহার বিশ্বাস ত্যাগ করা' বলা, প্রমাণহীন দাবী। দ্বিতীয়ত, যদি তাহা মানিয়া লওয়া যায়, তবে অন্যান্য আয়াতে স্পষ্টরূপেই ব্যাপকতা বুঝা যাইতেছে। তৃতীয়ত, শব্দগুলির ব্যাহ্যিক শব্দ তো অবশ্যই শর্তহীন। যে হৃদয়ে ব্যথা আছে, তাহা সামান্য শাব্দিক মিল থাকিলেও অস্থির হইয়া যায়। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ সন্দেহও তাহাকে প্রাণান্ত করিয়া তোলে। কবি বলেনঃ عشق است وهزار بدگمانی "অন্তরে এশ্‌ক থাকিলেই হাজার সন্দেহ উৎপন্ন হয়।" কিন্তু ইহার জন্য হৃদয়ে কামনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকা আবশ্যক। যে হৃদয়ে এশ্‌ক্ নাই, তাহা কামনা ও আকাঙ্ক্ষা হইতে অনেক দূরে।

হযরত শিব্‌লী রাহেমাহুল্লাহর কিস্‌সা বিখ্যাত। কোন এক তরকারি বিক্রেতা তাঁহার সম্মুখ দিয়া ধ্বনি করিয়া যাইতেছিলঃ اَلْخِيَارُ الْعَشَرَةُ بِدَانِقٍ "এক সিকি দেরহামে দশটি কাক্‌ড়ী।" এই আওয়ায শ্রবণমাত্র তিনি خِيَارٌ শব্দের অর্থ কাক্‌ড়ীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ইহার অন্য অর্থ خَيْرٌ -এর বহুবচন خِيَارٌ অর্থাৎ, 'নেককার লোক' মনে করিলেন এবং ভাবিলেন, দশ জন নেক্‌কার লোকের মূল্য যখন সিকি দেরহাম, তখন আমার ন্যায় মন্দ লোকের মূল্য কি হইবে?

এই ভাবিয়া তিনি এক বিকট চীৎকার করিয়া বেহুশ হইয়া পড়িলেন। বস্তুত কোন বিষয়ের চিন্তা মনে প্রবল থাকিলে অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। জনৈক কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেনঃ

بسکه در جان فگار وچشم بیدارم توئی - هرکه پیدا می شود از دور پندارم توئی

"আমার আহত প্রাণে এবং জাগ্রত চক্ষুতে তুমিই বিরাজমান, দূর হইতে যাহাকিছু আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাকেই তুমি বলিয়া মনে করি।"

হাদীস শরীফে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) জুমুআর দিন মসজিদে খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন। আর কেহ কেহ ইতস্তত ঘুরাফেরা করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে বসিবার জন্য اِجْلِسُوْا "তোমরা বস" বলিয়া নির্দেশ দিলেন। জনৈক ছাহাবী ঐ সময় দরজা দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিতেছিলেন। হুযূরের اِجْلِسُوْا শব্দটি শ্রবণমাত্র তিনি দরজায়ই বসিয়া পড়িলেন। যদিও এই আদেশ তাঁহার জন্য ছিল না। কিন্তু হুযূরের হুকুমের প্রতি আনুগত্য অধিক প্রবল থাকায় দরজায়ই বসিয়া পড়িলেন। হুযূরের আদেশ যাহার উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, শ্রবণমাত্র প্রতিপালিত না হওয়া পছন্দ করিলেন না।

মুসলমান! তোমাদের মধ্যে আনুগত্যের রুচিও নাই, মহব্বতও নাই। তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের কামনা এবং মহব্বত পরিলক্ষিত হইতেছে না। কামনা এবং মহব্বত থাকিলে কখনও তোমাদের মনে ইত্যাকার উদ্ভট প্রশ্ন ও সন্দেহের উদয় হইত না। বস্তুত আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু দুনিয়ার অনুরাগ এবং আখেরাতের প্রতি বিরাগের নিন্দা করাই আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশ্য। ইহাদের স্তর বিভিন্ন, দুনিয়ার প্রতি যেই স্তরের অনুরাগ থাকিবে, আখেরাতের প্রতি বিরাগও সেই পর্যায়েরই হইবে এবং ইহাদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তিরস্কারও তদ্রূপই হইবে। যদি দুনিয়া প্রিয় এবং আখেরাত বর্জনীয় বলিয়া আন্তরিক বিশ্বাসের পর্যায়ে হয়, তবে সে অনন্তকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করিবার উপযোগী হইবে। কেননা, এরূপ বিশ্বাস কুফরী। আর যদি আখেরাতের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস থাকে, কিন্তু তদনুযায়ী আমল না করে, তবে তাহা ফাসেকী এবং ইহার ফলে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করিবে। ফলকথা, বিশ্বাসের যেমন প্রয়োজন, তদ্রূপ আমলেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। এই বিশ্বাস নিখুঁত রাখিতে হইবে, বিশ্বাস দুরুস্ত থাকিলে আমলের প্রয়োজন নাই—এরূপ বিশ্বাস করা মারাত্মক। বিশ্বাস ও আমল নিজ নিজ স্তরে স্বতন্ত্র বিষয়। আমরা সুন্নী সম্প্রদায়; সুতরাং আমরা উভয় বস্তুকেই প্রয়োজনীয় মনে করি।

ছগীরা গুনাহের প্রতি বেপরোয়া হওয়ার কুফলঃ বিশ্বাস দুরুস্ত রাখিয়া আমল না করার শাস্তি যদিও কুফরীর স্তরে নহে, তথাপি এই স্তরও অবহেলার যোগ্য নহে। ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকিবেন না; বরং ইহা ছগীরা গুনাহ্‌ হইলেও নিশ্চিন্ত হওয়ার বিষয় ছিল না। ভাবিয়া দেখুন, ক্ষুদ্র একটি অগ্নিকণা কি সর্বনাশ ডাকিয়া আনে! দুঃসাহসিকতার সহিত অবিরত ছগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকাও ভীষণ ক্ষতির কারণ। যিনি ছগীরা গুনাহ্‌কে বড় কিছু মনে করেন না, তিনি এখান হইতে যাইয়া ক্ষুদ্র একটি অগ্নি-কণা নিজের ঘরের চালে রাখিয়া দেখুন, অল্পক্ষণের মধ্যে কি কাণ্ড ঘটাইয়া দেয়। এইরূপে ছগীরা গুনাহ্‌ও সর্ববিধ নেক কাজকে বিনাশ করিয়া দিতে পারে, যদ্রূপ একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমস্ত ঘরকে জ্বালাইয়া ছাই করিতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের গুনাহ্‌ আখেরাত বর্জন। অর্থাৎ, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ঠিক রাখিয়া তদনুযায়ী আমল না করা, যদিও এই গুনাহের স্তর কুফরী হইতে নিম্নে, কিন্তু তদ্রূপ আমল করাও ভীষণ যুলম বা অন্যায়। বিশেষত কুফরী হইতে

নিম্নস্তরের হইলেই তাহা মূলত ছগীরা গুনাহ্ হওয়া অনিবার্য নহে। এই প্রসঙ্গে মাওলানার একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িয়াছেঃ

آسماں نسبت بعرش آمد فرود ـ لیك بس عالیست پیش خاك تود

“আরশের তুলনায় আসমান নিম্নে হইলেও যমীনের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে।”

অর্থাৎ, আরশ অপেক্ষা আসমান ক্ষুদ্র হইলেও যমীন অপেক্ষা অনেক বড়। কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর তুলনায় ছোট হইলে তাহা মূলত নিজে ক্ষুদ্র হওয়া অনিবার্য নহে। কেহ কেহ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস থাকার দাবী করিলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাস করে না; বরং জাতীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ধর্ম যেহেতু এমন একটি বিষয়, যাহা জাতির সমস্ত সদস্যকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিতে পারে; সুতরাং তাহারা সেই পথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের এই উদ্দেশ্য যদি অন্য কোন ধর্মের দ্বারা সফল হইবার আশা থাকিত, তবে কখনও তাহারা মুসলমান হইত না।

ধর্ম এবং উন্নতিঃ কোন এক খবরের কাগজে নিম্নের মন্তব্যটি পড়িয়া আফসোস হইলঃ “যেহেতু ইহা প্রগতির যুগ, কাজেই বর্বর যুগের কল্পনা ও চিন্তাধারা ত্যাগ করিয়া সকলেই এককেন্দ্রিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম অবলম্বন করা উচিত। তাহা এইরূপে সম্ভব হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার একত্বে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ইহাকেই ধর্মের মূল বলিয়া নির্ধারণ করা হউক। রাসূলের রেসালতে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা বাদ দিলেও চলিতে পারে।” দুঃখের বিষয়, মুসলমান হইয়া এইরূপ মন্তব্য?

از مذهب من گبر ومسلمان گله دارد

“আমার ধর্মের বিরুদ্ধে মুসলমান এবং কাফের সকলেই অভিযোগ করে।”

এধরনেরই এক ব্যক্তির উক্তির উত্তরে আমি বলিয়াছিলামঃ “আল্লাহ্ তা'আলার একত্বে তো বিশ্বাস কর। আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁহার সত্তা এবং গুণাবলীতে একক সত্তা মনে করাই ‘তওহীদ’।” বস্তুত সত্য বলাই মানবীয় গুণাবলীর অন্যতম। মিথ্যা বলা খুবই ক্ষতিকর। সুতরাং মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তওহীদের বিপরীত হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ অতএব, যে ব্যক্তি রেসালতে অবিশ্বাস করিবে সে আল্লাহ্‌র একত্বেও অবিশ্বাসী হইবে। সুতরাং তওহীদে বিশ্বাসের দাবী করিলে তাহার পক্ষে রেসালতে বিশ্বাস করাও অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর জাতি-পূজকরা রাসূলের রেসালতই খতম করিয়া ফেলিতেছে। এই শ্রেণীর লোকেরা কালক্রমে কদাচিৎ ইসলামের যৎকিঞ্চিৎ খেদমত করিলেও আমরা তাহাদের সেই খেদমতের কোনই মূল্য দিতে পারি না। কেননা, ধর্মের খেদমত করা তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে; বরং শুধু সমাজ বা জাতির উন্নতিসাধনই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সত্য জ্ঞানে ইসলামের খেদমত করিলে তাহাদের কার্যকলাপেই তাহা প্রকাশ পাইত। কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলী ইহার বিপরীত বোধ হইতেছে। তাহারা ইসলামী আকীদাসমূহের সমালোচনা করিতেছে। ধার্মিক লোকদিগকে তুচ্ছ ও হীন মনে করিতেছে এবং ইস্‌লামের বিধানসমূহে সন্দেহ সৃষ্টি করিতেছে। সত্য মনে ইস্‌লামের খেদমত করিলে এসবের সুযোগ কখনও আসিত না। তাহাদের উদ্দেশ্য জাতির গণ্ডি সম্প্রসারিত করা এবং জাতীয়তার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করা, যেমনিভাবে

অন্যান্য জাতি জাগ্রত হইয়াছে এবং উন্নতি লাভ করিয়াছে। মুসলমান সমাজ উন্নতিলাভের ক্ষেত্রে সকলের শেষে জাগ্রত হইয়াছে। বস্তুত এরূপ জাগ্রত হওয়ার চেয়ে নিদ্রিত থাকাই ভাল ছিল। মোটকথা, আখেরাত বর্জন করা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকাল কয়েক প্রকারের লোক দেখা যাইতেছে।

(১) প্রাচীনপন্থী আমীর লোক—ইহাদিগকে সাধারণ শ্রেণীর খারাপ কার্যে লিপ্ত দেখা যায়। যদিচ বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা তাহাদের কর্ম-জীবনকে নিতান্ত নিকৃষ্ট করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা আলেম-ফাযেল এবং নেককার লোক দেখিলে তাহাদের যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে এবং তাহাদের সম্মুখে অবনত থাকে। আর তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ওয়ালা হিসাবে শ্রদ্ধার পাত্র ভাবিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এমন কি, শুধু দরবেশ বেশধারী লোক দেখিলেই, সে মূলে ডাকাতই হউক না কেন, অন্তরের সহিত ভয় করে এবং খেদমত করে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর দুনিয়াদারগণ তথাকথিত দরবেশদের চেয়ে সহস্র গুণে উত্তম।

আমার জনৈক বন্ধু বলিতেন ঃ অমুক জায়গার সমস্ত আমীর লোক বেহেশ্‌তী এবং সমস্ত ফকীর লোক দোযখী। কেননা, তথাকার ফকীরদের সহিত আমীরদের সম্পর্ক শুধু ধর্মের জন্য। পক্ষান্তরে ফকীর লোকেরা কেবল পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমীর লোকদের সহিত সংস্রব রাখিতেছে।

জনৈক পীরের কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে ঃ এক মুরীদ আসিয়া উক্ত পীরের নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করিল ঃ "হুযূর আমি দেখিলাম আমার অঙ্গুলি পায়খানায় পূর্ণ আর আপনার অঙ্গুলি মধুমাখা।" পীর ছাহেব তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন ঃ "ঠিকই তো দেখিয়াছ। ইহাতে সন্দেহ কি ? আমি এইরূপই এবং তুমি ঐরূপই।" মুরীদ বলিল, "আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত এখনও পূর্ণ হয় নাই। আমি ইহাও দেখিলাম যে, "আপনি আমার অঙ্গুলি চাটিতেছেন আর আমি আপনার অঙ্গুলি চাটিতেছি।" ইহা শুনিয়া পীর ছাহেব অতিশয় রাগান্বিত হইলেন। এই স্বপ্নের সারমর্ম এই যে, মুরীদ পীর হইতে ধর্ম শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহা মধুসদৃশ। আর পীর মুরীদ হইতে দুনিয়ার স্বার্থ লাভ করিতেছে, তাহা পায়খানাসদৃশ।

(২) আর এক প্রকারের লোক দেখা যায়, তাহাদের মনে ইস্‌লামের কোন গুরুত্ব বা মর্যাদাই নাই।

প্রথম প্রকারের লোকদের সংশোধনের উপায় অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করা। তাহাদের জ্ঞান-বিশ্বাস ঠিকই আছে, কেবল আমলে কমতি ছিল, তাই তাহাদেরকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। যেমন, হাদীসে আছে ঃ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'মৃত্যুকে খুব স্মরণ কর।' এই প্রকারের লোকেরা মৃত্যুর কল্পনা ও মুরাকাবা করিলে অতিসত্বর সংশোধন হইয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন আরও রেওয়ায়ত আছে যে, দৈনিক বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করিলে শহীদের মর্যাদা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, কেবল মৃত্যুর নাম জপ কর; বরং ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এমনভাবে মৃত্যুর স্মরণ কর, যাহা গুনাহ্‌ হইতে রক্ষা পাওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের সংশোধনের উপায় ঃ কোন তত্ত্বজ্ঞানী ও আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সংসর্গে থাকা। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুসলমানদের প্রতি সদয় হও। তোমরা বড়ই বিপজ্জনক অবস্থায় রহিয়াছ। তোমাদের সংশোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এখন একটি কথা জানিয়া লউন—দুনিয়াদারগণ যেমন উপরোক্ত দুই ভাগে বিভক্ত। তদ্রূপ দ্বীনদারগণও আখেরাত বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই ভাগে বিভক্ত। যাহেরওয়ালা এবং বাতেনওয়ালা।

ধর্মপরায়ণ লোকদের ত্রুটি ঃ দ্বীনদারদের মধ্যে একটি বাহ্যিক ত্রুটি এই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, তাহারা এমন কতকগুলি ধর্ম-কর্ম বর্জন করিয়া বসিয়াছে, যাহা বর্জন করা তাহারা ধর্মীয়

বিধানের বিপরীত মনে করে না। এইরূপে তাহারা পারলৌকিক ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, পরনিন্দা আজকাল ব্যাপক রোগে পরিণত হওয়ার কারণে ইহাকে পরহেযগারীর জন্য ক্ষতিকরই মনে করে না। বিবি তমীজা খাতুনের ওযূর মত। নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতম পাপানুষ্ঠানের পরেও তাহার ওযূ নষ্ট হইত না। এই রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে কোন কবি বলিয়াছেনঃ

قال را بگذار مرد حال شو ـ پیش مرد کاملے پا مال شو

“কথা ছাড়িয়া কাজে নিমগ্ন হও। কোন পীরে কামেলের পদতলে আশ্রয় লও।” অন্যথায় মানুষের অবস্থা প্রায়শ এইরূপ হয় যে,

واعظاں کیں خلوہ بر محراب وممبر می کنند ـ چوں بخلوت می روند آں کار دیگر می کنند
مشکلے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس ـ توبه فرمایاں چرا خود توبه کمتر می کنند

“মসজিদের মেহ্‌রাবে মিম্বরের উপর বসিয়া যাঁহারা ওয়ায করিয়া থাকেন—লোকচক্ষুর অন্তরালে যাইয়া তাঁহারা অন্যরূপ কাজে লিপ্ত হন। মজলিসের মধ্যে যিনি অধিক জ্ঞানী ও বরেণ্য, তাঁহার কাজের কৈফিয়ত তলব করা কঠিন। দুঃখের বিষয়, যিনি স্বয়ং তওবার ধার ধারেন না, তিনি তওবা করিবার উপদেশ দিয়া বেড়ান।”

ইহা হইল ওয়ায-নছীহতকারীদের দোষ। যাহারা ওয়ায করেন না, তাহাদের মধ্যে ইহার চেয়ে অধিক মারাত্মক দোষ এই যে, অনেকে নিজে আমল করেন না বলিয়া ওয়াযও করেন না। ইহারা দ্বিবিধ দোষে দোষী। (১) নিজে আমল করেন না, আমলের জন্য চেষ্টাও করেন না। (২) অন্যান্য লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করেন না। কতক আলেম এরূপ আছে যে, ধনী লোকের দরবারে পড়িয়া থাকিয়া অর্থ-পিপাসু ও লোভী হইয়া যায়। ইহা অতিশয় নিন্দনীয়। সৎ ও নেক্‌কার লোক সর্বদা ধনী লোক অবজ্ঞা করিয়া চলেন। কথিত আছেঃ

بِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْاَمِيْرِ وَنِعْمَ الْاَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ ○

“ধনী লোকদের দ্বারস্থ দরিদ্র লোক অতি নিন্দনীয় এবং দরিদ্র লোকের দ্বারস্থ ধনী লোক অতিশয় প্রশংসনীয়।”

যে সমস্ত আলেম ধনী লোকের মুখাপেক্ষী থাকেন, তাঁহারা কখনও হক কথা বলিতে সাহস পান না। কেননা, অর্থের লোভ তাহাদিগকে বোবা করিয়া রাখে। طمع بگسل وهرچه خواهی بگو “লালসা ছাড়িয়া দিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারিবে।”

শাহ সলীমের ঘটনা, বাদশাহ শাহ্‌জাহান তাঁহার নিকট আসিলে তিনি পা গুটাইলেন না। পরে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেনঃ “যখন হইতে হাত গুটাইয়াছি, পা প্রসারিত করিয়া দিয়াছি।”

মাওলানা ইস্‌মাঈল শহীদ (রঃ) একবার লক্ষ্ণৌ পদার্পণ করিলেন। লক্ষ্ণৌর জনৈক শাহ্‌যাদা তাঁহার দরবারে আসিয়া যমীনে মাথা রাখিয়া সালাম করিল। তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইলেন। সে আশ্‌রাফী (স্বর্ণ-মুদ্রা) হাদিয়া পেশ করিল। তিনি মুখ ভেংচাইলেন। মাওলানা ইচ্ছাপূর্বকই এরূপ করিয়াছিলেন। দুনিয়াদারগণ আসিয়া যেন বিরক্ত না করে। অশালীন মনে করিয়া যেন কাছে না

ঘেঁষে। ফলে তিনি দুনিয়াদারদের ঝামেলা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই সমস্ত তিনি নির্লোভ থাকার কারণেই করিতে পারিয়াছিলেন।

সুতরাং অর্থ-লিপ্সার প্রতিকার এই শ্রেণীর আওলিয়ায়ে কেরামের সংস্পর্শে থাকা। আল্লাহ্-ওয়ালাগণের সংসর্গে থাকিলে ধনের লিপ্সা দূরীভূত হইয়া যায় এবং অভ্যন্তরীণ অভাবশূন্যতা লাভ করা যায়। বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানকারীদের মধ্যে এই ত্রুটি বিদ্যমান। ইহা শুনিয়া বাতেনী ধর্মানুষ্ঠানকারিগণ মনে মনে খুশী হইবেন যে, “আমাদের মধ্যে কোন ত্রুটি নাই এবং কোন নিন্দনীয় কার্যও নাই।” কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ থাকা উচিত, সুস্বাদু খাদ্য পচিয়া গেলে তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। সূফিগণের পথভ্রষ্টতাও ঠিক এইরূপই বটে। সূফীদের মধ্য হইতে কেহ পথভ্রষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে অসদাচরণ, কোপন স্বভাব প্রভৃতি বদভ্যাস দেখা দেয়। অথচ দরবেশগণের মধ্যে এসমস্ত নিকৃষ্ট স্বভাব বিদ্যমান থাকা অতিশয় নিন্দনীয় এবং ঘৃণেয়।

আমার পীর হযরত হাজী ছাহেব কেব্লার তা'লীম বলিতেছি। তিনি বলিতেন ঃ “কোন কোন দরবেশ লোক আমীর লোকদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, আমি ইহা পছন্দ করি না। কোন আমীর তোমার দ্বারে আসামাত্র— نِعْمَ الْاَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ ‘ফকীরের দ্বারস্থ আমীর ব্যক্তি উত্তম লোক’ বাক্য অনুযায়ী উত্তম আমীর বলিয়া গণ্য হইল। সুতরাং তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করা উচিত।” হযরত হাজী ছাহেব কেব্লা সকলের সঙ্গেই মিশিতেন এবং اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ “মানুষকে তাহাদের মর্যাদানুসারে সম্মান কর” বাক্যানুসারে সকলেরই যথোপযোগী সম্মান করিতেন। আমাদের প্রতিও নির্দেশ—মানুষের সহিত তাহাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ কর। আমার ধারণা, আল্লাহ্ যাহাকে আমীর বা বড় লোক বানাইয়াছেন, তোমরাও তাহাকে বড় মনে কর। অবশ্য তাহাদের খোশামোদ-তোষামোদ করিও না বা তাহাদের নিকট হইতে কোন কিছুর লোভ করিও না, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিও। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহারা সৎ-স্বভাবাপন্ন, তাহারা আমীর লোকদের সঙ্গে মিশেন না, তাহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করেন না ; তবে তাঁহারা তাহাদের সংশোধন কেমন করিয়া করিবেন ? আচ্ছা, আপনারা তাহাদের বাড়ীতে যাইবেন না। কিন্তু তাহারা আপনাদের দরবারে আসিতে ইচ্ছা করিলেও বাধা দিবেন না ; বরং আসিলে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপত্তি করিবেন না। কেননা, তাহাদের সংশোধন করাও আপনাদের জন্য ফরয। কোন কোন আমীর লোক আলেম ও পীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকেন, “তাহারা আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের হেদায়ত এবং সংশোধন করেন না কেন ?” আমার উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে আপনারা সেই অভিযোগের অসারতা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, পিপাসার্ত ব্যক্তিই কূপের নিকট যায়। কূপ কখনও পিপাসার্তের নিকট যায় না। আলেমগণ তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন, তোমরাই আলেমদের মুখাপেক্ষী ; অতএব, তোমরাই তাঁহাদের নিকট যাও। কোন সিভিল সার্জন কোনদিন তোমাদের ডাকা ব্যতীত এবং ভিজিট গ্রহণ ব্যতীত তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে কি ? সুতরাং আমার মতে মৌলবীরাও যদি হেদায়তের জন্য ফিস্ নির্ধারিত করিয়া দেয়, তবে তাহা সঙ্গতই হইবে। কিন্তু মৌলবী ছাহেবগণ তাড়াহুড়া করিবেন না। আমার মত প্রকাশ পাইতেই ফিস্ বসাইয়া দিবেন না ; আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এখনও সময় আসে নাই। দুনিয়ার দরবেশগণের মধ্যে উপরিউক্ত এই কোপন স্বভাব দোষ রহিয়াছে ; কাজেই তাঁহারাও নির্দোষ নহেন।

সূফিগণের ত্রুটি ঃ প্রকৃত সূফী লোকের মধ্যে আর এক প্রকারের দুনিয়া-প্রীতির দোষ রহিয়াছে, যাহা অতি সূক্ষ্ম। তাহারা সামান্য কাজ করিয়াই কোন অবস্থা বা হাল উৎপন্ন হওয়ার প্রতীক্ষায়

থাকেন। কোন হাল উৎপন্ন হইলে ইহাও দুনিয়া-প্রীতির ফল। কেননা, হাল উৎপন্ন হওয়া ইহলৌকিক ফল। আল্লাহ্ তা'আলা এই ফল প্রদানের ওয়াদাও করেন নাই। আখেরাতের ফলই প্রকৃত ওয়াদা এবং উদ্দেশ্য। তাহা হইল দোযখের শাস্তি হইতে মুক্তি এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভ করা। ইহাও সূফীদের বড় ত্রুটি, ইহার প্রতি অনেকে লক্ষ্যই করে না, ইহার প্রতিকার বর্ণনা করিতেছি।

হযরত হাজী ছাহেব মরহুমের নিকট যদি কেহ আসিয়া বলিত, "হযরত! আল্লাহ্‌র নাম লইয়া কোন ফায়দা পাইতেছি না।" তিনি উত্তর করিতেনঃ "আল্লাহ্‌র নাম লইতে পারিতেছ, ইহা কি কম লাভ?"

گفت ان الله تولبیك ماست ـ ویں نیاز ودر دل پیك ماست

হযরত হাজী ছাহেব ইহাও বলিয়াছেনঃ যে আমীর লোক তোমাকে পছন্দ করে না, তুমি তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিলে কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দিবে। অতএব, তোমরা যখন মসজিদে যাইতেছ এবং তথা হইতে বহিষ্কৃত হও না, তখন ইহাতেই মনে করিও যে, তোমার হাযিরী কবূল হইয়াছে। দেখিতে পাইতেছ না, যাহাদের হাযিরী কবূল নহে, তাহাদের মসজিদে যাওয়ার তওফীকই দেওয়া হয় না।

একটি ঘটনা—কোন এক আমীর লোকের চাকর নামাযের সময় হইলে প্রভুর অনুমতি চাহিল। মনিব বলিলেনঃ আচ্ছা, যাও। চাকর মসজিদে চলিয়া গেল আর মনিব ঘরের দরজায় বসিয়া রহিল। মসজিদ হইতে ফিরিতে চাকরের অনেক গৌণ হইয়া গেল। মনিব অগত্যা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ এতক্ষণ মস্‌জিদে কি করিতেছ? চাকর উত্তর করিলঃ "বাহির হইতে দেন না।" মনিব বলিলেনঃ "কে বাহির হইতে দেয় না?" সে উত্তর করিলঃ "যিনি আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেন না, তিনি।"

যেকের এবং কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাঃ এক ব্যক্তি কোন একজন তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলঃ "এত দিন যাবত যেকের এবং এবাদত করিতেছি, আজ পর্যন্ত কোন ফল পাইলাম না।" উত্তরে তিনি বলিলেনঃ "ফল না পাইলেও কোন পরোয়া নাই।" ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর—প্রভু যদি কোন চাকরকে কোন কাজের আদেশ করেন, তখন চাকর যদি জিজ্ঞাসা করে, এই কাজের বিনিময় কি পাওয়া যাইবে? চাকরের এই উক্তি ধৃষ্টতা বলিয়া গণ্য হইবে না? এইরূপে আমরাও খোদার গোলাম। তাঁহার নিকট কোন বিনিময় চাওয়ার অধিকার আমাদের নাই।

'বোস্তাঁ' কিতাবে একটি কাহিনী লিখিত আছে। এক ব্যক্তি এবাদত করিত, কিন্তু গায়েবী আওয়ায আসিত—"কবূল হয় না।" তবুও সে যথারীতি এবাদতে মগ্নই থাকিত। তাহার, জনৈক মুরীদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ এমন এবাদতে ফল কি, যাহা কবূল হয় না। তিনি বলিলেনঃ বৎস!

توانی از آں دل به پرداختن ـ که دانی که بے او تواں ساختن

"এই দ্বার ভিন্ন অপর কোন দ্বার থাকিলে আমি তথায় চলিয়া যাইতাম। দ্বার তো মাত্র এই একটিই। এখান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় যাইয়া ঠাঁই পাওয়া যাইবে?" তৎক্ষণাৎ আওয়ায আসিলঃ

قبول است گرچه هنر نیست است ـ که جز ما پناه دیگر نیست است

“যদিও গুণ বলিয়া গণ্য নহে, তথাপি কবূল করা গেল। কেননা, আমার দ্বার ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল নাই।”

বাইআ'তের স্বরূপঃ কানপুর শহরে শাহ্‌ গোলাম রাসূল ‘রাসূলনোমা’ নামে একজন বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি তাওয়াজ্জুহ্‌ দ্বারা মুরীদকে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) যেয়ারত করাইয়া দিতেন। তিনি ভিন্ন আরও অনেক বুযুর্গ লোক ছিলেন, যাঁহারা হুযূরে আকরামের (দঃ) যেয়ারত করাইতেন। যাহাহউক, তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে নিজ পীরের দরবারে বাইআত হইতে গেলেন। পীর ছাহেব তাঁহাকে এস্তেখারা করিতে বলিলেন। শাহ্‌ ছাহেব তথা হইতে একটু দূরে সরিয়া বসিলেন এবং একটু পরেই আবার হাযির হইলেন। পীর ছাহেব জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “এস্তেখারা কেমন দেখিলে?” তিনি বলিলেনঃ “আমি বাইআত হওয়া সম্বন্ধে নফ্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলাম (‘বাইআত’ শব্দের অর্থ—বিক্রীত হওয়া)। তুমি বাইআত হইলে আযাদী হারাইয়া গোলামে পরিণত হইবে। বোকার মত কাজ করিতে যাইতেছ কেন? নফ্‌স্‌ উত্তর করিলঃ বিক্রীত হওয়ার পরে খোদা তো পাওয়া যাইবে?” আমি বলিলামঃ “খোদা তোমার ইজারার সম্পত্তি নহে। যদি না পাইলে?” নফ্‌স্‌ বলিলঃ না পাওয়া গেলে পরোয়া কি? তিনি তো এতটুকু জানিতে পারিলেন যে, কেহ আমার অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু আমি ধরা দেই নাই।

همینم بس که داند ماهر ویم ـ که من نیز از خریداران اویم

“আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট— আমার প্রিয়জন জানিতে পারিল যে, আমিও তাঁহার অন্যতম খরিদ্দার।”

পীর ছাহেব বলিলেনঃ “আল্লাহ্‌ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। এমন এস্তেখারা কেহ করে নাই।”

প্রত্যেক ব্যাপারে কাজই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ফল পাওয়া যাক্‌ বা না যাক্‌, সকল অবস্থাতেই রাজী থাকা উচিত।

এরূপ না হইলে সেই কাজ প্রকারান্তরে দুনিয়া-প্রীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে। তাই বলি, মুসলমান! আখেরাতের জন্য আমল করুন। অন্যথায় আখেরাত বর্জন এবং দুনিয়া-প্রীতির দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

তারজীহুল্ আখেরাহ্

[আখেরাতের প্রাধান্য]

■

দুনিয়া উপভোগ করিতে শরীঅত নিষেধ করে নাই, কেবল দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রগণ্য করিতে বারণ করিয়াছে। অতএব, ব্যবসায়ের দ্বারাই হউক আর চাকুরী দ্বারাই হউক, প্রয়োজন পরিমাণে দুনিয়া উপার্জন করা হারাম নহে, তবে ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া দুনিয়া উপার্জন করা অবশ্যই হারাম।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ○ صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى ○

আল্লাহ্ তা'আলার অভিযোগ

তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলির মধ্যে প্রথম আয়াতটি সম্বন্ধে আমি বর্ণনা করিব। পরবর্তী আয়াত দুইটিতে এই আয়াতেরই পোষকতা রহিয়াছে। সুতরাং আমিও পোষকতার জন্যই পাঠ করিয়াছি, অন্যথায় প্রথম আয়াত সম্বন্ধে বলাই আমার উদ্দেশ্য। কেননা, এই আয়াতটিই মুখ্য এবং পরবর্তী দুইটি ইহার আনুষঙ্গিক। কাজেই বর্ণনার বেলায়ও ইহাদিগকে মুখ্য এবং আনুষঙ্গিক-রূপেই গণ্য করা হইবে।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের একটি অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর উহা সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। এই অবস্থাটি যেমন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত—উহার একটি স্তর কাফেরদের সহিত সীমাবদ্ধ। আর একটি স্তর কাফের এবং মুমেনদের মধ্যে ব্যাপক—তেমনি এই অবস্থা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহাও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। বড় অবস্থা সম্বন্ধে অধিক

অভিযোগ এবং ছোট অবস্থা সম্বন্ধে কম অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু ছোট স্তরের অবস্থা মুমেন এবং কাফেরের মধ্যে ব্যাপক; সুতরাং এই অবস্থা সম্বন্ধীয় অভিযোগও উভয় সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাপক।

এখন শুনুন, সেই অবস্থাটি কি এবং তৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি? আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا "বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দান করিতেছ।" এই বাক্যে (بل) বরং শব্দটি হইতে বুঝা যায়, পূর্বোক্ত উক্তি ত্যাগ করিয়া উহার বিপরীত অন্য একটি কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে বলা হইয়াছিলঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى "যাহারা নিজের নফ্‌সের পবিত্রতা সাধন করিয়াছে এবং স্বীয় প্রভুর নাম যেকের করিয়া নামায পড়িয়াছে—তাহারাই সফলতা লাভ করিয়াছে।" অর্থাৎ সফলতালাভের উপায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, "যাহারা কোরআন শরীফ শ্রবণপূর্বক কলুষিত আকীদা, স্বভাব ও অসঙ্গত কার্যাবলী হইতে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে এবং স্বীয় প্রভুর নাম যেকের করিতে ও নামায পড়িতে রহিয়াছে, তাহারাই সফলকাম হইয়াছে। অতঃপর (بل) 'বরং' দ্বারা পূর্বকথা পরিত্যাগপূর্বক বলিতেছেনঃ "কিন্তু হে অবিশ্বাসিগণ! তোমরা কোরআন শ্রবণ করিয়া উহার নির্দেশ পালন কর না, তদনুযায়ী আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ কর না; বরং তোমরা ইহলৌকিক জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতেছ। সারকথা, সফলতালাভের বিপরীত আমাদের এই অবস্থা। অবশ্য ইহাকে পরিষ্কারভাবে বিপরীত অবস্থা বলা হয় নাই। কিন্তু (بل) অর্থাৎ, 'বরং' শব্দে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ববর্তী কথা বিলোপ করিয়া অন্য একটি কথা সাব্যস্ত করা হইয়াছে। বস্তুত বিলোপ করা ও সাব্যস্ত করার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই বুঝা যাইতেছে, এই অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থার বিপরীত। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারিলেন, পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া সফলতালাভের বিপরীত এবং ইহার ফলে সফলতা বিফলতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং আমাদের সেই অবস্থাটি এই যে, আমরা নিজেদের সফলতালাভের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতেছি না। পরন্তু খোদা তা'আলা আমাদের এই অবস্থারই অভিযোগ করিয়া বলিতেছেনঃ "তোমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতেছ।"

সুতরাং এই বিষয়টি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এস্থলে যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সাধারণ অভিযোগ নহে; বরং ইহার পরিণাম সফলতা লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিফলতা ও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাই তো আমাদের চৈতন্য উদয়ের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত এবং আমাদের মনে এই ভয় আসা উচিত যে, সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অবস্থারই অভিযোগ করিতেছেন। ইহা কি কম কথা? আহ্‌কামুল হাকেমীন' কাহারও অবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। সাধারণ হাকিমের অভিযোগেই লোকের দুর্দশার সীমা থাকে না। তদুপরি আল্লাহ্‌র অভিযোগের কথা শুনিয়া মুসলমান মাত্রেরই সতর্ক হওয়া উচিত। বিশেষত যখন এমন বিষয়ে অভিযোগ করা হইতেছে—যাহার পরিণাম আমাদের জন্যই ক্ষতিকর। আল্লাহ্ পাকের তাহাতে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। এই আয়াতটিতে যদিও কাফেরদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমরা নিশ্চিন্ত ও দুঃসাহসী হইতে পারি না। কেননা, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিভিন্ন স্তর আছে। অবশ্য উহার প্রধানতম স্তর কাফেরদের মধ্যেই রহিয়াছে। এই কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও সর্বাপেক্ষা বড়। আর আমাদের মধ্যে তাহা ক্ষুদ্র স্তরের বলিয়া আমাদের বিরুদ্ধে

অভিযোগও ছোট ; কিন্তু অভিযোগ অবশ্যই আছে। কেননা, কারণ যখন বিদ্যমান তখন অভিযোগ নিশ্চয়ই হইবে। অতএব, এই আয়াতটিতে কাফেরদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে ভাবিয়া আমাদের নির্ভীক হওয়া উচিত নহে এবং মনে করা উচিত নহে যে, উক্ত দোষে কাফেরেরা যত গাফেল আমরা তত গাফেল নহি। কেননা, কাফেরদের তুলনায় সামান্য হইলেও যখন আখেরাত হইতে অসতর্কতা আমাদের মধ্যে কিছু রহিয়াছে, তখন আমরা কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।

ক্ষতিকর বিষয়ের বিভিন্ন স্তরঃ পার্থিব ব্যাপারে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ক্ষতিকর বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে, তাহাতে কেহ সর্বপ্রধান স্তর ত্যাগ করিয়া অপর কোন প্রধান স্তর অবলম্বন করে এমনটা দেখা যায় না। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের রুচির কথা ছাড়িয়াই দিন। তাঁহারা তো লাভ-ক্ষতির কথা ছাড়িয়া খোদার অসন্তোষকেই পর্বত-পরিমাণ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু পেটপূজকেরা হয়ত সর্বনিম্ন স্তরের ক্ষতিকর বিষয়কে কিছুটা সহজ ও সম্ভব মনে করে। তাই বলিয়া ইহারাও প্রধানতমকে ছাড়িয়া প্রধানকে অবলম্বন করেনা। সর্বনিম্নস্তরের ক্ষতিকর বিষয়কে যে ইহারা সহজ মনে করে তাহা কেবল ধর্মীয় ব্যাপারেই। অন্যথায় পার্থিব ব্যাপারে তো তাহারা সর্বনিম্ন স্তরের ক্ষতিকর বিষয় হইতেও তেমনি সাবধানতা অবলম্বন করে, যেমন বড় রকমের ক্ষতিকর বিষয় হইতে সাবধান থাকে।

দেখুন, আপনাদের কাহারও ঘরের চালে একটি বড় জ্বলন্ত কয়লা পড়িতে দেখিলে যতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকণা পড়িতে দেখিলেও ততটুকুই ভীত এবং সাবধান হইবেন।

এইরূপে কেরোসিনের পূর্ণ টিনের মধ্যে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ফেলিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকেন না। অথচ ইহাতে ম্যাচের কাঠি পড়িয়া কোন কোন সময় নিভিয়াও যায়। তথাপি তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কেননা, আগুনে পুড়িয়া যত লোক মরিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহারা বিরাট অগ্নিকুণ্ড কিংবা কোন বয়লারের আগুনে পুড়িয়া মরে নাই; বরং ইহাদের অধিকাংশকে ক্ষুদ্র একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠিই ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং জ্ঞানীরা বিরাট অগ্নিকুণ্ড কিংবা ইঞ্জিনের আগুনকে যেরূপ ভয় করে, ক্ষুদ্র একটি অগ্নিকণাকেও সেরূপই ভয় করিয়া থাকে ; বরং ক্ষুদ্র অগ্নিকণা হইতে সতর্ক থাকার প্রতি বেশী জোর প্রদান করে। কেননা, নির্বোধেরা ইহাকে তুচ্ছ মনে করিয়া ইহা হইতে কম সতর্ক থাকে। সুতরাং আপনি কখনও কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে কাহাকেও তন্দুর কিংবা ইঞ্জিনের আগুন হইতে আত্মরক্ষার তালীম দিতে দেখেন নাই। কারণ, ইহা হইতে সকলেই সতর্ক থাকে। অবশ্য অনেকবারই চেরাগ কিংবা অগ্নিকণা হইতে সতর্ক থাকার তালীম দিতে নিজেদের মুরুব্বীয়ানকে দেখিয়াছেন।

অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, নিম্নস্তরের ক্ষতিকর বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করাই অধিক সঙ্গত। এই কারণেই হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদিগকে বেগানা পুরুষের সঙ্গে নির্জনে দেখা করিতে নিষেধ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু ইহার ভাষা তত কঠিন নহে, যত কঠিন ভাষায় ঐ সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্বের সহিত নির্জনে দেখা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয আছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্ত্রীলোক যদি তাহার দেবরের সহিত নির্জনে উঠা-বসা করে তাহা কেমন ? হুযূর উত্তরে বলিলেনঃ اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ "দেবরের সঙ্গে নির্জন মিলন সাক্ষাৎ মৃত্যু।" এই পার্থক্যের কারণ এই যে, আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হওয়াকে মানুষ হাল্‌কা মনে করিয়া থাকে এবং হাল্‌কা মনে করার কারণে

সতর্কতা অবলম্বন করে না। বস্তুত তরবিয়তের নীতি এই যে, সাধারণ লোক যে ক্ষতিকর বিষয়কে হাল্‌কা মনে করে—মুরুব্বী ও জ্ঞানী লোকেরা তাহাদিগকে সেই বিষয় হইতেই অধিক ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

কাজেই নফসের এই আপত্তি ভুল প্রমাণিত হইল যে, উক্ত আয়াতের লক্ষ্যস্থল কাফের সম্প্রদায়। কেননা, এখন পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে যে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রগণ্য মনে করা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রধান স্তর কাফেরদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বারণ করা হইয়াছে, আর তোমাদের মধ্যে উহার ছোট স্তর রহিয়াছে—তোমাদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে। অভিযোগের মূল উৎস ও কারণের মধ্যে চিন্তা করা উচিত। যদি সেই কারণ বিদ্যমান থাকে, তবে অভিযোগও তোমাদের উদ্দেশে অবশ্যই হইবে। তবে যেই স্তরের কারণকে তোমরা নগণ্য মনে করিতেছ, তাহা প্রধান স্তরের তুলনায় অবশ্য ছোট হইতে পারে, কিন্তু মূলে তাহা ছোট নহে।

آسمـاں نسبـت بعرش آمد فرود ـ ليك بس عالى ست پيش خاك تود

"আসমান আরশের তুলনায় অবশ্যই ছোট, কিন্তু মূলে ছোট নহে। যমীনের তুলনায় সহস্র গুণ বড়।"

অসতর্কতার স্তর ঃ এইরূপে আমাদের মধ্যে যেই স্তরের অসতর্কতা রহিয়াছে, তাহা কাফেরদের অসতর্কতার তুলনায় কম, কিন্তু মূলে আমাদের অসতর্কতাও বড়, যাহা আমাদের ধর্মকে ত্রুটিপূর্ণ এবং মৃত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এসম্বন্ধে সমস্ত আযাবের ধমক যদিও কাফেরদিগকে সম্বোধন করিয়াই প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু কারণের মধ্যে আমরাও শরীক আছি বলিয়া যেই যেই স্থানে উক্ত কারণ পাওয়া যাইবে, কাফের মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই উক্ত সম্বোধনে অল্প-বিস্তর শরীক থাকিবে। যদি উক্ত সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল মুসলমানদিগকে মোটেই করা না হয়, তবে তো আরও অধিক লক্ষ্য করার বিষয়। কেননা, এমতাবস্থায় অর্থ এই হইবে যে, মুসলমানের দ্বারা এমন কাজ সংঘটিতই হইতে পারে না, তাহাদের ইস্‌লামই ইহা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করার জন্য যথেষ্ট। স্বতন্ত্ররূপে তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক সাবধান করার প্রয়োজন নাই। আর মুসলমানের দ্বারা তাহা সংঘটিত হইতে না পারার অর্থ এই নহে যে, বিবেকানুযায়ী মুসলমানের দ্বারা তাহা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ; বরং এতটুকু বলা যায় যে, সাধারণত মুসলমানের দ্বারা এরূপ কাজ হয় না। শরীঅতে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে যে, যে সমস্ত কাজ যাহাদের দ্বারা সাধারণত সংঘটিত হয় না, ঐসমস্ত কাজের জন্য তাহাদিগকে প্রকাশ্যে নিষেধ করা হয় না। কেননা, এ সমস্ত কাজ হইতে তাহারা নিজেরাই নিবৃত্ত থাকিবে।

দেখুন, শরীঅতে যেনা এবং চৌর্যবৃত্তি নিষেধ করা হইয়াছে। শরাব পান করার প্রতি নানাবিধ শাস্তির ধমক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্রাব পান করিতে এবং মল ভক্ষণ করিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয় নাই। কেননা, স্বভাবত মুসলমান ; বরং কোন সুস্থ বিবেকবান লোক দ্বারা এই কাজ সম্ভবই নহে। তাহার ইস্‌লাম এবং সুস্থ ইন্দ্রিয় অনুভূতিই ইহা হইতে নিবৃত্ত রাখার জন্য যথেষ্ট। স্বতন্ত্ররূপে সম্বোধনপূর্বক নিষেধ করার কি প্রয়োজন ? আর اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ আয়াতে নামায মন্দ কথা ও কাজ হইতে নিষেধ করার অর্থ এই স্বভাবত নিবৃত্ত রাখা।

নামাযের দ্বারা মন্দ কাজের দ্বার বন্ধ হওয়া ঃ ইহাতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, "নামায মন্দ এবং অশ্লীল কার্য ও কথা হইতে কিরূপে নিবৃত্ত করে ? আমরা তো দেখিতে পাই, অনেক

নামাযী মন্দ কাজে লিপ্ত রহিয়াছে।” এসমস্ত লোকের বুঝা উচিত, নামায অনুভবনীয়রূপে মন্দ কার্য হইতে নিষেধ করে না বা বাধা প্রদান করে না; বরং নামাযের অবস্থাই এইরূপ যে, স্বভাবত মন্দ কথা ও কার্য হইতে নিবৃত্ত রাখে। যেমন বলা হয়, আইন ডাকাতি হইতে নিবৃত্ত রাখে। ইহার অর্থ এরূপ কেহ বুঝে না যে, আইন ডাকাতি হইতেই দেয় না; বরং অর্থ এই যে, ডাকাতি আইনত নিষিদ্ধ এবং তজ্জন্য আইনে কঠোর শাস্তির বিধান রহিয়াছে। কেহ যদি ইহার পরেও আইন অমান্য করিয়া ডাকাতি করিতে থাকে, তবে ইহাতে “আইন ডাকাতি হইতে নিবৃত্ত রাখে” কথাটি ভুল হইতে পারে না।

এইরূপে আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদিগকে সম্বোধন করা হয় নাই বলিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এইরূপ কার্য মুসলমানদের দ্বারা হওয়াই সম্ভব নহে। সুতরাং মুসলমানদিগকে পৃথকভাবে নিষেধ করা হয় নাই। কাজেই এই উপায়ে এই কার্যটির নিকৃষ্টতা আরও অধিক দৃঢ়রূপে ব্যক্ত হইয়া গেল। কেননা, এখন অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া কেবল কাফেরদেরই কাজ। মুসলমানদিগকে তাহাদের ইসলামই উহা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া থাকে। কাজেই এসম্বন্ধে মুসলমানদিগকে উদ্দেশই করা হয় নাই। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, যেই মুসলমান দুনিয়াকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, সে কাফেরদের কাজ করে এবং হুযূর (দঃ)-এর বাণীঃ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ “যেই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করে সে কাফের হয়”—এর অর্থ ইহাই। অর্থাৎ, সে কাফেরের ন্যায় কাজ করিয়াছে। কেননা, মুসলমানের পক্ষে নামায ত্যাগ করা সম্ভবই নহে। বস্তুত হুযূর (দঃ)-এর যুগে ব্যাপার এইরূপই ছিল। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিতেনঃ كَانَ فَرْقٌ مَّابَيْنِنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ تَرْكُ الصَّلٰوةِ “আমাদের ও মুনাফেকদের মধ্যে প্রভেদ ছিল নামায ত্যাগ করা।” সুতরাং এই “কাফের হইয়া যায়” কথাটি ঠিক সেইরূপ—যেমন আমরা আমাদের ছেলেপিলেকে বলিয়া থাকি, “তুই একেবারে চামার”, অর্থ তুই চামারের ন্যায় কাজ করিয়াছিস। বাক্যটির এইরূপ অর্থ হয় না যে, তুই বাস্তবিকই চামার। হাদীসটির মর্মও এইরূপই বুঝিতে হইবে। ফলকথা, মুসলমানদিগকে এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল না বলিলে মুসলমানদের প্রতি তিরস্কার আরও কঠোর হইবে। সুতরাং কেহ আর এরূপ টালবাহানা করিতে পারেন না যে, আমরা এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল নহি। ইহা তো কাফেরদের উদ্দেশে বলা হইয়াছে। বন্ধুগণ! তবে তো আরও আফসোসের কথা—কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার যেই অভিযোগ ছিল, আপনারা তাহাতেই লিপ্ত হইতেছেন।

দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ফলঃ এখন বুঝিয়া লউন, আমাদের সেই অবস্থাটি কি? আল্লাহ্ তা'আলা যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। তাহা এই যে, আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করিতেছি। ইহা আমাদের মধ্যে এমন একটি রোগ, যাহাকে আমরা রোগ বলিয়াই মনে করি না, প্রায় সকলেই এই রোগে আক্রান্ত। আমরা চুরি, ব্যভিচার, মদ খাওয়া ইত্যাদিকে পাপের তালিকার মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। সুদ খাওয়া এবং ঘুষ লওয়াকেও পাপ মনে করি; কিন্তু কোন সময় কাহারও মনে এই কল্পনাও কি উদয় হইয়াছে যে, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়াও পাপ? এইদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। ইহাকে পাপ কি মনে করিবে; বরং কোন কোন সময় এরূপ উক্তি শুনা যায়ঃ “আমরা তো দুনিয়াদার মানুষ, আমরা দুনিয়া ত্যাগ করিতে পারি না। ইহা তো তাঁহারা পারেন যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র নাই, দুনিয়ার সহিত যাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই।”

অতএব, দেখা যায়, দুনিয়াকে অগ্রগণ্য মনে করার কোন কোন স্তরকে তো ইহারা পাপই মনে করে না। আবার যেই স্তরকে পাপ মনে করে, তাহাতেও নিজদিগকে পাপী মনে করে না। কেননা, তাহারা যখন নিজদিগকে অপারক সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, তখন আর পাপ কোথায় রহিল? তাহারা হয়তো কোথাও শুনিয়া থাকিবে, অপারকতা ও বাধ্য-বাধকতার সময় পাপ থাকে না। যেমন, কেহ কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করিল, শরাব খাও, অন্যথায় মারিয়া ফেলিব। এমন কি, ভয় প্রদর্শনকারী এইরূপ করিতেও পারে। এই ক্ষেত্রে প্রাণরক্ষার জন্য এরূপ ব্যক্তি শরীঅত অনুযায়ী শরাব পান করিতে পারে। এমতাবস্থায় শরাব পান করিলে পাপ হইবে না। এই মাসআলা শুনিয়া মানুষ ইহাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং প্রত্যেক ব্যাপারে নিজকে অপারক মনে করিয়া পাপ কার্যে বেশ সাহসী হইয়া পড়িয়াছে।

আমি বলি, শরীঅতের এই আইনটির এইরূপ মনগড়া ব্যাখ্যা আপনি নিজেই তো করিয়াছেন। আপনার ইহাতে কি অধিকার আছে? অপারক হওয়ার সীমা আপনার শরীঅতের নিকটই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। বলপ্রয়োগে বাধ্য করার ক্ষেত্রে ফেকাহ্শাস্ত্রবিদগণ উহার সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, বলপ্রয়োগে বাধ্য করার কোন্ স্তর অপারকতার আওতায় আসে এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন, আপনি অক্ষমতার যেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সীমান্তের এক গ্রাম্য লোকের রেলওয়ে আইনের ব্যাখ্যা করার মতই হইয়াছে।

সে রেলগাড়ী হইতে একমণ ওযনের কিশমিশের পেটি বগলের নীচে চাপিয়া নামিয়া পড়িল। প্লাটফরমের দরজায় পৌঁছিলে টিকেট মাষ্টার তাহার নিকট টিকেট চাহিলে নিজের টিকেট দেখাইল। টিকেট মাষ্টার বলিলঃ এই মালের বিলও দেখাও। সে পুনরায় সেই একই টিকেট দেখাইল। মাষ্টার বলিলঃ ইহা তো তোমার টিকেট, মালের টিকেট কোথায়? সীমান্তের লোকটি বলিলঃ ইহা আমারও টিকেট, মালেরও টিকেট। মাষ্টার বলিলঃ না, তোমার এই মাল পনের সেরের বেশী ওযন হইবে। ইহার জন্য পৃথক টিকেট আবশ্যক। তখন সীমান্তের লোকটি বলিলঃ রেলওয়ে কোম্পানী পনের সেরের আইন এই জন্য করিয়াছে যে, ভারতবাসীরা পনের সেরের অধিক ওযনের মাল-সামান নিজে বহন করিয়া নিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই আইনের অর্থ এই যে, যাত্রীরা নিজে যেই পরিমাণ মাল বহন করিয়া নিতে পারিবে উহার মাসুল লাগিবে না। ইহার অতিরিক্ত যেই মাল বহন করিতে কুলির প্রয়োজন হয়, সেই মালের ভাড়া দিতে হইবে। ভারতবাসীরা যেহেতু পনের সেরের অধিক মাল বহন করিয়া নিতে পারে না; তাই তাহাদের জন্য পনের সের বিনাভাড়ায় নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এক মণেরও অধিক মাল নিজে বহন করিয়া নিতে পারি। অতএব, ইহাই আমাদের পনের সের। ইহার ভাড়া লাগিতে পারে না।

বলুন তো, রেল কোম্পানী সীমান্তবাসী লোকটির এই ব্যাখ্যা মানিয়া নিতে পারে কি? কখনও না। কোম্পানী নিশ্চয়ই ইহার উত্তরে বলিবে—আইনের ব্যাখ্যা করার কোন অধিকার তোমার নাই। আইনের অর্থ তুমি আমাদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া উচিত।

এইরূপে শরীঅত বিধানের ব্যাখ্যা করারও আপনাদের কোন অধিকার নাই। আপনারা আপনাদের কৃত ব্যাখ্যানুযায়ী মাযুর বলিয়াও গণ্য হইতে পারেন না। মোটকথা, মানুষ নিজে নিজে এইরূপ ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতে বাধ্য। সুতরাং আমরা ইহাকে পাপ বলিয়া মনে করি না। পাপ মনে করিলেও অতি নিম্ন স্তরের। বস্তুত কবীরা গুনাহ্‌কে ছগীরা মনে করাই স্বয়ং জঘন্য পাপ।

যেমন, কেহ ডাকাতিকে গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করার উপর ধারণা করিয়া মনে করে, গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করাও পরের দ্রব্য বিনষ্ট করা এবং ডাকাতির মধ্যেও তাই। সুতরাং এই দুইটিই এক পর্যায়ের পাপ। এইরূপ ব্যক্তিকে যুগের শাসক অবশ্যই আইনের অধিকারে হস্তক্ষেপের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিবেন এবং বলিবেনঃ আইনত যখন ডাকাতি এবং গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করার শাস্তি পৃথক অর্থাৎ, ডাকাতির অপরাধে দ্বীপান্তর কিংবা কমপক্ষে ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করার শাস্তি এত গুরুতর নহে, তবে উভয় অপরাধ সমান করিয়া দেওয়ার তোমার কি অধিকার আছে? তুমি আইনের উপর অনধিকারচর্চা করিতেছ।

এইরূপে শরীঅতে যখন প্রত্যেক পাপের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে, তখন সমস্ত পাপ কার্যকে সমান মনে করার অধিকার কাহারও নাই। যদি কেহ কবীরা গুনাহ্‌কে ছগীরা মনে করে, তবে সে শরীঅতের বিধান পরিবর্তন করার দরুন অতিরিক্ত আরও এক পাপে পাপী হইবে। এই কারণে ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, পাপ কার্যকে লঘু মনে করাও পাপজনক; বরং কুফরীর নিকটবর্তী।

আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকার কুফলঃ আল্লাহ্ পাক অভিযোগ করিয়া বলিতেছেনঃ তোমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার রোগে আক্রান্ত রহিয়াছ।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (على الْاٰخرة) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

"বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতেছ। অথচ আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অধিক স্থায়ী।" অর্থাৎ, দুনিয়ার সুখ-শান্তি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার চেষ্টায়ই তোমরা ব্যস্ত। আখেরাতের কাজ যাহাই নষ্ট হউক তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। এখানে আখেরাত সম্বন্ধে একটি শব্দ বলা হইয়াছে خير ইহা আধিক্যবোধক শব্দ। অর্থ এই যে, আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। আরও একটি শব্দ বলা হইয়াছে ابقى ইহাও আধিক্যবোধক শব্দ। অর্থাৎ, আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে বহুগুণে অধিক স্থায়ী। কিন্তু তথাপি তোমরা দুনিয়াকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছ। আখেরাতের জন্য কোন চিন্তাই নাই। অথচ ইহাও দেখা গিয়াছে যে, আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়া আরও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। আমি একটু পরেই বর্ণনা করিতেছি, আখেরাত মূলত গুরুত্ব প্রদানের যোগ্য তো বটেই, তদুপরি এই কারণেও গুরুত্ব প্রদান-উপযোগী যে, আখেরাতের চিন্তা মনে স্থান পাইলেই দুনিয়ার স্বাদও তখনই ভাগ্যে জোটে। পক্ষান্তরে যাহারা আখেরাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; খোদার শপথ! তাহারা দুনিয়ার স্বাদও পায় না।

এখন বুঝা উচিত, আল্লাহ্ তা'আলার এই অভিযোগের লক্ষ্যস্থল আমরাও কিনা? কাফেরদের উদ্দেশে অভিযোগ তো প্রকাশ্যে বুঝা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানগণও আজকাল এই অভিযোগের পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় প্রত্যেকেই এই রোগে আক্রান্ত। প্রত্যেকেই আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেছে। আমি বলি না যে, মুসলমানদের আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস নাই কিংবা বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেছে। কোন মুসলমান এইরূপ নাই, আখেরাতের প্রতি যাহার বিশ্বাস নাই কিংবা সে আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে কম মনে করিতেছে। অবশ্য কাফেরদের বিশ্বাস এইরূপ হইতে পারে। কেননা, কোন কোন কাফের তো আখেরাতের অস্তিত্বই অবিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের

ধারণা—মৃত্যুর পরে মানুষ মাটির সহিত মিশিয়া যায়, কুত্রাপি তাহাদের শাস্তিও হইবে না, সওয়াবও প্রাপ্ত হইবে না। আবার কোন কোন কাফের আখেরাত বিশ্বাস করে, কিন্তু তাহা এইরূপ—যেমন কেহ বলে, আমি রাজাকে দেখিয়াছি, তাহার একটি লেজ ও একটি শুঁড় আছে। প্রত্যেকে বুঝিবেন যে, এইরূপ ব্যক্তি রাজাকে কখনও দেখে নাই।

এইরূপে যে সমস্ত কাফের আখেরাত বিশ্বাস করে, তাহারা আখেরাত সম্বন্ধে এমন সব মনগড়া আজগুবি কথা বলিয়া থাকে যে, তাহাতে সহজেই বুঝা যায়, তাহারা আখেরাত মোটেই বিশ্বাস করে না; অন্য কিছু বিশ্বাস করে। সুতরাং তাহাদের এই বিশ্বাস অবিশ্বাসেরই শামিল। এই কারণে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা দুনিয়া অর্জনেই নিয়োজিত হয়। আখেরাতের একটুও চিন্তা নাই।

অবশ্য মুসলমানদের অবস্থা এইরূপ নহে। তাহারা আখেরাত বিশ্বাসও করে এবং আখেরাত সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানও সঠিক। আখেরাতকে তাহারা দুনিয়ার চেয়ে উত্তমও মনে করিয়া থাকে। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিব, তাহাদের কার্য বিশ্বাসের অনুরূপ নহে। তাহারা শুধু আখেরাত সম্বন্ধীয় বিশ্বাসকেই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিতেছে। কার্যক্ষেত্রে তদ্দ্বারা কাজ লয় না। যদিও বিশ্বাসেরও প্রয়োজন আছে এবং মূলত তাহাও উদ্দেশ্য; কিন্তু বিশ্বাসের একটি উদ্দেশ্যগত আমলও আছে। শরীঅত যে সমস্ত বিশ্বাস্য বিষয়ের তা'লীম দিয়াছে, তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। (১) মূলত সে সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং (২) উক্ত বিশ্বাসের দ্বারা কার্যক্ষেত্রে কাজ লওয়া। কেননা, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, কাজের মধ্যে বিশ্বাসের যথেষ্ট দখল রহিয়াছে। জনৈক আল্লাহ্ওয়ালা বলেনঃ

موحد چه بر پائے ریزی زرش - چه فولاد هندی نهی بر سرش
امید وهراسش نباشد ز کس - همین است بنیاد توحید وبس

"একত্ববাদীর পদতলে যদি ভূরি ভূরি ধন-রত্ন রাখিয়া দাও কিংবা ইস্পাতের তীক্ষ্ণধার তরবারি তাহার মাথার উপর উত্তোলন কর, কোন কিছুরই লোভ বা ভয় তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। ইহাই তওহীদ বা একত্ববাদের ভিত্তি।"

পূর্ণাঙ্গ তওহীদের ক্রিয়াঃ দেখুন, উপরিউক্ত কবিতায় কবি তওহীদকে আমলের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলিয়াছেন। তওহীদ যখন পূর্ণাঙ্গ হয়, তখন উহার ফল এই হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রত্যাশা বা ভয় থাকে না। কোরআনেও এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছেঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ○

"যেই ব্যক্তি খোদাকে পাইবার এবং তাঁহার দর্শনলাভের আশা করে অর্থাৎ, বিশ্বাস রাখে, তাহার নেক আমল করা উচিত এবং সে যেন নিজ প্রভুর এবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।" এই لَايُشْرِكْ শব্দের তফ্সীরে হাদীস শরীফে আসিয়াছেঃ لَايُرَائِىْ অর্থাৎ, সে যেন 'রিয়াকারী' না করে। হুযূরের এই তফসীরকে আল্লাহ্র তফসীর মনে করিতে হইবে। কেননা—

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود - گرچه از حلقوم عبد الله بود

"তাঁহার উক্তি আল্লাহ্রই উক্তি। যদিও তাহা আল্লাহ্র বান্দার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।"

এই আয়াতটি হইতে দুইটি কথা জানা গিয়াছে। (১) আল্লাহ্ তা'আলার দর্শনলাভের বিশ্বাস আমলের মধ্যে বিশেষ ক্রিয়াশীল। কেননা, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দর্শনলাভে বিশ্বাসী,

তাহাকে তিনি নেক আমল করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। দর্শনলাভের বিশ্বাসকে শর্ত এবং নেক আমল করাকে উহার জাযা বা ফল বলা হইয়াছে। বস্তুত শর্ত ফলের কারণস্বরূপ। কাজেই দর্শনলাভের বিশ্বাসই মানুষের নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণ। (২) দ্বিতীয়ত, ইহাও জানা গেল যে, খোদার দর্শনলাভের বিশ্বাসের কারণে "রিয়াকারী" অর্থাৎ, লোক দেখান মনোভাব দূরীভূত হয়। কেননা, আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করিতে হইলে এবাদতে রিয়াকারী না করিতেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, বিশ্বাসের ক্রিয়া মূল আমলের মধ্যেও আছে এবং আমলের পূর্ণতা সাধনের মধ্যেও আছে। আর এই আয়াতে 'রিয়াকারী'কে শির্‌ক বলা হইয়াছে। কারণ, কাহাকেও দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত করাকেই 'রিয়া' বলে। বলাবাহুল্য, যাহাকে দেখান উদ্দেশ্য হয়, এবাদতের মধ্যে মোটামুটি সেও উদ্দেশ্য থাকে। কাজেই এবাদতকারী যেন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে আর একজনকেও উদ্দেশ্য করিয়াছে এবং এই শিরক তাহার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বটে, এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা 'রিয়া'কে শিরক বলিয়াছেন।

অতএব, বুঝা যায় যে, لَامَعْبُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ 'শুধু এক আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ নাই'—ইহার নামই তওহীদ নহে; বরং আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কোন কিছুকে এবাদতে উদ্দেশ্য মনে না করাও তওহীদের পূর্ণতা সাধনকারী। ফলকথা, খোদা ভিন্ন অন্য কাহাকে উদ্দেশ্যও মনে করিবে না; তবেই এবাদতে অন্য কিছুর প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকিবে না। কাহারও প্রত্যাশা বা ভয়ও থাকিবে না। পূর্বোক্ত কবি তাঁহার কবিতায় এই মর্মটিই প্রকাশ করিয়াছেনঃ

موحد چه بر پائے ریزی زرش ـ چه فولاد هندی نهی بر سرش
امید وهراسش نه باشد ز کس ـ همین است بنیاد توحید وبس

এখান হইতেই বুঝা যায়, 'রিয়াকার' ব্যক্তি মানুষের নিকট প্রত্যাশী এবং তাহাদের হইতে ভীত থাকিবে। আর যেই ব্যক্তি 'রিয়া' হইতে মুক্ত থাকিবে, সে কাহারও প্রত্যাশী এবং কাহারও ভয়ে ভীত থাকিবে না। কেননা, খোদা ভিন্ন কাহারও প্রতি তাহার লক্ষ্যই থাকিবে না। মোটকথা, এই আয়াত ও হাদীসের যুক্ত মর্মে বুঝা যায়, কার্যের মধ্যে এবং কার্যের বিশুদ্ধতার মধ্যে বিশ্বাসের অসাধারণ প্রভাব রহিয়াছে।

আল্লাহ্ বলেনঃ لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ

ইহার একটু পূর্বে আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَافِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَاطاِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتَاكُمْ ۝

অর্থাৎ, "দুনিয়াতেও কোন বিপদ আসে না—এবং বিশেষ করিয়া তোমাদের জানের উপরও কোন বিপদ আসে না—পূর্ব হইতে উহা লওহে মাহফুযের দফ্‌তরে লিপিবদ্ধ হওয়া ব্যতীত।"

অদৃষ্টের স্বরূপঃ এই আয়াতটিতে আল্লাহ্ পাক তকদীরের মাসআলা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, তোমরা বিপদ-আপদ যাহাকিছুরই সম্মুখীন হও, তাহা পূর্ব হইতে নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখের দিকে আরও বলিতেছেনঃ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ 'নিঃসন্দেহ, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে খুবই সহজ।' কেননা, তিনি অন্তর্যামী। কাজেই ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, পূর্ব হইতে তাহা লিপিবদ্ধ

করা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। সামনের দিকে বলেনঃ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ অর্থাৎ اَخْبَرْنَاكُمْ بِذٰلِكَ لِكَيْلَا تَأْسَوْاعَلٰى مَافَاتَكُمْ "এইকথা আমি এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে বলিয়া রাখিলাম—যেন তোমাদের স্বাস্থ্য, সন্তান, ধন-সম্পদ বা মান-সম্মান যাহাকিছু বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমরা দুঃখিত না হও। আবার যাহাকিছু খোদা তা'আলা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহার জন্য গর্বিত না হও। কেননা, বিপদের বেলায় যখন এই বিষয়টি তোমার মনে উদিত হইবে যে, ইহা পূর্ব হইতেই অদৃষ্টে লিখিত রহিয়াছে এবং তাহাতে দুঃখের লাঘব হইবে। তদ্রূপ নেয়ামত সম্বন্ধেও যখন মনে করা হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হইতেই আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার অদৃষ্টে নেয়ামত লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে আমার কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব কিছুই নাই। কাজেই তজ্জন্য অহঙ্কার বা গর্ব কিছুই হইবে না। কেননা, গর্বিত সেই ব্যক্তিই হইতে পারে, যাহার ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে বা নিজ ক্ষমতায় উহা লব্ধ হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে যখন অপরের ইচ্ছা ও নির্দেশে কোন বস্তু পাওয়া গেল, তাহাতে গর্বিত হওয়ার কি অধিকার থাকিতে পারে? সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তক্দীরের মাসআলা বর্ণনা করার কারণ এই বয়ান করিয়াছেন—যেন এই বিশ্বাসের বদৌলত বিপদে ধৈর্যধারণের তওফীক হয় এবং নেয়ামতে ও শান্তিতে অহঙ্কার এবং গর্বের উৎপত্তি না হয়। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, কাজে ও কাজের সংশোধনে বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের যথেষ্ট কর্তৃত্ব রহিয়াছে।

শরীঅতে বিশ্বাসের স্থানঃ শরীঅতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বাসের দ্বারা কার্যক্ষেত্রে যেন কাজ লওয়া যায়। ফলত এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া মুহাদ্দেসগণ বলিয়াছেনঃ আমল ঈমানের অংশবিশেষ এবং আমলের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ঈমানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। খারেজী এবং মুতাযেলা সম্প্রদায় তো এতটুকুও বলিয়াছে যে, আমল ভিন্ন ঈমান কোন বস্তুই নহে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে আমল ঈমানের অংশ না হইলেও ঈমানের পূর্ণতা সাধনকারী অবশ্যই বলিতে হইবে। সুতরাং ঈমান যদিও বিশ্বাসকেই বলা হয়, তথাপি ইহার পূর্ণতা এবং অপূর্ণতাও নির্ভর করে আমলের উপর। বস্তুত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, উদ্দেশ্যযুক্ত বিষয়ে সর্বদা পূর্ণতাই কাম্য হইয়া থাকে, অপূর্ণ স্তরে কেহই ক্ষান্ত হয় না। যেমন, আমরা দেখিতেছি, পার্থিব কাজেও প্রত্যেকে পূর্ণতাই কামনা করিয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, শুধু আকীদা দুরুস্ত করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; বরং আমলেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। অন্যথায় আমল দুরুস্ত না করিলে আকীদা বা ঈমানও অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে। দুনিয়াবী কার্যসমূহে ইহার তাৎপর্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

দেখুন, আপনি যদি কোন ব্যক্তিকে বলেন, "যায়েদ তোমার পিতা।" ইহার অর্থ শুধু এতটুকু নহে যে, যায়েদ তাহার বাপ বলিয়া অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া লইবে; বরং ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বাপ বলিয়া যায়েদের সহিত আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করা উচিত। এতদসত্ত্বেও যদি সেই ব্যক্তি নিজের পিতার সহিত আদব ও সম্মানজনক আচরণ না করে, তবে আপনি অবশ্যই তাহাকে তিরস্কার করিবেনঃ হতভাগা! আমি তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, যায়েদ তোমার পিতা, তবুও তাহার সম্মান রক্ষা করিলে না।

সুতরাং বুঝিয়া লউন, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহে কেবল বিশ্বাসই উদ্দেশ্য নহে; বরং তদনুযায়ী কাজ করাও উদ্দেশ্য। যদি কাজ বিশ্বাসের অনুরূপ না হয়, তবে বিশ্বাসের অস্তিত্ব নাই বলিয়াই মনে করা হইবে।

এই ভূমিকার পরে আমি বলিতেছি—মুসলমানগণ যদিও আখেরাতের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে এবং উহাকে দুনিয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তমও মনে করে; কিন্তু তাহাদের আমল উক্ত বিশ্বাসের অনুরূপ নহে। সুতরাং উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে বলা ঠিক হইবে যে, আখেরাতের অস্তিত্বে তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস নাই। কেননা, যেই বিশ্বাসের অনুরূপ আমল করা হয় না, তাহা অপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ। এখন তো আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। আর আমাদের আমল এবং বিশ্বাসের সহিত যে ঐক্য নাই, তাহা আমাদের অবস্থা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কেননা, আমাদের কার্যক্ষেত্রে যদি কোন সময় দুনিয়া এবং আখেরাতের বিরোধিতা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে আমরা দুনিয়াকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া থাকি। যেমন—নামাযের সময় যদি আপনার দোকানে কোন খরিদ্দার আসিয়া পড়ে, তেমন অবস্থায় সাধারণত আপনি নামাযকেই পশ্চাদবর্তী করিয়া দুনিয়ার স্বার্থকে অগ্রবর্তী করিয়া থাকেন। ইহারই নাম দুনিয়াকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা।

তওবার ভরসায় পাপ কার্য করা নিষিদ্ধঃ এইরূপে যদি কোন সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়, তবে এমন লোক অতি কমই দেখা যায়, যিনি খোদার ভয়ে বা আখেরাতের চিন্তায় দৃষ্টি নিম্নগামী করিয়া ফেলেন; বরং অধিকাংশ লোকই নফ্‌সের তৃপ্তির জন্য তাহাকে খুব নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। ইহাও দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্যদানজনিত পাপের একটি শাখা। আবার কেহ এইরূপ মনে করিয়া থাকে—আখেরাতকে দুনিয়া হইতে অগ্রগণ্য করা আমার দ্বারা সম্ভব নহে, আমি অক্ষম; ইহা তো বুযুর্গ লোকের কাজ। এই শ্রেণীর লোক পাপ কার্য করিয়া নিজেকে পাপীও মনে করে না। আবার অনেকে এমনও আছে যে, পাপ কার্যকে পাপই মনে করে বটে; কিন্তু মনকে প্রবোধ দেয় যে, পরে তওবা করিয়া লইব। এই ভুলের মধ্যে বহু লোক পতিত রহিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ইহা সম্পূর্ণই নফ্‌সের ধোঁকা।

আমি অস্বীকার করি না যে, তওবা গুনাহের জন্য বিষ বিনাশক ঔষধ বিশেষ। কিন্তু বিষ বিনাশক ঔষধের ভরসায় বিষ পান করা কত বড় বোকামি! নিজের কাছে বিষ বিনাশক ঔষধ আছে, পরে উহা সেবনপূর্বক বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিব; এই ভরসায় স্বেচ্ছায় দুই তোলা বিষ পান করিয়াছে, এমন কোন লোক আজ পর্যন্ত দেখি নাই। যদি এইরূপ কেহ করেও, তবে তাহাকে সকলেই পাগল অথবা নির্বোধ বলে এবং তিরস্কার করে যে, বিষের ক্রিয়া তো এখনই তুমি অনুভব করিবে; বিনাশক ঔষধের ক্রিয়া যে পরে হইবে, তাহাও অনিশ্চিত। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, বিষের ক্রিয়া অত্যধিক হইয়া যাওয়ায় বিনাশক ঔষধে তাহা বিনষ্ট হইবে না। কিংবা বিষের তীব্র ক্রিয়া হঠাৎ এমন হইয়া পড়িতে পারে, যাহাতে তুমি বিনাশক ঔষধ সেবনের অবকাশই পাইবে না।

এইরূপে তওবার ভরসায় পাপ কার্য করাও আস্ত বোকামি। কারণ, গুনাহের অপক্রিয়া নগদ। আর তওবার উপকারিতা পরে লাভ করার ধারণা। কি নিশ্চয়তা আছে যে, ইহার পরে আয়ুও আছে কিনা? অনেক লোক ঠিক 'যেনা' কার্যে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। পাপ কার্য হইতে অবসরলাভের অবকাশও পায় নাই। দ্বিতীয়ত, তওবার ভরসায় একবার পাপ কার্য করিলে পাপের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়া যায়, পরে আর তওবার সুযোগ ঘটে না। কেননা, পরে আর কখনও এই পাপ কার্য করিব না—এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করাও তওবার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। "হে খোদা! আমার তওবা কবুল করুন" এরূপ মৌখিক তওবা গ্রহণীয় নহে।

বিশেষত পাপ কার্য করার পর যখন পাপের প্রতি মনে মোহ ও আকর্ষণ লাগিয়া যায়, তখন তওবা করিতে উদ্যত হইলে নফ্স বলে, এই তওবায় কি লাভ? এই কাজ তো পুনরায় করিবেই। কাজেই তওবার আর সুযোগ হইল কোথায়? তখন নফ্স এইরূপ ওয়াদা করে—এই পাপ কার্যের সাধ পূর্ণ হইলে পরে সমস্ত গুনাহ হইতে একসঙ্গে তওবা করিয়া লইব। কিন্তু পরিশেষে এই ওয়াদাও পূর্ণ হয় না। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, পাপ কার্যের দরুন অন্তরে মরিচা পড়িয়া যায় এবং পুনঃ পাপ কার্য করিতে থাকিলে উক্ত মরিচা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সম্বন্ধে মাওলানা বলেনঃ

هرگنـــاه زنـگـے است بر مرأة دل ـ دل شود زیں زنگهـا خوار وخجـل
چوں زیـادت گشت دل را تیر گی ـ نفس دوں را پیش گردد خیـر گی

"প্রত্যেক গুনাহ হৃদয়-দর্পণের জন্য মরিচা। এই মরিচা যতই বাড়িতে থাকে, হৃদয় ততই অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং লজ্জিত হইতে থাকে। এই অন্ধকার যতই বাড়িতে থাকে, নফ্সের অবাধ্যতাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে আর তওবার তওফীকই হয় না।"

অতএব, দীর্ঘকাল পাপ কার্যে লিপ্ত থাকার দরুন সেই মরিচার অন্ধকার এত প্রবল হয় যে, পরে আর তওবার তওফীক হয় না। কেহ তাহাকে তওবা করিতে বলিলেও সে উত্তর করে, "মিঞা! এত পাপের সম্মুখে বেচারা তওবা কি করিবে?" মোটকথা, শেষ পর্যন্ত সে খোদার রহমত হইতেও নিরাশ হইয়া পড়ে।

কোন কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে—মানুষ যখন তাহাদিগকে বলিয়াছে, "সমস্ত গুনাহ্ হইতে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করিয়া লও", তখন তাহারা এই উত্তরই প্রদান করিয়াছে যে, এত অসংখ্য পাপকে একটি মাত্র তওবা কেমন করিয়া মোচন করিবে? শেষ পর্যন্ত হতভাগা এমতাবস্থায় তওবা না করিয়াই মরিয়াছে। এখন আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, ইহা নফ্সের কত বড় ধোঁকা—সে তওবার ভরসায় পাপ কার্যের প্রতি উৎসাহিত করিয়া থাকে।

বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করুন। নফ্সের এই ধোঁকায় পড়িবেন না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ "হে আয়েশা! পাপকে কখনও ক্ষুদ্র মনে করিও না।" বাস্তবিকপক্ষে তওবার ভরসায় যাহারা পাপ কার্যের প্রতি অগ্রসর হয়, তাহারা পাপ কার্যকে ছোট বলিয়াই মনে করে। ফলকথা, প্রত্যেক লোকের নিকট দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য প্রদানের এক একটি কারণ আছে। কেহই ইহা হইতে মুক্ত নহে। প্রত্যেকেই ইহার কোন না কোন একটি কারণ আবিষ্কার করিয়া লয়। কেহ নিজেকে 'মা'যুর' বা অক্ষম মনে করে। কেহ তওবার ভরসায় আছে। হাঁ, আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন সে-ই রক্ষা পায়।

দুনিয়ার প্রধান দুইটি শাখাঃ এমনি তো দুনিয়ার শাখার অন্ত নাই, কিন্তু তন্মধ্যে দুইটি শাখা সর্বপ্রধান। ধন-দৌলত আর মান-সম্মান। ধন-মান লাভের জন্য অধিকাংশ মানুষই পাপের পরোয়া করে না, আখেরাত বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ধন-মান-লোভী মৌলবীরা বিরূপ ব্যাখ্যার সাহায্যে পাপজনক কার্যকে এবাদত এবং দুনিয়াবী কার্যকে আখেরাতের কাজ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্মরণ রাখিও, খোদা পাকের সম্মুখে এসমস্ত মতলবী ব্যাখ্যা কোন কাজে আসিবে না। যাহাহউক, মানুষ ধনের জন্য নানা উপায়ে ধর্মকে বিনষ্ট করিতেছে, কেহ ঘুষ গ্রহণ করে, কেহ অন্যায়-অত্যাচারপূর্বক অপর লোক হইতে অর্থ আদায় করে। এই সুযোগ অবশ্য সকলে পায় না।

ঘুষ গ্রহণ এবং অন্যায় উৎপীড়নের সুযোগ বা উপায় সকলের কোথায়? অবশ্য পরের ধন আত্মসাৎ করিবার একটি উপায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বহু লোক ইহাতে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহা এই যে, কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া উহা পরিশোধে গাফ্‌লতি করা। কাহারও কোন দ্রব্য কোন উপায়ে ঘরে আসিলে তাহা মালিকের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে জানে না। মৃত ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত ওয়ারিসী হক বণ্টনে অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে বা ব্যয় করিতে বেহিসাব ব্যয় করে। এইরূপ অবস্থা তাহাদেরই, যাহারা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গোপন করে না। কতক লোক তো এমনও আছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গোপনই করিয়া ফেলে। শাশুড়ীর ঘরে কোন বধূর মৃত্যু হইলে শাশুড়ী তাহার নিজস্ব ভাণ্ড-বাসন এবং অলঙ্কারপত্র হজম করিয়া ফেলে। তাহার মাতা-পিতাকে সামান্য কিছু দেখাইয়া বলে, তাহার নিকট ইহাই ছিল। পক্ষান্তরে মা-বাপের বাড়ীতে মৃত্যু হইলে যাহাকিছু তাহাদের হাতে পড়ে, মৃতার স্বামীকে সেই সম্বন্ধে কিছুই জানান হয় না; ইহা তো হইল একেবারে ময়লার উপর ময়লা। আমার কথা হইতেছে সে সমস্ত লোকের সম্বন্ধে, যাহারা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গোপন বা হজম করে না; কিন্তু ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে তাহারাও অসতর্কতার সহিত ব্যয় করে। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির গায়ের উপর বহু মূল্যবান শাল বা আলোয়ান দেওয়া হয়। পরে তাহা গরীব-মিস্‌কীনকে দান করা হয়; অথচ তাহাতে অনেক উত্তরাধিকারীর হক রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে নাবালকও আছে। সাবালকদের মধ্যেও সকলে এই কার্যে সম্মত নহে। আবার দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির ফাতেহা ইত্যাদি রসম পালনে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতেই সমস্ত ব্যয়নির্বাহ করা হয়। ইহাতে সমস্ত ওয়ারিসেরই হক রহিয়াছে, কিন্তু নাম করে বড় ওয়ারিস।

নাম ও গর্বের জন্য নিজের ধনও ব্যয় করা হারাম। পরের ধনে নাম অর্জন করা তো আরও অধিক জঘন্য ব্যাপার। অধিকন্তু তন্মধ্যে নাবালকও থাকে, আবার সাবালকেরাও সকলে অন্তরের সহিত তাহাতে সম্মত থাকে না। সম্মত থাকিলে পশ্চাতে এই সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয় কেন? অথচ দেখা যায়, পরে ভাগ-বণ্টনের বেলায় নানা প্রকারের অভিযোগ উত্থিত হয়; "এই ব্যয় তো তুমি নিজে করিয়াছ, আমাদের মত লইয়া তো এই খরচ কর নাই, সেই খরচের ভাগী আমরা কেন হইব?" লজ্জার খাতিরে কেহ না বলিলেও এই নীরবতায় সম্মতি প্রমাণিত হয় না! এইভাবে অযথা টাকা উড়াইতে হইলে সকলকে তাহাদের নিজ নিজ অংশ বাহির করিয়া দিয়া পরে নিজের অংশ হইতে তোমার যত ইচ্ছা খরচ কর। অথবা তাহাদের নিকট হইতে ধার লও এবং পরে সকলের ধার পরিশোধ কর। কিন্তু সেই ধার গ্রহণও যেন কাগুজে বিষয় না হয়, বরং প্রকৃত অর্থেই তাহা ধার গ্রহণ হইবে। অন্যথায় এজন্য আখেরাতে পাকড়াও করা হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ "ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বেহেশ্‌তে যাইতে আবদ্ধ থাকে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে বেহেশ্‌তে যাইতে পারে না।" যে সমস্ত ঋণ পরিশোধের নিয়তে গ্রহণ করা হয় নাই এবং অনাবশ্যক গ্রহণ করা হইয়াছে, উহাদের উদ্দেশ্যেই এই ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। তবে একান্ত প্রয়োজনে যে সমস্ত ধার লওয়া হইয়াছে, যাহার অভাবে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, বিশেষ কষ্ট হইত; সেই ধার সম্বন্ধে এই ভীতি প্রদর্শন করা হয় নাই। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, অনাবশ্যক 'রসম' পালন করিলে কি ক্ষতি!

আবার মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড়ও খুব বদান্যতার সহিত মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। মূল্যবান কাপড়ও দান-খয়রাত করা হয়, অথচ খয়রাত করা কোন কোন ওয়ারিসের ইচ্ছা নহে।

দুঃখের বিষয়, দান গ্রহণকারী খতাইয়া দেখে না যে, আমি যে কাপড় লইতেছি, ইহাতে সকল ওয়ারিস সম্মত আছে কিনা ? বরং এই ওযর পেশ করে যে, বাছ-বিচার করার দায়িত্ব আমার নহে। খোদার এই সমস্ত বান্দার এতটুকু জ্ঞান নাই যে, যেই ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নাই, সেইখানে অবশ্য বাছ-বিচার করার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু যেইখানে সন্দেহ—বরং প্রবল সন্দেহ আছে, সেইখানে খোঁজ-খবর লওয়া আবশ্যক। যেইক্ষেত্রে খোঁজ-খবর লওয়ার প্রয়োজন নাই তাহা এই যে, এক ব্যক্তি আপনাকে দাওয়াত করিল, আপনি জানেন, তাহার আয়-আমদানী হালাল উপায়েই হইয়া থাকে। এস্থলে অবশ্য আপনার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই—এই মাংস কোথা হইতে আনিয়াছেন ? মূল্য কোন্ উপায়ে অর্জন করিয়াছেন ? কিন্তু যেইখানে দাওয়াতকারীর আয়-আমদানী সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহ আছে, সেইখানে খাঁজ-খবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আবার মুশ্কিল এই যে, আল্লাহ্র কোন বান্দা এইরূপ খোঁজ-খবর লইতে গেলে অন্যান্য আত্মীয়েরা তাহার এই চেষ্টা বানচাল করিয়া দেয়।

জনৈক জমিদার এক স্ত্রী এবং দুই নাবালক কন্যা রাখিয়া মরিয়া গেল। তাহার স্ত্রী মৃতের কাপড়-চোপড় আমার এইখানে পাঠাইলে আমি এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম যে, ইহাতে নাবালকের হক রহিয়াছে। ঘটনাক্রমে তথায় এক মৌলবী ছাহেব ছিলেন। উক্ত কাপড় তাঁহার নিকট দানস্বরূপ পেশ করা হইল এবং আমার এইখানে যেই ওযরে গ্রহণ করা হয় নাই, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইল। মৌলবী ছাহেব বলিলেনঃ "পরিশেষে এই মেয়েদের বিবাহ-শাদীতেও তো তাহাদের ওয়ারিসী হকের চেয়ে অধিক তাহাদের মাতাকে ব্যয় করিতে হইবে ; কাজেই তাহাদের মাতা এখন এই কাপড় দান করিতে পারেন।" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। এই তো হইল এক শ্রেণীর আলেমের অবস্থা। নিজেরাও খোঁজ-খবর লইবেন না এবং যাহারা খোঁজ-খবর লয় তাহাদের কার্যের প্রশংসাও করিবেন না ; বরং তাহাদের সেই চেষ্টা বানচাল করিবার চেষ্টা করিবেন।

সর্বসাধারণের মধ্যে একটি সাধারণ নীতি প্রচলিত হইয়াছে যে, কোন মাসআলা সম্বন্ধে আলেমদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে যেই পক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে, সেই পক্ষকেই হক্পন্থী মনে করা হয়। জানি না, এই নীতি কোথা হইতে কাহারা আবিষ্কার করিল ? অথচ ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, দলিল-প্রমাণের আধিক্যে কোন বিষয়ের অগ্রগণ্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না। মনে করুন, কোন একটি মোকদ্দমায় এক পক্ষে দুইজন সাক্ষী আর অপরপক্ষে একশতজন সাক্ষী হইলেও ইস্লামী বিচারক উভয়পক্ষকে সমানই মনে করিবেন। একদিকে সাক্ষীর সংখ্যাধিক্য অগ্রগণ্যতার কারণ হয় না। অবশ্য আলেমদের ঐকমত্য শরীঅতে অকাট্য দলিলরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, যাহা এজ্মা নামে অভিহিত। কিন্তু একদিকে অধিকসংখ্যক এবং অপর দিকে অল্পসংখ্যক আলেম হওয়ার নাম 'এজ্মা' নহে। ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ পরিষ্কার লিখিয়াছেনঃ একজন গণ্যমান্য আলেমও যদি বিরোধিতা করেন, তথাপি তাহাতে এজ্মা সাব্যস্ত হয় না।

ফলকথা, আলেমদের ইত্যাকার আচরণে সাধারণ লোকেরা দুঃসাহসী হইয়া পড়িয়াছে এবং সতর্কতা মোটেই অবলম্বন করে না ; বরং নির্ভীক চিত্তে বলিয়া ফেলেঃ যদি সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইত, তবে মৌলবী ছাহেবগণ কাপড় গ্রহণে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না কেন ? এইরূপে কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু চাহিয়া আনিলে যেই পর্যন্ত সেই ব্যক্তি চাহিয়া না নিবে, সেই পর্যন্ত তাহা ফেরত দিতে জানে না।

অনুমতি ব্যতীত পর-দ্রব্য ব্যবহার করা অবৈধঃ কেহ চিনা মাটির বা তাম্রের ডিশে করিয়া যদি আপনার বাড়ীতে খাদ্য-দ্রব্য পাঠায়, তবে আপনি সেই ডিশ বা ভাণ্ড-বাসন ফেরত পাঠাইবার নাম করেনই না; বরং নিশ্চিন্ত মনে মাসের পর মাস ধরিয়া উক্ত পাত্রে খাদ্য আহার করিয়া থাকেন। অথচ ফকীহ্‌গণ বলিয়াছেনঃ যেই পাত্রে করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করা হয়, তাহা হইতে অন্য পাত্রে লইয়া উক্ত খাদ্য খাওয়া উচিত। সেই পাত্রে রাখিয়া খাওয়া জায়েয নহে। হাঁ, যদি এইরূপ খাদ্য হয় যে, অন্য পাত্রে লইলে উহা বিস্বাদ হইয়া যায়, কিংবা আকার-আকৃতি বিকৃত হইয়া যায়, তবে সেই পাত্রে খাওয়া জায়েয আছে। যেমন, ফির্‌নী তশ্‌তরীর মধ্যে জমাইয়া পাঠান হইল। এমতাবস্থায় ফির্‌নী অন্য পাত্রে লওয়া হইলে উহার আকৃতি নষ্ট হইয়া যায়। বস্তুত যেই পাত্রে ফির্‌নী জমান হয়, সেই পাত্রে খাওয়াতেই ফিরনীর স্বাদ; অন্য পাত্রে লইতে গেলে ফিরনী এলোমেলো হইয়া বিশ্রী আকার ধারণ করে, তখন আর উহা খাইতে প্রবৃত্তি হয় না।

কাজেই এইরূপ খাদ্য প্রেরকের পাত্রেই খাওয়া জায়েয আছে। অন্য প্রকার খাদ্য হইলে প্রেরকের ভাণ্ডে খাওয়া জায়েয নহে। ফকীহ্‌দের এই বিধানের যুক্তি এই যে, বিনানুমতিতে পরের দ্রব্য ব্যবহার করা জায়েয নহে। ভাণ্ডে করিয়া খাদ্য পাঠাইলে বুঝা যায় না যে, সেই ভাণ্ডে করিয়া খাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হইয়াছে। তবে পাত্র পরিবর্তনে যেই ক্ষেত্রে খাদ্যের স্বাদ বা আকার বিনষ্ট হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পাত্রে খাওয়ার অনুমতি আছে বলিয়া প্রকারান্তরে বুঝা যায়। আমি এই মাস্‌আলার কারণ ইহাই নির্ধারণ করিলাম; তবে খুব সম্ভব এইরূপ বিধান ফকীহ্‌গণ তৎকালীন প্রচলিত প্রথার উপর ভিত্তি করিয়াই দিয়াছেন। সেইকালে হয়তো খাদ্য প্রেরণকারীদের ভাণ্ডে খাওয়ার অনুমতি ছিল না। কিন্তু এইকালে আমাদের সমাজের রীতি অনুসারে খাদ্য প্রেরণকারীর তরফ হইতে তাহার ভাণ্ডে খাওয়ার অনুমতি থাকে। কিন্তু প্রেরিত খাদ্য খাওয়ার পর ভাণ্ড নিজ গৃহে রাখিয়া পরেও উহা মাসের পর মাস ধরিয়া ব্যবহার করার অনুমতি অবশ্যই থাকে না। তদুপরি আরও মুশকিল এই যে, কাহারও বাড়ীতে কোন স্থান হইতে খাদ্যসহ বাসন-পেয়ালা আসিলে তাহার যদি কোথাও খাদ্য প্রেরণের প্রয়োজন হয়; তবে নিজের বাসনে না পাঠাইয়া সেই পরের পাত্রেই পাঠাইয়া থাকে। অতঃপর উক্ত ভাণ্ড পরের বাড়ী যাইয়াও দীর্ঘ দিন পড়িয়া থাকে। যদি ঘটনাক্রমে কোন দিন এই ভাণ্ডে করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি ভাণ্ডের প্রকৃত মালিকের বাড়ী কিছু পাঠান, তবে উহা লইয়া বিবাদের উদ্ভব হয়। প্রকৃত মালিক বলে, ইহা আমার ভাণ্ড, অপর ব্যক্তি বলে, বাঃ! ইহা তো কয়েক মাস ধরিয়া আমার বাড়ীতে পড়িয়া আছে। এখন কাহারও স্মরণ নাই যে, উক্ত বাসন কাহার বাড়ী হইতে আসিয়াছে এবং প্রকৃত মালিকের বাড়ী হইতে কাহার বাড়ী গিয়াছিল। এখন বিবাদ ভঞ্জনের জন্য ঈমান কোরআন ইত্যাদির কসম খাওয়া আরম্ভ হয়। ইহাও কি একটা সামাজিকতা বা জীবনযাত্রা?

আল্লাহ্‌র কসম; আমাদের মধ্যে বর্তমানে বড় নিকৃষ্ট ধরনের জীবনযাত্রা চলিতেছে। প্রত্যেকের উচিত নিজের গৃহিণীকে কঠোরভাবে বলিয়া দেওয়া, যখনই কাহারও বাড়ী হইতে খাদ্যদ্রব্য আসে, তৎক্ষণাৎ যেন তাহাদের বাসনপত্র ফেরত দেওয়া হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্! এই সম্বন্ধে আমার বিশেষ কড়াকড়ি রহিয়াছে; অপরের ভাণ্ড-বাসন ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আমার কোন শান্তি থাকে না। এই তো বলিলাম সাধারণ লোকদের অবস্থা।

আলেমদের অবস্থা দেখুন, কাহারও নিকট হইতে কোন কিতাব নিলে আর দেওয়ার নাম জানে না। কিতাব প্রদানকারী অধিক কর্মব্যস্ত লোক হইলে তাঁহার স্মরণও থাকে না যে, কিতাব কে নিয়াছে? অতএব, মাসেককাল পরে তিনি ধারণা করেন, কিতাব চুরি হইয়া গিয়াছে। এইদিকে গ্রহণকারী নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন, কিতাবের মালিক তো আর চাহিতেছেন না। এখন যেন ইহা তাঁহারই মালিকানাস্বত্ব হইয়া গেল। আবার কেহ কেহ এইরূপও আছেন, নিজের দ্রব্য কাহারও নিকট থাকিলে খুব কড়াকড়ির সহিত তাহা আদায় করিয়া লন; কিন্তু পরের দ্রব্য নিজের কাছে থাকিলে তাহা দেওয়ার বেলায় একদম বেপরোয়া। কেহ কেহ আবার দেওয়ার বেলায়ও বেপরোয়া এবং নিজের দ্রব্য লওয়ার বেলায়ও বেপরোয়া হইয়া থাকেন। এইরূপ লোককে মানুষ বুযুর্গ মনে করিয়া থাকে—একেবারে সংসারবিরাগী! পড়িয়া মরুক এইসমস্ত দরবেশ। ইহারা দরবেশ নহে, খোদার দরবারের অপরাধী। নিজের দ্রব্য লওয়ার বেলায় বেপরোয়া হওয়া অবশ্য দোষ নহে, কিন্তু পরের দ্রব্য ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হওয়া জঘন্য অপরাধ। আজকাল মানুষ উদাসীনতাকেই দরবেশী নাম দিয়াছে; অথচ আল্লাহ্ওয়ালাগণ লেন্‌দেনের ব্যাপারে বড়ই শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া থাকেন, পরের অধিকার কখনও নিজের দায়িত্বে রাখেন না।

সহানুভূতি প্রকাশ ও ধার দেওয়ার ফলঃ এই প্রকারে কোন কোন মানুষ ধার পরিশোধের বেলায় গড়িমসি করিয়া থাকেন। কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া এমনভাবে ভুলিয়া থাকেন যে, দেওয়ার নামই জানেন না। নিজের যাবতীয় কাজে অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য করিয়া থাকেন; কিন্তু ধার পরিশোধের চিন্তা নাই। এই কারণেই মুসলমান সমাজে সহানুভূতি লোপ পাইয়াছে। সমাজে বহু লোকের কাছেই আবশ্যকের অতিরিক্ত টাকা মওজুদ আছে, ইচ্ছাও করেন যে, কাহাকেও ধার দিয়া পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব হইতে রক্ষা পান, অপরের প্রয়োজনে কিছু সাহায্য হউক। কিন্তু দিবেন কাহাকে? লোকে ধার নিয়া দেওয়ার নামই লয় না; এই কারণেই আজকাল বিনা সুদে ধার পাওয়া যায় না। কেননা, বিনা সুদের দেনা পরিশোধের জন্য মানুষের কোন চিন্তাই হয় না। হাঁ, মহাজনের দেনার কথা খুব স্মরণ থাকে। কেননা, তাহারা পূর্বাহ্নেই তমসুকপত্র লিখাইয়া লইয়া আনন্দের সহিত সুদী করয দিয়া থাকে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ মিলাইয়া এক হাজারের স্থলে চারি হাজার টাকা আদায় করিয়া লয়; ব্যাস্, ইহাতে উভয়পক্ষই বেশ খুশী। আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ্। মানুষ যদি সুদী করযের ন্যায় বিনাসুদের করয পরিশোধের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করিত, তবে মুসলমানদের পরস্পরের নিকট হইতেই করয পাওয়া যাইত এবং মুসলমানদের ভূসম্পত্তি এইভাবে হিন্দুদের হস্তগত হইত না।

আমানতের ক্ষেত্রেও এইরূপ বিশৃঙ্খলা। কেহই কাহারও নিকট আমানত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না যে, আমানতী দ্রব্য হুবহু থাকিবে। অধিকাংশ লোকই আমানতী টাকা নিজের কাজে ব্যয় করিয়া বসে। এইরূপে চারি পাঁচ শত আমানতী টাকা ব্যয় করিয়া উহা পরিশোধ করা সম্বন্ধে কোনই চিন্তা করে না। আমানতকারী বেচারা তাহার নিকট টাকা চাহিলে বলে, ভাই! টাকা তো ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি। হাতে আসিলে দিয়া দিব। সে বলেঃ আপনি আমানতের টাকা ব্যয় করিলেন কেন? যেইখান হইতে সম্ভব হয়, আমার টাকা দিন। তখন আমানতদার বলেনঃ বন্ধু!

ভুল হইয়া গিয়াছে। আমি একান্ত প্রয়োজনে ঠেকিয়া আপনার টাকাগুলি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমার হাতে টাকা নাই, কোথা হইতে উগরাইয়া দিব?

আমি বলিঃ "তুমি উগরাইও না। কিন্তু সেই বেচারার তো তোমার কথা শুনিয়া নাড়িভুঁড়ি উল্‌টিয়া গিয়াছে।"

চাঁদার টাকা আত্মসাৎ করাঃ সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ মসজিদের জন্য চাঁদা আদায় করিয়া তাহাও আত্মসাৎ করিয়া বসে। এক ব্যক্তি মসজিদের চাঁদা আদায় করিত। কিছু টাকা একত্রিত হইলে তাহা খাইয়া শেষ করিয়া পুনরায় চাঁদা চাহিতে লাগিত। কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, পূর্বের টাকা কোথায় গেল? তখন সে শপথ করিয়া বলিয়া দিত, মসজিদে লাগাইয়াছি। তাহার এক প্রতিবেশী বলিয়া উঠিলঃ যালেম! মিথ্যা শপথ করিও না, তুমি কোথায় মসজিদে লাগাইতেছ? তখন সে তাহাকে বলিলঃ আস, আমার সাথে চল, দেখাইয়া দিতেছি। অতঃপর মসজিদে যাইয়া টাকা মসজিদের দেওয়ালের সঙ্গে লাগাইয়া দিল এবং বলিলঃ ইহার উপরই শপথ করিয়া থাকি যে, মসজিদে লাগাইতেছি। ব্যাস্, মসজিদের দেওয়ালের সহিত লাগাইয়া দেই।

আজকালের চাঁদা আদায়কারীদের এই অবস্থা। ইস্‌লামী কার্যের জন্য আদায়কৃত চাঁদার কোনই হিসাব-কিতাব নাই। প্রত্যেকেই যদৃচ্ছা খরচ করিয়া ফেলে। স্মরণ রাখিবেন, ফেকাহর কিতাবে লিখিত আছে—তিন পয়সার পরিবর্তে সাত শত কবূলযোগ্য নামায কর্তন করা হইবে। দুনিয়ার মধ্যে খুব স্ফূর্তি করিয়া লও, আখেরাতে ইহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

বাস্তবিকপক্ষে পাক-ভারতের লোক চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে খুবই সাহসী। ইঁহারা সকলকেই অহরহ চাঁদা দান করিয়া থাকেন। যাহাহউক, ইঁহারা তো নিজ নিজ দানের সওয়াব প্রাপ্ত হইবেন। কেননা, তাঁহাদের নিয়ত ভাল। কিন্তু আদায়কারীরা আখেরাতে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করিবে। যাহারা এইভাবে মুসলমানদের টাকা-পয়সা বিনাশ করিতেছে।

হাঁ, এক অবস্থায় চাঁদাদাতাগণও সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবেন। যদি দাতা জানিতে পারেন যে, এই আদায়কারী চাঁদা আদায় করিয়া যথাস্থানে ব্যয় করে না। এমতাবস্থায় জানিয়া-শুনিয়া এরূপ ব্যক্তির হাতে চাঁদা দান করিলে কোনই সওয়াব হইবে না। কেননা, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে চাঁদা আদায় করা হারাম। এরূপ ব্যক্তিকে দান করিলে এই দুষ্কর্মে তাহার সাহস বাড়িয়া যায়। হারাম কার্যে সাহায্য করাও হারাম। দুঃখের বিষয়, মানুষ কত অভিনব উপায়ে মানুষকে ধোঁকা দিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু স্মরণ রাখিও, খোদার দরবারে ধোঁকা চলিবে না।

زنہار ازاں قوم نباشی کہ فریبند - حق را بسجودے ونبی را بدرودے

"সাবধান! সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইও না, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে সজ্‌দা দ্বারা এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দরূদ দ্বারা ধোঁকা দিয়া থাকে।" মাওলানা বলেনঃ

خلق را گیرم کہ بفریبی تمام - در غلط اندازی تا ہر خاص وعام
کارہا با خلق آری جملہ راست - با خدا تزویر وحیلہ کے رواست
کار با او راست باید داشتن - رایت اخلاص وصدق افراشتن

"আমি দেখিতেছি, মানুষ পূর্ণ ধোঁকাবাজ। মানুষের সঙ্গে কাজ-কারবার ভালই চলে, তবে খোদার সঙ্গে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি কেমন করিয়া চলিতে পারে? তাঁহার সঙ্গেও কাজ-কারবার বা ব্যাপার-বিধান পূর্ণ, সততা ও অকপটতার সহিত হওয়া উচিত।"

আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। কোন এক মাদ্রাসার সভায় ওয়ায করার জন্য আমি উপস্থিত ছিলাম। তৎকালে বলকানের জন্য সাহায্য আদায় করা হইত। আমার ওয়ায শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে বলকানের জন্য সভায় চাঁদা প্রার্থনা করিল। ইহাতে জনৈক পেন্‌শনপ্রাপ্ত তহসীলদার একশত টাকা দান করিলেন। আমি বাহিরে যাইতেছিলাম। একস্থানে কতিপয় লোক দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত একশত টাকা দানের কথা জানিতে পারিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ "জাযাকাল্লাহ্" বলিলাম। ইহাই আমার অপরাধ ছিল, এই অপরাধেই দাতা পরে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ঘটনা এই ঘটিয়াছিল যে, তহসীলদার সাহেব আদায়কারীদিগকে চাপ দিয়াছিলেন, "আমার একশত টাকার রসিদ পৃথকভাবে কাটিয়া দেওয়া হউক।" আদায়কারীরা এই দাবী অনর্থক মনে করিয়া সেদিকে কর্ণপাত করিল না। যখন তিনি নিরাশ হইয়া গেলেন—যেহেতু আমি "জাযাকাল্লাহ্" বলিয়াছিলাম, এই অপরাধে আমাকে ধরিয়া বসিলেন। আমার একশত টাকার রসিদ পৃথক আনাইয়া দিন। আমি এক বন্ধু দ্বারা তাঁহাকে লিখিলাম—আপনি যাহাদিগকে চাঁদা দিয়াছেন তাহাদের নিকট রসিদ তলব করুন, আমার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনি পুনরায় আমাকে চিঠি লিখিলেনঃ হযরত! আমার রসিদ দিন, নয়তো আমার টাকা ফেরত দিন; অন্যথায় আমি আদালতের আশ্রয় লইব। আমি চাঁদা আদায়কারীদিগকে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া বলিলামঃ তাহার টাকা ফেরত দাও। তাহারা জানাইল, টাকা তো রওয়ানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অগত্যা ঝগড়া মিটাইবার উদ্দেশ্যে নিজ তহবিল হইতে একশত টাকা এক বন্ধুর মারফতে তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তথাকার আমার বন্ধুবর্গ নিজেদের তহবিল হইতে উক্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই আমার টাকা ফেরত দিতে চাহিলেন। আমি অস্বীকার করিলাম। উভয়পক্ষ হইতে জেদ ও অস্বীকার বাড়িতে থাকিল। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত টাকা একটি সৎকাজে ব্যয় করিয়া দেওয়া হইল।

তখন একজন বিজ্ঞ আলেম আমাকে বলিলেনঃ আপনি উক্ত টাকা নিজ তহবিল হইতে কেন দিলেন? সেই খাতে আরও চাঁদা তো আসিতেছিল। তাহা হইতে তহসীলদারের একশত টাকা ফেরত দিতে পারিতেন। আমি বলিলামঃ আপনার এই ফতওয়ায় আমি বিস্মিত হইলাম। অপরের টাকা সেই ব্যক্তিকে দেওয়া আমার পক্ষে কেমন করিয়া জায়েয হইত? মানুষ কি আমাকে এই উদ্দেশ্যে টাকা দিয়াছে? আপনি ভাবিয়া দেখুন, আপনি আমাকে উক্ত উদ্দেশে চাঁদা দান করিলে যদি আমি এইরূপে ব্যয় করিতাম—আপনি কি তাহা পছন্দ করিতেন? কখনই না। তবে অপরের টাকা সম্বন্ধে আপনি আমাকে এরূপ পরামর্শ কেন দিতেছেন? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই পরামর্শদাতা একজন মুদার্‌রেস এবং মুফ্‌তীও ছিলেন।

ধর্মকে সুযোগ-সুবিধার অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছেঃ এইরূপে মানুষ আজকাল ধর্মকে নিজের পার্থিব উদ্দেশ্য এবং সুযোগ-সুবিধার অধীন বানাইয়া রাখিয়াছে। আরও একটি ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। এজতেহাদের দাবীদার জনৈক আলেম এক

ব্যক্তির শাশুড়ীকে হালাল করিয়া দিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি তাহার শাশুড়ীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে হতভাগা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া শাশুড়ীকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিল। আলেমদের নিকট ফতওয়া চাহিলে সকলেই একবাক্যে তাহা হারাম বলিয়া হুকুম দিলেন। কিন্তু অর্থলোভী এক মৌলবী একহাজার টাকার বিনিময়ে ফতওয়া দিল যে, শাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয। কিন্তু অকাট্য দলিল দ্বারা যেহেতু শাশুড়ী হারাম বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছেঃ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ সুতরাং সে এই ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিল যে, আজকাল স্ত্রী জাতি সাধারণত মূর্খ হইয়া থাকে। এই কারণে অনেক সময়ে তাহারা কুফরী কালাম উচ্চারণ করিয়া বসে। তাহার বিবাহিতা স্ত্রীও তদ্রূপ কুফরী কালাম বলিয়া থাকিবে, যদ্দরুন তাহার ঈমান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ বিবাহকালে নূতন করিয়া তাহার ঈমান দুরুস্ত করিয়া লওয়া হয় নাই। সুতরাং উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত তাহার বিবাহই শুদ্ধ হয় নাই। কাজেই বিবাহিতা স্ত্রীর মাতা তাহার শাশুড়ীও হয় নাই। বাকী রহিল সহবাসকৃতা স্ত্রীর মাতা হারাম হওয়া—তাহা শুধু ইমাম আবু হানীফার মত। আমি তাহা মানি না, ইহার বিপরীতপক্ষে বহু হাদীস রহিয়াছে।

মোটকথা, সে গোলমেলে প্রমাণ দ্বারা শাশুড়ীকে হালাল করিয়া দিল—শুধু হাজার টাকার লোভে। সর্বনাশা লোভ এই তথাকথিত আলেমকে ধর্মের উপরও হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী করিয়া দিল। লোভ বড় বিপদ, লোভের বশবর্তী হইয়া মানুষ করিতে পারে না এমন কাজ নাই।

আরও একটি সূক্ষ্ম কথা এখানে স্মরণ রাখার যোগ্য। অমিতব্যয়ী লোকই অধিক লোভী হইয়া থাকে। কৃপণ লোক শুধু অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি লোভী হয়; কিন্তু সে পরের দ্রব্য আত্মসাতের ব্যাপারে খুবই পরহেযগার হইয়া থাকে। সে কাহারও ধন স্পর্শ করে না। পক্ষান্তরে অপব্যয়ী লোক পরের দ্রব্যকে হালাল মনে করিয়া থাকে। অতএব, আমি বলি, আজকাল অপব্যয়ী লোক অপেক্ষা কৃপণ লোক ভাল। অপব্যয়ী লোক পরের হক্ নষ্ট করিয়া থাকে—আর কৃপণ লোক শুধু আল্লাহ্‌র হক্‌ই নষ্ট করে। অতএব, কৃপণ ব্যক্তির কার্যজনিত ক্ষতি তাহাতেই সীমাবদ্ধ, অন্য পর্যন্ত পৌঁছে না।

এইরূপে কোন কোন মানুষ কাহারও নিকট হইতে ধার লইয়া পরিশোধ করিতে জানে না। মুযাফ্‌ফরনগরে এক ব্যক্তি কোন এক সওদাগর হইতে দশ টাকা ধার করিয়াছিল; কিন্তু দেওয়ার নাম নাই। একেবারে হজম করিয়া বসিল। সওদাগর প্রথম প্রথম তাগাদা করিলে টালবাহানা করিত। কিন্তু এক বৎসরকাল অতীত হওয়ার পর বলিতে লাগিলঃ যাও, কি করযের তাগাদা করিয়া বেড়াইতেছ? তোমার নিকট আমার লিখিত কোন প্রমাণ আছে কি? থাকিলে দেখাও। নচেৎ যাও, আমি দিব না। এখন বেচারা লিখিত প্রমাণ কোথা হইতে আনিবে? সে তো বিশ্বাসের উপর এমনি ধার দিয়াছিল। এই ব্যাপারের ফল এই দাঁড়াইল যে, সওদাগর লোকটি ভবিষ্যতে আর কখনও কাহাকেও ধার দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। ফলকথা, লেন-দেনের ব্যাপারে যে ইত্যাকার বিশ্বাসঘাতকতা চলিয়াছে, ইহা বর্ণনাতীত।

تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نهم

"সর্বশরীরে ক্ষত, কত জায়গায় পট্টি লাগাইব?"

খাছ লোকদের অপকর্মঃ একটি দুইটি কথা হইলে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে তো আপাদমস্তক নিকৃষ্ট অবস্থা। আম (সাধারণ) এবং খাছ (বিশিষ্ট) সকলেরই লেন-দেনের ব্যাপার

জঘন্য। খাছ লোকদের অবস্থা এই যে, তাঁহারা কাহারও আতিথ্য গ্রহণ করিলে আরও অনাহূত লোককে ডাকিয়া আনিয়া দস্তরখানে বসাইয়া লন। প্রথমত, অন্যান্য লোকের উচিত আহারের সময় মজলিস হইতে সরিয়া পড়া। যদি সরিয়া না পড়ে, তবে মেহ্মানের পক্ষে সকলকে ডাকিয়া দস্তরখানে বসাইয়া লওয়া কখনও জায়েয নহে। গৃহস্বামীর অনুমতি ভিন্ন অপর লোককে দস্তরখানে বসাইবার আপনার কি অধিকার আছে?

বলিতে পারেন, গৃহস্বামী ইহাতে অসন্তুষ্ট হয় না; বরং খুশীই হয়। ইহা একেবারে ভুল কথা। কেননা, প্রত্যেকেই মেহমানের পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অধিক লোক বসিলে তাহার অসন্তোষ অবশ্যই হইবে। সে অসন্তুষ্ট না হইলেও তাহার ঘরের লোকেরা নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবে। কেননা, তাহাদের জন্য আবার নূতন করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। মেয়েদের রীতি—তাহারা নিজেদের জন্য পুনরায় চুলায় আগুন জ্বালে না। কোন সময় খাদ্যের অভাব পড়িলে তাহারা উপবাসই থাকিয়া যায়। বস্তুত নিজের পরিবারস্থ লোকের কষ্ট কেহই বরদাশ্ত করিতে পারে না। কিন্তু খাছ লোকেরা এবিষয়ে মোটেই চিন্তা করেন না। দস্তরখানে বসিয়া তাঁহারা পুরা মজলিসের লোককে ডাকিয়া বসাইয়া দেন এবং মন্তব্য করেন—উপস্থিত লোকদিগকে না ডাকিয়া নিজে একাকী আহার করা লজ্জার কথা।

দুঃখের বিষয়, তাঁহারা খোদার কাছে লজ্জাবোধ করেন না। এমন লজ্জাবোধ করিলে তাঁহাদের উচিত, নিজের পয়সায় বাজার হইতে খাদ্য আনাইয়া লোকদিগকে খাইতে দেওয়া। তাহা হইলে যত ইচ্ছা লোক ডাকিয়া খাওয়াইতে থাকুন, আপত্তি নাই। কিন্তু ইন্শাআল্লাহ্! তাঁহাদিগকে এরূপ বলা হইলে আর একজনকেও ডাকিয়া বসাইবেন না।

একবার আমার বাড়ীতে কোন একজন আলেম লোক মেহ্মান হইলেন। নিয়ম অনুযায়ী তাঁহার জন্য ঘর হইতে খাদ্য কিছু বেশী পরিমাণেই পাঠান হইল। তথায় আর একজন লোক ছিলেন, যিনি আমার মেহ্মান নহেন। খাদ্য আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা কিছু বেশী দেখিয়া আমার আলেম মেহ্মান উক্ত লোকটিকে দস্তরখানে ডাকিলেন। আমার চাকর বলিল, এই খাদ্যে আপনার মালিকানাস্বত্ব নাই; বরং আপনাকে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আপনি যত ইচ্ছা খাইতে পারেন। যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, ঘরে ফেরত যাইবে। আর একজনকে এই খাদ্যে শরীক করার অধিকার আপনার নাই। আলেম মেহ্মান বলিতে লাগিলেনঃ আমি ঘর হইতে আর খাদ্য চাহিব না। দুইজনে ইহাই আহার করিব। যেই পরিমাণ খাদ্য ঘর হইতে আমার জন্য আসিয়াছে, ইহাতে আমার অধিকার আছে। ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ খাইতেও পারি কিংবা ফেরতও দিতে পারি কিংবা অপর কাহাকেও খাওয়াইয়াও দিতে পারি।

আমার চাকর বলিলঃ মেহ্মানের জন্য ঘর হইতে খাদ্য কিছু অধিক পরিমাণেই পাঠাইবার নিয়ম, যেন মেহ্মানের কম না হয়। কিন্তু উহাতে মেহমানকে মালিকানাস্বত্ব দেওয়া হয় না। শুধু খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আপনি সম্পূর্ণ খাইতে পারেন—তাহার অনুমতি আছে। কিন্তু খাওয়ায় নিজের সহিত অপরকে শামিল করার অনুমতি আপনাকে দেওয়া হয় নাই। আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করিলে হযরত মাওলানা ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন! তিনি বলিলেনঃ হাঁ, জিজ্ঞাসা করিব।

অথচ এই মাসআলাটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। পাঠ্য কিতাবেই বর্তমান আছে, কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন হয় না। তথাপি উক্ত আলেম ছাহেবের তাহা খেয়াল হয় নাই। শেষ

পর্যন্ত আমার চাকরকে নির্লজ্জের মত বলিয়া দিতে হইল। তদুপরি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি জিজ্ঞাসাও করেন নাই। অবশেষে আমি তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম, ফকীহ্‌গণ পরিষ্কার লিখিয়াছেন, মেহ্‌মানকে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও খাদ্য-দ্রব্যের মালিকানাস্বত্ব গৃহস্বামীরই থাকে। গৃহস্বামী মেহ্‌মানের লোকমা উগরাইয়া লইতে চাহিলে সেই অধিকারও তাহার আছে। অবশ্য দান করিলে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণকারী ব্যক্তির স্বত্বাধীন হইয়া যায়। যেমন, কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সমস্ত খাদ্য বাড়ী বাড়ী পাঠান হয়, তাহাতে গ্রহণকারী মালিক হইয়া যায়। কিন্তু মেহ্‌মানের সম্মুখে যে খাদ্য পেশ করা হয়, তাহাতে মেহ্‌মানের স্বত্ব জন্মে না। উহাতে শুধু খাওয়ার অনুমতি থাকে; যত ইচ্ছা খাইতে পারে। অবশিষ্ট মালিকের ঘরে ফেরত যাইবে, কিন্তু আজকাল অনেক আলেমও এ বিষয় লক্ষ্য করেন না।

ইহার এক কারণ এই যে, এসমস্ত বিষয়ের প্রতি স্বভাবত শরীফ খান্দানের লোকেরাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অপরের দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের নিজেদের নিকটই লজ্জাবোধ হয়। পক্ষান্তরে নিম্ন সমাজের লোকের মধ্যে লোভের একটু আধিক্য থাকে। আর আজকাল শরীফ খান্দানের লোকেরা এল্‌মে দ্বীন শিক্ষার প্রতি মনোযোগ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা করিয়া থাকে। কাজেই তাহাদের স্বভাব তো এইরূপই হইবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছেন। শিক্ষা উহাকে কিছুটা সংশোধন করিলেও সমূলে পরিবর্তন করিতে পারে না। এই কারণেই নওয়াব সাআদাত আলী খান কোন কোন শ্রেণীর লোককে চাকুরীতে নিযুক্ত করিতেন না। তিনি বলিতেনঃ এ সমস্ত সমাজের লোক স্বভাবত অধিক ঘুষখোর হইয়া থাকে। সেই শ্রেণীর জনৈক ব্যক্তি চাকুরীপ্রার্থী হইয়া উক্ত নওয়াব সাহেবের সমীপে দরখাস্ত পেশ করিলে তিনি উপরোক্ত কারণ দর্শাইলেন। তখন চাকুরীপ্রার্থী নওয়াব সাহেবের সেই নীতির উপর কটাক্ষ করিয়া এই কবিতাটি লিখিলেনঃ

نه هر زن زنست ونه هر مرد مرد ـ خدا پنج انگشت یکساں نه کرد

“প্রত্যেক স্ত্রীলোকই স্ত্রীলোক হয় না এবং প্রত্যেক পুরুষও পুরুষ হয় না। আল্লাহ্‌ তাআলা পাঁচ অঙ্গুলি এক সমান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।

অর্থাৎ, “আপনি যে সেই শ্রেণীর সমস্ত লোককে সমান মনে করিতেছেন, ইহা ভুল। সকলে সমান নহে।” সাআদাত আলী খান কৌতুক কথার ন্যায় উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেনঃ

وقت خوردن همه یکساں می شوند “খাওয়ার সময়ে সবগুলি অঙ্গুলিই এক সমান হইয়া যায়।”

অর্থাৎ, তুমি যে বলিতেছ, পাঁচ অঙ্গুলি সমান সৃষ্টি করা হয় নাই, ইহা ঠিক; কিন্তু খাওয়ার সময়ে সবগুলি সমান হইয়া যায়। কেননা, সমস্ত অঙ্গুলির মাথা সমান করিয়াই লোক্‌মা ধরা হয়। ব্যাস্‌, মিঞা ছাহেব বোধহয় লজ্জায় মরিয়া গেলেন।

স্বভাব সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাঃ আমি বলি, আলেমদের স্বভাব সংশোধন করিয়া লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। আমাদের ওখানকার জনৈক বুযুর্গ লোক কাহারও বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইলেন। খাওয়ার সময় তাঁহাকে ডাকা হইলে তাঁহার মজলিসের সকলেই তাঁহার সঙ্গে চলিল।

এ সম্বন্ধে গ্রাম্য লোকেরা বেশ চালু হইয়া থাকে। খাওয়ার নাম শুনিতেই দৌড়াইতে আরম্ভ করে। সকলে যাইয়া খাওয়ার মজলিসে বসিলে গৃহস্বামী নম্রতার সহিত সকলকে বলিলঃ “আপনারাও খাওয়ায় শরীক হউন। খাওয়ার অভাব হইবে না।” কিছুসংখ্যক লোক অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল, “আমরা তো শুধু হযরতের সঙ্গে এমনি আসিয়াছি। আমরা খাদ্য গ্রহণ করিব না।” গৃহস্বামী নীরব রহিল। তখন বুযুর্গ লোক বলেনঃ একজন মুসলমান যখন মহব্বতের সহিত বলিতেছেন, তখন তোমরা অস্বীকার কর কেন? সোব্হানাল্লাহ্! কেহ যদি সেই গরীবকে জিজ্ঞাসা করিত, সে কেমন মহব্বতের সহিত বলিয়াছিল? সে তো শুধু লৌকিকতার খাতিরে বলিয়াছিল—এসমস্ত লোক যখন আমার বাড়ীতে একেবারে খাওয়ার সময় আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাদিগকে খাওয়ার জন্য সমাদর না করা এবং তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা না করা লোকাচার মতে নিন্দনীয়। অন্যথায় ইহা স্পষ্ট কথা—যে ব্যক্তি দশ-পাঁচ জন লোকের জন্য খাওয়ার আয়োজন করিতেছে, সে এত বড় জনতাকে মহব্বতের সহিত কেমন করিয়া দাওয়াত করিতে পারে? যাহারা এমনভাবে আসিয়া মেহ্মান হইয়া বসিয়াছে—যেমন কথিত আছেঃ “مان نه مان میں تیرا مهمان” —“স্বীকার কর আর নাই কর, আমি তোমার মেহমান।”

মোটকথা, বুযুর্গ লোকটির আদেশ অনুযায়ী সকলেই হাত ধুইয়া খাইতে বসিয়া গেল। ফলে খাদ্যদ্রব্য কম পড়িয়া গেল। গৃহস্বামী তাহার ভাইয়ের বাড়ী হইতে খাদ্য আনাইয়া লইল, তাহাতেও কুলাইল না। অবশেষে বাজার হইতে খরিদ করিয়া আনা হইল। সকলের সম্মুখে বেচারা লজ্জা পাইল। কেননা, তাহার ঘর হইতে সকলের খাওয়া জুটিল না। বেশ তিক্ততার সৃষ্টি হইল। পরে কেহ কেহ উক্ত বুযুর্গ লোকের দুর্নাম করিল। তিনি আল্লাহ্র ভয় একটুও মনে স্থান দিলেন না। এত বড় জনতা পরের বাড়ীতে আনিয়া হাযির করিলেন।

বন্ধুগণ! এমন অন্যায় আচরণে সকলের মনেই কষ্ট হয়, যদিও কেহ লজ্জার কারণে প্রকাশ করে না। আমার নিজেরই এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একবার কোন এক সমিতির তরফ হইতে আমাকে দাওয়াত করা হইয়াছিল। আমি সফরের খরচ ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করি নাই। ভাড়াও থার্ড ক্লাসেরই লইয়াছি। তাহাও সমিতির ফাণ্ড হইতে লই নাই; বরং দাওয়াতকারী নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমার পূর্ব হইতেই শর্ত স্থির হইয়াছিল। তিনি নিজ তহবিল হইতে আমাকে খরচ দিয়াছেন। তিনি অতিরিক্ত দিতে চাহিলে আমি গ্রহণ করি নাই। খাওয়ার বেলায়ও আড়ম্বর করিতে আমি নিষেধ করিয়া দিয়াছি। এই ব্যবহারে সমিতির লোকেরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং সমিতির সেক্রেটারী আমার সম্মুখে জনৈক ওয়ায়েযের দুর্নাম করিয়া বলিলঃ হযরত! তিনি তো একদিনে এগার টাকার পান খাইয়া গিয়াছেন। একজন লোকে অবশ্য এগার টাকার পান খাইতে পারে না। ব্যাপার এই হইয়াছিল যে, তাঁহার সঙ্গে যত লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল, সকলকে প্রচুর পরিমাণে পান খাওয়াইয়াছেন। তখন অবশ্য কেহ কিছু বলে নাই। কিন্তু পরে দুর্নাম মুখে আসিয়াই পড়িয়াছে।

আমি মনে মনে বলিলাম, আপনি যে আমাকে অধিক টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, যদি আমি তাহা গ্রহণ করিতাম, তবে আপনি পরের দিন আমারও এরূপ দুর্নাম করিতেন। বাস্তবিক-পক্ষে এহেন অবস্থায় গৃহস্বামীর যেরূপ কষ্ট হয় তাহাতে দুর্নাম মনে আসিয়াই পড়ে। আল্হামদু লিল্লাহ্। আমি পানও খাই না, চা-ও পান করি না। নাশ্তারও অভ্যাস করি নাই, যাহাতে অতিথি

সৎকারকের কোন কষ্টই না হয়। একস্থানে খাওয়ার পরে এই মনে করিয়া পান চাহিয়া লইলাম, যেন গৃহস্বামী আমার সংকোচহীনতায় খুশী হয়, কিন্তু গৃহস্বামী খুব উত্তম করিয়াছেন। পরিষ্কার জবাব দিয়াছেন, আমাদের এখানে পান নাই, কেহই খায় না। প্রকৃতপক্ষে পানের খরচ বাহুল্য ব্যয় ছাড়া কিছুই নহে। ইহাতে গৃহস্বামীর বেশ খরচ হয়। কিন্তু কাহারও প্রতি ইহা তাহার কোন এহ্‌সান গণ্য হয় না। কেননা, প্রত্যেকেই মনে করে, আমি মাত্র সামান্য এক টুকরাই তো খাইয়াছি। কিন্তু একশত লোককে এক টুক্‌রা করিয়া দিতে গৃহস্বামীর কয়েক টাকাই ব্যয় হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন খাদ্য খাওয়ার জন্য সময় নির্ধারিত থাকে দিনে রাত্রে দুইবার। আর পান খাওয়ার জন্য কোন সময়ই নির্দিষ্ট নাই। আমার ধারণা—কোন কোন সময় পানের খরচ খাওয়ার খরচের চেয়ে অধিক হইয়া যায়।

কাজেই এই অপ্রয়োজনীয় খরচ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যদি কোন মেহ্‌মানের জন্য পান হাযির করা হয়, তবে তাঁহার নিকটে উপস্থিত সকল লোককে তাহা হইতে বিতরণ করা মেহ্‌মানের পক্ষে জায়েয নহে। কিংবা মেহমানের পক্ষে তাহাদের জন্য গৃহস্বামীকে ফরমায়েশ করিয়া পান আনাইয়া দেওয়াও জায়েয নহে। ইহাতে কোন কোন সময় গৃহস্বামীর মনে কষ্ট হইয়া থাকে।

এই কারণে আমি সফরে মাত্র একজন লোক সঙ্গে লইয়া থাকি। তাহা পূর্বাহ্নেই দাওয়াতকারীকে জানাইয়া দেই, যাহাতে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। দাওয়াতকারীর উপর শুধু আমার এবং আর এক ব্যক্তির দায়িত্ব থাকে। পরে কখনও পথে যদি কেহ আমার মহব্বতে সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করে, তবে আমি তাহাকে পরিষ্কার বলিয়া দেই—আপনি নিজের ব্যবস্থা নিজে করিবেন। আমার থাকার ব্যবস্থা যেখানে হইবে আপনি সেখানে থাকিবেনও না; বরং হোটেল বা অন্য যেখানে আরামপ্রদ হয়, থাকার ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। বাজার হইতে নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। কেবল সকালে ও সন্ধ্যায় সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিবেন। যাহাতে দাওয়াতকারী বুঝিতে না পারে যে, আপনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। অতঃপর যদি সে নিজে আপনাকে দাওয়াত করে, তবে আপনি নিজের সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া তাহা মঞ্জুর করিবেন অথবা না-মঞ্জুর করিবেন। আমার সঙ্গী হিসাবে সেখানে খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। যদি কোন সময় কোন দাওয়াতকারী আমাকে বলে, আপনার সাথী লোকদিগকে দাওয়াত করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমি পরিষ্কার বলিয়া দেই—আমার সাথী কেহ নাই। আমি কাহাকেও ডাকিয়া আনি নাই। আপনি তাহাদিগকে দাওয়াত করিতে হইলে নিজে তাহাদিগকে বলুন এবং শুধু আপনার নিজের সম্পর্কের ভিত্তিতে যাহা ইচ্ছা করুন। ইহার জন্য আমার উপর কোন এহ্‌সান মনে করিবেন না। আমি তাহাদিগকে কিছু বলিতে চাই না। আমার সাধারণ অভ্যাস এইরূপ। হাঁ, কেহ একান্ত অন্তরঙ্গ হইলে সেক্ষেত্রে এই নীতি রক্ষা করিয়া চলি না।

একবার জৌনপুরে বহু লোক আমার সঙ্গী হইয়া গেল এবং সকলেই বাজার হইতে নিজ নিজ ব্যবস্থা করিত। দাওয়াতকারীর ইচ্ছা ছিল সকলে তাঁহার বাড়ীতেই আহার করুক। কিন্তু আমার সঙ্গীগণ তাহাতে সম্মত হইল না। জনৈক আলেম আমার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল; জনাব! আপনার সঙ্গীগণকে আপনার সহিত এখানে আহার করিতে বলিয়া দিন। তাহারা অন্যত্র খাইলে গৃহস্বামীর মনে কষ্ট হয়। আমি বলিলামঃ "মাওলানা! আপনি নীরব থাকুন। আমি এই লৌকিক

মনঃকষ্টকে প্রকৃত কষ্ট অপেক্ষা হাল্‌কা মনে করি ; যাহা এত লোকের ব্যবস্থা করিতে গৃহস্বামীর এবং তাহার পরিবারস্থ লোকের ভোগ করিতে হইবে এবং কেহ কেহ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন।

এখন শুনুন, পরের গৃহে তো মাওলানা এরূপ মন্তব্য করিলেন, কিন্তু যখন আমাকে নিজ গৃহে দাওয়াত করিলেন, তখন শুধু আমাকে এবং সঙ্গীগণের মধ্য হইতে তাঁহার এক পুরাতন বন্ধুকে দাওয়াত করিলেন। অবশিষ্ট সঙ্গীগণের মধ্যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না এবং বলিতে লাগিলেনঃ ঘরে অসুস্থ, কাজেই সকলকে দাওয়াত করিতে পারিলাম না। আমি মনে মনে বলিলাম, পরের গৃহে মন্তব্য করার বেলায়তো আপনার একথা মনে পড়িল না যে, এই বেচারার ঘরেও কোন অসুবিধা থাকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন মাওলানা যদি আমার সঙ্গীদিগকে দাওয়াত করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে ঘরে সম্ভব না হইলে বাজার হইতেও ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, বরং আমার ধারণা—মাওলানা যখন দেখিয়াছেন যে, কাহারও দাওয়াতে আমি সঙ্গীগণকে সঙ্গে লই না। এই কারণেই মাওলানা আমাকে দাওয়াত করিতে সাহস করিয়াছেন। সমস্ত সঙ্গী আমার সঙ্গে দাওয়াতে শরীক হওয়ার দস্তুর থাকিলে মাওলানা আমাকেও দাওয়াত করিতেন না। এই কারণে মাশায়েখ ও ওলামায়ে কেরামের এসমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। নিজের সমস্ত সঙ্গীর বোঝা যেন দাওয়াতকারীর ঘাড়ে চাপাইয়া না দেন।

ফলকথা, টাকা-পয়সার লেনদেনে ও অন্যের বাড়ীতে মেহমান হওয়ার সময় গৃহস্বামীর সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে অতি অল্পই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ইহার ফলে আমাদের সামাজিক জীবন অতিশয় নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর ইহার একমাত্র কারণ, আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতেছি।

মান-মর্যাদার মোহ অর্থলোভ হইতেও অধিকঃ মান-মর্যাদা অর্থ অপেক্ষাও অধিক লোভনীয়। কেননা, মান-সম্মানের প্রকৃত অধিকার অন্তরের উপর। ইহা দ্বারা অনেক বড় বড় কাজ উদ্ধার হয়। হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়াও যে কাজে সফলতা লাভ করা যায় না, একজন সম্মানী লোকের মুখের একটি কথায় সে কাজ সফল হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই কারণে মান-সম্মান কাম্য হয়, যেন উহার বদৌলত মানুষের ক্ষতি হইতে নিরাপদে থাকা যায়। অর্থাৎ, মান-সম্মানের প্রকৃত লাভ হইল ক্ষতি নিবারণ করা। কিন্তু আজকাল ইহাকে লাভ অর্জনের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয় এবং ইহার সাহায্যে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করা হয়। ফলকথা, দুনিয়ার ধন-দৌলতের মোহ যখন হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তখন দুনিয়ার মান-মর্যাদার মোহ কেন হইবে না? হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِىْ قَطِيْعَةِ غَنَمٍ اَفْسَدَ لَهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِلدِّيْنِ (اَوْكَمَا قَالَ)

“অর্থাৎ, বক্‌রীর পালে পতিত দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ বক্‌রীর পালের এত ক্ষতি করিতে পারে না। ধন এবং মান-সম্মানের মোহ ধর্মকে যতখানি বিনষ্ট করিতে পারে।”

ইহা হইতে বুঝিয়া লউন, মান-মর্যাদার মোহ ধর্মের কতটুকু ক্ষতি করিয়া থাকে। বস্তুত মানুষ সম্মানলাভের জন্য এমন জঘন্য কাজ করিয়া ফেলে, যাহা অর্থ উপার্জনের জন্যও করে না।

সম্মানলাভের জন্য ধর্মের বিনাশ সাংঘাতিকরূপেই করা হয়। রসম এবং অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে হাজার হাজার টাকা শুধু নামের জন্য ব্যয় করা হয়। উৎসবে এবং শোকানুষ্ঠানে কেহ নিজের ভূসম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া ফেলে। কেহ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি লাভ করিয়াছ? উত্তর করিবে, কিছুই না; কেবল একটা নাম কিনিয়াছি, বিক্রয় করিলে যাহার মূল্য দুই কড়িও হইবে না।

যাহাহউক, ইহারা দুনিয়ার বিনিময়ে এমন বস্তু খরিদ করিয়া থাকে, যাহাকে তাহারা নিজেরাও দুনিয়া বলিয়াই মনে করে। কিন্তু কেহ কেহ ধর্মের বেশ ধরিয়া দুনিয়া খরিদ করিয়া থাকে। ইহারা পূর্বোক্ত লোকদের চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট। কেননা, তাহারা দুনিয়াকে দুনিয়ার বেশে অর্জন করে, কাহাকেও ধোঁকা দেয় না। আর শেষোক্ত লোকেরা ধর্মের বেশে দুনিয়া উপার্জন করে, ইহাতে তাহারা মানুষকে ধোঁকা দেয়; এমন কি কোন কোন সময় তাহারা নিজেরাও ধোঁকায় পতিত হয়। মনে করে, আমরা ধর্মের কাজ করিতেছি। যেমন, দ্বীনী এলম শিক্ষা করা সর্বোত্তম বস্তু। কিন্তু ইহাতে মানুষের কি কি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। অধিকাংশ লোকেরই দ্বীনী এলম হাসিলের উদ্দেশ্য থাকে শুধু দুনিয়া উপার্জন করা। যদিও দ্বীনী এলমের দ্বারা দুনিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্জিত হয় না—তবে হাঁ, ভিক্ষাবৃত্তি অবশ্যই শিক্ষা হয়। শিক্ষালাভের পর মুসলমানদের নিকট চাঁদার সওয়াল লইয়া বাহির হয়। যাহার ফলে মানের পরিবর্তে অপমান অধিক হইয়া থাকে। তথাপি কেহ কেহ শুধু এই উদ্দেশ্যে দ্বীনী এলম শিক্ষা করিয়া থাকে যে, আলেম হইয়া নিজে পৃথক একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার জন্য চাঁদা উসুল করিব। কেহ কেহ আবার চাঁদা উসুল করে না। তাহারা টাকা-পয়সা যদিও কম পায়, কিন্তু মান-সম্মান অধিক পায়। কেননা, আল্‌হামদুলিল্লাহ্! মুসলমান সমাজে আজও আলেমদের যথেষ্ট সম্মান আছে। যদি সে আলেমদের চাল-চলন অবলম্বন করে, ভিক্ষাবৃত্তি না করে—যদিও রিয়াকারীর জন্যই আলেমের চাল-চলন অবলম্বন করুক এবং তাহার দ্বীনী এলম শিক্ষার উদ্দেশ্য ইহাই হয় যে, মানুষের দৃষ্টিতে সে সম্মানিত হইবে। এই ভিক্ষাবৃত্তি না করার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে এমনিতেই আলেমের ন্যায় সম্মান লাভ হয়। অতএব, দ্বীনী এলম শিক্ষার পশ্চাতে যদি চাঁদা উসুলের নিয়ত নাও থাকে, বরং সম্মানলাভের নিয়ত করে, তাহাও দুনিয়াই বটে।

সম্মান মোহের ফলঃ ধর্মের বেশে এই ধর্মীয় শিক্ষার্জণের শিক্ষার পরিণাম এই হইবে, যেমন হাদীস শরীফে আছেঃ

يُجَآءُ بِالشَّهِيْدِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ مَاعَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ فَاسْتَشْهَدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ فُلَانٌ جَرِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ ○

অর্থাৎ, "শহীদকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে এবং তিনি তাহাকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া দিবেন, তাহা সেও স্বীকার করিবে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি এসমস্ত নেয়ামতের শোকরগুযারীতে কি আমল করিয়াছ? সে বলিবেঃ হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়াছি। আল্লাহ্ বলিবেনঃ তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, তুমি শুধু বাহাদুর বলিয়া খ্যাতি লাভ করার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলে; তোমাকে বাহাদুর বলা হইয়াছে। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হইবে—ইহাকে উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ কর, ফলত তাহাই করা হইবে।"

ثُمَّ يُجَـاءُ بِالْقَـارِىْ قَدْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَـهٗ وَقَـرَأَ الْقُـرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَـرَفَهَـا قَالَ فَمَـا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَرَأْتَ لِيُقَالَ اِنَّكَ قَارِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ ○

"অতঃপর আলেমকে আনা হইবে, যিনি নিজে এল্‌ম শিখিয়া অপরকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সুন্দররূপে কোরআন পড়িয়াছেন, আল্লাহ্ তাহাকেও যে সমস্ত নেয়ামত সে ভোগ করিয়াছে স্মরণ করাইয়া দিবেন; সে তাহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলিবেনঃ এ সমস্ত নেয়ামতের শোকরগুযারীতে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে উত্তর করিবেঃ আমি এল্‌ম শিখিয়াছি ও অপরকে শিখাইয়াছি এবং আপনার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কোরআন শিখিয়াছি। আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলিতেছ; বরং তুমি শুধু আলেম নামে খ্যাতিলাভের জন্য এল্‌ম শিখিয়াছ এবং এই জন্যই কোরআনও পড়িতে, যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। সবকিছুই তুমি লাভ করিয়াছ। অতঃপর এ ব্যক্তির জন্যও পূর্বোক্তরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া নিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।" হাদীসের ভাষ্যমতে সেই মাওলানা ছাহেবের এই দুর্দশা হইবে, যিনি বড় সূক্ষ্মদর্শী, বিখ্যাত শিক্ষক এবং মুফ্‌তী ছিলেন। সহস্র সহস্র মানুষ যাঁহার মুরীদ ও অনুরক্ত ছিল এবং মুছাফাহার সময় তাঁহার হাত-পায়ে চুম্বন করা হইত। ثُمَّ يُجَاءُ بِالْجَوَّادِ

"অতঃপর দাতাকে উপস্থিত করা হইবে যাহাকে, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামত এবং নানাবিধ ধন-দৌলত দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাহার সম্মুখেও নিজের প্রদত্ত সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করিবেন, সে তাহা স্বীকার করিবে। অতঃপর প্রশ্ন করা হইবে, এসমস্ত নেয়ামতের শোকরগুযারীতে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে বলিবেঃ হে খোদা! যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করা আপনার প্রিয় ছিল, তেমন কোন স্থানেই আমি ব্যয় না করিয়া ছাড়ি নাই। আল্লাহ্ বলিবেনঃ তুমি মিথ্যা বলিতেছ; বরং তুমি শুধু দাতা নামে লোকসমাজে খ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যেই দান করিয়াছিলে। তুমি যথেষ্ট প্রশংসা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছ। অতঃপর ইহার সম্বন্ধেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে। ফলত তাহাকেও উপুড় করিয়া টানিয়া নিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।" —মুস্‌লিম, নাসায়ী ও তিরমিযী

কেবল ধর্মের বাহ্যিক রূপের নাম ধর্ম নহেঃ ভাবিয়া দেখুন, শহীদ, আলেম এবং দাতার এই দুর্দশা কেন হইল? শুধু এই জন্য যে, খোদার সন্তোষলাভের জন্য তাহারা এই আমল করে নাই। ইহাতে বুঝা যায়, শুধু ধর্মের বাহ্যিক রূপের নাম ধর্ম নহে; বরং বাহ্যিক রূপের সঙ্গে যথার্থ বিষয়ও আবশ্যক। মাওলানা বলিয়াছেনঃ

گر بصورت آدمی انساں بدے ۔ احمد وبو جہل هم یکساں بدے

"বাহ্যিক আকারে মানুষ মানুষ হইলে আহমদ (দঃ) এবং আবু জাহল সমকক্ষ হইতেন।" অর্থাৎ, ধর্মের বাহ্যিক রূপ গণ্য হইলে কিয়ামতের দিন শহীদ, আলেম এবং দাতার এই দুর্দশা হইত না। কেননা, বাহ্যিক আকারের ধর্ম-কর্ম তাহাদের নিকট কম ছিল না। কিন্তু সারবস্তু হইতে তাহারা শূন্য ছিল। অর্থাৎ, আমলের মধ্যে নিয়ত খাঁটি ছিল না। মৌলিক বস্তু এবং উহার বাহ্যিক

রূপের মধ্যে পার্থক্য এইরূপ, যেমন প্রকৃত বাঘের আকৃতি তো দূরের কথা, উহার শব্দ কিংবা গন্ধ পাইয়াও সমস্ত প্রাণী কাঁপিয়া উঠে, জঙ্গল প্রকম্পিত হয়। পক্ষান্তরে কৃত্রিম বাঘ, যেমন মহররম মাসে কেহ কেহ বাঘের চামড়া পরিধান করিয়া বাঘ সাজিয়া থাকে, অথচ একটি নেক্‌ড়ে বাঘ কিংবা ক্ষিপ্ত কুকুর দেখিলে এই নকল বাঘই সর্বপ্রথম লেজ নামাইয়া পালাইতে থাকে। যাহারা ধর্মের বেশে দুনিয়া অর্জন করে, তাহাদেরও এই অবস্থা। মাওলানা বলেনঃ

اینکه می بینی خلاف آدم اند ـ نیستند آدم غلاف آدم اند

"মানব আকারে যাহাকিছু দেখিতেছ ইহারা মানবের বিপরীত। আদম নহে, আদমের খোলস।"

সেই কৃত্রিম বাঘ যেমন সত্যিকারের বাঘ নহে, বাঘের খোলসমাত্র; তদ্রূপ ধর্মের বেশে দুনিয়া সত্যিকারের ধর্ম নহে; বরং ধর্মের খোলস মাত্র। যেমন, কোন বিশ্রী বৃদ্ধা রমণী যুবতীর বেশধারণপূর্বক মনমাতান পোশাকে কোন পুরুষের সহিত বিবাহিতা হইলে, বাহিরে তো খুব রূপসী বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু পোশাক খুলিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে, মায়ের মা নানী। কবি বলেনঃ

بس قامت خوش که زیر چادر باشد ـ چوں باز کنی مادر مادر باشد

"চাদরে আচ্ছাদিত অনেককেই সুন্দর গঠন বলিয়া বোধহয়, কিন্তু চাদর খুলিয়া ফেলিলে মায়েরও মায়ের মত দেখা যায়।" অর্থাৎ, বোরকাবৃত থাকা পর্যন্ত মনমাতান থাকে, কিন্তু বোরকা খুলিয়া ফেলিলে স্বরূপ প্রকাশ পায়। যাহারা খাঁটি নিয়ত ভিন্ন ধর্মের কাজ করে, তাহাদের অবস্থাও এইরূপঃ

از بروں چوں گور کافر پر حلل ـ واندروں قهر خدائے عز وجل
از بروں طعنه زنی بر بایزید ـ و ز درونت ننگ میدارد یزید

"বাহ্যিক রূপ কাফেরের কবরের ন্যায় সুসজ্জিত। অভ্যন্তর খোদার গযবের ন্যায় ভয়ঙ্কর। বাহিরের পবিত্রতা বায়েযীদ (রঃ)-কে তিরস্কার করে, কিন্তু অভ্যন্তর ইয়াযীদের জন্যও লজ্জার কারণ।"

ইহার অর্থ এই নহে যে, বাহিরের বেশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমার বলার উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যিক রূপ যথেষ্ট নহে; বরং বাহ্যিক আকারের সঙ্গে সত্যিকারের বস্তুও আবশ্যক। দেখুন, কেহ যদি বলে, মাটির তৈয়ারী আম কোন কাজের নহে; ইহার অর্থ এই নহে যে, আমের আকার সম্পূর্ণ নিরর্থক; বরং ইহার অর্থ এই—এই মনোরম আকৃতির সঙ্গে সত্যিকারের পদার্থও আমই যদি হয়, তবে এই আকৃতিও উত্তম। অন্যথায় এই মাটির মূর্তি লইয়া কাহার কি কাজে আসিবে? যেমন, সত্যিকারের আমের মধ্যে ইহার আকৃতিও কাম্য হইয়া থাকে, যেখানে আমের মিষ্টতা এবং স্বাদের প্রশংসা করা হয়, সেখানে ইহার মনমাতান বর্ণ এবং হালকা বাকলেরও প্রশংসা করা হয়। কেহ আপনাকে মৃত সুন্দরী স্ত্রীলোকের একখানা ফটো আনিয়া দিলে আপনি ইহাকে অনর্থক মনে করিবেন। কিন্তু তেমন সুন্দরী একজন স্ত্রীলোক জীবিত অবস্থায় পাইলে তখন আপনি তাহার সুন্দর আকৃতিকে কখনও অনর্থক মনে করিবেন না।

এইরূপেই মনে করুন, ধর্মের বাহ্যিক আকৃতিও কাম্য। কিন্তু শর্ত এই যে, ইহার সঙ্গে ধর্মের মূল পদার্থও একত্রিত থাকিতে হইবে। ধর্মের মূল বস্তুর সহিত যদি বাহ্যিক রূপ নাও থাকে, তবে তাহারা আভ্যন্তরীণ স্বভাবেই ভাল হইবেন। তাঁহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের মহব্বত, নম্রতা

এবং সৎস্বভাব সব কিছুই থাকে, কিন্তু বাহ্যিক আকার হয় শরীঅতের বিপরীত। তাহাদের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন, যেমন কেহ নিজ রূহের উপর আধিপত্য বিস্তারপূর্বক উহাকে কুকুরের দেহ-পিঞ্জরে ঢুকাইয়া দিল, রূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের অভ্যাসের দ্বারা কেহ কেহ এরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে তিনি নিজের রূহকে অপর প্রাণীর দেহে স্থানান্তরিত করিয়া দিতে পারেন। বলাবাহুল্য, এই উপায়ে কেহ নিজের আত্মাকে কুকুরের দেহে স্থানান্তরিত করিয়া দিলে সে তখন বাহ্যিকভাবে কুকুরই হইবে, মানুষ থাকিবে না। আত্মা মানুষের হইলেও ঐ কুকুররূপী মানুষকে কেহই মানুষের সমান আসন দিবে না।

এই দৃষ্টান্ত হইতে হয়তো আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন, বাহ্যিক আকৃতিরও প্রয়োজন আছে এবং মূল বস্তুরও। মূল বস্তু ভিন্ন বাহ্যিক আকার এবং বাহ্যিক আকার ভিন্ন মূল বস্তুও যথেষ্ট নহে। (অবশ্য) এই যথেষ্ট না হওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। কেননা, মূল বস্তুবিহীন বাহ্যিক রূপ অধিকতর নিকৃষ্ট। পক্ষান্তরে বাহ্যিক রূপবিহীন মূল বস্তু তত নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু মন্দ তাহাও। খুব বুঝিয়া লউন।

রূহ এবং দেহের সম্পর্ক ঃ কোন তালেবে এল্‌ম প্রশ্ন করিতে পারে—হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে ঃ শহীদগণের রূহ বেহেশ্‌তে সবুজ পক্ষীসমূহের দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে থাকিবে। আর পূর্বোক্ত বর্ণনায় বুঝা যায়, মানুষের রূহ কোন প্রাণীর দেহ-পিঞ্জরে স্থানান্তরিত হইতে পারে। তখন সে মানুষ থাকিবে না ; বরং "হায়ওয়ান" হইবে। উভয় হাদীসের সম্মিলিত মর্মে ইহাই অনিবার্য হয় যে, শহীদগণ বেহেশ্‌তে মানুষ থাকিবেন না, পক্ষী হইয়া যাইবেন। ইহা মর্যাদার কথা নহে। কেননা, মানুষ পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাজেই পক্ষী হওয়া মানুষের পক্ষে অবনতির কারণ হইবে, উন্নতির কারণ হইবে না।

ইহার উত্তর এই যে, যে সমস্ত পক্ষীর দেহে শহীদগণের রূহ অবস্থান করিবে, উহারা শুধু তাঁহাদের বাহন হইবে, প্রকৃত দেহ হইবে না। তাঁহাদের মানব দেহ থাকিবে স্বতন্ত্র। তাহাতে তাঁহাদের রূহের অবস্থান ঠিক আমাদের পাল্কী, ডুলি বা বাগ্‌গীতে আরোহণের ন্যায় হইবে। পাল্কী বা ডুলির দ্বার রুদ্ধ থাকিলে দর্শকেরা কেবল পাল্কী বা ডুলি আসিতেছে বলিয়াই দেখিতে পাইবে। আরোহীর দেহ দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তাহাতে কখনও বুঝা যাইবে না যে, পাল্কী এবং ডুলিই আরোহীর দেহ, ইহার মধ্যেই আরোহীর আত্মা ঢুকিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকেই জানে, পাল্কীর ভিতরে যে মানুষ বসিয়া রহিয়াছে তাহার দেহ পাল্কীর খাঁচা হইতে স্বতন্ত্র এবং পাল্কী শুধু তাহার বাহন। এরূপে এস্থলেও মনে করুন, বেহেশ্‌তে শহীদগণের রূহের জন্য পক্ষী-দেহ পাল্কীর সমতুল্য হইবে এবং উহার ভিতরে মানুষের রূহ্ মানব দেহ লইয়া আরোহী থাকিবে। অতএব, ইহাতে মানুষ পক্ষী হইয়া যাওয়া অনিবার্য হয় না। অবশ্য মানুষের রূহ যদি নিজের দেহ ছাড়িয়া পক্ষী-দেহের মধ্যে ঢুকিত, তবে তাহা অনিবার্য হইত। এক্ষেত্রে কিন্তু তদ্রূপ হইবে না।

এখন একটি কথা ভাবিয়া দেখার বিষয়—শহীদের রূহ্ যে মানব দেহে ঢুকিয়া পক্ষী-দেহের পিঞ্জরে আরোহণ করিবে, তাহা কোন্ মানব দেহ? উপাদানগঠিত মানব দেহ? না অন্য কোন প্রকার দেহ?

ইহার তথ্য অবগত হওয়ার জন্য 'কাশ্‌ফের' প্রয়োজন, কোরআন ও হাদীস এ সম্বন্ধে নীরব। 'কাশ্‌ফ'বিশিষ্ট ওলিগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, 'আলমে বরযখের' মধ্যে মানুষকে ইহ-জগতের দেহ-সদৃশ এক দেহ দেওয়া হইবে। প্রকৃতপক্ষে উহা এই দেহের ন্যায় উপাদানগঠিত

হইবে না; বরং উহার সদৃশ হইবে মাত্র। কিন্তু ইহা হইতে আরও সূক্ষ্ম হইবে। এই সদৃশ দেহ শুধু আলমে বরযখের মধ্যেই দেওয়া হইবে। অতঃপর বেহেশ্‌তে ও দোযখে আবার মৌলউপাদানের দেহই প্রাপ্ত হইবে। অবশ্য আলমে বরযখের মধ্যে ইহলৌকিক দেহ প্রদান করা অসম্ভব নহে, কিন্তু কোন 'আহ্‌লে কাশ্‌ফ' তদ্রূপ দেখিতে পান নাই। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, আলমে বরযখের মধ্যে সদৃশ দেহের মাধ্যমেই মানবাত্মার শাস্তি বা শান্তি হইয়া থাকে।

সুতরাং ধর্মদ্রোহীরা যে বলে, "হাদীসে বর্ণিত কবর-আযাবের বিষয়টি আমাদের বোধগম্য হয় না; কেননা, মানবের মৃত্যুর পর আমরা তাহার উপাদানগঠিত দেহ মাসের পর মাস ধরিয়া প্রহরা দিয়াছি, কিন্তু উহাতে আযাব বা সওয়াবের কোন লক্ষণ দেখিতে পাই নাই।" পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে ইহার উত্তর স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, আলমে বরযখের মধ্যে মানুষ ইহলৌকিক দেহেরই সদৃশ এক দেহ প্রাপ্ত হয়, যাহা উপাদানগঠিত নহে। সেই দেহের উপরই তৎকালীন আযাব বা সওয়াব হইয়া থাকে। সুতরাং ইহলৌকিক দেহে আযাব বা সওয়াব অনুভূত না হওয়ায় আযাব বা সওয়াব আদৌ হইবে না বলিয়া বুঝা যায় না। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অনুপম কুদরত প্রকাশের নিমিত্ত কোন কোন ক্ষেত্রে ইহলৌকিক দেহের উপরই আযাব এবং সওয়াব দেখাইয়াছেন। এমন বহু ঘটনা শুনা গিয়াছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির কবর, হইতে অগ্নিশিখা দেখা গিয়াছে। আবার কোন মৃত ব্যক্তির কবর হইতে অতি পবিত্র সুগন্ধ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং কবর আযাব সম্বন্ধীয় হাদীসের উপর কোন প্রশ্ন হইতে পারে না।

মোটকথা, আমি বলিতেছিলাম, বাহ্যিক আকারের সহিত ভিতরের এবং ভিতরের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্যও আবশ্যক। কোন কোন মূর্খ দরবেশ এই ভুলের মধ্যে পতিত হইয়াছে যে, তাহারা ভিতরের সংশোধনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া বাহিরের সংশোধনকে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছে। তাহারা মনে করিয়াছে—"নামাযের রূহ যেকের।" তদুপরি দাবী করিয়াছে, তাহাদের অভ্যন্তর সর্বদা যেকেরে মগ্ন, সুতরাং তাহাদের নামাযের প্রয়োজন নাই। এরূপে যাকাতের রূহ্ অভ্যন্তরকে পাক করা। অন্তরকে লোভ ও কৃপণতা হইতে মুক্ত করা। অতঃপর বলিতেছে—আমাদের স্বভাব দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এরূপে হজ্জের রূহ্ আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লী দর্শন করা। আমরা সর্বত্র আল্লাহ্‌র তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং আমাদের হজ্জেরও প্রয়োজন নাই।

স্মরণ রাখিবেন—ইহা প্রত্যক্ষ ধর্মদ্রোহিতা, ইহারা শরীঅতের আমলসমূহের রূহ কখনও দেখেই নাই। যদি তাহারা ঐসমস্ত আমলের রূহ্ উপলব্ধি করিতে পারিত, তবে উহাদের বাহ্যিক রূপকে কখনও নিষ্প্রয়োজন মনে করিত না। কেননা, প্রত্যেক আমলের রূহ্ এবং উহার বাহ্যিক রূপের সহিত এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে যে, বাহ্যিক রূপ ব্যতীত উহা কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না। নামাযের রূহ্ শুধু 'যেকের' নহে, যেমন ইহারা মনে করিতেছে—এক বিশেষ ধরনের যেকের, যাহা কেবল নামাযের বাহ্যিক রূপের সঙ্গেই পাওয়া যাইতে পারে। এরূপে হজ্জের রূহ্ শুধু খোদার তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করা নহে; বরং হজ্জের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে খোদার যে তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহাই হজ্জের রূহ্। যেমন, কোন কোন ঔষধ এক বিশেষত্বের কারণে হিতকর হইয়া থাকে। সেই বিশেষত্ব উক্ত ঔষধের মধ্যেই নিহিত থাকে। অন্য কোন ঔষধে তাহা পাওয়া যাইতে পারে না। যদিও উষ্ণতা এবং শীতলতায় উভয় ঔষধই সমান। খুব অনুধাবন করুন। —('রূহুল আরওয়াহ্' নামক কিতাবে আমি এই মাসআলাটিকে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছি।)

সুতরাং আমি পুনরায় বলিতেছি—বাহ্যিক আকারও অভ্যন্তর হইতে নিঃসম্পর্ক নহে, আর অভ্যন্তরও বাহিরের সহিত সম্পর্কহীন নহে; বরং উভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকা একান্ত প্রয়োজন। যাহের ও বাতেন সম্পর্কীয় বর্ণনাটি এখানে প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আমি বলিতেছিলাম—কেহ কেহ ধর্মের বেশে দুনিয়া অর্জন করিয়া থাকে। যেমন, অনেকে দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা করে—বাহ্যত ইহা অবশ্য আখেরাতেরই কাজ। কিন্তু ইহা দ্বারা ধন-দৌলত ও মান-সম্মান অর্জন করা তাহাদের উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং এরূপ এল্‌মকে দুনিয়াই বলা হইবে। ইহারই নাম ধর্মের বেশে দুনিয়া অর্জন করা।

খাঁটি নিয়তের লক্ষণঃ বিশেষ করিয়া ঐ এল্‌মকে ধর্মীয় এল্‌ম বলা হইবে, যাহাতে খাঁটিভাবে আখেরাতের উদ্দেশ্য থাকে। আজকাল এরূপ খাঁটি নিয়তের যথেষ্ট অভাব। আল্লামা শা'রানী (রঃ) এখলাছ বা খাঁটি নিয়তের একটি লক্ষণ এই লিখিয়াছেন যে, যে কাজ তুমি করিতেছ, যদি এই কাজের লোক তোমার চেয়ে উত্তম কেহ তোমার বস্তির মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং সেই কাজটিও এরূপ হয় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নির্দিষ্টরূপে ওয়াজেব নহে। যেমন, মস্‌জিদ বা মাদ্রাসার পরিচালনা কিংবা ওয়ায করা অথবা পীরী-মুরীদী করা, কোন সৎকাজের জন্য চাঁদা উসুল করা ইত্যাদি; তবে তুমি তাঁহার আগমনে আনন্দিত হও। দুঃখিত হইও না; বরং তুমি সর্বসাধারণকে এই বলিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ কর যে, "যাও, তিনি আমা হইতে উত্তম" এবং তোমার সমুদয় কাজ তাঁহার হাতে ন্যস্ত করিয়া তুমি কোন নির্জন স্থানে বসিয়া মনে মনে খোদার শোকরগুযারী করিতে থাক যে, তিনি এমন একজন লোক তোমার কার্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি আসিয়া তোমার কর্তব্য বোঝা ঘাড়ে লইয়াছেন। যদি তোমার অবস্থা এরূপ হয়, তবে বুঝিব—বাস্তবিকই তোমার নিয়ত খাঁটি আখেরাতের জন্য।

কিন্তু আজকাল কোন আলেমের বস্তির মধ্যে অপর কোন আলেম আসিয়া পড়িলে যদি তাঁহার প্রতি লোকের ঝোঁক অধিক হয়, তবে বস্তিবাসী আলেম ছাহেব জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরেন এবং অন্তরের সহিত কামনা করিতে থাকেন, এ ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হউক যাহাতে তাহার প্রতি লোকের ধারণা খারাপ হইয়া যায়। কেননা, দুই তরবারি যেমন এক খাপে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ দুই আলেমও একস্থানে থাকিতে পারে না। তিনি যেন নিজেকে وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ মনে করেন। তাই বস্তির সকল লোক কেবল তাঁহারই মুখাপেক্ষী থাকুক, অন্য কাহারও দিকে তাহাদের মুখ ফিরানই উচিত নহে। কেননা, এই বস্তিবাসীদের কেব্‌লা-কা'বা সবকিছু তো আমিই নির্ধারিত আছি। লোকে আবার অন্য দিকে নামায পড়িবে কেন? "ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজেউন।" এমতাবস্থায় তোমার নিয়ত খাঁটি আখেরাতের জন্য, ইহা কখনও বলা যাইবে না; বরং তুমি খাঁটি নিয়ত হইতে রিক্ত।

আরও দেখুন, কোন মৌলবী ছাহেব কোন মাদ্রাসায় মুদাররেসী করিতেছেন। মাদ্রাসার বার্ষিক সভার সময় তাঁহার মনে এক আনন্দ হয়। তিনি মনে করেন, ইহা ধর্মীয় আনন্দ। কেননা, নফ্‌স বলে, আমার মনে তো শুধু ধর্মকার্যের প্রসার এবং পাঠ সমাপ্তকারী তালেবে এল্‌মদের সার্টিফিকেট প্রদানের আনন্দই হইতেছে। নিজের কর্মকুশলতা প্রকাশের আনন্দ নহে।

আমি বলি, ইহার পরীক্ষা এরূপে হইতে পারে, সেই মৌলবী ছাহেবকে উক্ত মাদ্রাসা হইতে বিদায় করিয়া তাঁহার স্থানে অপর কাহাকেও আনিয়া বসাইয়া দেওয়া হউক এবং এই মুদাররেসের নিকট অধ্যয়নরত ছাত্রদের পাঠ সমাপনের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বার্ষিক সভার আয়োজন

করা হউক। তখন দেখা যাইবে, উক্ত বিদায়কৃত মৌলবী ছাহেবের মনে আনন্দ হয় কিনা। ঈমানদারীর সহিত নিজের অন্তরের খোঁজ নিয়া দেখুন—যদি তখনও তাঁহার মনে আনন্দ হয়, তবেই বুঝিতে হইবে, তাহা সত্যিকারের ধর্মীয় আনন্দ। অন্যথায় মনে করিতে হইবে, ইহা শুধু দুনিয়াবী আনন্দ। ইহার সহিত রিয়া এবং আত্মগর্বের মিশ্রণ রহিয়াছে।

আজকাল তো এরূপ অবস্থা—কোন মাওলানা ছাহেবকে মাদ্রাসা হইতে বিদায় করিয়া দেওয়ার পর তিনি সেই মাদ্রাসাকে ধ্বংস করার চেষ্টায়ই লাগিয়া যাইবেন। যদি তাহা না করেন, তবে তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ, ভবিষ্যতে এই মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় আনন্দিত হওয়া তো দূরেরই কথা।

এরূপ অনেক ঘটনা আমার সম্মুখে আসে। এক মৌলবী ছাহেব কোন মাদ্রাসায় মুদাররেস্ আছেন। যতদিন তিনি সেখানে থাকিবেন, অহরহ আমার নিকট চিঠি লিখিতে থাকিবেন, "এখানে আপনার আগমনের একান্ত প্রয়োজন, এই স্থানটিতে মূর্খতা ও বেদআত প্রচুর।" কিছুদিন পর যখন মাওলানা তথা হইতে বদ্‌লী হইয়া গেলেন, তখন মূর্খতা ও বেদআত সমস্তই বিদায় গ্রহণ করিল। এখন আর সেখানে সভা ও ওয়াযের কোনই প্রয়োজন নাই; বরং মাওলানা এখন যে স্থানে বদলী হইয়া গিয়াছেন, তথাকার চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মূর্খতা এবং বেদআত সেখানে গিয়া হাযির হইয়াছে। এখন এই স্থানের জন্য সভা ও ওয়াযের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

ইহার তাৎপর্য এই যে, সেই মৌলবী ছাহেবের ব্যক্তিত্বই সমস্ত মূর্খতা এবং বেদ্‌আতের আড্ডা। যেখানেই তিনি যান সেখানেই বেদ্‌আত ও মূর্খতার প্রাবল্য হয় এবং সভা, ওয়ায প্রভৃতির প্রয়োজন অনুভূত হইতে আরম্ভ করে। আসলে কিছুই নহে। পূর্বস্থানেও বেদ্‌আত এবং মূর্খতার সংশোধনের উদ্দেশ্যে সভা এবং ওয়ায অনুষ্ঠান করা হইত না। পরবর্তী স্থানেও এই উদ্দেশ্যে সভার আয়োজন করা হয় না; বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মাওলানা ছাহেব যেখানে থাকেন তথাকার মাদ্রাসা হইতে তিনি বেতন পাইয়া থাকেন। এই কারণে তাঁহার ইচ্ছা—মাদ্রাসার আমদানী ও খ্যাতি বৃদ্ধি পাক। যাহাতে তাঁহার বেতনের কখনও অভাব না হইয়া উন্নতি হয়। অন্যথায় যদি সত্যিই তিনি মূর্খতা এবং বেদ্‌আত সংশোধনের উদ্দেশ্যে সভার অনুষ্ঠান করিতেন, তবে সকলের আগে তিনি ঐ সমস্ত স্থানের চিন্তা করিতেন, যেখানকার মুসলমান কলেমাও পড়িতে জানে না। তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি হিন্দুর ন্যায় এবং বিবাহ-শাদী সবকিছু হিন্দুয়ানী নিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেননা, এরূপ স্থানে ধর্ম প্রচার করা ফরয। কিন্তু আমরা তো আজকাল এমন জায়গায় যাই, যেখানে আমাদের প্রচুর আদর-আপ্যায়ন হয়। এমন জায়গায় কে যায়? যেখানকার মুসলমান আমাদিগকে পানি পান করার জন্য গ্লাসও দিবে না। কেননা, তাহারা তো আমাদের সহিত হিন্দুদের ন্যায়ই অস্পৃশ্য আচরণ করিবে। আফসোস্।

নফ্‌সের গোপন ধোঁকাঃ বন্ধুগণ! ইহা নফ্‌সের গোপন ধোঁকা—আমরা আমাদের মাদ্রাসার সভানুষ্ঠানে আনন্দিত হওয়াকে ধর্মীয় আনন্দ মনে করিয়া থাকি। এই নফ্‌স বড়ই চতুর। কোন কোন সময় সে এমনভাবে ফুসলায় যে, স্বয়ং নফ্‌স্‌ওয়ালা লোকও তাহার এই ধোঁকা টের পায় না। যেমন, এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন সময় নফ্‌স্ এই ধোঁকা দেয় যে, নিজের কৃতকর্মের সওয়াব আমি পাইব এই ভাবিয়া আনন্দিত হয়। অপরের কার্যের সওয়াব আমি পাইব না মনে করিয়া তেমন আনন্দিত হয় না। ইহার পরীক্ষা এরূপে করা যাইতে পারে যে, যদি এমন কতকগুলি কারণ একত্রিত হয়—কাজ হয় তাহার নিজের, কিন্তু উহা অন্য কাহারও বলিয়া গণ্য হয়—তখনও কি তাহার মনে তদ্রূপই আনন্দ হইবে?

ফলকথা, আমাদের অবস্থা এই যে, আমাদের মধ্যে অনেকে দুনিয়াকে দুনিয়ার বেশেই অর্জন করিতেছে এবং তাহাতে এত নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, আখেরাতের কোন পরোয়াই নাই। আবার কেহ কেহ দুনিয়াকে ধর্মের বেশে অর্জন করিতেছে। এরূপ ব্যক্তি নিজকে ধার্মিক বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিও দুনিয়াদার। এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেনঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○

অর্থাৎ, “তোমরা আখেরাতের জন্য চেষ্টা করিতেছ না; বরং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দান করিতেছ।” অথচ আখেরাত বহুগুণে স্থায়ী ও উত্তম।

মূলতঃ দুনিয়া অন্বেষণ করা নিষিদ্ধ নহেঃ এখানে বুঝিয়া লওয়ার উপযোগী কতকগুলি সূক্ষ্ম কথা আছে—(১) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলিয়াছেনঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ অর্থাৎ, “তোমরা দুনিয়ার জীবনকে (অন্য বস্তুর উপর) শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতেছ।” بَلْ تَطْلُبُوْنَ বা بَلْ تَبْتَغُوْنَ অর্থাৎ, “তোমরা দুনিয়া তলব করিতেছ” বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, শুধু দুনিয়া তলব করার কারণে অভিযোগ করেন নাই; বরং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য প্রদানের কারণে অভিযোগ করিতেছেন। সুতরাং যদি কেহ দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য না দেয়; বরং কোন ক্ষেত্রে উভয়ের বিরোধ ঘটিলে আখেরাতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, এরূপ মনোভাব লইয়া যদি কেহ দুনিয়া অর্জনে লিপ্ত হয়, তবে তাহার নিন্দা করা হয় নাই। ইহাতে নীরস দরবেশদের সংশোধন করা হইয়াছে—যাহারা দুনিয়া অর্জন করাকে সকল অবস্থায় নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকে। অতএব, খুব বুঝিয়া লউন—দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে—দুনিয়া অর্জন করিতে সরাসরি নিষেধ করা হয় নাই।

এখন মানুষের অবস্থা এই যে, কোন দরবেশ লোক বিবাহ করিলে বলা হয়, ইনি কেমন বুযুর্গ লোক! গৃহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। বুযুর্গ লোকের স্ত্রীর কি প্রয়োজন? সোব্হানাল্লাহ্! বুযুর্গ লোকদের ফেরেশ্তা হইতে হইবে। খাইতেও পারিবেন না। বিবাহও করিতে পারিবেন না।

একবার আমি মীরাঠ গিয়াছিলাম। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমার বিবি ছাহেবা সঙ্গে ছিলেন। মুযাফ্ফরনগরে সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। কেননা, মফস্বলের শহরে চিকিৎসার বহু উপকরণের অভাব। মীরাঠে তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মীরাঠের জনৈকা স্ত্রীলোক আমার নিকট বাইআত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অপর একজন স্ত্রীলোক তাহাকে বলিলঃ “তুমি ইনির হাতে বাইআত হইও না। ইনি বিবি সঙ্গে লইয়া বেড়ান। আমাদের পীর ছাহেবের হাতে মুরীদ হও। তিনি পঞ্চাশ বৎসর যাবত নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন নাই।” উক্ত বাইআত প্রার্থিনী স্ত্রীলোকটি কিছু মাসআলা জানিত। তিনি উত্তর করিলেনঃ “যে পীর ৫০ বৎসর যাবত স্ত্রীর সহিত কথা বলে নাই, সে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত খোদার দরবারে অপরাধী রহিয়াছে। কেননা, এত বৎসর যাবত সে স্ত্রীর হক্ নষ্ট করিতেছে, সে কিসের দরবেশ! সে তো ফাসেক।” ফলকথা, আজকাল বিবিকে সঙ্গে রাখাও দুনিয়ার শামিল করা হইতেছে।

নবী (দঃ)-এর অভ্যাসের অনুসরণঃ এরূপে অনেকে বলিয়া থাকে—এ কেমন বুযুর্গ লোক! ঠাণ্ডা পানি পান করে, আট আনা গজের (মূল্যবান) কাপড় পরিধান করে। গমের আটা ভক্ষণ করে। যবের রুটি খায় না। অথচ যব হুযূরের (দঃ) খাদ্য।

আমি বলিঃ হুযূর (দঃ) অভ্যাসবশত যব খাইতেন, না এবাদতের উদ্দেশ্যে খাইতেন? বলাবাহুল্য, এবাদতের উদ্দেশ্যে খাইতেন না। হুযূরের অভ্যাসের অনুসরণ করা আমাদের জন্য ওয়াজেব নহে। ইহার অনুসরণ না করিলে কোন গোনাহ্‌ও হইবে না। হুযূর (দঃ)-এর অভ্যাসের অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুসরণকারীর স্বীয় স্বভাব-প্রকৃতি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখার অধিকার আছে। আসল কথা এই যে, হুযূর (দঃ)-এর কোন কোন অভ্যাসের অনুসরণ আমাদের সহ্যও হইবে না। এ কারণেই নবীর অভ্যাসের অনুসরণ শরীঅত আমাদের জন্য ওয়াজেব করে নাই। অবশ্য কেহ সাহস করিয়া হুযূরের অভ্যাসের অনুরূপ আমল করিতে পারিলে তাহাতে ফযীলত বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ ব্যক্তির অপরের নিন্দা করিবার অধিকার নাই।

যবের রুটি সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা স্মরণ পড়িয়াছে। একবার হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শেবন্দ রাহেমাহুল্লাহ্ বলিলেনঃ "আজ হইতে সুন্নত অনুযায়ী যবের রুটি আহার করিব।" যবের আটা পিষাণ হইল। কিন্তু উহাকে চাল্‌নি দ্বারা চালিলেন না। কেননা, হুযূর (দঃ) আটার মধ্যে ফুঁ মারিলে যাহাকিছু ভুষি উড়িয়া যাইত, তাহাই যথেষ্ট মনে করিতেন এবং বাকী সমস্তই গুলিয়া লইতেন। খাজা ছাহেবও তদ্রূপ করিলেন। ফলত সেই যবের রুটি খাইয়া সকলেরই পেটে ব্যথা ধরিল।

এখন তাঁহার আদব দেখুন। তিনি এরূপ বলিলেন না যে, সুন্নতের অনুসরণের ফলে এরূপ হইয়াছে; বরং বলিলেনঃ "ভাই আমাদেরই ভুল হইয়াছে যে, আমরা হুযূর (দঃ)-এর সমকক্ষতার দাবী করিয়াছিলাম এবং নিজদিগকে সেই সুন্নত পালনের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলাম। আমরা তদুপযুক্ত ছিলাম না। এ কারণেই আমাদের কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। যিনি এই স্তরের লোক, তিনিই উক্ত সুন্নত পালন করিতে পারেন। আমরা সে স্তরের লোক নহি।" সোবহানাল্লাহ্! ইহাকেই বলে আদব।

হুযূর (দঃ)-এর মাটিতে শোয়ারও অভ্যাস ছিল। কিন্তু আজকাল মানুষের স্বভাব এরূপ হইয়াছে যে, মাটিতে শয়ন করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন কতক লোক যয়তুনের তৈল এবং চর্বি খাইতে পারে না। ইহা খাইলেই তাহাদের অসুখ হয়। অতএব, এসমস্ত সুন্নত পালন করা জরুরী নহে। কেননা, এসমস্ত অভ্যাসগত সুন্নত এবং অভ্যাসের ব্যাপারে নিজের স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে শরীঅত অধিকার দিয়াছে। এরূপে চাকুরী এবং খেত-কৃষির সাহায্যে দুনিয়া অন্বেষণ করা নিষিদ্ধ নহে। কেননা, আয়াতের মর্মে বুঝা যায়, সাধারণভাবে দুনিয়া অন্বেষণ করা হারাম নহে; বরং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হারাম। এতদ্ভিন্ন হুযূরের (দঃ) বাণী ও কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সমস্ত কাজ করা জায়েয।

কামেল পীরের অবস্থাঃ কামেল পীরগণ দুর্বলমতি মুরীদদিগকে দুনিয়ার সহিত জায়েয সম্পর্ক-সমূহ ছিন্ন করিতে নির্দেশ দেন না। চাকুরী, ব্যবসায় এবং কৃষিকার্যের অবাধ অনুমতি দিয়া থাকেন। রুচিকর উত্তম খাদ্য আহার করিতে নিষেধ করেন না, অধিক ঘুমাইতেও নিষেধ করেন না। স্ত্রী-পুত্রের সহিত আমোদ-স্ফূর্তি করিতেও বারণ করেন না। অল্পমাত্রায় আহার করিবার নির্দেশও দেন না; বরং তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও স্বভাব অনুযায়ী চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যাহার সম্বন্ধে মনে করেন যে, অল্পাহারে তাহার ক্ষতি হইবে না, তাহাকে মিতাচারের সহিত অল্পাহারের আদেশ করেন। যাহাকে দুর্বল মনে করেন, তাহাকে অল্পাহারের নির্দেশের পরিবর্তে শক্তিবর্ধক দুধ-ঘি প্রভৃতি খাওয়ারও আদেশ করেন। সেই পীরকে আনাড়ি বলিতে হইবে

যিনি সকলকে একই ছড়ি দ্বারা তাড়া করিয়া থাকেন। কোন কোন পীর নির্বিচারে বাঁধাধরা নিয়মের বশীভূত হইয়া যেকোন মুরীদ তাঁহার নিকট আসুক, অল্পাহার, অল্প নিদ্রা প্রভৃতির নির্দেশ দান করেন। ইহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক শুষ্ক হউক না কেন, কোন পরোয়া নাই। এসমস্ত পীরকে লক্ষ্য করিয়াই মাওলানা বলিয়াছেনঃ

چار پا را قدر طاقت بار نه - بر ضعیفاں قدر همت کار نه
طفل را گر نان دهی بر جائے شیر - طفل مسکیں را ازاں نان مرده گیر

"চতুষ্পদ জন্তুর শক্তি অনুযায়ী উহার উপর বোঝা চাপাও, দুর্বল লোকের ক্ষমতানুযায়ী তাহাকে কাজের আদেশ দাও। শিশুকে যদি দুধের পরিবর্তে রুটি খাইতে দাও, তবে ইহার ফলে শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে।" অর্থাৎ, শিশুকে দুধের পরিবর্তে রুটি খাইতে দিলে সে দুই-চারি দিনের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে তাহার বরদাশ্‌ত শক্তি অনুযায়ী কাজের আদেশ দেওয়া উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রথম দিনই চাকুরী ছাড়িয়া সংসারত্যাগী করিয়া দিতে আরম্ভ করিও না। আরেফ শীরাযী এসমস্ত পীরের সম্বন্ধেই বলিতেছেনঃ

خستگاں را چوں طلب باشد وهمت نبود - گر تو بیداد کنی شرط مروت نه بود

"কামনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, এরূপ মুরীদের প্রতি অবিচার করিলে তাহা মনুষ্যত্ব হইবে না।"

মানুষ 'দীওয়ানে হাফেয' কিতাবটিকে সাধারণ মনে করে, অথচ ইহা শুধু মারেফাতের এবং তরীকতের কথায়ই পরিপূর্ণ। ইহা ভক্তিগত কথা নহে। অন্যথায় অপর কোন গ্রন্থ হইতে তাসাওউফ সংক্রান্ত এত মাসআলা বাহির করা হউক, যাহা প্রকৃতপক্ষে তাসাওউফ শাস্ত্রের কিতাবে নাই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিষয়বস্তু পূর্ব হইতে যেখানে সঞ্চিত থাকে, সেখান হইতেই বাহির হয়। এরূপ আরও দীওয়ান আছে, যেইগুলি দীওয়ানে হাফেযেরই অনুকরণ করিয়াছে। তথাপি উহাদের মধ্য হইতে তাসাওউফের এত মাস্‌আলা বাহির করা সম্ভব হইবে না। কেননা, ঐ সমস্ত কিতাবে পূর্ব হইতেই কোন বিষয়বস্তু সঞ্চিত ছিল না। সারকথা, আরেফ শীরাযী বলেনঃ যে সমস্ত দুর্বল লোকের অন্তরে অন্বেষণ এবং কামনা আছে, কিন্তু হিম্মতের অভাব, তাহাদিগকে তাহাদের শক্তির অনুরূপ কাজের নির্দেশ দেওয়া উচিত। শক্তির অধিক কাজের চাপ দেওয়া তাহাদের প্রতি যুলুম এবং মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক হইবে।

আমি ইদানীং এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, কম খাইয়া যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। হযরত মাওলানা গঙ্গোহীর এক মুরীদ কম খাওয়া আরম্ভ করিলে মাওলানা তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, "ইহাতে মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়া যাইবে।" সঙ্গে সঙ্গে এই হাদীসটি পড়িলেনঃ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ "শক্তিশালী মুমেন দুর্বল মুমেন অপেক্ষা উত্তম।" কেননা, শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান লোক অপরেরও সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারে। পক্ষান্তরে দুর্বল লোক নিজেই অন্যের উপর বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং অযথা আহার কমাইয়া নিজেকে দুর্বল করা ভাল নহে। পূর্ব যুগের দরবেশগণ যে বহু পরিশ্রম করিতেন বলিয়া শুনা যায়, তাঁহাদের শক্তি ছিল প্রচুর। কাজেই এত পরিশ্রমের মধ্যেও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করার কারণে তাহাদের কোন ক্ষতি হইত না বা দুর্বলতা আসিত না। তাঁহারা প্রচুর পরিশ্রমের পরেও এত কাজ করিতেন যে, আমরা

সুস্থ অবস্থায়ও উহার দশমাংশ করিতে পারি না। মাওলানা গঙ্গোহীর উক্ত মুরীদ নূরানী অক্ষরে কিছু আরবী এবারত দেখিতে পাইয়া মনে করিল, তাহার কাশ্‌ফ্ হইয়াছে এবং সে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। হযরত মাওলানার নিকট তাহা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেনঃ "মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বাভাস দেখা দিয়াছে। অল্পাহার ত্যাগ কর। দুধ-ঘি প্রচুর পরিমাণে খাও এবং চিকিৎসকের দ্বারা মস্তিষ্কের চিকিৎসা করাও, অন্যথায় অল্প দিনের মধ্যেই পাগল হইয়া যাইবে।" কিন্তু তথাপি সে অল্পাহার ত্যাগ করিল না; ফলে অল্প দিন পরেই সে পুরাদস্তুর উন্মাদ হইয়া গেল, বিবস্ত্র অবস্থায় বসিয়া যেকেরের পরিবর্তে গালি-গালাজ করিতে লাগিল।

চিকিৎসকদের রীতি এই, প্রত্যেক রোগীর অবস্থা অনুযায়ী তাহার চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কামেল পীরগণ কেন তদ্রূপ করিবেন না? বোধশক্তি থাকিলে তাঁহাদের দরবারে থাকিয়া সাধারণ লোকও আমার কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

এক পীর ছাহেবের দরবারে এক মুরীদ সর্বাপেক্ষা অধিক আহারে অভ্যস্ত ছিল। অন্যান্য মুরীদেরা অভিযোগ করিল—অমুক মুরীদ অত্যধিক আহার করে। পীর ছাহেব তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেনঃ "ভাই! তরীকতপন্থীদের কম খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। অধিক খাওয়া উচিত নহে; বরং মিতাচার রক্ষা করিয়া আহার করা উচিত।" সে বলিলঃ "হযরত, প্রত্যেকের মিতাচার পৃথক পৃথক। আপনি আমার ইতিপূর্বেকার আসল খাদ্য সম্বন্ধে আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। তবেই বুঝিতে পারিতেন, বর্তমানে আমি যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করি, ইহাই আমার জন্য মিতাচার। আমি এখানে আসার পূর্বে প্রতি বেলা পঁচিশটি রুটি আহার করিতাম। এখন পনেরটি রুটি খাইয়া থাকি। ইহা মিতাচার হইল, না মিতাচার অপেক্ষা অধিক হইল? যাহারা খান্‌কা হইতে পাঁচটি করিয়া রুটি খায়, তাহাদের খাদ্য পূর্বে ৭/৮টি রুটি ছিল। সুতরাং এখন পাঁচ রুটি খাওয়াই তাহাদের জন্য মিতাচার।" পীর ছাহেব বলিলেনঃ "তুমি সত্যই বলিতেছ, ইহা হইতে কম খাইও না।" আর অন্যান্য মুরীদগণকে বলিয়া দিলেনঃ ভাইসকল! এ ব্যক্তি অধিক আহার করে না। নিজের খাদ্যের চেয়ে অনেক কম খায়। দেখুন, কামেল পীরের সংসর্গের ফলে ঐ সাধারণ লোকও জানিতে পারিয়াছে যে, প্রত্যেকের মিতাচার পৃথক পৃথক। সুতরাং আমার খাদ্য সেই পরিমাণ কমান উচিত নহে যে পরিমাণ অন্যান্য লোক কমাইয়াছে।

মোটকথা, শরীঅত দুনিয়া উপভোগ করিতে নিষেধ করে নাই; বরং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করিয়াছে। অতএব, চাকুরী দ্বারাই হউক বা ব্যবসায় দ্বারাই হউক, আবশ্যক পরিমাণ দুনিয়া উপার্জন করা হারাম নহে। তবে হাঁ, ধর্ম নষ্ট করিয়া দুনিয়া অর্জন করা অবশ্যই হারাম।

দুনিয়া কামনার প্রকারভেদঃ এস্থলে হয়তো তালেবে এল্‌মদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হইবে, কোরআন শরীফে তো দুনিয়া কামনা করার শর্তহীন নিন্দা করা হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ
يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○

এসমস্ত আয়াতে দুনিয়া কামনা করারই নিন্দা করা হইয়াছে। অন্বেষণ এবং চেষ্টা তো কামনার উপরে। তাহা তো আরও অধিক নিন্দনীয়। ইহার উত্তরে আমি বলি, اَلْقُرْاٰنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهٗ بَعْضًا 'কোরআনের এক অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করে।' অন্যান্য আয়াতকে এ আয়াতগুলির সহিত মিলাইলে জানা যায়—এস্থলে শুধু কামনার জন্য আযাবের ধমক দেওয়া হয় নাই। অন্যথায় اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا "আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসায় হালাল করিয়াছেন এবং সুদ হারাম করিয়াছেন" কথার কোন অর্থই হইত না। দুনিয়া কামনা করা যদি বিনাশর্তে হারাম হয়, তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার অনুমতি কেন দেওয়া হইয়াছে এবং শরীঅত উৎপন্ন শস্যের উপর 'ওশর' প্রভৃতি কেন ওয়াজেব করিয়াছে? টাকা-পয়সায় এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে যাকাত কেন ওয়াজেব করিয়াছে? দুনিয়া উপার্জন করাই যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে এসমস্ত হক ওয়াজেব হওয়ার সুযোগ কোথা হইতে আসিবে; বরং এমতাবস্থায় পরিষ্কার বলিতে হইবে, ব্যবসায়-বাণিজ্যও নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করা এবং অধিক পশু পালন করা হারাম। অথচ কোরআন-হাদীসে কৃষি, বাণিজ্য এবং অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করার প্রতি কোনই নিষেধ নাই। অবশ্য নিষেধের পরিবর্তে উহাদের জন্য যাকাতের বিধান দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, অন্যান্য আয়াত সংযোগ করিলে এসমস্ত আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায়ঃ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ مَحَضَ الْعَاجِلَةَ "যাহারা শুধু দুনিয়া কামনা করে" তাহাদের জন্যই শাস্তির ধমক। অর্থাৎ, দুনিয়া কামনা করা দুই প্রকার। (১) শুধু দুনিয়া কামনা করা, ইহার সহিত আখেরাতের কামনা আদৌ না থাকা। ইহা অবশ্যই নিন্দনীয় এবং ইহারই উদ্দেশ্যে শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে। (২) আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়া কামনা করা। হালাল উপায়ে ব্যবসায়, কৃষিকর্ম এবং চাকুরী এই উদ্দেশ্যে করা যে, ইহার দ্বারা হকদারগণের প্রাপ্য হক আদায় করা হইবে এবং নিরুদ্বেগে আখেরাতের কাজ করিতে থাকিবে। এতদবস্থায় প্রকৃত উদ্দেশ্য আখেরাত। দুনিয়ার কামনা উহার অধীন। ইহা নিন্দনীয়ও নহে, দণ্ডপ্রাপ্তির কারণও নহে; বরং এই শ্রেণীর দুনিয়া কামনা তো এক অর্থে ফরয। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ —বায়হাকী, তাবরানী, দায়লামী, 'মাকাসেদে হাসানাহ্' ১২৮ পৃষ্ঠা

দুনিয়ার কামনা সকল অবস্থায় নিষিদ্ধ হইলে কোরআন শরীফে উহাকে ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হইত না। অথচ ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেনঃ এই পরাজয়ের একমাত্র কারণ—যে কয়জন লোককে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) পর্বতের ঘাঁটি রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই, কোন অবস্থাতেই তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। কিন্তু তাঁহারা এই আদেশ মান্য করেন নাই; বরং মুসলমানদিগকে জয়ী এবং কাফেরদিগকে পরাজিত হইতে দেখিয়া পর্বতঘাঁটি প্রহরা দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না। গনীমতের মাল আহরণে লিপ্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ○

"তোমাদের অর্থাৎ, ছাহাবাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ দুনিয়া কামনা করে আর কেহ কেহ আখেরাত কামনা করে", ইহাতে ছাহাবাদের প্রতি দুনিয়া কামনার সম্বন্ধ আরোপ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ছাহাবাগণের ফযীলত ও মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত আছে, সে বুঝিতে পারে—নিন্দনীয়

কামনা তাঁহাদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা কঠিন। ছাহাবায়ে কেরাম শুধু দুনিয়ার কামনা কখনও করিতে পারেন না। অতএব, এখানে দুনিয়া কামনার অর্থ কি? ইব্‌নে আ'তা এ আয়াতের তফসীরে বলিয়াছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ (আখেরাতের উদ্দেশ্যে) দুনিয়া কামনা করে। আর কেহ কেহ (খালেছ) আখেরাত কামনা করে।" ইহার উপর সন্দেহ হইতে পারে—আখেরাতের উদ্দেশ্যে দুনিয়া তলব করা ছাহাবাদের পক্ষে যখন নিন্দনীয় ছিল না, তবে তাঁহাদের দুনিয়া কামনা পরাজয়ের কারণ বলিয়া গণ্য হইল কেন? উত্তরে বলিতেছি ঃ দুনিয়া কামনা অবশ্য মূলত নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের এজতেহাদে ভুল হওয়ার দরুন তাঁহারা রাসূল (দঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করিয়াছিলেন। এ কারণেই তাঁহাদের দুনিয়া কামনাকে নিন্দা করা হইয়াছে।

এখন পরিষ্কার হইয়া গেল যে, দুনিয়ার জন্য দুনিয়া উপার্জন করা নিন্দনীয় এবং আখেরাতের জন্য দুনিয়া অর্জন করা নিন্দনীয় নহে। সুতরাং চাকুরী, ব্যবসায় এবং কৃষিকর্ম হইতে কাহাকেও নিষেধ করা যায় না। অবশ্য এতটুকু বলা যায় যে, লক্ষ্য রাখিও—দুনিয়ার জন্য ধর্ম যেন নষ্ট না হয়।

দুনিয়া শব্দের নিগূঢ়তত্ত্ব ঃ সম্মুখের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই ভ্রমের কারণ বর্ণনা করিতেছেন। আমরা যে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিতেছি, আল্লাহ্ তা'আলা 'দুনিয়া' শব্দের মধ্যেই ইহার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কেননা, دنيا শব্দটি دنو নৈকট্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ, দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভ যেহেতু নগদ, নিকটবর্তী এবং এখনই প্রাপ্তব্য। এই কারণেই ইহাকে তোমরা আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিতেছ। বলাবাহুল্য, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আমরা এখন লাভ করিতেছি। তাহা জায়েযই হউক বা পাপজনকই হউক। এই কারণে মানুষ দুনিয়ার ভোগের প্রতি দৌড়াইতেছে। পক্ষান্তরে আখেরাতের নেয়ামত এবং ভোগ বাকী, এই কারণে সেদিকে তত আকর্ষণ নাই, যতখানি আকর্ষণ দুনিয়ার প্রতি রহিয়াছে। যেমন, এক কবি বলেন ঃ

اب تو آرام سے گزرتی ہے - عاقبت کی خبر خدا جانے

দুনিয়াকামীদের এই একটি ওযর ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাও বর্ণনা করিয়া দিলেন। কি রহমত তাঁহার! আমাদের ওযরও সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন এবং কোরআনের ইহা কত বড় উচ্চাঙ্গের ভাষালঙ্কার! একটি শব্দও অতিরিক্ত এবং নিরর্থক নহে। অনেকেই হয়তো এস্থলে 'দুনিয়া' শব্দ অবলম্বনের রহস্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহারা হয়তো এই শব্দটিকে অতিরিক্ত মনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু অতিরিক্ত নহে; বরং ইহাতে আমাদের ওযরের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আলেমগণ সূরা-আবাসা-এর মধ্যে اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى সম্বন্ধেও এই নিগূঢ় তত্ত্বই বর্ণনা করিয়াছেন।

ঘটনা এই যে, একবার হুযূর (দঃ)-এর মজলিসে কোরায়শ সম্প্রদায়ের বড় বড় নেতারা সমবেত ছিল। হুযূর (দঃ) তাহাদিগকে ধর্মের তব্‌লীগ করিতেছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উম্মে মাক্‌তুম নামক এক অন্ধ ছাহাবী হাযির হইয়া উচ্চ রবে বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! عَلِّمْنِىْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ "আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যাহা শিখাইয়াছেন, আমাকেও তাহা শিখাইয়া দিন।" এক্ষেত্রে উক্ত ছাহাবীর প্রশ্ন হুযূরের নিকট কিছুটা বিরক্তিকর মনে হইয়াছিল।

কেননা, তিনি ধারণা করিয়াছিলেন, শাখা-বিধান অপেক্ষা মূলনীতি শিক্ষাদান অগ্রগণ্য। অধিকন্তু এই ব্যক্তি তো সর্বদাই আছে, এই কোরায়শ নেতৃবৃন্দ ঘটনাক্রমেই আসিয়া গিয়াছে; এমন না হয় যে, তব্‌লীগের এমন সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়। বিশেষত ছাহাবীকে তা'লীম দেওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে তব্‌লীগ অধিক জরুরী। কেননা, উক্ত ছাহাবী তো ঈমান আনয়ন করিয়াছে, অন্য সময়েও শাখাবিধান শিখিয়া লইতে পারিবে। আর ইহারা কাফের, আমার নিকট আসার কোন গরযই তো তাহাদের নাই। এখন ঘটনাক্রমে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে, সম্ভবত তব্‌লীগ করিলে তাহারা হেদায়ত গ্রহণও করিতে পারে! এই কারণে ছাহাবীর প্রশ্নে হুযূরের মনে কিছুটা বিরক্তিভাব উদয় হইয়াছিল এবং উহার লক্ষণ মুখমণ্ডলেও প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে স্নেহ মিশ্রিত তিরস্কার নাযিল হইলঃ عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى অর্থাৎ, "রাসূলের ললাট কুঞ্চিত হইল এবং তিনি মুখ ফিরাইলেন, যেহেতু তাঁহার নিকট একজন অন্ধ আসিয়াছে।"

আলেমগণ লিখিয়াছেন, اعمى অর্থাৎ, 'অন্ধ' শব্দের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরের ওযর বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, কাহারও আগমনে আপনার ললাট কুঞ্চিত হইয়া পড়া আপনার সদয় স্বভাবের পক্ষে অতিশয় অশোভন। কেননা, আগন্তুক ব্যক্তির ইহাতে মনে কষ্ট হয়, কিন্তু উক্ত ছাহাবী যেহেতু অন্ধ ছিলেন, তিনি হুযূরের ললাট কুঞ্চন দেখিতে পান নাই। এই কারণেই এমন সময়ে হুযূরের ললাট কুঞ্চিত হইয়াছিল বা উহার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কেননা, ইহাতে অন্ধ আগন্তুকের মনে কষ্ট হয় নাই। তিনি যদি চক্ষুষ্মান হইতেন, তবে হুযূরের চেহারা মোবারকে অসন্তোষের লক্ষণ কখনও প্রকাশিত হইত না।

এখন একটি কথা এই যে, যদি ইহা হুযূরের পক্ষে ওযরই ছিল, তবে ইহার জন্য আল্লাহ্ তাঁহাকে তিরস্কার কেন করিলেন? উত্তর এই যে, হুযূরের মর্যাদা অনেক উচ্চে। তাঁহার চরিত্র পূর্ণাঙ্গ ও অতি উচ্চ শ্রেণীর হউক, ইহাই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। অতএব, যদিও একটি বাহ্যিক কারণে উক্ত ছাহাবীর মনে হুযূরের ললাট কুঞ্চনে কষ্ট হয় নাই, কিন্তু ব্যবহারটি তো এমন হইয়াছে যে, উক্ত ছাহাবী দেখিতে পাইলে মনে কষ্ট হইত। সুতরাং হুযূরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল—এমন কাজ যেন কখনও না করা হয়, যাহাতে হুযূরের দরবারে আগন্তুকদের মনে সামান্য মাত্রায়ও কষ্ট হইতে পারে। সোব্‌হানাল্লাহ্! কেমন সুন্দর তা'লীম!

আজকাল মানুষ লোকের সম্মুখে অসন্তোষ প্রকাশ না করাকে এখলাছ মনে করে; অথচ যদি এসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, অন্য কেহ আমার অসন্তোষ জানিতে পারিবে না, তখন কিন্তু ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা এসম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ইহাও পূত চরিত্র-বিরোধী। এখন আর একটি প্রশ্ন বাকী থাকে যে, হুযূর যখন এমন একটি কাজে মশ্‌গূল ছিলেন, যাহা উক্ত ছাহাবীর কাজ হইতে অগ্রগণ্য ছিল, তখন উক্ত ছাহাবী কর্তৃক এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটান হুযূরের অসন্তোষের কারণ অবশ্যই ছিল। সুতরাং এই অসন্তুষ্ট হওয়ার মধ্যে হুযূর ন্যায়পন্থী ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে তিরস্কার কেন করা হইল? উক্ত ছাহাবী অসময়ে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেই তো তিরস্কার করা উচিত ছিল।

উত্তর এই যে, اَعمٰى অর্থাৎ 'অন্ধ' শব্দের মধ্যে উক্ত ছাহাবীর ওযরও বর্ণিত হইয়াছে যে, বেচারা অন্ধ হওয়ার কারণে জানিতে পারে নাই হুযূর তখন কি কাজে মশ্‌গূল ছিলেন। আর একটি উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সম্মুখের দিকে বর্ণনা করিতেছেনঃ

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى وَمَا عَلَيْكَ اَنْ لَّا يَزَّكّٰى

ইহার সারমর্ম এই যে, যে কাফেরদের তিনি তব্‌লীগ করিতেছিলেন, তাহারা উহার প্রার্থী ছিল না। শুধু হুযূরেরই কাম্য ছিল যে, তাহারা ঈমান আনয়ন করুক। কিন্তু তাহারা সত্য ধর্ম হইতে বিমুখ ছিল, পক্ষান্তরে উক্ত ছাহাবী সত্যের অন্বেষী ছিলেন। এমতাবস্থায় কাফেরদের সংশোধন ছিল নিছক ধারণা, আর ছাহাবীর সংশোধন ছিল নিঃসন্দেহ; সুতরাং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্দেহযুক্ত সংশোধনের প্রতি এত গুরুত্ব কেন প্রদান করিলেন, যাহাতে এমন সময়ে একজন সত্যান্বেষীর আগমন তাঁহার মনে কষ্টের কারণ হইল? উক্ত ছাহাবীর আগমনের সাথে সাথে যদি তাহারা চলিয়া যাইত, তবে হুযূরের কোন পরোয়াই ছিল না। তাহাদের সঙ্গে হুযূর বেপরোয়াভাব প্রদর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ ছাহাবীকে শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল, যাঁহার সংশোধন ছিল সুনিশ্চিত।

সুতরাং ইহা হইতে একটি মাস্‌আলা জানা গেল যে, সুনিশ্চিত লাভকে সন্দেহজনক লাভের উপর অগ্রগণ্য মনে করা উচিত, যেমন ইব্‌নে উম্মে মাক্‌তূমের তা'লীমে একটুখানি বিলম্ব করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (দঃ)-কে তিরস্কার করিয়াছেন, অথচ এই বিলম্বের ফলে তাহা বিনষ্ট হইতেছিল না। ধর্মের মূলনীতির তা'লীমকে তখনই অগ্রগণ্য মনে করা যাইবে, যখন ফল সুনিশ্চিত বা সন্দেহজনক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মূলনীতির তা'লীম এবং শাখা-বিধানের তা'লীম সমকক্ষ হয়। অন্যথায় যাহা সুনিশ্চিত তাহাই সন্দেহজনকের উপর অগ্রগণ্য হইবে। কিন্তু আজকাল সাধারণত মুসলমান ইহার বিপরীত করিতেছে, সন্দেহজনক দুনিয়াবী স্বার্থের খাতিরে সুনিশ্চিত পারলৌকিক স্বার্থ নষ্ট করিতেছে। এই কথাটি প্রসঙ্গক্রমে মধ্যস্থলে বলিয়া ফেলিলাম। আমি বলিতেছিলাম, 'দুনিয়া' শব্দে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ওযর বর্ণনা করিয়াছেন। ধর, তোমাদের ওযরও আমি বর্ণনা করিয়া দিতেছি যে, দুনিয়ার স্বার্থ নগদ এবং সন্নিকট বলিয়া তোমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রগণ্য মনে করিতেছ, কিন্তু ইহার উত্তরও শ্রবণ কর।

আখেরাতের অবস্থাঃ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى "আখেরাত সর্বোত্তম এবং অধিক স্থায়ী" কথার মধ্যেই উক্ত ওযরের জবাব নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে তোমাদের ওযর ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কোন লাভ কেবল নগদ হওয়া উহাকে অগ্রাধিকারদানের জন্য যথেষ্ট নহে; বরং উহার অন্য কারণও রহিয়াছে, যদিও দুনিয়ার স্বার্থ নগদ, কিন্তু ইহার বিপরীতপক্ষে আখেরাতের মধ্যে দুইটি অবস্থা রহিয়াছে। আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং অনন্তকালের জন্য স্থায়ী, সুতরাং আখেরাতের লাভ দুনিয়ার চেয়ে প্রকারেও উত্তম এবং পরিমাণেও অনেক বেশী, আবার অনন্তকালের জন্য স্থায়ীও বটে। দুনিয়ার স্বার্থ উত্তমও নহে, পরিমাণেও অধিক নহে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ীও নহে। আখেরাতের মধ্যে যে বিশেষ দুইটি অবস্থা রহিয়াছে, ইহাদের তুলনায় দুনিয়ার শুধু নগদ গুণকে কোন জ্ঞানীই প্রাধান্য দিবে না। কেননা, একমাত্র নগদ গুণই যদি অগ্রগণ্যতার কারণ হইত, তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য কখনও চলিত না। কেননা, ব্যবসায়ে নগদ পুঁজি এখনই বিনিয়োগ করিতে হয়, অথচ ইহার লাভ থাকে ভবিষ্যতের অন্ধকারে বাকী। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানী লোক এই কারণে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন নাই যে, ইহাতে মূলধন নগদ এবং লাভ বাকী; বরং সকলেই ভবিষ্যতের অধিক লাভের আশায় আনন্দের সহিত নগদ পুঁজি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়া থাকে। এখন বুঝা গেল যে, আধিক্য এবং প্রাচুর্যগুণের সম্মুখে নগদ গুণ পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং নগদ বলিয়া তোমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রগণ্য কেন মনে করিতেছ? তোমরা ইহাও কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যে, আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে কত অধিক এবং কত উত্তম?

এইরূপে বাকীর চেয়ে নগদ উত্তম হইলে কৃষিকর্মও চলিত না। কেননা, উহাতেও ভবিষ্যতের অধিক ফসলের আশায় নগদ বীজকে মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হয়। যদি তোমরা নগদ লাভের এতই অনুরক্ত হইয়া থাক, তবে আর খেত-কৃষি করিও না। কিন্তু তাহা তোমরা কর না; বরং অধিক ফসল লাভের আশায় প্রত্যেক বৎসরই কৃষি করিয়া থাক। তবে আখেরাত এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে এই বিচার কেন করিতেছ যে, দুনিয়া নগদ এবং আখেরাত বাকী; এতটুকু চিন্তা করিতেছ না যে, আখেরাত এমন বাকী, যাহার তুলনায় দুনিয়া কিছুই নহে।

আখেরাতের আর একটি গুণ—উহা অনন্তকাল স্থায়ী। স্থায়িত্ব স্বয়ং এমন একটি গুণ, যাহার তুলনায় নগদ গুণ কিছুই নহে, পৃথিবীতে ইহার নযীর যথেষ্ট রহিয়াছে।

এক ব্যক্তি আপনাকে বাড়ী দিতে চায়—তাহার দুইটি বাড়ী আছে, একটি ক্ষুদ্র এবং কাঁচা বাড়ী। অপরটি পাকা এবং বিরাট অট্টালিকা। সে আপনাকে বলেঃ “আপনি বিরাট অট্টালিকাটি চাহিলে তাহাও দিতে পারি, কিন্তু ইহা ধারস্বরূপ পাইবেন, চারি বৎসর পরে ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু যদি কাঁচা বাড়ীটি লইতে ইচ্ছা করেন, তবে ইহা চিরতরে আপনার মালিকানাস্বত্বে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।” এখন বলুন, আপনি কি করিবেন? নিঃসন্দেহ, প্রত্যেক জ্ঞানী মানুষই বলিবে, ধারের ক্ষণস্থায়ী বিরাট অট্টালিকা অপেক্ষা চিরস্থায়ী স্বত্ববিশিষ্ট কাঁচা ছোট বাড়ীটি উত্তম।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আখেরাতের ব্যাপারে তোমাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় না। চিরস্থায়ী আখেরাতকে তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য ত্যাগ করিতেছ। মানুষের আয়ুই কত? অনেকে সুস্থ অবস্থায় রাত্রে শয্যা গ্রহণ করে এবং সকালে দেখা যায়, সে মরিয়া রহিয়াছে। এই অস্থায়ী মুর্দার জন্য তোমরা নিজের আসল বাসস্থান বিনষ্ট করিতেছ, যাহা অনন্তকালের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মালিকানা-স্বত্বে দান করিতে চান। তদুপরি আরও মজার কথা এই যে, এখানকার ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা। কেননা, আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়া তেমন মর্যাদাপূর্ণ এবং সৌন্দর্যময় স্থান নহে। আখেরাত উহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক প্রশস্ত, অনেক বড়, অতি সুন্দর ও উচ্চস্তরের। অথচ তুমি একটি ক্ষণস্থায়ী কাঁচা বাড়ীর জন্য—যাহা কিছুকাল ব্যবহারের জন্য ধারস্বরূপ পাইতেছ, সেই ধারও বৎসর দুই বৎসরের জন্য নহে; বরং দুই-এক মুহূর্তের জন্য, কেননা, মৃত্যুর জন্য কোন নির্ধারিত সময় তোমার জানা নাই, হয়তো প্রত্যেক নিঃশ্বাসই তোমার শেষ নিঃশ্বাস হইতে পারে, এমন উত্তম ও উচ্চস্তরের মহল ত্যাগ করিতেছ যাহা অনন্তকালের জন্য তোমার মালিকানাস্বত্বে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এখন বল, তোমার সেই নগদ-বাকীর ওযর কোথায় গেল? বন্ধুগণ! দুনিয়া তোমরা দুই-এক মুহূর্তের জন্য পাইতেছ। ইহাতে কোন শান্তিও নাই, কেবল কষ্টই কষ্ট। অথচ আখেরাত অনন্তকালের জন্য পাওয়া যাইতেছে, সেখানে দুঃখ-কষ্টের নামও নাই। উহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ نِ الَّذِىْٓ اَحَلَّنَا دَارَ
الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَايَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَايَمَسُّنَا فِيْهَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদের চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয়, আমাদের প্রভু ক্ষমাশীল এবং প্রচুর বিনিময় প্রদানকারী, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদিগকে অনন্ত বাসগৃহে স্থান দিয়াছেন। এখানে আমাদিগকে কোন কষ্টও স্পর্শ করে না এবং কোন ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।”

আর একটি সন্দেহ রহিল—দুনিয়াপ্রার্থীরা বলিতে পারে, আমরা যে ব্যবসায় ও কৃষিকার্যে বাকী অধিক লাভকে নগদ পুঁজির উপর প্রাধান্য দান করি, তাহার কারণ এই যে, ব্যবসায় এবং কৃষিকার্যে

উক্ত বাকী লাভ ছয় মাস কিংবা এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আখেরাতের সেই বাকী লাভ কে জানে কখন পাওয়া যাইবে? ইহার উত্তরে আমি বলিব—বিলম্বে অধিক লাভের দরুন নগদকে তখনই প্রাধান্য দান করা যায়, যখন বাকী উসুল হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ নিশ্চয়তা না থাকে। কিন্তু পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকিলে দীর্ঘমেয়াদে অধিক লাভের দরুন বাকীর উপর নগদকে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে না।

আখেরাতের অস্তিত্বঃ এখন দেখুন, আখেরাতের অস্তিত্ব নিশ্চিত না সম্ভাবনাযুক্ত? আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى

অর্থাৎ, "আখেরাতের অস্তিত্ব এত নিশ্চিত যে, অসংখ্য ধারাবাহিক সংবাদের দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ইবরাহীম এবং মূসার (আঃ) যমানা হইতে প্রত্যেক যমানায় ইহার অস্তিত্বের সংবাদ প্রদান করা হইতেছে।" সুতরাং এই ওযরও বাতিল হইয়া গেল। আর একটি উত্তর ইতিপূর্বে আমি প্রদান করিয়াছি যে, আখেরাতের অস্তিত্ব ঘটিতে কেবল তোমাদের মৃত্যুর বিলম্ব। মৃত্যুর পরক্ষণ হইতে তোমরা আখেরাতের নেয়ামতসমূহ স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। মৃত্যুর বিলম্বই বা কত? জীবনের দুই মিনিটেরও তো ভরসা নাই। সুতরাং আখেরাতকে দীর্ঘমেয়াদী বাকী বলাই ভুল।

তৃতীয় উত্তরের প্রতি এই আয়াতে ইব্‌রাহীম ও মূসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আখেরাতের কার্যাবলীর ফল সম্পূর্ণই বাকী নহে; বরং পার্থিব জীবনেও তোমরা ইহার অনেক ফল লাভ করিয়া থাক; যেমন, হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা সারা দুনিয়ার লোক অবগত আছে। তাঁহারা আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়াছিলেন, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও তাঁহাদিগকে কেমন কৃতকার্যতা, মঙ্গল, সম্মান ও শান্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শত্রুদল পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইয়াছিল এবং তাঁহারা বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। দুশ্‌মনদের নাম লওয়ার মতও কেহ অবশিষ্ট ছিল না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের নাম লওয়ার জন্য বহুসংখ্যক অনুগামী ও সম্মানকারী প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং আখেরাতের উৎকৃষ্টতা ও স্থায়িত্বের নমুনা দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণকে দান করিয়া থাকেন।

সারমর্ম এই হইল যে, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলে দুনিয়ার শান্তি এবং সম্মানও লাভ করা যায়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, ফলত প্রত্যেক যমানার বরং আজকালের আখেরাত প্রত্যাশীগণও দুনিয়াদারদের অপেক্ষা অধিক শান্তি ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। দুনিয়াদারগণ তো ইহাই কামনা করে, বস্তুত তাহাও আখেরাত প্রত্যাশী লোকই অধিক লাভ করেন। এখন আর এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

সারকথা এই—দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিবেন না। অতঃপর দুনিয়া অর্জনেও নিষেধ নাই। সমস্ত কাজে শুধু এতটুকু লক্ষ্য রাখুন—আখেরাত বিনষ্ট হইতেছে কিনা। এখন দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদিগকে সুষ্ঠু বোধশক্তি এবং আমলের তওফীক দান করে।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

◆

এলাহাবাদ শহর, ১০ই শাবান ১৩৪০ হিজরী

দারুল মাস্‌ঊদ্

[সৌভাগ্যবানের গৃহ]

◆

সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে—দুনিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তথাপি আমরা দুনিয়াকে হৃদয়ের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। ইহার কারণ শুধু এই যে, আমাদের ধারণা—মৃত্যুর পরে মানুষ এক সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার গহ্বরে আবদ্ধ থাকিবে এবং তাহাতেই একাকী অবস্থান করিবে। সে অন্ধকারের কথা কল্পনা করিয়া মানুষ ভয়ে অস্থির হইয়া যায়। অথচ এই নিঃসঙ্গতা শান্তির কারণ হইবে। বস্তুত সেই নির্জনতায় এমন আনন্দ হইবে, খোদার কসম! অপর কিছুতেই উহার সমান আনন্দ হইবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ○

উপক্রমণিকা

এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক নেক্‌কার পুণ্যবান বান্দাগণের স্থায়ী বাসস্থান এবং ঠিকানার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এক আয়াতে মোটামুটিভাবে বান্দাগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেনঃ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ ইহার পূর্বে কিয়ামতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সারমর্ম এই যে, কিয়ামত অবশ্যই আসিবে। তখন প্রত্যেক মানুষকে তাহার আ'মলের বিনিময়—পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করা হইবে—তাহারই প্রসঙ্গে প্রথমত মোটামুটিভাবে বলিয়াছেনঃ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ অর্থাৎ, তখন মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হইবে—'একদল হতভাগ্য এবং অপর দল সৌভাগ্যশালী হইবে।' অতঃপর বিস্তারিতভাবে উভয় দলের বিষয় বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا الخ এই আয়াতে এক দলের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহারা অনন্তকাল পর্যন্ত দোযখের অগ্নির মধ্যে আর্তনাদ করিতে থাকিবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকে। হাঁ, তবে আপনার প্রভু যদি ইচ্ছা করেন। কারণ, তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। দ্বিতীয় আয়াতে অপর দলের বিষয়ে বলিতেছেনঃ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا الخ অর্থাৎ, 'যাহারা নেককার ও পুণ্যবান, তাহারা আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকাকাল পর্যন্ত সর্বদা বেহেশ্‌তে বাস করিতে থাকিবে। হাঁ, তবে আপনার প্রভু যদি ইচ্ছা করেন।' মোটকথা, অনন্তকালের জন্য তাহাদের উপর অনুগ্রহ হইতে থাকিবে। কোন সময়ই তাহা বন্ধ হইবে না। এই হইল আলোচ্য আয়াতের তরজমার সারমর্ম।

কবর এবং রূহের সম্পর্কঃ এখন এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া এতটুকু ব্যক্ত করা আমার উদ্দেশ্য—মানুষ সর্বদা এই ভুল ধারণায় লিপ্ত রহিয়াছে যে, সমস্ত ভোগ ও স্বাদ দুনিয়াতেই সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। আখেরাতের, বিশেষ করিয়া কবর সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা—কবর একটি বিজন প্রান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষ যেহেতু আখেরাতের নেয়ামতসমূহের বিস্তৃত বিবরণ অবগত নহে, সুতরাং যদিও আলমে বরযখের বিশাল বিস্তৃত প্রান্তর কল্পনায় উদিত হয়; কিন্তু তথাকার সুখ-শান্তির কথা কল্পনাও করে না। আর যাহারা পরলোকের সুখ-শান্তির বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান রাখে—তাহারাও যেহেতু তৎবিষয়ক চিন্তা মনে উপস্থিত রাখে না—কাজেই তাহাদের মনের অবস্থাও সেই অজ্ঞ লোকেরই অনুরূপ। পরজগতকে বিজন ও ভয়ঙ্কর প্রান্তর বলিয়া তাহারাই ধারণা করে, যাহারা পরলোক সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান রাখে। পক্ষান্তরে যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের ধারণা শুধু এই যে, পরজগত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কিয়ামতের পরে বেহেশতের কল্পনা অবশ্য তাহাদের মনেও উদিত হয়, কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে ও মৃত্যুর পরে তাহাদের শুধু কবরের ধারণাই আসে। প্রকাশ্যত যাহা একটি সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার গহ্বর। অজ্ঞ লোকেরা ইহাকেই কবর বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা আলমে বরযখের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত আছে, তাহারা জানে যে, ইহা প্রকৃত কবর নহে। ইহা তো শুধু দেহের কবর বা ঘর। রূহের বাসস্থান এই গর্ত নহে; এই গর্তের সহিত রূহের সম্পর্ক থাকিলেও রূহ্ এখানে আবদ্ধ থাকে না। সম্পর্ক থাকা এক কথা আর আবদ্ধ থাকা অন্য কথা।

দেখুন! যমীনের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক অবশ্যই আছে। ইহারই আলোতে সমস্ত ভূমণ্ডল আলোকিত হয়। তাই বলিয়া কি সূর্য যমীনে আবদ্ধ? কখনই নহে, সূর্য যমীন অপেক্ষা শত শত গুণে বড়। রূহকেও তদ্রূপই মনে করুন। কবি বলেনঃ

كَالشَّمْسِ فِىْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَضُوْءُهَا ـ يُغْشِى الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَّمَغَارِبًا

"যেমন সূর্য আস্‌মানের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং উহার কিরণ পৃথিবীর সকল প্রান্তের নগর ও দেশসমূহকে আলোকিত করে।"

আপনি হয়তো দেখিয়াছেন, কোন পানিপূর্ণ পাত্রে বা ভাণ্ডে দৃষ্টি করিলে সূর্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, সূর্য উহাতে আবদ্ধ আছে? কখনই নহে। এইরূপে আপনারা আয়নার মধ্যে নিজের আকৃতি দেখিতে পান। তখন আয়নার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তো স্থাপিত হয়, কিন্তু তাহাতে আপনি কি আয়নার মধ্যে আবদ্ধ হইলেন? কখনই না। অতএব, মৃত্যুর পরে দেহের সহিত রূহের সম্পর্ক ঠিক এইরূপই থাকে।

সুতরাং এই বাহ্যিক কবর দেহের জন্য অবশ্যই কয়েদখানা। কিন্তু ইহা রূহের বন্দীখানা নহে। বস্তুত রূহই মানুষ, দেহ মানুষ নহে। কোন মানুষকে যদি কবরে দাফন করা না হয় ; বরং দেহটাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলে, তখন আপনি বলিতে পারেন না যে, নেকড়ে বাঘ মানুষ খাইয়াছে। এতটুকু বলিতে পারেন যে, দেহকে খাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং কবরকে মানুষের বন্দিশালা মনে করা ভুল। উহা শুধু দেহের কারাগার। মন্দ কার্যের দরুন মানুষের কবরে যে সঙ্কীর্ণতা হইয়া থাকে, উহার অর্থ এই নহে যে, কবরের গর্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। কারণ, কেহ কবরে সমাহিত না হইলে কি সে এই সঙ্কীর্ণতা হইতে রক্ষা পাইবে ? বরং উক্ত সঙ্কীর্ণতা অন্য রূপ। খুব বুঝিয়া লউন যে, রূহ্ কবরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তবে কবরের সহিত উহার সম্পর্ক অবশ্যই থাকে। যাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহারা মনে করে যে, মৃত্যুর পরে যে আলমে আখেরাত আরম্ভ হয় তাহা খুবই সঙ্কীর্ণ। ইহার কারণ এই যে, তাহারা এই বাহ্যিক কবরকেই রূহের কবর বলিয়া মনে করে।

আখেরাতকে ভয় করার কারণঃ আখেরাত সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাহারা রূহকে কবরে আবদ্ধ মনে করে না। তাহারা কেবল মনে করে, আখেরাতের জগত আফ্রিকার মরুভূমির ন্যায় বিজন ও ভয়ঙ্কর প্রান্তর। তাহারা কল্পনাও করে না যে, পরলোকে ইহলোকের চেয়ে উৎকৃষ্ট ফল-মূলাদি, সুন্দর ও মনোরম উদ্যানরাজি, বিরাট ও উত্তম অট্টালিকাসমূহ এবং সর্ববিধ সুখ-শান্তির উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কারণেই সাধারণ মানুষের পরলোকের প্রতি আগ্রহ নাই; বরং তাহা হইতে ভয় পাইতেছে। ইহা আখেরাতের নেয়ামতসমূহ হইতে অজ্ঞ থাকারই কুফল। কেননা, সুখ-শান্তির প্রতিই সাধারণত মানুষের আগ্রহ হইয়া থাকে। এমন স্বভাবসম্পন্ন মানুষ অনেক কম আছে—যাহারা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে আখেরাতের প্রতি আগ্রহশীল হইয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে আখেরাতের নানাবিধ সুখ-শান্তি এবং নেয়ামতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেনঃ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ "ইহার প্রতিই আগ্রহশীল ব্যক্তিদের আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত।" অন্যদিকে কোরআন ও হাদীসের বাণীসমূহে আখেরাতের প্রতি উৎসাহ এবং দুনিয়ার প্রতি নিরুৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেনঃ

اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّادَارَ لَهٗ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَّاعَقْلَ لَهٗ

"দুনিয়া তাহার ঘর যাহার ঘর নাই এবং দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় করে সেই ব্যক্তি, যাহার বুদ্ধি নাই।" অথচ আমাদের অবস্থা ইহার বিপরীত। দুনিয়ার প্রতিই আমাদের আগ্রহ অধিক, আর আখেরাতকে আমরা ভয় করি। ইহার একমাত্র কারণ আখেরাতের নেয়ামতসমূহ হইতে অজ্ঞতা। এখনই আমি তাহা বর্ণনা করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, কারণ দূরীভূত করিয়াই ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। সুতরাং আখেরাতের নেয়ামত এবং সুখ-শান্তির কল্পনা সর্বদা মনের সম্মুখে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। এই কারণেই অদ্যকার আলোচনার জন্য আমি এই আয়াতটি অবলম্বন করিয়াছি।

শুনুন ! আল্লাহ্ বলেনঃ اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا "যাহারা নেক্‌কার তাহারা বেহেশ্‌তের মধ্যে চিরকাল থাকিবে।" বেহেশ্‌ত-এর আভিধানিক অর্থ উদ্যান। সোব্‌হানাল্লাহ্ ! কি পবিত্র বাণী ! একটি শব্দের মধ্যেই সমস্ত বিবরণ দান করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইতিপূর্বে বলিয়াছেন, اَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ "দুরদৃষ্ট লোকেরা দোযখে প্রবেশ করিবে।" এখানেও একটিমাত্র শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে আবশ্যকীয় ব্যাখ্যা নাই।

ইহাতে তালেবে-এল্‌মগণের অনুধাবনের উপযোগী একটি রহস্য নিহিত আছে। তাহা এই যে, ভয় জিনিসটি মূলত কাম্য নহে; বরং উহা শুধু পাপ কার্য হইতে রক্ষিত থাকার উপায় হিসাবে কাম্য। এই বর্ণনাপদ্ধতি দ্বারা আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে যে, ভয় প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। কেননা, অধিক ভয় প্রদর্শনে মানুষ ঘাবড়াইয়া যায়। কোন কোন সময় আল্লাহ্‌র রহ্‌মত হইতে নিরাশ হইয়া পড়ে। ফলে সে আমল ছাড়িয়া দেয়।

কানপুর শহরে আমার নামীয় এক উকিল সাহেব এমন অবস্থায় আমার নিকট আসিলেন যে, তাঁহার চেহারায় নিরাশার ছায়া প্রতিফলিত ছিল। তিনি 'এহ্‌ইয়াউল উলুম' কিতাবের 'বাবুল-খাওফ' অধ্যয়ন করিয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং 'এহ্‌ইয়াউল উলুম' কিতাবের 'বাবুল-খাওফ' পড়িতে নিষেধ করিয়া দিলাম। অতএব, বেশী ভয় প্রদর্শনের অনুমতি নাই। হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছেঃ

وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنِىْ وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ

ইহাতে বুঝা গেল, শুধু এতটুকু ভয় কাম্য যাহা পাপ কার্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। ইহার অধিক কাম্য নহে যাহাতে নিরাশার উদ্ভব হইতে পারে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এস্থলে শুধু نار "অগ্নি" শব্দ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কারণ, نار শব্দটিতে অন্য কোন প্রকারের শাস্তি বুঝাইতেছে না। অতএব, অন্য কোন শাস্তির প্রতি ইঙ্গিতও করা হয় নাই। পক্ষান্তরে আশান্বিত এবং উৎসাহিত করা মূলত কাম্য। এই কারণে বিপরীতপক্ষে নেক্‌কারদিগকে বেহেশ্‌তের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের আবশ্যক ছিল, যেন আখেরাতের প্রতি আগ্রহ এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

আখেরাতের নেয়ামত সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলঃ কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এতই মার্জিত ও অর্থপূর্ণ যে, নেক্‌কারদের পরিণাম সম্বন্ধেও একটিমাত্র শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন الجنة। (উদ্যান); কিন্তু ইহা এমন একটি শব্দ, স্বভাবতই মন ইহার বিস্তৃত বিবরণের প্রতি ধাবিত হয়। কেননা, উদ্যানে নানাবিধ সুস্বাদু ফল-মূলাদি থাকে, ছায়া থাকে, গাছে গাছে বিভিন্ন ফুল শোভা পায়। আনন্দদায়ক স্নিগ্ধ সমীরণও থাকে, প্রচুর পরিমাণে পানিও থাকে। ইহার সঙ্গে আর একটি কথা যোগ করিয়া চিন্তা কর যে, উহা খোদার উদ্যান। এখন বুঝিতে পারিবে, উহা সাধারণ বাগানবাড়ী নহে। দুনিয়াতেও বাদশাহ্ এবং আমীর লোকের যেসব বাগানবাড়ী আছে, তাহাতে সর্বপ্রকারের শান্তি ও আরামের উপকরণ প্রস্তুত থাকে। নানা রকমের বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক বস্তু সঞ্চিত থাকে। কোন কোন বাদশাহের বাগানে অট্টালিকা প্রভৃতি ব্যতীত জাদুঘর বা চিড়িয়াখানাও থাকে। কাহার কাহারও বাগানে অনুপম ভ্রমণক্ষেত্রও থাকে। অতএব, এখন চিন্তা করিয়া দেখ, খোদার বাগান কেমন বাগান হইবে। বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলা যখন উহার প্রতি উৎসাহিতও করিতেছেন, কাজেই উহা কোন সাধারণ বাগান নিশ্চয়ই নহে; বরং উহাতে বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক সাজ-সরঞ্জামও থাকিবে।

সারকথা এই যে, নেক্‌কারদিগকে এরূপ মনে করিও না যে, মৃত্যুর পরে তাঁহাদের সবকিছুই বিলীন হইয়া গেল; বরং তাঁহারা সর্বপ্রকারের আরামে ও শান্তিতে থাকিবেন। কাফের এবং মোনাফেকদের এরূপ ধারণা ছিল যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু পূর্ব-কালের মুসলমানদের ধারণা এরূপ ছিল না; অবস্থাও তদ্রূপ ছিল না। আজকালকার মুসলমানদের ধারণা যদিও এরূপ শুনা যায় নাই, কিন্তু তাহাদের অবস্থা হইতে কতকটা এরূপই বুঝা যায় যে,

তাহারাও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শেষ এবং বিলীন হইয়া যায় বলিয়া ধারণা করিতেছে। কেননা, ধারণা এরূপ না হইলে উহার কিছু না কিছু লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইত। বেহেশ্‌তের প্রতি আগ্রহ অবশ্যই হইত, আখেরাতের প্রতি বিরাগ এবং ভয় থাকিত না। মোনাফেকদের অবস্থা এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ
اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط

অর্থাৎ, তাহাদের ভাই-বন্ধুদের মৃত্যুতে তাহারা শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, আহা! তাহারা আমাদের নিকট থাকিলে নিহত হইত না, যুদ্ধে চলিয়া যাওয়াতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কাফের ও মোনাফেকদের এরূপ অবস্থা এই কারণে হইয়াছে যে, তাহারা দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করিত। আখেরাত সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এই কারণেই মুসলমান যুদ্ধে শহীদ হইলে তাহারা তাঁহাদের সবকিছু বিফল হইয়াছে মনে করিত। তাহাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন, যেমন পাথরের অভ্যন্তরস্থ কোন কীট মনে করে, তাহার আসমান-যমীন সবকিছু এই পাথরের মধ্যেই।

چوں آں کرمے کہ در سنگے نہان ست - زمیں وآسماں وے ہمان ست

তাহাদের দৃষ্টান্ত 'মস্‌নবী' কিতাবে বর্ণিত সেই যাযাবরের ন্যায়ও মনে করিতে পারেন। উক্ত বদ্দু লোকটি রিক্তহস্ত ও অনাহারী ছিল। তাহার স্ত্রী বলিলঃ শুনা যায়, বাগদাদের খলীফা বড়ই দয়ালু এবং দাতা। তুমি তাঁহার দরবারে কেন যাও না? সম্ভবত তাঁহার এক দয়া দৃষ্টিতেই আমাদের অভাব মোচন হইয়া যাইতে পারে। স্বামী বলিলঃ ভাল পরামর্শ দিয়াছ, কিন্তু বাদশাহের দরবারের উপযোগী কিছু হাদিয়া লইয়া যাওয়া আবশ্যক। স্ত্রী বলিল, ইদানীং কয়েক বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টির ফলে সর্বত্র পানির অভাব, কিন্তু আমাদের পুষ্করিণীতে কিছু পানি আছে। ইহাই দুর্লভ বস্তু হইবে। ইহার চেয়ে অধিক উপযোগী আর কোন্‌ বস্তু বাদশাহের জন্য হাদিয়া নেওয়া যাইতে পারে? যাযাবর লোকটি বলিলঃ ঠিক বলিয়াছ, ইহার চেয়ে উত্তম আর কোন হাদিয়াই হইতে পারে না। হয়তো এমন পানি বাদশাহের ভাগ্যে কখনও জোটে নাই।

পরিশেষে সে পুষ্করিণী হইতে এক কলসী পানি লইয়া বাগদাদ যাত্রা করিল। সারা পথে رَبِّ سَلِّمْ - رَبِّ سَلِّمْ ওযীফা পড়িতে পড়িতে যাইতে লাগিল, যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা পানির কলসীটি নিরাপদে বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। খলীফার মহলে পৌঁছিয়া সে রক্ষী ও প্রহরীদের বলিল, আমি খলীফার জন্য একটি দুর্লভ হাদিয়া লইয়া আসিয়াছি, তাঁহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক। প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ খলীফাকে সংবাদ দিলে তিনি তাহাকে হাযির করিতে নির্দেশ দিলেন। লোকটি পানির কলসী মাথায় করিয়া দরবারে পৌঁছিলে খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন, يَا وَجْهَ الْعَرَبِ مَاعِنْدَكُمْ "হে সম্মানিত আরব! কি হাদিয়া আনিয়াছ?" ইহা শুনিতেই লোকটি পানির কলসীটি সিংহাসনের উপর রাখিয়া বলিলঃ هٰذَا مَاءُ الْجَنَّةِ "ইহা বেহেশ্‌তের পানি।"

খলীফা কলসীর মুখ খুলিতেই বদ্ধ পানির দুর্গন্ধে সমস্ত দরবার ভরিয়া গেল। কেননা, কয়েকদিন ধরিয়া কলসীর মুখ বন্ধ থাকার কারণে গরমে পানি দুর্গন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সোবহানাল্লাহ্‌! খলীফার এমন সদাশয়তা এবং বদান্যতা! চেহারায় একটুও অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। দরবারিগণের কি সাধ্য ছিল একটু অসন্তোষ প্রকাশ করে? খলীফা যাযাবর

লোকটির খুব শোক্‌রিয়া আদায় করিয়া বলিলেনঃ বাস্তবিকই তুমি আমার জন্য বড় দুর্লভ হাদিয়া আনিয়াছ, ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন হাদিয়াই হইতে পারে না। অতঃপর তাহাকে অতিথিশালায় প্রেরণ করা হইল। কয়েকদিন তাহাকে মেহ্‌মান রাখিয়া মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া দেওয়া হইল। তৎপর তাহার কলসীটি স্বর্ণ-মুদ্রায় পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে বিদায় দিতে নির্দেশ দিলেন। আর প্রত্যাবর্তনকালে দজ্‌লা নদীর ধার দিয়া বাহির করিতে বলিয়া দিলেন। যেন সে নিজ চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারে যে, খলীফা এই হাদিয়ার মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁহার মহলের তলদেশ দিয়া এমন মিষ্ট পানির নহর বহিয়া যাইতেছে।

رو برو سلطاں وکار وبار بیں - حسن تجری تحتها الانهار بیں

"বাদশাহের সুন্দর কার্যকলাপ দর্শন কর। মহলের নিম্নদেশে প্রবাহমান নহরসমূহের শোভা দর্শন কর।" বদ্দু লোকটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলসী লইয়া যখন দজ্‌লা নদীর তীরে পৌঁছিল, তখন লজ্জায় তাহার মাটির নীচে লুকাইবার ইচ্ছা হইতেছিল। সে বলিয়া উঠিলঃ আল্লাহু আকবর! খলীফা আমার হাদিয়ার যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহার মহানুভবতা মাত্র। আমার এই হাদিয়ার বিনিময়ে তিনি আমাকে যে পোশাক ও পুরস্কার দান করিয়াছেন, তাহা সম্বন্ধে শুধু এই বলা যাইতে পারেঃ أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ "আল্লাহ্ তাহাদের মন্দ কার্যসমূহকে নেক কার্যে পরিবর্তিত করিয়া দিবেন।"

বন্ধুগণ! এই ব্যক্তি যেমন দজ্‌লা নদী দর্শন করিয়া নিজ পুকুরের পানিকে হাদিয়া আখ্যা দিতে লজ্জাবোধ করিয়াছিল, আল্লাহ্‌র কসম! এইরূপে আমরা আখেরাতের নেয়ামতসমূহ স্বচক্ষে দেখিলে দুনিয়ার স্বাদ ও সুখ-শান্তিকে স্বাদ বলিতে লজ্জাবোধ করিব। কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এই কারণেই আমরা যখন এখানে আম কিংবা খরবুযা খাই, তখন আমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করি—'আহা আজ সে থাকিলে সেও খাইতে পারিত।' আল্লাহ্‌র কসম, সে তো এখন তোমাদের এখানকার খরবুযা খাওয়া দূরের কথা, এদিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না।

দানকৃত বস্তুর সওয়াব মৃত ব্যক্তিরা পাইয়া থাকেঃ কেহ কেহ প্রত্যেক মওসুমে মওসুমী উৎপন্ন দ্রব্য হইতে নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য দান-খয়রাত করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া যে সমস্ত দ্রব্য মৃত ব্যক্তি ভালবাসিত। অনেক আলেম লোকও এরূপ কাজে লিপ্ত আছেন। তাঁহারা বরং এবিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা একাজের জন্য দলিল পেশ করেনঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"তোমরা পূর্ণ সওয়াব লাভ করিতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান কর।" অর্থাৎ, প্রিয় বস্তু দান করাই শরীঅতের কাম্য। সুতরাং মৃত ব্যক্তির প্রিয় বস্তু তাহার নামে দান করাতে ক্ষতি কি? আমি বলি, আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ "তোমাদের প্রিয় বস্তু হইতে", কিন্তু "তাহাদের প্রিয় বস্তু হইতে" বলেন নাই; সুতরাং দাতার উচিত নিজের প্রিয় বস্তু দান করা, মৃত ব্যক্তির প্রিয় বস্তু নহে। ইহাতে রহস্য এই যে, এখ্‌লাছেই দানের ফযীলত বৃদ্ধি পায়, আর নিজের প্রিয় বস্তু দান করাতেই এখ্‌লাছ অধিক হইয়া থাকে, অপরের প্রিয় বস্তু দান করাতে নহে, ইহা তো ছিল উক্ত আলেমদের দলিলের জবাব।

এখন আমি দলিল দ্বারা প্রমাণ করিব, আমরা যাহাকিছু মুরদার উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকি, অবিকল তাহাই মুরদার নিকট পৌঁছে না ; বরং উহার সওয়াব পৌঁছিয়া থাকে। শুনুন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

(তোমরা যে জন্তু আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী কর) "উহাদের মাংসও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না এবং উহাদের রক্তও না। কিন্তু তোমাদের খোদাভীতি তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে।" ইহাতে পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে যে, কোরবানীর জন্তুর মাংস এবং রক্ত আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে না ; বরং তোমাদের খাঁটি নিয়ত ও এখ্‌লাছ পৌঁছিয়া থাকে, আর ইহারই সওয়াব তোমরা লাভ কর এবং সে সওয়াবই মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়—যদি তাহাদের পক্ষ হইতে কোন কোরবানী বা কোন কিছু দান করা হয়। ইহাতে আপনারা একথাও জানিতে পারিয়াছেন যে, মহররম মাসের শরবত বিতরণেও সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, কারবালার শহীদগণ পিপাসার্ত অবস্থায় শহীদ হইয়াছেন ; সুতরাং তাহাদের রূহ্‌কে শরবত পৌঁছান উচিত, যেন তাঁহাদের পিপাসা নিবারণ হয়। অতএব, প্রথমত এই ধারণাই ভুল যে, এই শরবতই তাঁহাদের নিকট পৌঁছিয়া থাকে ; এই শরবত কখনও পৌঁছে না। দ্বিতীয়ত এরূপ রীতি আকীদারও বিপরীত। আপনারা কি এই আকীদা পোষণ করেন যে, শহীদানে কারবালা এখন পর্যন্ত পিপাসার্তই রহিয়া গিয়াছেন ? তাঁহারা এখনও কি বেহেশ্‌তের শরবত প্রাপ্ত হন নাই ? এরূপ আকীদা একান্তই অশোভন। আমাদের আকীদা এই যে, শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আল্লাহ্‌র ফযলে তাঁহারা বেহেশ্‌তের সেই শরাবে তহুরের পেয়ালা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের পূর্ববর্তী পিপাসাও নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতকালের জন্যও পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছে।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের এক অনিষ্টকারিতা এই যে, কোন কোন বৎসর শীতকালে মহর্‌রম মাসের আগমন হয়। তখনও শরবত পান করান হয়। ইহার কুফল এই দাঁড়ায় যে, অনেক লোক অসুস্থ হইয়া পড়ে। কেহবা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। এমন রীতি পালন হইতে খোদা রক্ষা করুন। গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, লোকে না বুঝিয়াই এসমস্ত নিয়ম-প্রথা পালন করিয়া থাকে।

যেমন, বিবাহের দুই-চারদিন পূর্বে দুল্‌হানকে হলুদ বা অন্য কোন রং-এর কাপড় পরাইয়া বদ্ধ কোঠায় নির্জনে বসাইয়া রাখা জরুরী মনে করা হয়। সেখানে তাহাকে নীরবতা এবং উপবাস শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে বিবাহের পরে মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং নীরব থাকা তাহার পক্ষে কঠিন না হয়। কিন্তু আমি বলি, বিয়ের পরক্ষণেই এই নীরব থাকার আবশ্যকতাই বা কি ? রসম বা কুসংস্কার পালন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন কোন সময় গ্রীষ্মকালে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই কুসংস্কার পালন করার ফল এই দাঁড়ায় যে, দুল্‌হানকে বদ্ধ কোঠায় আবদ্ধ রাখিলে তাহার মস্তিষ্ক গরম হইয়া যায়। এখন মেয়েলোকেরা বলিবে না যে, বদ্ধ কোঠায় আবদ্ধ করার ফলেই মাথা গরম হইয়াছে ; বরং বলিবে যে, জিন্‌ বা ভূতের আসর হইয়াছে। আমি বলি, আসর হইয়াছে সত্য ; কিন্তু বলিতে পার কি, এই ভূত কে ? দুল্‌হানের মা, যিনি বেচারীকে দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে বদ্ধ কোঠায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেননা, শয়তান দুই প্রকার—জিন্‌ জাতীয় শয়তান এবং মানুষ জাতীয় শয়তান। বস্তুত মেয়েদের নিকট ভূতের আসর খুবই সস্তা, কথায় কথায় ভূতের আসর হইয়া যায়।

ইহার ফল এই হয় যে, প্রথমে তো বদ্ধ কোঠায় গরম মাথায় উঠার কারণে মেয়ে প্রলাপ বকিয়াছিল। যখন তোমরা ইহাকে ভূতের আসর বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়াছ এবং উহার তদবীরও করিয়াছ। এইরূপ পরিস্থিতির শিকার মেয়েরা কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাকে বাহানাস্বরূপ কাজে লাগায় এবং প্রত্যেক ব্যাপারে নিজের উপর ভূতের আসর সওয়ার করিয়া লয়। যেমন, কোন কোন ক্ষেত্রে শুনা গিয়াছে, স্ত্রী কোন ব্যাপারে স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার উপর 'এলাহী বখ্‌শ্‌ মামুর' আসর হইয়াছে বলিয়া বাহানা জুড়িয়া দেয়। স্বামী নির্বোধ হইলে স্ত্রীর ধোঁকায় পতিত হয় এবং চতুর হইলে জুতার সাহায্যে উহার চিকিৎসা আরম্ভ করে। মাথার উপর দশ-বারটা জুতার আঘাত পড়িতেই সমস্ত 'আসর' পলায়ন করে।

বিবাহের পূর্বে বদ্ধ কোঠায় আবদ্ধ করার প্রথায় যেমন শীত-গ্রীষ্মের বিচার করা হয় না, তদ্রূপ মহর্‌রমের শরবত পান করাইবার প্রথায়ও শীত-গ্রীষ্মের ভেদ-বিচার করা হয় না। অতএব, আমি মনে করি, শরবত বিতরণকারীদের ধারণা—যে বস্তু দান করা হয়, ঠিক তাহাই মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়া থাকে। এই ধারণা ভুল। মৃত ব্যক্তির প্রিয় বস্তু তাহার উদ্দেশ্যে ব্যয় করার মূলেও এই আক্ষেপ যে, আহা! আজ সে জীবিত থাকিলে সেও তো খাইত। সে যখন নাই, তবে তাহার জন্য দান করিয়াই দেওয়া হউক। যেন তাহার নিকট পৌঁছিয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ, আখেরাতের নেয়ামতসমূহের কথা আমরা স্মরণ রাখি না। যদি আমাদের মনে থাকিত পরলোকে বেহেশ্‌তের বহুবিধ নেয়ামত ভোগ করিয়া সে আনন্দিত রহিয়াছে, তবে তাহার জন্য এরূপ আক্ষেপ কখনও হইত না। কেননা, বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহের সহিত দুনিয়ার নেয়ামতের কোনই সম্পর্ক নাই।

ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন শরীফে বেহেশ্‌তের যে সমস্ত আপেল এবং খোরমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহাদিগকে দুনিয়ার আপেল এবং খোরমার উপর যেন ক্বেয়াস বা অনুমান করা না হয়। আখেরাতের নেয়ামতের সহিত দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের শুধু নামে মাত্র সাদৃশ্য থাকিবে। অন্যথায় বেহেশ্‌তের নেয়ামত এক বস্তু আর দুনিয়ার নেয়ামত অপর বস্তু। নামে মাত্র উভয়ের মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য থাকিবে। যেমন, মাহমুদাবাদের রাজা বড় লাটকে নিমন্ত্রণ করিয়া দুই শত টাকা ব্যয়ে এক আনার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উহা নামে এবং আকারে অবশ্য আনারের মতই ছিল, কিন্তু মূলে তাহা অন্য বস্তু ছিল। কোরআনে উল্লেখ আছেঃ قَوَارِيْرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا অর্থাৎ, বেহেশ্‌তে চাঁদির বা রৌপ্যের কাঁচ হইবে। উহাতে আয়নার ন্যায় স্বচ্ছতা থাকিবে। কিন্তু মূলত তাহা রৌপ্য। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, বেহেশ্‌তের পদার্থসমূহ নামে মাত্র দুনিয়ার পদার্থসমূহের সদৃশ হইবে, অন্যথায় তথাকার রৌপ্য আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইবে, যাহাতে এদিক হইতে দৃষ্টি করিলে অপর পৃষ্ঠে দেখা যাইবে। দুনিয়ার রৌপ্যে এই স্বচ্ছতা কোথায়? এখনও তুমি এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছ—আহা! যদি মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকিত এবং তাহার প্রিয় খাদ্য খাইতে পারিত। অথচ মৃত ব্যক্তি সেখানে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, আহা! যদি তোমরা মরিতে এবং তাহার ন্যায় বেহেশ্‌তের নেয়ামত ভোগ করিতে পারিতে!! খোদা জানেন এখানে এমন কি আছে যাহার জন্য মানুষ এত পাগলঃ

زر و نقره چیست تا مفتوں شوی - چیست صورت تا چنیں مجنوں شوی

"সোনা-চাঁদি এমন কি পদার্থ? যাহার জন্য তুমি এত মত্ত। কি উহার আকৃতি, যার জন্য তুমি এত পাগল?"

দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতসমূহের সাদৃশ্য ঃ আখেরাতের নেয়ামতসমূহের বিবরণ হাদীসের বর্ণনা হইতে অবগত হউন। হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে—"হূরগণের মাথার উপর এমন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর ওড়নাসমূহ রহিয়াছে যে, উহার এক পার্শ্ব দুনিয়ার আসমান হইতে ঝুলাইয়া দিলে চাঁদ-সুরুজের আলো নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। বেহেশ্তের হূরগণের রূপ এত উজ্জ্বল যে, সত্তর পরত কাপড়ের নীচে হইতেও তাহাদের দেহ ঝলসিতে থাকিবে। বেহেশ্তের মাটি মূল্যবান জওহর এবং মেশ্ক। হাউযে কাউসারের পানির বিবরণ এই— مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَّا يَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا "যে ব্যক্তি উহা হইতে একবার পানি পান করিবে আর কখনও তাহার পিপাসা হইবে না।" মজার ব্যাপার এই যে, পিপাসা ব্যতীতও উহার পানি পান করিবার আগ্রহ হইবে, পূর্ণ স্বাদ প্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার পানিতে পিপাসার সময় তো স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু পিপাসা ব্যতীত ইহাতে কোনই স্বাদ পাওয়া যায় না। বেহেশ্তের পানির এই গুণ—একবার পান করিলে সারা জীবনের তরে পিপাসার কষ্ট নিবারণ হইয়া যাইবে। পিপাসা ব্যতীতও উহার স্বাদ যথারীতি পাওয়া যাইবে। বলুন, দুনিয়ায় এমন পানি কোথায়? যাহা পান করিলে আর কখনও পিপাসাই হয় না, আবার পিপাসা ব্যতীতও স্বাদ পাওয়া যায়। ইহার উপরই অন্যান্য সমস্ত নেয়ামতের অবস্থা অনুমান করিয়া লউন। বেহেশ্তের নেয়ামতসমূহের সহিত দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের শুধু নামে মাত্র সামঞ্জস্য এবং সাদৃশ্য আছে।

কাজেই এরূপ আক্ষেপ করা—"আমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন যদি দুনিয়ায় থাকিত এবং এখানের নেয়ামতসমূহ ভোগ করিতে পারিত" নিছক বোকামি ছাড়া আর কি বলা যায়। এসমস্ত নেয়ামত তাহাদের সম্মুখে রাখিলে তাহাদের বমি আসিবে। গঙ্গোহ শহরে আমি এই বিষয়টি অবলম্বনে এক দরবেশের সংশোধন করিয়াছিলাম। তিনি হযরত হাজী ছাহেব কেবলার মুরীদ ছিলেন। কিন্তু সঙ্গীত শ্রবণ এবং ওরস্ অনুষ্ঠানের বেদআত প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি গঙ্গোহ শহরে আসিয়া হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুসের (রঃ) মাযারে ফুল ছিটাইয়া আমার নিকট আসিলেন এবং আমার গলায়ও ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, এক বাগানে গিয়াছিলাম। তথা হইতে এই ফুলগুলি আনিয়া কিছু অংশ হযরত শায়খের মাযারে ছিটাইয়া অবশিষ্ট অংশ আপনার জন্য আনিয়াছি। কেননা, আপনিও আমার নিকট শায়খের ন্যায় প্রিয়। আমি বলিলাম, আপনি শায়খের মাযারে ফুল ছিটাইয়া বড় ভুল করিয়াছেন। কেননা, অবস্থা দুইয়ের বাহিরে নহে—হয়তো শায়খের রূহ অনুভব করিতে পারিয়াছেন অথবা পারেন নাই। যদি অনুভব করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে এই ফুল ছিটাইবার সার্থকতা কি? আর যদি অনুভব করিয়া থাকেন, তবে বলুন, যিনি বেহেশ্তের আতর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য উপভোগ করিতেছেন, এই ফুলের ঘ্রাণে তাঁহার কি শান্তি বা আনন্দ হইতে পারে? বরং তিনি হয়তো ইহাতে অশান্তি এবং কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি সতর্ক হইয়া গেলেন, নিজের ভুল স্বীকার করিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ করিবেন না বলিয়া তওবা করিলেন।

আপনারা শুধু এই নিয়মটি বুঝিয়া লউন, বেহেশ্তের নেয়ামতের সম্মুখে দুনিয়ার নেয়ামত কিছুই নহে। অতঃপর মওসুমের নেয়ামত উপভোগ করার সময় মৃত ব্যক্তির জন্য আপনাদের কোন আফ্সোস বা আক্ষেপ হইবে না যে, আহা! আমার অমুক আত্মীয় জীবিত থাকিলে সেও খাইতে পারিত। এখন সে বঞ্চিত। বন্ধুগণ! বেহেশ্তের নেয়ামতের সহিত দুনিয়ার নেয়ামতের কোন তুলনাই চলে না।

আরও একটি পার্থক্য আছে—ইহলোকের সর্ববিধ নেয়ামত সামান্য কিছুক্ষণ পরেই পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয় কিংবা পেটে যাইয়া দুর্গন্ধময় পায়খানায় পরিণত হয়। ইহার দুর্গন্ধে মস্তিষ্ক অস্থির হইয়া উঠে। বেহেশ্‌তের নেয়ামতে অতিরিক্ত অংশ কিছুই নাই। যত ইচ্ছা খাও। একটি সুগন্ধময় ঢেকুর আসিবে, আর সমস্ত ভুক্তদ্রব্য হজম হইয়া যাইবে কিংবা সামান্য সুগন্ধময় ঘাম বাহির হইবে এবং সমস্ত পানকৃত পানি হজম হইয়া যাইবে। বেহেশ্‌তে পায়খানা-প্রস্রাব করার প্রয়োজন হইবে না। পেটে অসুখ করার সম্ভাবনাও নাই। তথাকার সুখ-শান্তির মধ্যে কষ্টের নাম পর্যন্ত নাই। এই কারণে কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, আদম আলাইহিস্‌ সালামকে যে বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল—তাহা দুনিয়ার বৃক্ষ ছিল। তাঁহার পরীক্ষার জন্য বেহেশ্‌তে উক্ত গাছ লাগান হইয়াছিল। তাঁহাকে উক্ত বৃক্ষের ফল খাইতে এই কারণে নিষেধ করা হইয়াছিল যে, উহা ভক্ষণে পেটে মল উৎপন্ন হইবে, অথচ বেহেশ্‌তে মল ত্যাগের স্থান নাই। আদম (আঃ) উক্ত বৃক্ষের ফল খাইতেই তাঁহার মল ত্যাগের প্রয়োজন হইল। তৎক্ষণাৎ নির্দেশ হইল, বেহেশ্‌ত হইতে বাহির হও, দুনিয়ায় যাও। মল ত্যাগের স্থান সেখানে। বেহেশ্‌তে সেই ব্যবস্থা নাই।

অতএব, শুধু মল ত্যাগের প্রয়োজনে তাঁহাকে পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছিল। নিছক শাস্তির জন্য নহে। বস্তুত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের প্রতি কি কখনও নিছক শাস্তি বা তিরস্কার হইয়া থাকে?

বেহেশ্‌তের খাদ্যসমূহে পেটে মল উৎপন্ন না হওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে এই সূক্ষ্ম কথাটি ব্যক্ত করা হইল। আমি বলিতেছিলাম, ইহা একান্ত সত্য কথা যে, বেহেশ্‌তের খাদ্যে অতিরিক্ত অংশ অর্থাৎ, মল-মূত্রের ভাগ মোটেই নাই। সুতরাং আমাদের অমুক মৃত আত্মীয় দুনিয়ার অমুক নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করা একেবারে নিরর্থক। তাহারা বেহেশ্‌তে এমন নেয়ামত খাইতেছে যাহা তোমরা স্বপ্নেও দেখিতে পাও নাই। কিন্তু আমরা বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহ দেখিও নাই এবং সে সম্বন্ধে চিন্তাও করি না। এই কারণেই দুনিয়ার নেয়ামতে মত্ত রহিয়াছি এবং এমনভাবে মত্ত হইয়াছি যে, এই জগতের পচা বস্তুসমূহও বেহেশ্‌তে কামনা করিতেছি। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব রাহেমাহুল্লাহ্‌র এক খাদেম হুক্কাপানে অভ্যস্ত ছিল। সে মাওলানার নিকট জিজ্ঞাসা করিলঃ হযরত! বেহেশ্‌তে তামাক সেবনের নিমিত্ত আগুন পাওয়া যাইবে কিনা। এই বেচারা হুক্কা-তামাকে এত মত্ত যে, বেহেশ্‌তেও হুক্কা কামনা করিতেছে। এই জ্ঞান রাখে না যে, বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহ দেখিয়া দুনিয়ার উপভোগ্য সবকিছুই ভুলিয়া যাইবে। হুক্কা-তামাক এমন আর কি বস্তু! ইহা তো একটা বাজে জিনিস। এক কবি সুন্দর বলিয়াছেনঃ

علی الصباح که مردم بکاروبار روند ـ بلاکشـان تمبـاکو بسوی نار روند

“প্রত্যুষে মানুষ যখন কাজকর্মের দিকে যায়, তামাকসেবীগণ তখন আগুণের দিকে যায়।” ভোরের পবিত্র ও মহান সময় অন্যান্য লোকের জন্য এবাদতের সময়। আর তামাকসেবীগণ এমন সময়ে আগুনের তালাশে বাহির হয়। এমন কি, বেহেশ্‌তের ন্যায় পবিত্র স্থানেও তাহাদের এই চিন্তা—আগুন পাওয়া যাইবে কিনা। আমি তামাক সেবন হারাম বলিতেছি না। কিন্তু মূলে ইহা নিকৃষ্ট বস্তু। তামাকসেবীগণ ইহা ব্যতীত পানাহারেও স্বাদ পায় না। মহান এবং পবিত্র সময়েও তাহারা এই চিন্তায়ই মগ্ন থাকে। আবার তামাক সেবনে আকৃতিও বীভৎসাকার ধারণ করে। মুখেও ধোঁয়া, নাকেও ধোঁয়া, পেটেও ধোঁয়া—একেবারে দোযখীদের আকৃতি। বেহেশতিগণের দোযখী লোকের আকৃতি ধারণ করা কেমন কথা?

বেহেশ্‌তের বিস্ময়কর ফল ঃ আমরা বেহেশ্‌তের নেয়ামত সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করিয়া দেখি নাই। এই কারণেই দুনিয়ার নেয়ামতে মত্ত রহিয়াছি। কোন এক কিতাবে দেখিয়াছি, বেহেশ্‌তে বিচিত্র মজার ব্যাপার হইবে—কোন কোন সময় ফল সম্মুখে আনয়ন করা হইবে। খাওয়ার জন্য উহা ভাঙ্গিতেই উহা হইতে অতি সুন্দরী হূর বাহির হইয়া আসিবে। ইহা দেখিয়া বেহেশ্‌তীর বিস্ময়ে তাক লাগিয়া যাইবে।

কোন এক আমীর লোকের মেহমানদারীর কাহিনী শুনিয়াছি। উক্ত আমীর লোকের বাবুর্চি মেহমানের সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া রাখিল। তাহা পরিমাণে খুবই অল্প ছিল। রুটি এবং তরকারী নিঃশেষ হইলে বাবুর্চি বলিল, ডিশ্‌ এবং পেয়ালা ভক্ষণ করুন। মেহ্‌মান ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল ঃ তুমি বেআদবী করিতেছ? আমাকে ডিশ্‌-পেয়ালা খাইতে বলিতেছ? সে করজোড়ে বলিল ঃ হুযূর, বেআদবী করিতেছি না। আপনি ইহা ভাঙ্গিয়াই দেখুন। মেহ্‌মান ডিশ্‌ ও পেয়ালা ভাঙ্গিয়া দেখিতে পাইলেন, উহা 'মালাই।' আহার করিয়া খুব স্বাদ পাইলেন। বাবুর্চি পুনরায় বলিল ঃ দস্তরখানও আহার করুন। দস্তরখান ছিঁড়িয়া মুখে দিতেই মেহমান দেখিতে পাইল, এক বিচিত্র ধরনের রুটি।

নবাব-বাদশাহ্‌দের দস্তরখানে এরূপ মজার ব্যাপার সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। কিন্তু বেহেশ্‌তে এমন তামাশা প্রত্যহ হইবে। অতএব, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল যে, মৃত্যুর পরে মানুষের সবকিছুই বিলীন হইয়া যায়। মুসলমান কখনও এরূপ হয় না; বরং মৃত্যুর পরে মুসলমান এমন শান্তি ও আরামজনক স্থানে পৌঁছিয়া যায় যে, উহার সম্মুখে দুনিয়ার সুখ-শান্তি এবং নেয়ামত কিছুই নহে। অতএব, মৃত আত্মীয়েরা পরলোকে গমন করিয়া আকাঙ্ক্ষা করে ঃ আহা, তোমরাও যদি সেখানে হইতে, দুনিয়ায় না থাকিতে! আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۙ ○
فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ
خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

আল্লাহ্‌র দ্বীনের উন্নতির জন্য যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হইয়াছেন, তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না। তাহারা স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে জীবিত। তাহাদিগকে বেহেশ্‌ত হইতে রিযিক প্রদান করা হইতেছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ও দয়ায় তাহারা বেশ আনন্দে আছে। যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, তাহাদের জন্যও তাহারা আনন্দ করে যে, পরলোকে পৌঁছিয়া তাহাদের কোন প্রকার চিন্তা বা ভয় থাকিবে না। তাহারা আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে এবং এজন্যও তাহারা আনন্দিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নেককার লোকের বিনিময় নষ্ট করেন না। এখন বল, তোমাদের অভিমতই ঠিক, না বেহেশ্‌তবাসীদের? নিঃসন্দেহ, তাঁহাদের মতই ঠিক। তাই দুনিয়া ছাড়িয়া পরলোকে চলিয়া যাওয়া তোমাদের জন্যও মঙ্গল।

আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঃ আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى "তোমরা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দান করিতেছ, অথচ আখেরাত উহা হইতে বহুগুণে উত্তম এবং স্থায়ীও বটে।" ইহাতে বুঝা গেল যে, মৃত ব্যক্তিগণের মতই ঠিক। জীবিত লোকেরই বেহেশ্‌তে পৌঁছিবার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। অতএব, তোমরা

মৃত ব্যক্তিদের চিন্তা ছাড়িয়া নিজেদের চিন্তা কর, তোমরাও তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হও। এই বিষয়টি একজন বদ্দু আরব খুব সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছে।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালের (রাঃ)-এর এন্তেকাল হইলে তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ্ (রাঃ) খুবই শোকাতুর হইয়া পড়িলেন। তখন একজন বদ্দু আরব এইরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেনঃ

اِصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِيْنَ فَاِنَّمَا ـ صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّأْسِ

“হে ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ), ছবর করুন। আপনাকে দেখিয়া আমরাও ছবর করিব। বস্তুত মনিবের ছবরের পরেই প্রজাগণ ছবর করিতে পারে।”

خَيْرٌ مِّنَ الْعَبَّاسِ اَجْرُكَ بَعْدَهٗ ـ وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْكَ لِلْعَبَّاسِ

“ছবর কেন করিবে না। অথচ ব্যাপার এই যে, আব্বাস যে তোমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তোমাদেরও ক্ষতি হয় নাই, তাঁহারও ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার বিচ্ছেদে তোমরা যে শোক পাইয়াছ, তোমরা উহার সওয়াব প্রাপ্ত হইয়াছ। ইহা তোমাদের জন্য আব্বাসকে পাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর তিনি তোমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খোদাকে পাইয়াছেন, যিনি তাঁহার জন্য তোমাদের চেয়ে উত্তম।” বাস্তবিকই অতি সুন্দর সান্ত্বনা! ইব্‌নে আব্বাস বলেন, উক্ত বদ্দু আরব অপেক্ষা উত্তম সান্ত্বনা আমাকে আর কেহই দিতে পারে নাই।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আখেরাতের কথা আমাদের স্মরণ নাই বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ-চিন্তা। যদি আখেরাতের সুখ-শান্তির কথা আমাদের স্মরণ থাকিত, তবে আত্মীয়-স্বজনের ইহলোকের চলাফেরা ও গতিবিধির কথা স্মরণ করিতাম না; বরং আমরাও পরলোকে তাঁহাদের নিকট যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিতাম এবং যাইতে পারিলে সুখী হইতাম। দেখুন, আপনার পুত্র হায়দরাবাদ যাইয়া ষ্টেটের মন্ত্রী হইয়া গেলে আপনি কি আকাঙ্ক্ষা করিবেন যে, সে হায়দরাবাদ না গেলে ভাল হইত; কিংবা এই আকাঙ্ক্ষা করিবেন যে, আপনি সেখানে যাইয়া ছেলের সম্মান ও শান-শওকত নিজ চোখে দেখিতে পারিলে ভাল হইত? নিঃসন্দেহ, আপনি নিজেও হায়দরাবাদ যাওয়ারই আকাঙ্ক্ষা করিবেন। তবে নিজের মৃত আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে এরূপ কামনা কেন করিতেছেন যে, তাহারা এখানে থাকিলে ভাল হইত; এরূপ কেন আকাঙ্ক্ষা করেন না যে, আপনারা পরলোকে যাইয়া তাহাদের সুখ-শান্তি দেখিতে পারিলে ভাল হইত?

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সর্বদা এই কামনা থাকে যে, ইহলোক ছাড়িয়া কোনরূপে তাড়াতাড়ি পরলোকে পৌঁছিয়া যান। কেননা, তাঁহারা আখেরাতের সুখ-শান্তির অবস্থা দিব্যচক্ষে দেখিতে পান। জামী (রঃ) বলেনঃ

دلا تاکے دریں کاخ مجازی ـ کنی مانند طفلاں خاك بازی
توئی آں دست پرور مرغ گستاخ ـ که بودت آشیاں بیروں ازیں کاخ
چرا ازاں آشیاں بیگانه گشتی ـ چو دوناں چغد ایں ویرانه گشتی

“হে মন! আর কতকাল এই কৃত্রিম বাসস্থানে খেলাধুলা করিবে? তুমিই সেই নিজ হস্তে প্রতিপালিত ধৃষ্ট ও অবাধ্য পাখী, তোমার বাসা ছিল এই পৃথিবীর বাহিরে, কেন নিজের প্রকৃত বাসা হইতে নিঃসম্পর্ক হইয়া গেলে? কেন হীনমনা উল্লুর (পেঁচক) ন্যায় এই পোড়োবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছ?”

মাওলানা বলেনঃ

بشنو از نے چوں حکایت می کند - وز جدائی ها شکایت می کند
کز نیستاں تا مرا ببریده اند - از نفیرم مرد و زن نالیده اند

"বাঁশীর দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ কর, বিচ্ছেদ-কষ্ট বর্ণনা করিয়া বলিতেছে, আমাকে বাঁশের ঝোঁপ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, আমার শোক-সন্তপ্ত সুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলে ক্রন্দন করিতেছে।"

যেহেতু আশেকের ক্রন্দন-সুর শ্রবণ করিলে অপরের হৃদয়েও অনুরাগ উৎপন্ন হয়। এই কারণে বলিতেছেন, আশেকদের ক্রন্দন-সুর এবং তাহাদের উক্তি শ্রবণ কর। বাঁশী বলিতে এস্থলে আল্লাহওয়ালা আশেক লোকদিগকে বুঝান হইয়াছে। এই কবিতায় দুনিয়া হইতে বিরাগ এবং আখেরাতের প্রতি অনুরাগ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ্‌র আশেকদের সংসর্গ অবলম্বন কর। তাঁহাদের বিচ্ছেদ-কাহিনী শ্রবণ কর। কাহার বিচ্ছেদ?

کز نیستاں تا مرا ببریده اند - از نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق - تا بگویم شرح درد اشتیاق

"যখন হইতে বাঁশের ঝোঁপ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, আমার দুঃখ-পূর্ণ ক্রন্দন-সুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলে ক্রন্দন করিতেছে, বিচ্ছেদের দুঃখে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হউক, যাহাতে আমি এশ্‌কের ব্যথা বিস্তারিত ব্যক্ত করিতে পারি।" কেন? এই কারণে যে—

هرکسے کو دور ماند از اصل خویش - باز جوید روزگار وصل خویش

"যে ব্যক্তি নিজের মূল বাসস্থান হইতে দূর হইয়া পড়ে, সে আবার মূলের সহিত মিলিত হওয়ার পন্থা অন্বেষণ করে।"

জনাব, সমস্ত সর্বনাশের মূল এই যে, আমরা দুনিয়াকে নিজের আসল বাসস্থান মনে করিয়া রাখিয়াছি। এই কারণে আখেরাতের প্রতি আমাদের আগ্রহ নাই। যদি আখেরাতকে প্রকৃত বাসস্থান মনে করিতাম এবং তথাকার নেয়ামত ও সুখ-শান্তির কথা সর্বদা মনে উদিত থাকিত, তবে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন সেখানে যাওয়াতে আমাদের মনে শোক হইত না; বরং নিজেরা যাইতে না পারার জন্য দুঃখ হইত।

বেহেশ্‌তে কোন কষ্ট নাইঃ আখেরাতের শান্তির কথা আর কি বলিব—তথাকার অবস্থা এই যে— وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ ○

"মন যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, যাহাকিছুর জন্য প্রার্থনা করিবে তাহাও পূর্ণ হইবে।" হাদীস শরীফে আছেঃ কেহ কেহ খেত-কৃষির প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, হে বনী আদম! তুমি বড়ই লোভী, বেহেশ্‌তে তোমার খেতি-কৃষির কি প্রয়োজন? সে বলিবেঃ প্রভু! আমার মনে চায়। তৎক্ষণাৎ কৃষি উৎপন্ন হইয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ শস্য পাকিয়া খেত হইতে পৃথক হইয়া স্তূপীকৃত হইয়া যাইবে।

সম্ভবত কোন যুক্তিবাদী ভদ্রলোক এখানে "সম্ভাবনা" আবিষ্কার করিতে পারেন, কাহারও যদি মরিবার ইচ্ছা হয়, তবে বেহেশ্‌তে কি তাহার মৃত্যুও আসিবে?

ইহার উত্তর এই যে, তেমন লোক হয়তো তুমিই হইবে, বেহেশ্‌তে থাকিয়া যাহার মরিতে ইচ্ছা হইবে। আর তো কাহারও তেমন ইচ্ছা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেননা, মরিতে তো দুনিয়াতেও কাহারও মন চায় না। স্বভাবত মৃত্যুকে সকলে না-পছন্দ করে, যদি কাহারও মনে মৃত্যুর কামনা হয়ও, তবে ইহার কারণ হয়তো দুঃখ-কষ্টের আধিক্য, যাহা অসহনীয় হওয়ার কারণে মানুষ মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু বেহেশ্‌তে কোনই দুঃখ-কষ্ট নাই, অথবা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎলাভের আগ্রহাতিশয্যে মানুষ মৃত্যু কামনা করে। বেহেশ্‌তে সেই আগ্রহও পূর্ণ হইয়া যাইবে। কাজেই তথায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা হওয়ার কোনই কারণ নাই।

প্রকৃত উত্তর এই যে, বেহেশ্‌তে যাওয়ার পর মৃত্যুর কামনা মনে আসিতেই পারে না। পরীক্ষা-স্বরূপও এই আকাঙ্ক্ষা মনে আসিবে না। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর বেহেশ্‌তে প্রবেশলাভের পরেই এসমস্ত সুখ-শান্তি উপভোগ করা যাইবে।

রূহের অবস্থা ঃ কিয়ামতের পূর্বের অবস্থা এই হইবে যে, রূহের অবস্থানের জন্য আরশের নীচে একটি ফানুস ঝুলান থাকিবে। সবুজ পাখীর আকারে রূহসমূহ উহাতে অবস্থান করিবে। সবুজ পাখীর এই দেহ-পিঞ্জর, উহাদের দেহ বা খাঁচা হইবে না; বরং বাহনস্বরূপ হইবে। যেইখানে যাওয়ার ইচ্ছা হইবে, সেই বাহনে আরোহণপূর্বক উড়িয়া যাইবে। ইহাই আখেরাতের নেয়ামত এবং সুখ-শান্তি, যাহার জন্য আল্লাহওয়ালাগণের অন্তর দুনিয়ার প্রতি বিরূপ।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাদীসে বলিয়াছেন ঃ আমার সহিত দুনিয়ার কি সম্বন্ধ? আর দুনিয়ার সহিত আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়াতে তো আমার অবস্থা এইরূপ, যেমন কোন মুসাফির ভ্রমণ করিতে করিতে কোন গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য দণ্ডায়মান হয়। বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় মুসাফির গাছের সহিত মন লাগায় না, উহাকে নিজের স্থায়ী বাসস্থানও মনে করে না।

কিন্তু আমাদের অবস্থা আক্ষেপের উপযোগী কিনা, এখন চিন্তা করিয়া দেখুন। আমরা দুনিয়ার সহিত মন লাগাইয়া রাখিয়াছি, অথচ এই দুনিয়াকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই বিশ্বাস সকলেরই আছে। কেহই এখানে চিরস্থায়ী নহে। বস্তুত দুনিয়ার সহিত এত অধিক মন লাগাইবার কারণ শুধু এই যে, মানুষ মনে করিয়াছে, মৃত্যুর পরে মানুষ এক সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকে এবং একাকী পড়িয়া থাকে। এই নির্জনতার কল্পনায় মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; বরং মানুষের একটি খারাপ অভ্যাস, অদৃশ্যকে সম্মুখস্থ বস্তুর উপর ধারণা করিয়া এরূপ মনে করে যে, ইহলোকে আমরা যেমন নির্জনতাকে ভয় করি, মৃত্যুর পরেও তদ্রূপই হইবে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই সে মনে করে, মৃত্যুর পরে মানুষ কবরের নির্জন কোঠায় ভয় পাইবে। কিন্তু মৃত্যুর পরে নির্জন কোঠায় আবদ্ধ থাকা এবং নির্জনতাকে ভয় পাওয়া—উভয় কথাই ভুল এবং ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, দেখা গিয়াছে, অনেক সময় নির্জনতায়ই আরাম হইয়া থাকে। যেমন কবি বলেন ঃ

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت ست - چوں کوئے دوست هست بصحرا چه حاجت ست

“নির্জনতাপ্রিয় স্বভাবের জন্য জনসমাগমের কি প্রয়োজন? যিনি প্রিয়জনের গলি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মুক্ত প্রান্তর দিয়া কি করিবেন?”

যিনি নির্জনতা ভালবাসেন, নির্জনতার মজা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর। তিনি তোমাদের জনসমাবেশের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন ঃ

ستم ست اگر هوست کشد که بسیر سروسمن درآ - تو ز غنچه کم نه دمیدهٔ در دل کشا به چمن درآ

"কি অন্যায় কথা! তুমি বাগানে ভ্রমণের জন্য আগ্রহশীল। তুমি তো কোন ফুল অপেক্ষা কম নও। হৃদয়ের দ্বার খোল এবং এই বাগানে আস।"

তথাপি ইহলোকে নির্জনতার পূর্ণ স্বাদ তাহারা এই জন্য উপভোগ করিতে পারে না যে, দেহ-পিঞ্জরটি পূর্ণ নির্জনতার প্রতিবন্ধক। মৃত্যুর পরে এই পিঞ্জর হইতেও মুক্ত হইবে, কাজেই তখন তাহারা নির্জনতার পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করিবে। অর্থাৎ, বন্ধুর একচ্ছত্র রূপসুধা পান করা পূর্ণরূপে ভাগ্যে জুটিবে। ইহাতে এমন স্বাদ, খোদার কসম! অন্য কিছুতেই ইহার সমান স্বাদ নাই। খাকানী বলেনঃ

پس از سی سال ایں معنی محقق شد بخاقانی ـ که یکدم با خدا بودن به از ملك سلیمانی

"বহু বৎসর পরে খাকানীর এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র সংসর্গের একটি মুহূর্ত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব অপেক্ষা উত্তম।"

নওয়াব শেফতা বলেনঃ

چه خوش ست با تو بزمے بنهفته ساز کردن ـ در خانه بند کردن سر شیشه باز کردن

"হে খোদা! তোমার সহিত নির্জনে মিলনের মজলিস কতই না আনন্দদায়ক! যখন ঘরের দরজাও বন্ধ থাকে এবং শরাবের (রহমতের) বোতলও খোলা থাকে।"

আর এক প্রেমিক বলেনঃ

همه شهر پر ز خوباں منم وخیال ماهے ـ چه کنم که چشم بد بیں نه کند بکس نگاهے

"সমগ্র শহর সুন্দরীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমি কি করি! কুতসিৎদর্শী (হতভাগা) চক্ষু কাহারও দিকে দৃষ্টিই করে না।"

আমাদের খাজা ছাহেব বলেনঃ

دل ہو وہ جس میں کچه نه ہو جلوۂ یار کے سوا ـ میری نظر میں خاك بهی جام جہاں نما نہیں

"অন্তর বলিতে উহাই, যাহাতে বন্ধুর (আল্লাহ্‌র) নূর ব্যতীত আর কিছুই না থাকে। আমার চোখে সমগ্র জগতের কোন মূল্যই নাই।"

তিনি আরও বলেনঃ

کسی کی یاد میں بیٹهے جو سب سے بے غرض ہو کر ـ تواپنا بوریه بهی پهر ہمیں تخت سلیمان تها

"সবকিছু হইতে সম্পর্কহীন হইয়া কাহারও (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র) ধ্যানে বসিয়া থাকিলে নিজের চাটাইও তখতে সোলায়মানীর সমতুল্য হয়।"

সুতরাং আল্লাহ্‌র দরবারের নির্জনতাকে ভয়ের কারণ মনে করা ভুল। সেই নির্জনতার উপর দুনিয়ার সমস্ত জনসমাবেশ কোরবান। মৃত্যুর পরে মানুষ একাকী নির্জন কোঠায় পড়িয়া থাকে, এ কথা ঠিক নহে। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ মৃত্যুর পরে রূহ রূহের জগতে পৌঁছিয়া যায়। তথাকার অধিবাসী সমস্ত রূহ আগন্তুক রূহ্‌কে সম্বর্ধনা জানায় এবং তাহার নিকট দুনিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করে। অতঃপর বলে, তাহাকে আরাম করিতে দাও, দুনিয়া হইতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে।

আমার নানী ছাহেবা এন্তেকালের মুহূর্তে দেখিতে পাইলেন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তশরীফ আনিয়াছেন এবং তাঁহাকে বলিতেছেনঃ 'আমার সঙ্গে চল। রাস্তা পরিষ্কার, কোন ভয় নাই।'

অতএব, বিভিন্ন হাদীস ও ঘটনাবলী হইতে বুঝা যায়, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একাকিত্ব এবং নির্জনতা শেষ হইয়া যায়। মুসলমানের রূহ্ রূহের জগতে যাইয়া হুযূরে আক্‌রাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হয় এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়া আনন্দিত হয়। ফলকথা, সেখানে সর্বপ্রকার আনন্দই থাকিবে। প্রত্যেকেই সেখানে এমন আনন্দ লাভ করিবে যে, দুনিয়াতে তাহা কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لَّالَغْوٌ فِيْهَا وَلَاتَأْثِيْمٌ

"বেহেশ্‌তীরা শরাবের পেয়ালা লইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি করিবে। তাহাতে কোন অশ্লীল উক্তিও হইবে না এবং কোন গালি-গালাজও হইবে না।" এই শান্তির নমুনা দুনিয়াতে কিছু পাওয়া গেলে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের জীবনে পাওয়া যায়। দুনিয়াদারগণ ইহার গন্ধও পায় না।

আমাদের হাজী ছাহেব কেব্‌লাকে যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেনঃ হযরত হাজী ছাহেবের অভ্যাস ছিল, ফজর ও এশরাকের নামাযের পরে তিনি হুজ্‌রা হইতে মিষ্টির হাঁড়ি বাহির করিয়া মাওলানা শেখ মোহাম্মদ এবং হযরত হাফেয মোহাম্মদ যামেন ছাহেবের সঙ্গে বসিয়া মিষ্টি আহার করিতেন। কোন কোন সময় এরূপ ঘটিত যে, তাঁহাদের মধ্যে একজন মিঠাইর হাঁড়ি লইয়া দৌড়াইতেন আর অবশিষ্ট দুই জন উহা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়ার জন্য পাছে পাছে ছুটিতেন। আজকাল অবশ্য ইহাকে শালীনতাবিরোধী মনে করা হয়। কিন্তু কে জানে, আজকালকার লোকেরা কোন্ কোন্ বিষয়কে শালীনতা মনে করিয়া লইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আজকাল কষ্ট দেওয়ার নামই শালীনতা রাখা হইয়াছে।

মোটকথা, আখেরাতে যেই শান্তি ও শান্তির উপকরণ রহিয়াছে, দুনিয়ায় তাহা সম্ভব নহে। একথাটি স্মরণ রাখিলে কোন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে শোক-দুঃখ আসিতে পারে না। হাঁ, এই দুঃখ হইতে পারে যে, আমি কেন তথায় পৌঁছিতে পারিলাম না। তোমাদের দো'আ যদি কবূল হয় এবং মৃত ব্যক্তি পুনরায় দুনিয়ায় চলিয়া আসে, তবে আল্লাহ্‌র কসম! সে এখানে থাকা পছন্দ করিবে না; বরং আবার মৃত্যুরই আকাঙ্ক্ষা করিবে এবং তোমাদিগকে তিরস্কার করিবে যে, তোমরা দুনিয়ার সহিত মন লাগাইয়া রাখিয়াছ। আখেরাতকে ভুলিয়া রহিয়াছ। অথচ আমরা এই আক্ষেপ করি—আহা, অমুক আত্মীয় এখন আমাদের মধ্যে থাকিলে সেও আমাদের সঙ্গে আমরূদ এবং আনার খাইতে পারিত। ইহা ঠিক কবির এই উক্তির ন্যায়ঃ

تو نہ دیدی گھے سلیماں را ۔ چہ شناسی زبان مرغاں را

"তুমি কখনও সোলায়মানকে দেখ নাই। তুমি পাখীর ভাষা কেমন করিয়া জানিবে?" অথচ আমাদের অবস্থা এইঃ

چوں آں کرمے کہ در سنگے نہان ست ۔ زمیں وآسماں وی ہمان ست

"পাথরের ভিতরে আবদ্ধ কীট মনে করে, তাহার যমীন এবং আসমান উহাই।"

প্রিয়জনের এন্তেকালে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক, ইহা দূষণীয় নহে। কারণ, ইহা অনিচ্ছামূলক। ইহার যুক্তি এই যে, এই স্বাভাবিক শোক-দুঃখের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পায় এবং তজ্জন্য সওয়াব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই বিলাপ এবং প্রাণ ফাটান কান্নাঃ "আহা! সে সঙ্গহীন হইয়া গেল, সে আমাদের ন্যায় সুস্বাদু খাদ্য আহার করিতে পাইবে না।"

এসমস্ত বিলাপ ও আক্ষেপ নিরর্থক। আল্লাহ্‌র কসম! সে তোমাদিগ হইতে অধিক আরামে এবং সুখে আছে। তোমরা তাহার চিন্তা করিও না। মুরদাদের সুখ-শান্তির অবস্থা ইহার চেয়ে বিস্তারিত জানিতে চাহিলে আমার রচিত 'শওকে ওয়াতান'* কিতাবটি পাঠ করুন। আমি দাবী করিয়া বলিতে পারি, এই কিতাবটি দেখিবার পরে জীবিত লোকেরা মৃত্যুর জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িবে। মুরদাদের জীবিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর মনে আসিবে না; বরং নিজেদের চিন্তায় মগ্ন হইবে যে, কোন প্রকারে আমরাও পরলোকে কেমন করিয়া পৌঁছিব। সুতরাং আমাদের কেবল এই চেষ্টাই করা উচিত, আখেরাতের শান্তি ও আরাম কিরূপে লাভ করিতে পারি। ইহার পন্থা অদ্যকার আলোচ্য এই আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার সারমর্ম এইঃ সৌভাগ্য অর্জন কর, নেক আমল কর।

ঘটনাক্রমে আজ যেই স্নেহাস্পদের এন্তেকালে শোক প্রকাশার্থে এই ওয়ায অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার নামও সৌভাগ্যজড়িত। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ সে নিজ নামের ন্যায় "মাস্‌উদ" অর্থাৎ, সৌভাগ্যবানই বটে; সে আখেরাতের সুখ-শান্তি লাভে সফলকাম। যাহাহউক, সুখ-শান্তি লাভের পন্থা হইল নেক আমল দ্বারা সৌভাগ্য অর্জন করা।

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের স্বরূপঃ سعادت 'সাআদাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ সৌভাগ্য। অতএব, অর্থ এই হয় যে, যাহারা সৌভাগ্যশালী তাহারা অনন্তকালের জন্য বেহেশ্‌তে বাস করিবে। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশের জন্য নেক আমলের আবশ্যক নাই; বরং যাহার ভাগ্য ভাল সে-ই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, তাহা হইলে কোরআন ও হাদীস শরীফে নেক আমলের জন্য এত পীড়াপীড়ি এবং পাপ কার্যের জন্য এত শাস্তির ধমক কেন দেওয়া হইল? এই তাকীদ এবং শাস্তির ধমক কি অর্থহীন? কখনই নহে; বরং যাহার তক্‌দীর ভাল তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র দফতরে লিখিত হয়ঃ অমুক ব্যক্তি যেহেতু নেক আমল করিবে, এই কারণে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি নেক আমল করিবে, সে-ই সৌভাগ্যশালী, আর যে ব্যক্তি মন্দ আমল করিবে, সে দুর্ভাগা। নছীব এবং তক্‌দীর ভাল হওয়া নেক আমলের উপর নির্ভরশীল। ইহাই নিয়ম, ইহাই আইন।

এমনি নিয়মের বিপরীত কাহারও প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ এবং দয়া হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। তাহাও শুধু আমাদের নিকট নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেননা, আমরা তাহার আমল সম্বন্ধে জ্ঞাত নহি, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তাহাও নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে। কারণ, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির আমল সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। মন্দ আমল সত্ত্বেও যাহাকে তিনি আযাব ব্যতীত বেহেশ্‌তে প্রেরণ করিবেন, বুঝিতে হইবে, তাহার এত বড় কোন নেক আমল আছে যাহা, সমস্ত পাপ কার্যের উপর প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহা জানেন—আমরা জানি না। سعادت (সাআদাত) শব্দের অন্য অর্থও আছে, যাহা অমঙ্গলের বিপরীত। এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত কথার মর্ম এই হয় যে, যাহারা মঙ্গলময়, তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। আর যাহারা অশুভ, অমঙ্গলময় তাহারা দোযখে যাইবে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, প্রকৃত অশুভ কে?

টীকা

---

* এই বিষয়বস্তু নিয়াই আমাদের প্রকাশিত "শেষ বিচারের আগে" পুস্তকখানি দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

যাহারা দোযখে যাইবে কেবল তাহারাই প্রকৃত অশুভ ও অমঙ্গলময়। আর কেহ কুমীর কিংবা উল্লুকে অশুভ বলিয়া থাকে কিংবা গাছকে অশুভ মনে করিয়া থাকে, অথবা কোন কোন দিনকে অশুভ বলে। ইহা কিছুই নহে। মীরাঠের এক বানিয়া সমস্ত অশুভ বলিয়া কথিত ঘোড়া খরিদ করিয়া বিস্তর লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য সেই অশুভই ছিল শুভ। কেহ কেহ কোরআন শরীফের এই আয়াত ঃ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ

“অতএব, আমি তাহাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বাতাস এমন দিনে প্রেরণ করিলাম, যাহা তাহাদের জন্য অশুভ ছিল” হইতে সন্দেহ পতিত হইয়াছে যে, কোন কোন দিন অশুভও আছে। কিন্তু তাহারা দেখে নাই যে, অপর আয়াতে ايام نحسات -এর তফসীর করা হইয়াছে ঃ سبع ليال وثمانية ايام “একাধারে সাত রাত্রি এবং আট দিন” ইহার সহিত যোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, কোন দিনই শুভ নহে; বরং সমস্ত দিনই অশুভ, অথচ এরূপ কেহই বলে না। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা কোন কোন দিন অশুভ হওয়ার প্রমাণ গ্রহণ করা ঠিক নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে দিনের মধ্যে শুভাশুভ আবিষ্কার করিয়াছে জ্যোতিষীগণ। শীয়া সম্প্রদায় অবশ্য ইহাকে হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত মনে করে, কিন্তু উক্ত রেওয়ায়ত বানোয়াট। শরীঅতে অবশ্য কোন কোন দিন মোবারক বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন দিনই অশুভ নহে। এখন একটি কথা বাকী থাকে, তবে ايام نحسات ‘আইয়্যামে নাহেসা’-এর অর্থ কি?

ইহার উত্তরে বলি, ইহার অর্থ—‘তাহাদের জন্য অশুভ’ অর্থাৎ, ঐদিনগুলি আ’দ সম্প্রদায়ের জন্য অশুভ ছিল। কেননা, সেই দিনগুলিতে তাহাদের উপর আযাব আসিয়াছিল এবং সেই আযাব আসিয়াছিল তাহাদের কুফরী ও অবাধ্যাচরণের কারণে। অতএব, বুঝা গেল যে, সেই অমঙ্গলের মূল হইল তাহাদের কুফরী এবং অবাধ্যাচরণ। যাহাহউক, এই আয়াতেও বুঝা গেল যে, এবাদত ও আনুগত্যের নাম মঙ্গল আর কুফরী ও অবাধ্যতার নাম অমঙ্গল। অমঙ্গল ও অশুভ আমরা? না—পেঁচক ও ঘুঘু ও কলা। বলাবাহুল্য, এসমস্ত বস্তুর কোনই পাপ নাই। কাজেই ইহা কত বড় ভুল যে, আমরা নিজেদের অমঙ্গল অন্য বস্তুর উপর চাপাইতেছি। অতএব, আমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ ঃ

حمله بر خود می کنی اے ساده دل – همچوں آں شیریکه بر خود حمله کرد

“কোন এক সিংহ যেমন নিজে নিজের উপর আক্রমণ করিয়াছিল; হে সরলমতি, তুমিও তদ্রূপ নিজের উপর আক্রমণ করিতেছ।”

নেক আমলের তওফীক ঃ এখন আমি আলোচ্য আয়াত সংক্রান্ত কয়েকটি এল্‌মী সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। এখানে ‘কামুস’ অভিধানটি পাওয়া গেল না, পাইলে দেখিয়া লওয়া যাইত। سَعِدَا শব্দটি যদি সকর্মক ক্রিয়া বলিয়া অভিধানে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, [কামুস অভিধানে দেখা যায় سَعِدَ ও سُعِدَ সকর্মক ক্রিয়া অকর্মক ক্রিয়া, উভয়েরই এক অর্থ, ইহা হইতে اَسْعَدَ সকর্মক রূপ, কিন্তু ইহার اسم مفعول - مَسْعَدٌ নহে مَسْعُوْدٌ এই আভিধানিক প্রমাণটি কেহ হযরত মাওলানার দৃষ্টিগোচর করিলে তিনি বলেনঃ যদিও سُعِدُوْا সকর্মক ক্রিয়া নহে, কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার রূপধারী। অতএব, যদিও শব্দের দ্বারা আমার ইঙ্গিতকৃত

সূক্ষ্ম রহস্য বুঝা যায় না, তথাপি সকর্মক রূপ হইতে আমার মনে এই সূক্ষ্ম কথাটি এল্‌হাম হইয়াছে।] তবে আলোচ্য আয়াতে سُعِدُوْا শব্দের কর্মবাচ্য রূপ ব্যবহার করার একটি রহস্য আমার এই মনে হইতেছে যে, ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তোমাকে যে সফলকাম ও সৌভাগ্যশালী করা হইয়াছে, তাহাতে তোমার কোন কৃতিত্ব নাই; বরং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে ইহা তোমার প্রতি অনুগ্রহই অনুগ্রহ। কেননা, সৌভাগ্য যদিও নেক আমলের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু নেক আমলের তওফীক শুধু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই হইয়া থাকে। আপনার নামাযের যে আগ্রহ হয়, রাত্রে আপনি যে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া থাকেন, তাহা আপনার কাজ নহে; বরং অন্য এক শক্তি আপনাকে উঠাইতেছে, সুতরাং আমাদের অবস্থা এইরূপঃ

رشتــه در گردنـم افگنـده دوست - مى برد هر جا كه خاطر خواه اوست

"বন্ধুর মহব্বতের শিকল আমার ঘাড়ে পতিত রহিয়াছে, তিনি যেখানে ইচ্ছা আমাকে টানিয়া নিয়া যান।" سُعِدُوْا শব্দে কর্মবাচ্য রূপের এই রহস্য।

দুইটি এল্‌মী সূক্ষ্ম কথাঃ অতঃপর مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ বাক্যটি সম্বন্ধে দুইটি সূক্ষ্ম কথা বলিতেছি। ইহার উপর বাহ্যদৃষ্টিতে সন্দেহ হয় যে, যতদিন আসমান-যমীনের অস্তিত্ব থাকিবে, বেহেশ্‌তিগণ বেহেশ্‌তে ততদিন থাকিবে। অথচ আসমান-যমীনের স্থায়িত্ব সীমাবদ্ধ। ইহাতে বুঝা যায়, বেহেশ্‌তিগণের বেহেশতে অবস্থান এক নির্দিষ্ট কালের সহিত সীমাবদ্ধ।

ইহার উত্তর শুনুন। এস্থলে আসমান-যমীন বলিতে বেহেশ্‌তের আসমান-যমীন উদ্দেশ্য, দুনিয়ার আসমান-যমীন উদ্দেশ্য নহে। এখন অর্থ এই হইল যে, বেহেশতিগণ বেহেশ্‌তে স্থায়ীভাবে বাস করিবে, যে পর্যন্ত বেহেশ্‌তের আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকিবে। যেহেতু বেহেশ্‌তের আসমান ও যমীন অনন্তকাল স্থায়ী থাকিবে, কখনও ধ্বংস হইবে না, সুতরাং বেহেশ্‌তিগণের বেহেশতে অবস্থানও আর সীমাবদ্ধ হইল না। যে সমস্ত আয়াতে خالدين فيها ابدا উল্লেখ আছে, সে সমস্ত আয়াত হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বেহেশ্‌তের আসমান ও যমীন অনন্ত স্থায়ী, আর যে হাদীসে উল্লেখ আছেঃ

يا اهل الجنة خلود ولاموت - ويا اهل النار خلود ولاموت

"হে বেহেশ্‌তিগণ! অনন্তকাল বাস করিতে থাক, আর মৃত্যু নাই; হে নরকবাসীরা! অনন্তকাল ইহাতে থাক, আর মৃত্যু নাই," উক্ত হাদীস দ্বারা বেহেশ্‌ত-দোযখের অনন্ত স্থায়িত্ব বুঝায়।

এখন একটি কথা এই থাকে যে, তবে مادامت السموات والارض বলার প্রয়োজনই কি ছিল? ইহার উত্তর এই যে, যেমন কোন ব্যক্তিকে পুরস্কারস্বরূপ একটি গ্রাম দান করিয়া বলা হয়, যতদিন এই গ্রামের অস্তিত্ব আছে, ততদিন পর্যন্ত তুমি ইহার মালিক থাকিবে। এই ধরনের কথায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয় যে, ইহা আমার নিকট হইতে কেহ কখনও কাড়িয়া নিবে না। এস্থলে مادامت السموات والارض যোগ করার উদ্দেশ্যও ইহাই।

অতঃপর اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ সম্বন্ধে একটি সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, خالدين فيها বাক্যের ব্যাপকতা হইতে اِلَّامَاشَآءَ رَبُّكَ -কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই মর্মে অনুবাদ এই হয়—"সৌভাগ্যশালীগণ সর্বদার জন্য বেহেশ্‌তে থাকিবে, কিন্তু খোদা যখন

ইচ্ছা করেন।” ইহাতে সন্দেহ হয় যে, হয়তো কোন এক সময়ে চিরকালের জন্য বেহেশতে অবস্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে অথবা পড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। । ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি, اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ কথাটি خالدين فيها বাক্যের ব্যাপকতা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই; বরং اَلَّذِيْنَ سُعِدُوْا অর্থাৎ, যাহারা সৌভাগ্যবান—পদের ব্যাপকতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ এবং ما শব্দটি এখানে من -এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সারমর্ম এই—যাহারা সৌভাগ্যবান তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। কিন্তু যাহাকে খোদা ইচ্ছা করিবেন না সে বেহেশ্‌তে যাইবে না। অর্থাৎ, কোন কোন আমলকারী এমনও আছে, যাঁহাদিগকে আমরা সৌভাগ্যবান মনে করি, কিন্তু খোদার নিকট তিনি সৌভাগ্যবান নহেন। আল্লাহ্‌র শপথ, এই কথাটি সূফিগণের কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কেননা, কাহারও নিশ্চয়তামূলক খবর নাই যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে কিরূপ আছেন। تا یار کرا خواهد ومیلش بکه باشد “প্রিয়জন কাহাকে চায় এবং তাহার আকর্ষণ কাহার দিকে হয় কে জানে।”

সূরা-আ'রাফের এক আয়াতে ইব্‌নে-আব্বাস (রাঃ) الا ماشاء الله বাক্যে ما শব্দটিকে مَنْ -এর অর্থে বলিয়াছেন। এই আয়াতদ্বয়ে বাহ্যিক কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং এখানেও ما -কে من -এর অর্থে বলায় কোন ক্ষতি নাই! অতঃপর বেহেশ্‌তিগণের বেহেশতে চিরস্থায়ী অবস্থান সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা, এখানে চিরস্থায়ী অবস্থান হইতে اِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ কথাটিকে বাদ দেওয়া হয় নাই।

মাওলানা শাহ্ আবদুল কাদের ছাহেব (রঃ) এই আয়াতের অন্যরূপ এক তফসীর করিয়াছেন, যাহা খুবই বিচিত্র। সেই ব্যাখ্যার প্রতি কাহারও কল্পনা পৌঁছিতে পারে না। উহার সারমর্ম এই— الا ماشاء ربك কথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের চিরস্থায়িত্ব এবং বেহেশ্‌তবাসিগণের চিরস্থায়িত্বের পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, খোদা তা'আলার চিরস্থায়িত্ব কাহারও ইচ্ছার অধীন নহে, কিন্তু বেহেশ্‌তিগণের চিরস্থায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন। الاماشاء ربك বাক্যে শুধু এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, বেহেশ্‌তিগণের চিরস্থায়িত্ব স্বয়ংসম্পন্ন নহে; বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন। ইহার অর্থ এই নহে যে, তাঁহাদের বেহেশতে চিরস্থায়িত্ব কোন সময় লোপ পাইবে। কেননা, অন্যান্য আয়াতে একথা জানা গিয়াছে যে, বেহেশ্‌তবাসীদের চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা কখনও পরিবর্তন হইবে না। কাজেই তাঁহাদের চিরস্থায়িত্বও কোন সময় লোপ পাইবে না।

কিন্তু শাহ ছাহেবের উদ্দেশ্য তাঁহার এবারত হইতে সকলে বুঝিতে পারিবে না; সেই ব্যক্তি বুঝিবে, যে ব্যক্তি অবগত আছে যে, এখানে একটি সন্দেহ আছে, শাহ ছাহেব উহার নিরসন করিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে শাহ ছাহেব বড় সহজে ও সংক্ষেপে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অগাধ জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এক আর্য পণ্ডিত প্রশ্ন করিয়াছিল—খোদার অস্তিত্বও অসীম, অনন্ত এবং বেহেশ্‌তীদের অস্তিত্বও অসীম অনন্ত। তবে তো উভয়ে সমকক্ষ হইয়া গেল। এরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, খোদার অস্তিত্ব কালের পরিপ্রেক্ষিতে অসীম, অনন্ত। আর বেহেশ্‌তিগণের অস্তিত্ব অনন্ত হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁহাদের অস্তিত্ব লোপ করা হইবে না। কিন্তু শাহ ছাহেবের উত্তর সর্বাপেক্ষা উত্তম। তিনি বলিয়াছেনঃ খোদার অস্তিত্ব সত্তাগতভাবে অনন্ত। আর বেহেশ্‌তীদের অস্তিত্ব অপরের দ্বারা অনন্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত এই কয়েকটি সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করিলাম। এখন আয়াতের সারমর্ম বর্ণনা করিয়া বক্তব্য সমাপ্ত করিব।

সারকথা এই হইল যে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে আখেরাতের সুখ-শান্তির প্রতি মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন, যেন আমরা উহার বিষয় স্মরণ রাখিয়া আখেরাতের প্রতি উৎসাহী ও আগ্রহশীল হই এবং উহার জন্য চেষ্টা করি। আখেরাতের সুখ-শান্তি হাছিল করিবার পন্থা এই বলিয়া দিয়াছেন যে, আমরা সৌভাগ্য অর্জন করি অর্থাৎ, নেক আমল করিতে থাকি। এখান হইতে আমি তালেবে এল্‌মদের সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাহারা নিজ নিজ সংশোধনের প্রতি লক্ষ্য করুন। কেননা, আমি দেখিতেছি, আলেমগণ আজকাল এল্‌ম শিক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন। আমলের প্রতি গুরুত্ব দেন না এবং আমলের পূর্ণতালাভে যত্নবান হন না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতদসত্ত্বেও তাহারা নিজদিগকে নায়েবে রাসূল (দঃ) মনে করিয়া থাকেন। এই আমলশূন্য এল্‌ম দ্বারাই তাহারা নায়েবে নবী হওয়ার দাবী করিতেছেন? এই আমলশূন্য এল্‌মের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেনঃ

علم رسمی سربسر قیل است قال - نے ازو کیفیتے حاصل نه حال
علم چه بود آں که ره بنمایدت - زنگ گمراهی ز دل بزدایدت
ایں هوس ها از سرت بیروں کند - خوف وخشیت در دلت افزوں کند
تو ندانی جز یجوز ولا یجوز - خود ندانی که تو حوری یاعجوز
علم نبود غیر علم عاشقی - ما بقی تلبیس ابلیس شقی
علم چوں بر دل زنی یارے شود - علم چوں بر تن زنی مارے شود

অর্থাৎ, "রস্‌মী এল্‌ম শুধু দলিল—প্রমাণের সমষ্টি। ইহা দ্বারা অবস্থাও হাছিল হয় না, অবস্থার খবরও পাওয়া যায় না। ইহাতে ভ্রান্তি দূর হয় না। এল্‌ম অন্তরে ক্রিয়া করিলে বন্ধু হয়। উহার ক্রিয়া যদি দেহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সাপ হয়।"

সত্যিকারের এল্‌মঃ যে এল্‌ম আল্লাহ্ তা'আলার মা'রেফত লাভ হয় তাহাই সত্যিকারের এল্‌ম, তাহা আমল ভিন্ন লাভ করা যায় না। সুতরাং আমলবিহীন এল্‌ম মূর্খতার সমতুল্য।

علمے که ره حق نه نمایدت جهالت ست

"যে এল্‌ম তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ প্রদর্শন করে না তাহা মূর্খতা।"

ফলকথা, নিছক এল্‌মের উপর পরিতৃপ্ত হওয়া বড় ভুল। ওলামা এবং তোলাবাগণেরও আমলের প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তাহাতেই তাঁহাদের সৌভাগ্য লাভ হইবে। আজিকার ওয়াযের মজলিসে যেহেতু ওলামা এবং তোলাবাও উপস্থিত আছেন, সুতরাং তালেবে এল্‌মগণের প্রয়োজনে এই বিষয়টি বর্ণনা করিলাম। সারকথা এই যে, দুনিয়া এবং আখেরাতের শান্তি কামনা করিলে নেক আমলের দ্বারা সৌভাগ্য অর্জন কর। এমন সৌভাগ্য অর্জন কর, যাহাতে প্রথমবারেই বেহেশ্‌তে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হও এবং আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ সান্নিধ্য লাভ হয়। এল্‌মের সহিত আমল থাকিলেই তাহা এল্‌মে দ্বীন বলিয়া গণ্য হয়, যদিও শুধু এল্‌ম কিংবা শুধু আমলেও সৌভাগ্যের এক স্তর লাভ করা যাইতে পারে। কেননা, শুধু নাজাতের জন্য

ঈমান এবং ইসলামই যথেষ্ট। কিন্তু নিম্নস্তরের উপর ক্ষান্ত থাকা বা তৃপ্ত থাকা মহাভুল। কেননা, পরলোকের সামান্য আযাবও মহাযন্ত্রণাময়। আল্লাহ্‌র শপথ, তাহা বরদাশ্‌ত করিতে পারিবে না। সুতরাং পূর্ণ সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা কর। ইহা তখনই লাভ হইবে যখন দ্বীনী এল্‌মও শিক্ষা করিবে এবং তৎসঙ্গে আমলের প্রতিও গুরুত্ব দিবে।

এখন মরহুমের জন্য দো'আ করুন। আল্লাহ্ যেন তাঁহাকে আখেরাতের সুখ-শান্তি এবং তাঁহার জীবিত আত্মীয়-স্বজনকে ছবর ও শান্তি দান করেন।

আমি আশাকরি, ইন্‌শাআল্লাহ্, আমার এই বর্ণনায় তাঁহাদের শোকাতুর হৃদয়ে সান্ত্বনা আসিয়াছে। এই বিষয়টিকে চিন্তা করিতে থাকিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ তাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ণরূপে সান্ত্বনা ও শান্তি আসিবে। ইহার সঙ্গে আরও একটি তদবীর আছে—মরহুমের রোগ এবং এন্তেকাল সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিবেন। কেননা, সেই আলোচনায় মনে নূতন করিয়া আঘাত লাগিবে।

এখন আমি শেষ করিতেছি। দো'আ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে পূর্ণ সৌভাগ্য সুস্থ বোধশক্তি, এল্‌ম ও সুষ্ঠু আমলের তওফীক দান করুন। আমীন!

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

■ সমাপ্ত ■

মুজাফ্‌ফরনগর
১৬ই শাবান, ১৩৩৭ হিজরী